দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি

দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি

মধ্যশিক্ষাপর্ষদের নবপ্রবর্তিত সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী অনুসারে
নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত

(Vide Notification No. SYL/1/62, dated 30th March, 1962)

দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি

শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী

এম.এ. (ইতিহাস), বি.টি., এম.এ. এডুকেশান (লণ্ডন)
এ.বি.পি.এস. (লণ্ডন)

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ ; বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ; বর্তমানে হুগলি গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ

ও

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, এম. এড.

ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা বিভাগীয় প্রধান, এনডোলা, জাম্বিয়া
ভূতপূর্ব ইতিহাসের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, গণ্ডার, ইথিওপিয়া
ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক, ম্যাকউইলিয়ম উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
আলিপুর দুয়ার

2 copies

সংশোধিত সংস্করণ

ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড
২৯৪ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৯৭১

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দশম-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাস এবং ভূগোল এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে সামাজিক জ্ঞান (Social Studies) আবশ্যিক পাঠ্যরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। একাদশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে অবশ্য এ সুযোগ পূর্ব হইতেই ছিল। দশম-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি যে সাগ্রহে এই সুযোগ গ্রহণ করিবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

ইতিহাস এবং ভূগোল এই দুইটি বিষয়ই অনেক ছাত্রছাত্রীর নিকট নীরস এবং দুরূহ। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে একটি বিষয় পাঠের অনুমতিকে সুযোগই বলিতে হয়। ইতিহাস এবং ভূগোলের (বিশেষ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে যে ধরনের পাঠ্যসূচী) দুরূহ তাত্ত্বিক জ্ঞানের স্থলে দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়িত 'সামাজিক জ্ঞান' (Social Studies)এর ব্যবহারিক জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা তাহাদের নিকট সহজতরও মনে হইবে। তাই, বিদ্যালয়ে সামাজিক জ্ঞান পাঠের প্রবর্তন করিলে, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তো সহজ হইবেই, অধিকন্তু তাহারা দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক বাস্তবজ্ঞানও সংগ্রহ করিতে পারিবে—শিক্ষালাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে। সামাজিক জ্ঞানের বিষয়বস্তু এমনই যে, শুধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কেন, দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভেচ্ছু যে কোনো ব্যক্তি এই বিষয় পাঠে উপকৃত হইবেন।

নূতন বিষয় বলিয়া, এই বিষয়ে পাঠদান করা কঠিন হইবে বলিয়া শিক্ষক মহাশয়দের মনে করার কোনো কারণ নাই। এই পুস্তকে যে সকল বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা অতি সহজ ও সুললিত ভাষায় ছাত্রদের জন্য পরিবেষিত হইয়াছে। 'Exercises'গুলি ছাত্রদের

দ্বারা করাইয়া, পরিবেষিত জ্ঞান সংহত করিতে পারিলেই, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে।

বস্তুতপক্ষে, পুস্তকখানি অনেকটা Self-study Readerএর মতো করা হইয়াছে। ছাত্ররা যাহাতে নিজেরা পুস্তকখানি পড়িয়া বুঝিতে পারে তাহার জন্য প্রচুর দৃষ্টান্ত, মানচিত্র, ছবি ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে।

কিভাবে Scrap-book রক্ষা করিতে হয়, কিভাবে Project পরিচালনা করিতে হয়, এইসব বিষয়েও পুস্তকে বাস্তব নির্দেশ দেওয়া আছে। ঐসব নির্দেশ অনুসরণ করিয়া ছাত্ররা অনেকটা শিক্ষক-নিরপেক্ষভাবেও কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। পুস্তকের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের (Objective Tests) উত্তর সংগ্রহ করাও এক ধরনের হাতে-কলমে কাজ এবং ইহা পাঠ-শিক্ষায় সাহায্য করে। প্রত্যেক পাঠের শেষে কিছুসংখ্যক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে ; এইগুলি অনুশীলন করিলে ছাত্ররা যথেষ্ট লাভবান হইবে।

আর একটি কথা, Scrap-book এবং Projects সম্বন্ধে যেসব কাজের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সব কিছুই যে করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হইবে এবং অন্তত একটি Project গ্রহণ করিতে হইবে। ছাত্রদের ইচ্ছা, বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কাজ গ্রহণ করিলেই চলিবে।

সংক্ষেপে, শিক্ষক মহাশয়ের মোটামুটি পরিচালনা থাকিলেই ছাত্ররা এই বিষয়ের পাঠে সাফল্যলাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃত শিক্ষা এবং সহজে পরীক্ষা পাশের মধ্যে যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই, এই পুস্তকের মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ তাহা প্রমাণ করিবে বলিয়া ভরসা করি।

১লা অক্টোবর, ১৯৬২ **গ্রন্থকারদ্বয়**

সংশোধিত সংস্করণের ভূমিকা

পুস্তকখানি আগাগোড়া বিশেষভাবে সংশোধন করা গেল। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে জিজ্ঞাসিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই পুস্তকখানিতে দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকটির পৃষ্ঠার উল্লেখ করিয়া উত্তর-সংকেত দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৮ সাল অবধি পরিসংখ্যান তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পরীক্ষার প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া পুস্তকটির অনেক জায়গা সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। পুস্তকখানি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক মহলে আরও বেশী আদৃত হইবে বলিয়া আশা রাখি।

২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭১ গ্রন্থকারদ্বয়

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় ভাগ

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

আমাদের জাতীয় সরকার

আজিকার ভারত

প্রথম ভাগ

ভূমিকা

আমাদের দেশ ও আমরা

আমাদের দেশ—ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-লৌহিত্য বিধৌত, সাগরপর্বতধৃত এই সুবিশাল দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের জীবন সার্থক। 'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে' যুগ যুগ ধরিয়া আর্যদের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপীয়দের অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিচিত্র জন কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা এই দেশে আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং একে একে ধীরে ধীরে কিভাবে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারায় বিলীন হইয়া ইহাকে সমৃদ্ধতর করিয়াছে। জ্ঞানে গুণে গরিমায় অর্থসম্পদে কর্মক্ষমতায় একদিন এই দেশ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। আজিও যখন পৃথিবী যুদ্ধভয়পীড়িত তখন 'মহামিলনের গান' এই দেশেই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে; 'শান্তির ললিতবাণী'র আশায় বিভিন্ন জাতি এই দেশের দিকেই তাকাইয়া আছে।

ভৌগোলিক পটভূমি—এশিয়ার দক্ষিণ দিকে পূর্ব গোলার্ধের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ভারতবর্ষ অবস্থিত। ইহার উত্তরে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ, দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের অপর পারে আফ্রিকা, আর দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগরের অপর পারে ওসেনিয়া। ফলে, ভারতবর্ষের সহিত এই তিন মহাদেশেরই যোগাযোগ বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে।

অবস্থান

উত্তরে ও দক্ষিণে বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা আমাদের এই দেশ সীমিত। ইহার উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়, আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরবসাগর। পূর্ব দিকে পূর্ব পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশ, আর পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের সীমা নির্দেশ করিতেছে। বস্তুত, আজিকার রাষ্ট্রীয় সীমা যাহাই হউক, তিনদিকে সুউচ্চ পর্বত আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র—এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূখণ্ডই প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ভারতবাসীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি। ইহাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত হইবার সুযোগ দিয়াছে।

সীমা

ভারত ও ইউরোপ
আয়তনের তুলনা

আকৃতি

ভারতের আকৃতি দেখিতে অনেকটা ত্রিভুজের মতো। তবে ইহার উত্তর-দক্ষিণে বা পূর্ব-পশ্চিমে দুই দিকেই দীর্ঘতম দূরত্ব প্রায় সমান (প্রায় ৩২১৮ কিলোমিটার)। এই কারণেই বোধ হয় এদেশীয় তথা বিদেশীয় পণ্ডিতরা প্রাচীনকালে এই দেশকে ত্রিভুজের দ্বারাই বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়তন

আমাদের এই দেশের আয়তন প্রায় ৩০,৫৩,৫৯৭ বর্গ কিলোমিটার। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র এবং চীন সাধারণতন্ত্রের পরেই ইহার স্থান। পৃথিবীর মধ্যে আয়তনে ইহার স্থান অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে অষ্টম। পাকিস্তান অপেক্ষা আমাদের দেশ প্রায় সাড়ে তিন গুণ এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ অপেক্ষা বারো গুণ বড়ো। বস্তুত, রাশিয়াকে বাদ দিলে গোটা ইউরোপ মহাদেশটাই আমাদের এই দেশের সমান।

জনসংখ্যা—আয়তনে ভারতবর্ষ যথেষ্ট বড়। তাই উহাকে অনেক সময় উপমহাদেশ বলা হয়। কিন্তু আয়তনের তুলনায়, ভারতে লোকসংখ্যা আরও বেশী। রাষ্ট্রসংঘের ১৯৬৫ সালের পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জিতে, ভারতের

জনসংখ্যা ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ দেখানো হইয়াছে। লোকসংখ্যার দিক হইতে, ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে (চীন—প্রথম) পৃথিবীর স্থলভাগের ২·৪% ভারতবর্ষে পড়িয়াছে, কিন্তু ঐটুকু স্থানেই, পৃথিবীর ১৫% লোক বাস করে। পৃথিবীর প্রতি ৭ জন মানুষের মধ্যে একজন ভারতীয়। শুধু তাহাই নহে, ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। আগামী ২৫।২৬ বৎসরের মধ্যে ইহা দ্বিগুণ হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এক দিকে জন্মের হার ভারতবর্ষে খুব বেশী, অপর দিকে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে অন্যান্য সভ্য দেশের মত ভারতবাসীর পরমায়ুও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯০১ সালে ভারতে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি ১,০০০-এ ৪২.৬। ১৯৬৬ সালে উহা কমিয়া ২১ হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৩১ সালে ভারতীয়দের গড় আয়ু ছিল ৩২ বৎসর এবং ১৯৬১ সালে ইহা বাড়িয়া ৪২ বছরে দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক এই বিপুল জনসংখ্যা একদিকে ভারতের সম্পদও বটে, আবার অপর দিকে ইহা তাহার অন্যতম প্রধান সমস্যাও বটে। জনসংখ্যাকে যদি যথাযথভাবে শিক্ষিত ও চারিত্রিক গুণাবলীতে উন্নত করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগানো যাইত, তাহা হইলে উহা ভারতকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করাইতে পারিত। কিন্তু বর্তমান সামাজিক, নৈতিক এবং অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে ইহা সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়। ফলে ভারতের বিপুল জনসংখ্যা তাহার দারিদ্র্যের এবং দুঃখ-কষ্টের

অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে ভারতবর্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহার লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেছে।

ভূ-প্রকৃতি—নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই সুবিশাল দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশও বৈচিত্র্যময়। এদেশের বিভিন্ন অংশের ভূ-প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান, সেই অনুযায়ী এই দেশকে চারিটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—(১) উত্তরের ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল, (২) উত্তর ভারতের নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চল, (৩) মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, এবং (৪) উপকূলের নিম্নভূমি অঞ্চল।

১। **উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলকে** সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। (ক) পশ্চিমে পামির মালভূমি হইতে উত্তর প্রদেশের পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলকে হিমালয়ের পশ্চিম অঞ্চল বলা হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে পার্বত্য অঞ্চল এবং ইহার বিস্তার প্রায় ২৫০ মাইল। এই অঞ্চলের দক্ষিণ দিকের পর্বতশ্রেণী বেশী উঁচু নহে; ইহা নিম্ন হিমালয় নামে পরিচিত। ইহাদের উচ্চতা ২০০০ হইতে ৫০০০ ফুটের মধ্যে। এই পর্বতশ্রেণীর উত্তরদিকে বেশ বড় একটি উপত্যকা আছে। ইহা বেশ উর্বর। দেরাদুন শহর এই উপত্যকায়ই অবস্থিত।

নিম্ন হিমালয়ের উত্তরাংশের পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশী—৬০০০ হইতে ১৫০০০ ফুটের মধ্যে। উচ্চতার দিক হইতে বিচারে ইহা মধ্যম বলিয়া, ইহাকে মধ্য হিমালয় বলা হয়। হিমালয়ের বিখ্যাত কাশ্মীর উপত্যকা এই অঞ্চলে অবস্থিত। কাশ্মীর উপত্যকার উত্তরের পর্বতশ্রেণী সব চাইতে উঁচু, গড়ে ২০,০০০ ফুট। তাই ইহাকে বলা হয় প্রধান হিমালয়।

(খ) নেপাল হইতে আসাম পর্যন্ত পর্বতাঞ্চলকে হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল বলা হয়। এখানে পর্বত অঞ্চলের বিস্তার পশ্চিম অঞ্চল হইতে কম—১৫০ হইতে ২০০ মাইলের মধ্যে। হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গগুলি পূর্বদিকেই বেশী।

হিমালয়ের প্রধান প্রধান গিরিশৃঙ্গ ও তাহাদের উচ্চতা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

পশ্চিমাংশ			পূর্বাংশ		
১।	নাঙ্গা পর্বত ;	২৬,৬০০ ফুট	৪।	এভারেষ্ট ;	২৯,১৪২ ফুট
২।	নন্দা দেবী ;	২৫,৬০০ ফুট	৫।	কাঞ্চনজঙ্ঘা ;	২৮,১০০ ফুট
৩।	কামেট ;	২৫,৪০০ ফুট	৬।	মাকালু ;	২৭,৮০০ ফুট
			৭।	গোঁসাইস্থান ;	২৬,৩০০ ফুট
			৮।	ধবলগিরি ;	২৬,৮০০ ফুট

উত্তরের এই পর্বতমালার অবস্থান ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু এই পার্বত্য অঞ্চলে বাধা পায় বলিয়াই যেমন এই দেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়, তেমনি শীতকালে উত্তরের শীতল বায়ুও এই পর্বতমালায় বাধা পায় বলিয়াই এই দেশে অধিক শীত হইতে পারে না। এই পর্বতমালার বরফ-গলা জল ও বৃষ্টির জলের ধারাই এই দেশের বহু নদ-নদীর উৎস। আর এই নদ-নদীই সৃষ্টি করিয়াছে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ পলিগঠিত সমভূমি, সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে সেখানকার কৃষি ও শিল্পের উন্নতির, নৌপথে যাতায়াতের সুবিধার। সাম্প্রতিককালে এই সকল নদীর পার্বত্য অংশে জল-বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের সুবিধা হইয়াছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের প্রচুর বনজ সম্পদ এই দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এই পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গমতাই এই দেশকে স্থলপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে অনেক সময় রক্ষা করিয়াছে। অবশ্য একই কারণে স্থলপথে এদেশের বহির্বাণিজ্যও কোনোদিনই বেশী হইতে পারে নাই।

উত্তর ভারতের নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চল ও তাহার প্রভাব

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণে রহিয়াছে বিস্তীর্ণ পলিময় সমভূমি। ইহার পশ্চিম প্রান্তে আরাবল্লী পর্বত আর তাহার পশ্চিমে থর মরুভূমি। পূর্ব-পশ্চিমে এই সমভূমি ১৫০০ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে ১৫০ – ২৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের উত্তর পূর্বে সামান্য একটু উঁচু ভূমিতে ভারতের রাজধানী দিল্লী অবস্থিত। এই উচ্চ ভূমিকে দিল্লী শৈলশিরা (Delhi-Ridge) বলা হয়। এই অঞ্চলের ভূমি পলিগঠিত বলিয়া উর্বর এবং প্রতি বৎসরই বৃষ্টি ও বন্যার ফলে এখানে নূতন পলি সঞ্চিত হয়। ফলে, এই অঞ্চল চাষের পক্ষে

অত্যন্ত সুবিধাজনক। নদীগুলি এখানে শান্ত বলিয়া যেমন নাব্য তেমনি জলসেচনের জন্যও উপযোগী। এই বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল স্থলপথ, রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণের পক্ষেও সুবিধাজনক। সেইজন্যই এখানে বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য নগরাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। একই কারণে লোকবসতিও এই অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী।

মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও তাহার প্রভাব

সমভূমি অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণেই মধ্য ভারত ও সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে এক বিরাট মালভূমি। মধ্য ভারত মালভূমি পশ্চিমে

মালব, মধ্যাংশে বুন্দেলখন্দ এবং পূর্বে ছোটনাগপুরের মালভূমি নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের মালভূমির সহিত ইহা বিন্ধ্য পর্বতমালাদ্বারা বিচ্ছিন্ন। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পশ্চিমদিকে বিস্তৃত সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা আর পূর্বদিকে বিস্তৃত মলয়াদ্রি বা পূর্বঘাট পর্বতমালা দক্ষিণে মহীশূরের দক্ষিণপ্রান্তে নীলগিরিতে মিলিত হইয়াছে। সেখান হইতে আন্নামালাই, পাল্নি ও কার্ডামম পর্বত আরও দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চল প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূভাগের অন্তর্গত এবং আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলাদ্বারা গঠিত বলিয়া এই অঞ্চলেই এদেশের প্রায় সমুদয় খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। আবার ইহার উত্তর-পশ্চিমের যে অংশ প্রধানত লাভা দ্বারা গঠিত সেই অঞ্চল বিশেষ উর্বর বলিয়া সেখানে চাষাবাদের সুবিধাও রহিয়াছে। এখানকার নদীগুলি খরস্রোতা বলিয়া যদিও নাব্য নয়, কিন্তু জল-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী। এখানকার পার্বত্য অংশও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু এখানকার বেশীর ভাগ অঞ্চলেই চাষাবাদের সুবিধা কম বলিয়া এখানে লোকবসতি উত্তরের সমভূমি অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম ; ফলে, নগরাদিও কম।

উপকূলের নিম্নভূমি অঞ্চল ও তাহার প্রভাব

উপকূলের সমভূমি অঞ্চল পূর্বদিকে বেশ প্রশস্ত হইলেও (প্রায় ১৬১ কিলোমিটার চওড়া), পশ্চিমে সংকীর্ণ (প্রায় ৪৮-৪৬ কিলোমিটার মাত্র)। প্রধানত উর্বর পলির দ্বারা গঠিত বলিয়া এই অঞ্চল কৃষিকার্যের অত্যন্ত উপযোগী। মৎস্য ব্যবসায়ের জন্যও এই অঞ্চল সুবিধাজনক ; বিশেষতঃ পূর্ব উপকূলে প্রচুর শঙ্খ ও মুক্তা পাওয়া যায়। উত্তরের সমভূমির পরেই এখানে জীবিকা অর্জনের সুবিধা বেশী বলিয়া এখানে লোকবসতিও বেশ ঘন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়াছে এদেশের অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী। উত্তর ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু। গঙ্গার অসংখ্য উপনদী ও শাখানদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যমুনা, শোণ, গোমতী, সরযূ, গণ্ডক, কুশী, মহানন্দা, ভাগীরথী প্রভৃতি। ইহার শেষ গতিতে পদ্মা নামে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবাহিত। লোহিত, সুবর্ণশ্রী, তোর্সা, তিস্তা প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। সিন্ধুর ডান দিকের উপনদীগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত। ইহার বামতীরের উপনদীর মধ্যে বিতস্তা,

নদ-নদী

চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু প্রধান। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি উত্তর ভারতের নদীগুলির তুলনায় ক্ষুদ্র এবং সারা বৎসর ইহাদের উপত্যকাতে জলও থাকে না। ইহাদের মধ্যে প্রধান নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, পেন্নার, পেরিয়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই নদীগুলিই এদেশের প্রাণ। ইহারাই উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া উত্তরের সমভূমি ও উপকূলের সমভূমি অঞ্চলকে গড়িয়াছে। ইহারাই এদেশের আশীর্বাদ। ইহাদেরই তীরে তীরে ভারতীয় সভ্যতার জয়যাত্রা, মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম-নগরের উদ্ভব, শিল্প-

সাহিত্য-ধর্ম-কর্মের বিকাশ। এদেশের শস্যসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উত্তর ভারতের নদীগুলি এবং বর্ষাকালে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি সাম্প্রতিক কালে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎসে পরিণত হইয়াছে।

আমাদের এই সুবিশাল দেশের জলবায়ুও বৈচিত্র্যময়। মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষ উষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত। তবে উত্তর ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশেই (পাঞ্জাব ও রাজস্থানে) গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর। অন্যত্র গ্রীষ্মের বায়ু উষ্ণ জলীয়। আবার সমুদ্র-সান্নিধ্যের ফলে দক্ষিণ ভারতে শীত-গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য খুবই কম, কিন্তু উত্তর ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে এই পার্থক্য খুব বেশী।

জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক পার্থক্যের কারণ

এদেশের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বায়ুপ্রবাহেরও দিক পরিবর্তন ঘটে। এই বায়ুপ্রবাহের নাম মৌসুমী বায়ু। শীতকালে উত্তর দিকে পার্বত্য অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে উচ্চচাপ থাকে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণে চাপ কমিয়া যায়। ফলে, বায়ু সাধারণতঃ উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। আবার গ্রীষ্মকালে ভারতের উত্তর অঞ্চলে নিম্নচাপ থাকে এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে বায়ুর চাপ থাকে বেশী। ফলে বায়ু তখন দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে ভারত মহাসাগর হইতে আগত বায়ুপ্রবাহকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বলে। এই মৌসুমী বায়ুর দুইটি শাখা, একটি আরব সাগর হইতে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত হইয়া চলে, এবং অপরটি বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারতবর্ষে শতকরা ৯০ ভাগ বৃষ্টি ঘটাইয়া থাকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরবসাগরীয় শাখা, সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প লইয়া প্রথমই পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বাধা পায় এবং সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। তাই এইস্থানে বৃষ্টিপাতের হার উচ্চতম (২০০ সেন্টিমিটারের উপরে)।

গ্রীষ্মকালে ভারত মহাসাগর হইতে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু-প্রবাহ পশ্চিম ভারতের উপকূলে পৌঁছিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বৃষ্টি শুরু হয়। ক্রমে এই বায়ুপ্রবাহ আরও উত্তরে অগ্রসর হইলে সেখানে বৃষ্টি শুরু হয়। একই সময়ে বঙ্গোপসাগর হইতে আগত

বায়ুপ্রবাহের ফলে পূর্ব ভারতের দেশগুলিতে বৃষ্টিপাত হয়। এই বায়ু যখন সেখান হইতে ঘুরিয়া ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়, তখন স্বভাবতই পশ্চিমদিকে বৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া যায়। শীতকালে যে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তাহা স্থলভাগ হইতে আগত বলিয়া তখন এদেশে বৃষ্টি হয় না। তবে ঐ বায়ু যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন যে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায় তাহার ফলে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতবর্ষকে মোটামুটি নিম্নলিখিত অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। **অতিবৃষ্টি অঞ্চল:** বছরে ২০৩ সেন্টিমিটার বা ৮০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হইলে ঐ সব অঞ্চলকে অতি বৃষ্টির অঞ্চল বলা যাইতে পারে। মালাবার উপকূল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগ, আসাম ও হিমালয়ের পাদদেশ অতিবৃষ্টি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

২। **প্রচুর বৃষ্টি অঞ্চল:** বৎসরে ১৫৩-২০৩ সেঃ মিঃ বা ৬০ হইতে ৮০ ইঞ্চির ভিতর বৃষ্টিপাত হইলে উহাকে প্রচুর বৃষ্টি অঞ্চল বলা যাইতে পারে। ইহা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত নহে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত। দক্ষিণ বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম ভাগ প্রচুর বৃষ্টি অঞ্চলে পড়ে।

৩। **মধ্যম বৃষ্টি অঞ্চল:** বছরে ১০২-১৫৩ সেঃ মিঃ বা ৪০ হইতে ৬০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি হইলে, সেই অঞ্চলকে মধ্যম বৃষ্টি অঞ্চল বলা যাইতে পারে। এই বৃষ্টি পর্যাপ্ত পরিমাণ না হইলেও, চাষবাসের তেমন অসুবিধা হয় না। মধ্যপ্রদেশের কিছুটা অংশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজের মধ্যভাগ মধ্যম বৃষ্টি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

৪। **স্বল্প বৃষ্টি অঞ্চল:** বৎসরে ৫১-১০২ সেঃ মিঃ বা ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চির মধ্যে বৃষ্টিপাত হইলে, সেই অঞ্চলকে স্বল্প বৃষ্টি অঞ্চল বলে। উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিছুটা অংশ এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। দিল্লীতে বৎসরে ২৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

৫। **অত্যল্প বৃষ্টি অঞ্চল:** বৎসরে ৫১ সেঃ মিঃ বা ২০ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হইলে, সেই অঞ্চলকে অত্যল্প বৃষ্টির অঞ্চল বলা হয়। বৃষ্টির অভাবে এই সকল অঞ্চলে চাষবাসের খুবই অসুবিধা হয়। রাজস্থান এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। বিকানীরে বছরে বৃষ্টিপাত হয় মাত্র ১২ ইঞ্চি।

৬। **হেমন্ত ও শীতকালে মধ্যবৃষ্টি অঞ্চল :** হেমন্তকালে গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু যখন ফিরিয়া যায়, তখন অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালেও ঐসব অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।

ভারতে ঋতু পরিবর্তন

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ফলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে, পৃথিবীর যে কোন নির্দিষ্ট স্থান সূর্য হইতে বিভিন্ন রূপ তাপ পাইয়া থাকে। প্রধানতঃ ইহার ফলে ঐ স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতু উপস্থিত হয়। এই নিয়ম অনুসারেই ভারতেও ঋতু পরিবর্তন হইয়া থাকে।

১। **শীতকাল :** ডিসেম্বর—জানুয়ারী (পৌষ-মাঘ), উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী অঞ্চলে সূর্যরশ্মি হেলানোভাবে পতিত হয়। ফলে সূর্যের উত্তাপ কম হওয়ায় উত্তর গোলার্ধের সর্বত্রই ঐ সময় শীতকাল। পৌষ-মাঘ মাস ভারতেও শীতকাল। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারত নিরক্ষরেখার অধিকতর নিকটে অবস্থিত বলিয়া, শীতকালে ঐ স্থানের উষ্ণতা, উত্তর ভারত হইতে অনেক বেশী হয়। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থানের উষ্ণতা শীতকালেও ৭৫°-৮০° ফা থাকে, অথচ উত্তর ভারতে পাঞ্জাবে উত্তাপ ঐ সময় ৫০° হইতে ৫৫° ফা মধ্যে নামিয়া আসে। হিমালয় অঞ্চলে তখন অনবরত তুষারপাত হয়। তুতিকোরিনে জানুয়ারীর গড় তাপমাত্রা প্রায় ৮০° ফা, অমৃতসরে ৫৫° ফা এবং কাশ্মীরের অন্তর্গত লেহ্ শহরে ১৭·৩ ফা। পশ্চিমবঙ্গে শীত কিন্তু, উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে অনেক কম থাকে কারণ পশ্চিমবঙ্গ সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত। শীতকালে ভারতের সর্বত্রই গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করা যায়।

২। **বসন্তকাল :** শীতের পরই আসে বসন্তকাল। মার্চমাসে (ফাল্গুন) সূর্যের কিরণ নিরক্ষরেখার আশে-পাশে লম্বভাবে পড়ে। দক্ষিণ ভারত নিরক্ষরেখার খুব নিকটে রহিয়াছে ; তাই মার্চের শেষ হইতেই সেখানে শীত কমিতে আরম্ভ করে। এবং প্রায় তখন হইতেই ভারতের সর্বত্র শীত কমিয়া, এপ্রিল মাসের (চৈত্র) আরম্ভ পর্যন্ত, একটা আরাম-দায়ক অবস্থা থাকে। তখনই গাছে গাছে নূতন পাতা জন্মায় ও বহু ফুল ফোটে। এই সময়কে বসন্তকাল বলে।
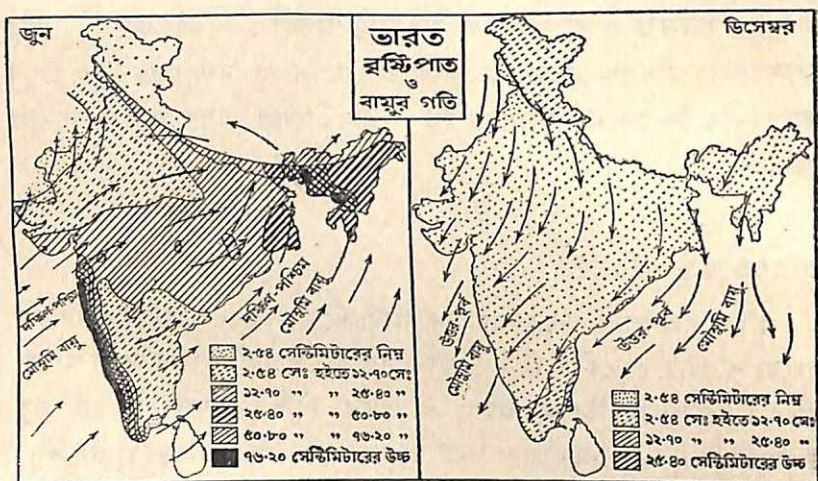
৩। **গ্রীষ্মকাল ঃ** মার্চ মাসের পর হইতেই সূর্য-রশ্মি ক্রমশঃ নিরক্ষ-রেখার, অধিক উত্তরদিকে লম্বভাবে পতিত হয়, আর জুনমাসে তাহা কর্কটক্রান্তির আশে পাশে লম্বভাবে পড়ে। তাই এপ্রিল মাসের (চৈত্র) শেষ হইতেই ভারতের সর্বত্র গরম পড়িতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ মে-জুন মাসকে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) আমাদের দেশে গ্রীষ্মকাল বলে। তবে ভারতের বিভিন্নস্থানে তাপের বৃদ্ধির মধ্যে সময়ের কিছু তারতম্য থাকে। দক্ষিণ ভারতে মার্চ মাসে বায়ুর তাপ থাকে এদের মধ্যে সব চাইতে বেশী ; মধ্য ভারতে এপ্রিল মাসে উষ্ণতা হয় সর্বাধিক। কিন্তু উত্তর ভারতে মে-জুন মাসেই তাপ হয় অসহ্য। তখন পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি স্থানে ৯০°-৯৫° ফা বেশী উত্তাপ হয়। রাজস্থান, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ ও দক্ষিণ পাঞ্জাবে দিনের উত্তাপ ১১৮° ফা—১২৫° ফা পর্যন্ত হয়। কিন্তু, সিমলা, দার্জিলিং, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি শৈলাবাসে স্থানের উচ্চতার জন্য উত্তাপ বেশী হইতে পারে না। প্রচণ্ড উত্তাপের জন্য উত্তর ভারতের অনেক স্থানেই গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা ঘর হইতে বাহির হওয়া যায় না। কঠোর পরিশ্রম করার জন্য গ্রীষ্মকাল এদেশে একেবারেই অনুকূল নহে।

৪। **বর্ষাকাল ঃ** মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলেই, এদেশে বর্ষাকাল সুরু হয়। সাধারণতঃ জুলাই-আগষ্ট (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসই আমাদের দেশে বর্ষাকাল। বর্ষাকালে দেশের কোথায় কোন বৃষ্টিপাতের তারতম্য হয় তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

৫। **শরৎকাল:** জুনমাসের পর হইতেই সূর্যের কিরণ, কর্কটক্রান্তি হইতে ক্রমশঃ আরও দক্ষিণদিকে লম্বভাবে পতিত হইতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে তাহা নিরক্ষরেখার আশে পাশে লম্বভাবে পতিত হয়। ফলে আগষ্ট মাস (ভাদ্র) হইতেই আমাদের দেশে গরম কমিতে থাকে এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (আশ্বিন-কার্তিক) মাসে আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক হইয়া উঠে। ঐ সময়কে শরৎকাল বলে। এই শরৎকালেই বাঙ্গালীর প্রিয়তম উৎসব দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

এই জলবায়ুর প্রভাবেই এই দেশের বিভিন্ন অংশে উদ্ভিদের মধ্যেও
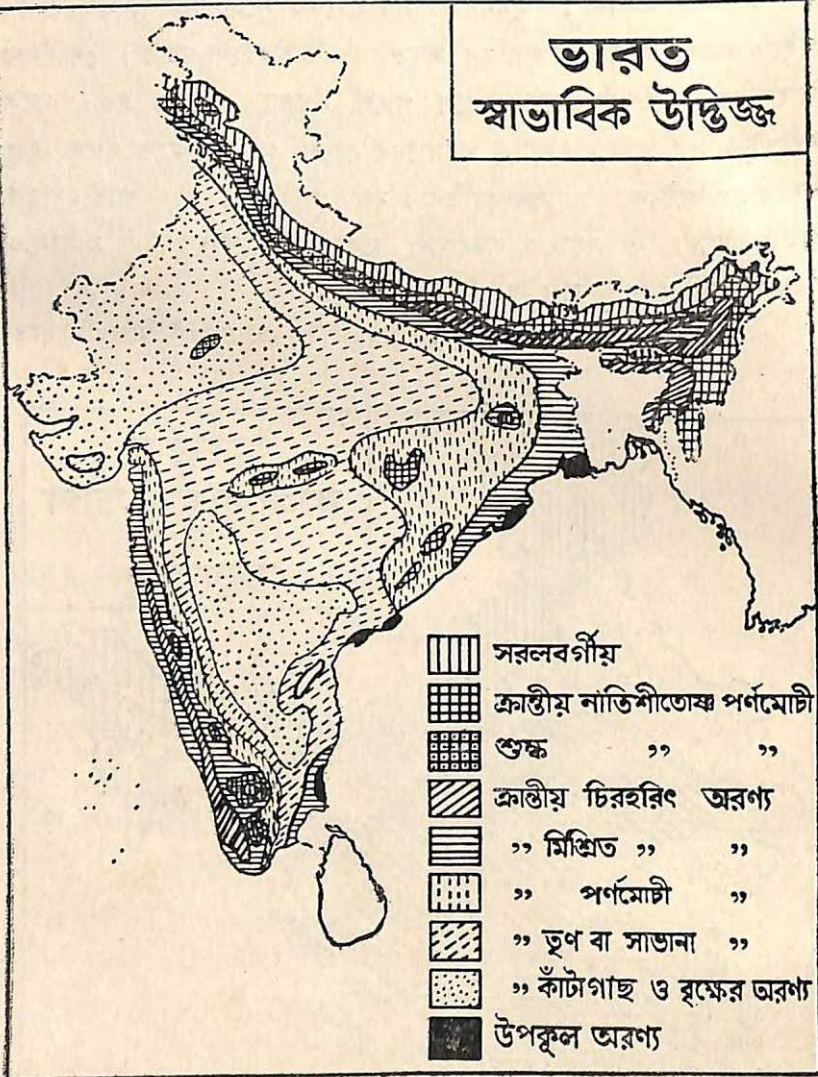
বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে এবং পশ্চিমঘাটের পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী সেখানে গর্জন, শিশু, আবলুস, রবার প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের বন। এখানে চিতাবাঘ, বন্য হাতী, গণ্ডার, ভাল্লুক প্রভৃতি পশুর বাস। ইহাদের চামড়া ও হাতীর দাঁত বিশেষ মূল্যবান। হিমালয়ের পাদদেশে কতক অংশে এবং পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও

বনজ সম্পদ

দাক্ষিণাত্যের যেসকল স্থানে বৃষ্টিপাত মাঝারি রকমের সেখানে সেগুন, শাল, অর্জুন, খয়ের, শিমূল, প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। শুষ্ক ঋতুতে এই সকল বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া পড়ে, তাই ইহাদিগকে পর্ণমোচী বৃক্ষ বলে। এই সকল বনে হরিণ, বাঘ, শূকর প্রভৃতি পশু বাস করে। ইহাদের চামড়া, শিং, চর্বি প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। হিমালয়ের নিম্ন অংশে পাইন, দেবদারু প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছের বন। এখানে হরিণ, বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতির বাস। উপকূল অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী, কেয়া, তাল, সুপারী, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছ। এছাড়া মধ্য প্রদেশ হইতে পশ্চিমে বোম্বাই পর্যন্ত এবং পাঞ্জাবের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত যেখানে বৃষ্টি স্বল্প সেখানে শুধু তৃণ ও গুল্ম জন্মে। সেখানে শুধুমাত্র খরগোস ও বন্য ছাগের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রাজস্থান ও আশপাশের শুষ্ক অঞ্চলে সামান্য তৃণ এবং কাঁটাগাছ মাত্র জন্মে।

আমরা ও পৃথিবী

বিশেষ করিয়া ভৌগোলিক অবস্থানের নিমিত্ত এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। এই কার্যে স্থল এবং জল উভয় পথই ব্যবহৃত হইত। ভারতের পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক সমুদ্র বেষ্টিত বলিয়া সমুদ্র পথে অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাহার পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলির সহিত যাতায়াত ছিল। ইউরোপ, আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এমন কি চীন পর্যন্ত, সমুদ্র পথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত।

স্থলপথেও বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ কঠিন ছিল না। ভারতের উত্তর দিকে, আপাতদৃষ্টিতে দুর্ভেদ্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অনেকগুলি গিরিপথ রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে জোজিলা ও কারাকোরাম গিরিপথ বিখ্যাত। ইহাদের ভিতর দিয়া তিব্বতের সহিত ভারতের যোগাযোগ রহিয়াছে। আরও পূর্বে আমরা লিপফা গিরিপথ দেখিতে পাই। দার্জিলিং অঞ্চলে জেলেপ্ লা ও নাথুলা গিরিপথ রহিয়াছে। এইসব গিরিপথের মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন এমন কি ইউরোপের সহিতও ভারতের যোগাযোগ হইয়াছে।

সুয়েজ খাল কাটার পর ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। জাহাজ চলাচল পথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন মহাদেশ আমেরিকার সহিতও ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকটি প্রধান বিমানপোত কোম্পানীর বিমানসমূহ নিয়মিতভাবে এদেশের উপর দিয়া যাতায়াত করে বলিয়া ইহাদের মারফত ভারতের পক্ষে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত ও তাহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ হইয়াছে।

অধুনা আফ্রিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে তাহাদের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়িয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে সমগ্র বিশ্বে আমাদের মর্যাদাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সহিত আমাদের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধও গড়িয়া উঠিতেছে। সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী, গান্ধী-শতবার্ষিকী প্রভৃতি পালন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সমগ্র বিশ্বের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলা স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিও বটে।

রাজনৈতিক পটভূমি

প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজের অধীনে থাকিবার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট আমাদের এই দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তবে সেই দিনই এদেশের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের মুসলমান প্রধান অংশ লইয়া নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রও গঠিত হইয়াছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে এই দেশ এক স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে (Sovereign Democratic Republic) পরিণত হইয়াছে এবং ভারতীয় সংবিধান (Constitution) চালু হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠন

দেশ বিভাগের সময় ভারতবর্ষে এগারোটি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ, পাঁচটি চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ এবং ছয়শ'র বেশী দেশীয় রাজ্য ছিল। পরবর্তীকালে ঐসব রাজ্যগুলি ধীরে ধীরে নিকটবর্তী রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, বা কতকগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া রাজপ্রমুখ-শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই দেশে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবী ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এই দাবী মানিয়া রাজ্যসমূহের পুনর্গঠনের

ব্যাপারে মতামত দেবার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করেন। এবং এই কমিশনের মতামতের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য রাজ্যসংখ্যা হয় বিশটি। ইহাদের মধ্যে চৌদ্দটি—উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, বিহার, অন্ধ্র প্রদেশ, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, রাজস্থান, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, কেরালা, আসাম এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য। আর বাকী ছয়টি—দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, আন্দামান-নিকোবর, লাক্ষা, আমিন, মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ—কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চল। গুজরাটী ও মারাঠীদের নিজ নিজ ভাষা-ভাষী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের সুযোগ দেবার জন্য বোম্বাইকেও গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামে দুইটি রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৯৬২ সালে নাগা পাহাড়-তুয়েনসাং অঞ্চলকে নাগাভূমি নামে স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। তারপর ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাবকে দুইভাগ করিয়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নামে দুইটি পৃথক রাজ্য গঠন করা হয়।

সর্বশেষে, ১৯৭০ সালে, খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড় ও গারো পাহাড় লইয়া, মেঘালয় নাম দিয়া, আসামের মধ্যেই একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

বর্তমানে, ভারতে স্বতন্ত্র রাজ্যের (States) সংখ্যা ১৭টি ও কেন্দ্রাধীন এলাকা (Union Territory) ১০টি। ইহার উপর মেঘালয়কে এক তৃতীয় ধরনের রাজ্য বলা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে মেঘালয় অষ্টাদশ রাজ্যে পরিগণিত হইবে।

নিচে স্বতন্ত্র রাজ্য সতেরটির নাম, রাজধানী ও আঞ্চলিক ভাষা এবং কেন্দ্র দ্বারা শাসিত অঞ্চলসমূহের তালিকা দেওয়া হইল—

রাজ্য	রাজধানী	আঞ্চলিক ভাষা
১। আসাম	শিলং	অসমীয়া/বাংলা
২। উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর	ওড়িয়া
৩। বিহার	পাটনা	হিন্দী
৪। উত্তর প্রদেশ	লক্ষ্ণৌ	হিন্দী
৫। রাজস্থান	জয়পুর	রাজস্থানী/হিন্দী
৬। পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়	পাঞ্জাবী
৭। পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা	বাংলা

রাজ্য	রাজধানী	আঞ্চলিক ভাষা
৮। হরিয়ানা	চণ্ডীগড়	হিন্দী
৯। নাগারাজ্য	কোহিমা	ইংরেজী
১০। মহারাষ্ট্র	বোম্বাই	মারাঠী
১১। মধ্য প্রদেশ	ভূপাল	হিন্দী
১২। তামিলনাড়ু	মাদ্রাজ	তামিল
১৩। মহীশূর	বাঙ্গালোর	কানাড়ী
১৪। কেরালা	ত্রিবান্দ্রম	মালয়ালম
১৫। গুজরাট	আমেদাবাদ	গুজরাটী
১৬। অন্ধ্র	হায়দরাবাদ	তেলেগু
১৭। জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর	কাশ্মীরী/উর্দ্দু

কেন্দ্রদ্বারা শাসিত অঞ্চলসমূহ

রাজ্য	রাজধানী	রাজ্য	রাজধানী
১। *হিমাচল প্রদেশ	সিমলা	৭। লাক্ষা, আমিন, মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ	কোঝিকোড
২। দিল্লী	দিল্লী	৮। দাদরা ও নগর হাবেলী	
৩। গোয়া, দমন, দিউ	মার্মাগোয়া	৯। *পণ্ডিচেরী	পণ্ডিচেরী
৪। *মণিপুর	ইম্ফল	১০। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (নেফা)	শিলং
৫। *ত্রিপুরা	আগরতলা		
৬। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	পোর্টব্লেয়ার		

এই রাজ্যগুলি যে সব প্রায় একই আয়তনের তাহা নহে। রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যসমূহের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ বৃহত্তম (প্রায় ৪,৪৩,৪৫২ বর্গ কিলোমিটার) আর সর্বনিম্নের দুইটি স্থান যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ (প্রায় ৮৭,৬১৭ বর্গ কিলোমিটার) ও কেরালার (প্রায় ৩৮,৮৫৫ বর্গ কিলোমিটার)। কিন্তু লোকসংখ্যার দিক হইতে উত্তর প্রদেশ প্রথম (৭৩,৭৪৬,৪০১) আর শেষ দুইটি রাজ্য যথাক্রমে আসাম (১১,৮৭২,৭৭২) এবং জম্মু-কাশ্মীর (৩,৫৬০;৯৭৬)। আবার প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি যদি ধরা যায়,

* এই ৪টি অঞ্চলে বর্তমানে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

তাহা হইলে প্রথম স্থান অধিকার করে কেরালা (১,১২৭) এবং তাহার পরই পশ্চিমবঙ্গ (১,০৩২); জম্মু-কাশ্মীরের লোকবসতি সবচেয়ে কম আর রাজস্থানের লোকবসতি কাশ্মীর হইতে শুধু সামান্য বেশী।

কিন্তু যখন দেখা গেল যে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটাইতে পারে নাই, যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সমস্যা মিটাইয়াও জাতীয় চেতনায় আমাদের উদ্বোধিত করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহাতে ব্যর্থ হইয়াছে, ভেদবুদ্ধি জাতীয়তাবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে

সম্প্রীতি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন রাজ্যসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে এদেশকে নিম্নলিখিত পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে—

উত্তর অঞ্চল—জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ ও দিল্লী।

কেন্দ্রীয় অঞ্চল—উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ।

পূর্ব অঞ্চল—বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, নাগাভূমি এবং মণিপুর।

পশ্চিম অঞ্চল—গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং মহীশূর।

দক্ষিণ অঞ্চল—অন্ধ্র প্রদেশ, মাদ্রাজ (তামিলনাডু) এবং কেরালা।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক

বহু শহীদের ত্যাগে ও জীবনদানে আমরা আজ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের বলে আজ আমরা কতকগুলি মৌলিক অধিকারের অধিকারী। আইনের চোখে ভারতের নাগরিকমাত্রই সমান—আমাদের প্রত্যেকেরই যোগ্যতা থাকিলে সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার রহিয়াছে। আমাদের সকলেরই স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার, সভাসমিতি গঠনের অধিকার, দেশের অভ্যন্তরে অবাধ ভ্রমণের ও বাস করিবার অধিকার রহিয়াছে। সকলেই ইচ্ছামত যে কোনো ধর্ম গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে পারে, যে কোনো ধর্মানুষ্ঠান পালন করিতে পারে। যে কোনো সম্প্রদায়—যত সংখ্যালঘুই হোক না কেন—নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে ও তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে। রাষ্ট্র এই সব প্রয়াসকে ন্যায্য অর্থসাহায্য পর্যন্ত করে। বেআইনীভাবে কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায় না। আমরা সকলেই যাহাতে যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার এবং জীবিকার্জনের সুযোগ এবং প্রয়োজনমত চিকিৎসার সুযোগ পাই সে চেষ্টা রাষ্ট্র করিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা নবজীবনের প্রভাতে উপনীত হইয়াছি।

আমাদের অধিকার

আমাদের এই সব অধিকার এবং দাসত্ববিমুচিত নবজন্মকে সার্থক করিতে হইলে আমাদেরও দায়িত্ব বহন করিতে হইবে প্রচুর পরিমাণে।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের উপর কতকগুলি গুরু দায়িত্বও আসিয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা যদি আমরা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই, যদি আমাদের দেশকে এবং নিজেদের জীবনকে আরও সুন্দরতর ও সমৃদ্ধতর করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাই, তবে এই দায়িত্বগুলি আমাদের পালন করিতে হইবে।

আমাদের দায়িত্ব

আজ জাতীয় সংহতি আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। এখনও আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস এবং সম্প্রীতি স্থাপিত হয় নাই। এখনও আমরা সমগ্র দেশের স্বার্থের চেয়ে আঞ্চলিক এবং ধর্মদলগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্থ। অস্পৃশ্যতা এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের কর্তব্য নিজেদের এবং অপরের মন হইতে এসব ভাব ও ধারণা দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে, নানা কারণে, আমাদের কর্মজীবনে দুর্নীতি এবং আলস্য প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের কর্তব্য নিজেদের এবং অপরের কর্মজীবন হইতে এসব দূর করা।

অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ইত্যাদিতে এখনও আমাদের জীবন পূর্ণ। একা সরকারের চেষ্টায় এসব দূর হইবে এরূপ ভরসা করা অন্যায়। গ্রামে বা শহরে যেখানেই আমাদের বাড়ী হউক না কেন, আমাদের কর্তব্য সেখানকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি সমস্যা দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। পৌর প্রতিষ্ঠান, বা যেসব জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, পঞ্চায়েৎ রহিয়াছে বা যেসব জাতীয় এক্সেটেন্সন সার্ভিস (N. E. S.) ব্লক প্রভৃতির উদ্বোধন হইয়াছে, আমাদের কর্তব্য সেই সব প্রতিষ্ঠানের কার্যে সবরকমে সাহায্য করা। কোন-না-কোনরূপে সমাজসেবা আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

অধুনা আমাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। উচ্ছৃঙ্খল দেশ মেরুদণ্ডহীন মানুষের মত। সরকারের নিয়ম-কানুন এবং আমরা যে সব প্রতিষ্ঠানের সভ্য (বিদ্যালয়, ক্লাব ইত্যাদি) তাহাদের নিয়ম-কানুন অনুগত সৈনিকের মতো আমাদের মানিয়া চলিতে হইবে। অবাঞ্ছিত নিয়ম-কানুন দূর করার জন্য আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত নিয়ম-কানুনগুলি চালু আছে, ততদিন পর্যন্ত তাহা ভঙ্গ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিতে পারি না।
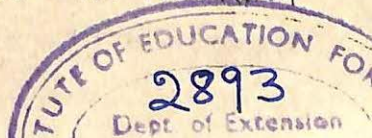
অনুশীলন

(ভূমিকা)

১। (ক) ভারতের অবস্থান, আকৃতি, আয়তন এবং লোকসংখ্যার একটি বিবরণ দাও।

২। ভারতের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিজ ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ লেখ। (S. F. 1965) (উঃ পৃঃ ৪-৯)

৩। ভারতের প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি কি কি? প্রত্যেকটি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বর্ণনা কর। (S. F. 1968, Comp.) (উঃ পৃঃ ৪-৯)

৪। ভারতের ঋতু পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্রাকার প্রবন্ধ রচনা কর। (S. F. 1968, Comp.) (উঃ পৃঃ ১১-১৩)

৫। ভারতের বৃষ্টিপাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ভারতের আঞ্চলিক বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণের তারতম্যের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দাও।
(S. F. 1965) (উঃ পৃঃ ৯-১১)

৬। ভারতের নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্বের বিবরণ দাও।

৭। ভারতের একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা মানচিত্র অঙ্কন করিয়া নিম্নলিখিতগুলি বসাও—

(ক) পরেশনাথ পাহাড় ও লুসাই পাহাড়; মহানদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ; আগ্রা, সিমলা, বোকারো, পুরী, আহমেদাবাদ; গোয়া, দুইটি ভিন্ন অঞ্চলে শীতকালীন বৃষ্টিপাত ও দুইটি প্রধান প্রধান ধান্য উৎপাদক অঞ্চল।
(S. F.1968)

(খ) কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী ও নাগা পর্বত; নর্মদা এবং গোদাবরী; শিলং, কোচিন, মাদ্রাজ, নাগপুর, এলাহাবাদ; দুইটি প্রধান খনিজ অঞ্চল।
(S. F. 1968, Comp.)

৮। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক বিভাগগুলি উল্লেখ কর। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে তোমার ভূমিকা কি?
(S. F. 1969) (উঃ পৃঃ ১৭-২০)

৯। নিচে ভারতের চারিটি ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগের বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে কয়েকটি বাক্যাংশ দেওয়া হইল। যে বাক্যাংশ উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বুঝায় তাহার নিচে ১. যেটি উত্তর ভারতের নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বুঝায়, তাহার নিচে ২. যেটি মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের

মালভূমি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বুঝায় তাহার নিচে ৩. যেটি উপকূলের নিম্নভূমি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বুঝায় তাহার নিচে ৪. যেটি কোন অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য বুঝায় না, তাহার নিচে × চিহ্ন বসাও। যদি কোন বাক্যাংশ একাধিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বুঝায় তবে তাহার নিচে একাধিক সংখ্যা বসাইতে পার।

পৃষ্ঠার বাম দিকে বাক্যাংশগুলি লেখা হইয়াছে এবং ডান দিকে আরও কতকগুলি বাক্যাংশ দেওয়া আছে। ঐ বাক্যাংশগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণ উল্লেখ করিতেছে। যে বাক্যাংশ যে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণ তাহার নিচে, সেই বৈশিষ্ট্যের বাঁদিকে দেওয়া সংখ্যাটি বসাও।

বাক্যাংশ

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য	উহার কারণ
১। প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত	প্রচণ্ড সূর্যকিরণ
২। খনিজ সম্পদের আকর	প্রস্তরময় মালভূমি
৩। নাব্য নদীসমূহ	পলিমাটিদ্বারা গঠিত লম্বা নদী-উপত্যকা
৪। প্রচুর পরিমাণ কৃষির উপযুক্ত জমি	দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উঁচু পর্বতগুলির গায়ে আঘাত পায়
৫। ছোট ছোট নদী	লম্বা সমুদ্র উপকূল
৬। মৎস্য ব্যবসায়ের উপযুক্ত	লম্বা লম্বা নদী, কিন্তু স্রোত বেশী নহে
৭। নদীগুলি নাব্য নহে	নদীগুলি প্রবল স্রোতে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছে
৮। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রহিয়াছে	উত্তর মৌসুমী বায়ু পাহাড়ের গায়ে আঘাত করে
৯। সেচের জন্য প্রচুর জল পাওয়া যায়	উচ্চ পর্বতাঞ্চলে পূর্ণ—সহজে আরোহণ করা যায় না
১০। খুব ঠাণ্ডা নহে	বিস্তৃত সমভূমি
১১। মরু অঞ্চলে পূর্ণ	পর্বতশ্রেণীতে পূর্ণ
১২। রাস্তা এবং রেল লাইন নির্মাণের উপযুক্ত	অল্প পরিমাণ উর্বর জমি
১৩। পার্বত্য সম্পদে পূর্ণ	প্রবল স্রোতস্বিনী
১৪। অধিকাংশ স্থানেই প্রবল শীত	কৃষি এবং শিল্পে উন্নতির জন্য উপযুক্ত

জীবনের চাহিদা

আমাদের খাদ্য

জীবনে যে কতরকম চাহিদা আছে তাহার ঠিকঠিকানা নাই। ঐ চাহিদাগুলি নিবৃত্তির চেষ্টায় আমরা সারা জীবন ঘুরিয়া মরিতেছি। উহাদের নিবৃত্তিতেই আমাদের জীবনের শান্তি, সুখ—সব কিছু। অপর দিকে জীবনের ন্যূনতম চাহিদা না মিটিলে কাহারও পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব নহে। আজ স্বাধীন ভারতে যাহাতে সকলের ন্যূনতম জীবন-চাহিদার নিবৃত্তি হয় তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

জীবন ও তাহার চাহিদা

জীবনে আমরা যতসব জিনিস চাই তাহাদের মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করা যায়—খাদ্য, পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী ও অন্যান্য। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্য আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

শরীর হইতে রোজ যাহা খরচ হইয়া যাইতেছে তাহা নিত্য পূরণ করিয়া লইবার জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন। জীবনকে যদি আগুনের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে খাদ্যকে বলা যায় তাহার ইন্ধন। আগুনকে জ্বালাইয়া রাখিতে যেমন ক্রমাগত ইন্ধনের যোগান প্রয়োজন, তেমনি আমাদের জীবনাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিবার জন্যও খাদ্য ইন্ধনের প্রয়োজন। জীবনের স্ফুলিঙ্গ আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষে, প্রত্যেকটি রক্তকণিকায় বিরাজমান। ঐসব কোষ প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, ঐসব রক্তকণিকা প্রতি মুহূর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। সাধারণভাবে বলা হয়, বারো বৎসর পর শরীরে পূর্বের একটি রক্তকণিকাও পুরাতন থাকে না—প্রতি বারো বৎসরে হয় আমাদের নবজন্ম। তাই এই কোষগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, নূতন রক্তকণিকা সৃষ্টির জন্যই বাহির হইতে খাদ্যের সরবরাহ করিতে হয়।

খাদ্যের প্রয়োজন

আবার, শরীরকে যদি যন্ত্রের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বলা যায় যন্ত্র যেমন কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি ইন্ধন ছাড়া চলিতে পারে না, শরীরও তেমনি উপযুক্ত ইন্ধন ছাড়া চলিতে পারে না। যন্ত্র বরং ইন্ধনের অভাবে

কিছুদিন ফেলিয়া রাখা যায়, কিন্তু শরীরকে কখনই ঐরূপ বেকার ফেলিয়া রাখা যায় না। প্রতিমুহূর্তে সে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এমন কি যখন আমরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকি, বাহির হইতে মনে হইতে পারে শরীর-যন্ত্র কাজ বন্ধ করিয়া আছে, কিন্তু তখনও উহার অভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ডের কাজ চলিতে থাকে, রক্ত চলাচল হইতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে। বস্তুতঃ, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মানুষের হৃৎপিণ্ড একবার মাত্র সংকুচিত হইতে যে শক্তি খরচ করে তাহাতে দুই পাউণ্ডের জিনিস এক ফুট উঁচুতে তোলা যায়। ঘুমের সময় যদি আমাদের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭০ বার ধুকধুক করে, তাহা হইলে বলা যায় ঘুমের সময়ও উহা প্রতি মিনিটে ১৪০ ফুট-পাউণ্ড (প্রায় ১৯০'৩ জুলস্) শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে। শরীর যন্ত্রকে চালু রাখিতে হইলে খাদ্যের ইন্ধন যোগাইতেই হইবে।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে মোটামুটি তিনটি কারণে শরীরকে খাদ্য যোগানো প্রয়োজন—(১) উহার কর্মশক্তির ইন্ধন যোগানোর জন্য, (২) উহার উত্তাপ বজায় রাখার জন্য, এবং (৩) শরীরে বিভিন্ন কোষ প্রভৃতির নিত্যক্ষতি পূরণের জন্য। অতএব, খাদ্য বলিতে আমরা তাহাকেই বুঝিব যাহা আমাদের কর্মশক্তি দেয়, যাহা আমাদের শরীরে তাপের সৃষ্টি করে, এবং যাহা শরীরের বিভিন্ন কোষ প্রভৃতিকে নিত্য নূতন গড়িয়া তুলিতে পারে। এছাড়া অন্য কিছু, তাহা যত মুখরোচকই হউক না কেন, খাদ্য আখ্যার যোগ্য নহে। বস্তুতঃ, রসনার তৃপ্তি করা খাদ্যের একটি আনুষঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ খাদ্যকে সুস্বাদু করার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। খাদ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল ইহাই নহে।

খাদ্য কাহাকে বলিব ?

পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। সেই সময় কাঁচা মাংসই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। এই মাংস তাহারা সংগ্রহ করিত বন্য পশু শিকার করিয়া। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাহারা ক্রমে আবিষ্কার করিল কোনো কোনো পশুকে বশ মানাইয়া পোষা যায়। ফলে, মাংসের প্রয়োজনে তাহাদের আর শিকারে যাইবার প্রয়োজন রহিল না। গোরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু শুধু যে তাহাদের মাংসেরই যোগান দিল তাহা নহে, তাহাদের দুধও মানুষ আহার্য হিসাবে গ্রহণ করিল।

খাদ্যের ইতিকথা

মানুষ তাহার পশ্বাদির জন্য তৃণভূমি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা শুধুমাত্র শিকারী রহিল না, পশুপালকেও পরিণত হইল। ইতিমধ্যে আগুনের আবিষ্কার তাহাদের খাদ্যজগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করিল। তাহারা আবিষ্কার করিল অপক্ক মাংসের চাইতে আগুনে পোড়া মাংস অনেক সুস্বাদু।

আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধুই মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত না। ফল, মূল, বীজ, পাতা যাহা কিছু হাতের কাছে পাইত তাহাও তাহারা আহার করিত। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা আবিষ্কার করিল যে, মাটিতে এইসব বীজ বুনিলে নূতন করিয়া গাছ হয়। তাহারা সভ্যতার অগ্রগতির তৃতীয় স্তরে পৌঁছিল—শিকারী এবং পশুপালক ছাড়াও তাহারা এখন হইল
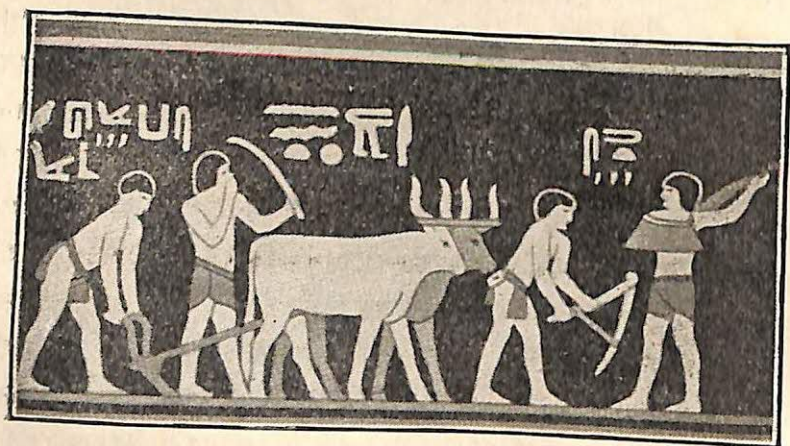
প্রাচীন মিশরে কৃষিকার্যের পদ্ধতি

কৃষিজীবী। খুব সম্ভবতঃ নীল নদের তীরে মিশরের, সিন্ধুনদের তীরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাংশের এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়ার উষ্ণ উর্বর জমিতেই এই কৃষিকার্যের সূত্রপাত হয়। খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেকার মিশরের বিভিন্ন মন্দির-চিত্রে এই চাষ-কার্যের ছবি পাওয়া গিয়াছে। সমকালীন ভারতবর্ষে হরপ্পায় গম ভাঙ্গার পাথরের জাঁতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সময়ই খুব সম্ভবতঃ জলের সহিত আটা মিশাইয়া চাকৃতি করিয়া আগুনে গরম রুটি তৈরীর কৌশল মানুষ আবিষ্কার করিয়াছিল। ধানের চাষ বা চালজাত খাদ্যের

প্রচলন হয় আরও পরে। চীন দেশে হোয়াং হো ও ইয়াং শিকিয়াং নদীর উপত্যকায় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চাষ বাস আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে।

আমেরিকার মেক্সিকো হইতে পেরু পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার আর এক ধারা বিকাশ লাভ করে। অতি প্রাচীনকাল হইতে সে অঞ্চলেও কৃষিকার্যের প্রচলন হইয়াছিল।
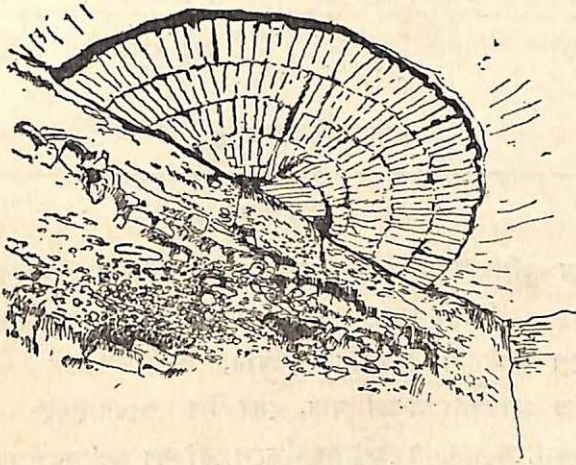
হরপ্পায় আবিষ্কৃত গম ভাঙ্গার জাঁতা

তাহার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। মানুষ নানাপ্রকার রন্ধন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে। তৈলবীজ আবিষ্কারের ফলে তেলের ব্যবহার শিখিয়াছে। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত যোগাযোগের ফলে বিভিন্ন মসলা আবিষ্কার করিয়াছে; রন্ধনকার্যে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছে; খাদ্যকে সুস্বাদু করিয়াছে। আজ বিভিন্ন দেশে কতো না বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সমারোহ, তাহাদের খাদ্যাভ্যাসে কতো না বৈচিত্র্য!

খাদ্যাভ্যাসে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক এই যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, এমন কি আমাদের দেশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব। যে দেশে যে খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই দেশের লোক সাধারণতঃ সেই খাদ্যেই অভ্যস্থ হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে ধান প্রচুর পরিমাণে
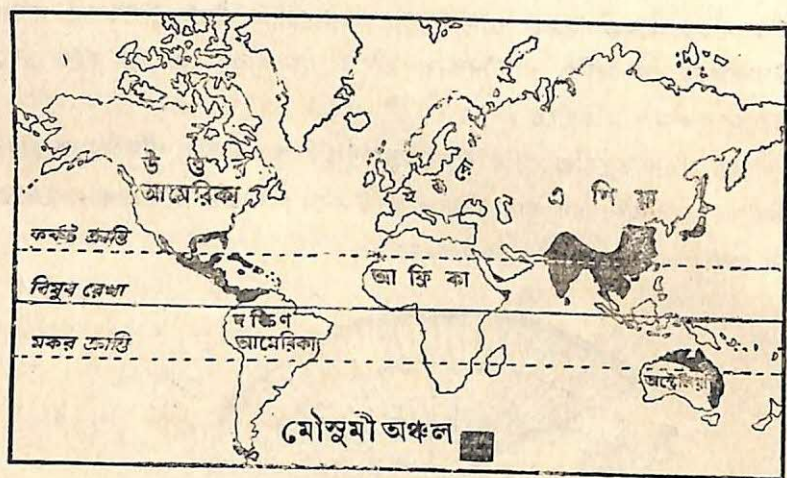
মৌসুমী অঞ্চল

পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা বাঙ্গালারা প্রধান খাদ্য হিসাবে ধানজাত চালকে গ্রহণ করিয়াছি। শুধু বাংলা দেশই বা বলি কেন। পৃথিবীর যেসব অংশে মৌসুমী জলবায়ু বর্তমান, অর্থাৎ একই সঙ্গে প্রচুর বারিপাত ও খরতাপ পাওয়া যায়, সেই সব জায়গাতেই এই জাতীয় জলবায়ুর কল্যাণে ধানচাষ বেশী হয়। ফলে সেই সব অঞ্চলেরই অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ধান হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি। আবার, ভারতের পশ্চিমাংশে বা য়ুরোপে যেখানে ধান প্রায় জন্মায়ই না, অথচ গমের চাষ হয়, সেখানকার লোকেরা গমজাত খাদ্য খাইতেই ভালোবাসে। আবহাওয়ার পার্থক্যের জন্যও দেশে দেশে খাদ্যের পার্থক্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শীতের দেশের লোক সাধারণতঃ আমিষ ও উগ্র পানীয়ের ভক্ত। গরমদেশে এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য শরীর প্রচুর পরিমাণে গ্রহণে অসমর্থ বলিয়াই ইহার প্রচলন কম।

সাংস্কৃতিক প্রভাবও খাদ্যাভ্যাস গঠনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে না। যেমন, আমাদের বাঙ্গালীদের মাছ খাওয়া। একদিন এই নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইত। নানাধরনের মৎস্য-রন্ধনপ্রণালী বাঙ্গালী আবিষ্কার করিয়াছিল। ফলে, উৎসবাদিতে ও ধর্মাচরণে মাছের ব্যবহার আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন মাছ দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে; তবু বাঙ্গালী এই

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করিতে পারিতেছে না। অথচ, ভারতেই অন্যান্য অঞ্চলের লোক হয়তো মাছের গন্ধই সহ্য করিতে পারে না। আবার খাদ্য-দ্রব্যের স্বাদও আমাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রিত করে। যাহা খাইতে সুস্বাদু তাহাই আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে চাই। খাদ্যকে সুস্বাদু করার জন্য আমরা পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করি না। কিন্তু ইহার উপরও ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অনস্বীকার্য। একের কাছে যাহা সুস্বাদু অপরের কাছে তাহা বিস্বাদ। ভারতের মধ্যেই এক অঞ্চলের লোকের যাহা প্রিয়তম খাদ্য, অপর অঞ্চলের লোক তাহার কণামাত্রও হয়তো খাইতে পারে না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস

আমরা জানি, নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর লোক লইয়া আমাদের ভারতবর্ষের জনসমষ্টি গঠিত। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, জলবায়ু ইত্যাদিও বিভিন্ন। তাই আমাদের দেশের সর্বত্র খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যসংক্রান্ত রুচিও এক নহে। প্রধান খাদ্যবস্তুর ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যাইতে পারে :

১। চাল-প্রধান খাদ্য—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালা। এক কথায়, পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারত।

২। গম-প্রধান খাদ্য—উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত, যথা, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী ইত্যাদি।

৩। বাজরা, জোয়ার, রাগী ইত্যাদি মিলেট-প্রধান খাদ্য—পশ্চিম ভারত ও মধ্য ভারত, যথা, মধ্য প্রদেশ ইত্যাদি।

৪। ভুট্টা—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি পার্বত্যাঞ্চলের লোকদের ভুট্টার রুটি প্রধান খাদ্য।

ভারতের সর্বপ্রধান খাদ্যবস্তু চাল বা ভাত। চালের পর, খাদ্যবস্তু হিসাবে স্থান, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি মিলেট শ্রেণীর খাদ্যের। মনে রাখিতে হইবে যে, বাজরা প্রভৃতি সাধারণতঃ গরীব লোকেরই খাদ্য। যাহারা অর্থবান তাহারা বাজরা না খাইয়া গম খাইয়া থাকেন। প্রধান খাদ্যবস্তু হিসাবে গমের স্থান তৃতীয়।

আগেই বলা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা, অন্ধ্র,

তামিলনাড়ু প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। ফলে, এখানকার প্রচুর বৃষ্টিপাত ও খরতাপের প্রভাবে ধানের চাষ হয় খুব বেশী। সেই কারণেই এইসব রাজ্যের অধিবাসীরা প্রধানতঃ চালজাত ভাতকেই তাহাদের প্রধান খাদ্য করিয়া লইয়াছে। শুধু ভাতই নয়। চাল হইতে নানাপ্রণালীতে অপরাপর জিনিসের মিশ্রণে নানাপ্রকার খাদ্যও তাহারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের চালে-দুধে তৈরী পায়েস, চালগুঁড়ার তৈরী নানাপ্রকার পিষ্টক, চাল-ভাজা মুড়ি, ধান-ভাজা খই প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে, অর্থাৎ পাঞ্জাব, দিল্লী, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের লোকেরা প্রধানতঃ গমজাত দ্রব্যাদিকেই তাহাদের প্রধান খাদ্য করিয়া লইয়াছে। স্বল্প বৃষ্টি ও প্রচুর উত্তাপের ফলেই এইসব অঞ্চলে গমের চাষ প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। গমজাত আটার তৈরী রুটি যদিও ইহারা প্রধানতঃ আহার করিয়া থাকে, তথাপি ইহাদের রুটি তৈরীর প্রণালী সর্বত্রই এক নহে। যথা, কোথাও বা শুধু আটার রুটিই খাওয়া হইয়া থাকে, আবার কোথাও বা আটার সহিত বিভিন্ন শাক-সবজি মিশানো হইয়া থাকে। কোথাও বা হাতে করিয়াই পুরু করিয়া চাপাটি তৈরী হয়, আবার কোথাও বা বেলুন-চাকতির সাহায্যে পাতলা করিয়া রুটি বেলা হয় যাহা আগুনে দিলেই ফুলিয়া ওঠে। ইহা ছাড়া গমের দ্বারা নানাপ্রকার পিষ্টক ও খাবারও বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরী করা হয়।

মধ্য ভারতীয় ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে অবশ্য ধান বা গম কোনোটাই বিশেষ জন্মে না। সেখানে মালভূমির নিকৃষ্ট জমিতে সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিতে জলসেচ ভিন্নই প্রচুর পরিমাণে জোয়ার ও বাজরা জন্মায়। এই অঞ্চলের স্বল্পবিত্ত অধিবাসীরা তাই জোয়ার ও বাজরাজাত রুটিকেই প্রধান খাদ্য করিয়া লইয়াছে।

আবার, ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলের লোক আমিষভোজী, কোনো কোনো অঞ্চলের লোক নিরামিষভোজী। প্রধানতঃ, সাংস্কৃতিক প্রভাবেই এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের আদিমতম সভ্যতার লীলাভূমি সিন্ধু উপত্যকায় যেসব নিদর্শন মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় তাহারা আমিষ খাইতে অভ্যস্থ ছিল। পরবর্তীকালে

এদেশে আগত আর্যরাও যে আমিষ আহার করিত বৈদিক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু বৈদিক-উত্তর যুগে খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবেই জীবহত্যা বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলেই আমিষ ভক্ষণও বন্ধ হইয়া যায়। মৌর্যসম্রাট অশোকের শিলালিপিতে আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করার উল্লেখ আছে। হিন্দুযুগের শেষে মুসলমানদের আগমনের ফলে তাহাদের প্রভাবে আমিষ আহার পুনরায় প্রচলিত হয়। ইংরেজ আগমনের পরে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রসারের ফলেও আমিষাশীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পাঞ্জাব, বাংলা, উড়িষ্যা ও আসাম ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রায় সব জায়গাতেই নিরামিষাশীর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু অহিন্দুরা, এবং হিন্দুদের মধ্যেও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রায় সর্বত্রই আমিষভোজী। মাংস ও ডিম সকল আমিষভোজীরই প্রিয়। উপকূল অঞ্চলে এবং নদীমাতৃক বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় মাছ অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। শুকনো মাছ খাওয়ার প্রচলন অবশ্য উপকূল অঞ্চলেই বেশী।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই কোনো-না-কোনো রকমের ডালের চাষ হয়। তাই ডালও ভারতবাসীর একটি প্রধান খাদ্য। তবে ডালজাত খাদ্যও সর্বত্র এক প্রকারের নহে। আমরা বাংলাদেশে যেভাবে ডাল খাইয়া থাকি, অন্যত্র সেইভাবে ডাল খাওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোথাও বা ডালের তৈরী পাকৌড়া বিশেষ প্রিয় খাদ্য (যেমন দিল্লী, পাঞ্জাব অঞ্চলে), আবার কোথাও বা ডাল গুঁড়া করিয়া তাহা হইতে তৈরী বেসন দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যই বেশী উপভোগ্য (যেমন, গুজরাট, মহারাষ্ট্র)। ডালজাত বোঁদে, মিহিদানা, লাড্ডু প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত।

পানীয়ের ব্যাপারেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পার্থক্য রহিয়াছে। পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রধান পানীয় দুগ্ধ। এছাড়া দুগ্ধজাত দধির দ্বারা তৈরী লস্যিও ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যগুলির গ্রীষ্মকালের প্রধান পানীয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য অংশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। এই চা উত্তর ভারতের, বিশেষ করিয়া পূর্বাঞ্চলের বিশেষ প্রিয় পানীয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কেরালা, মহীশূর, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে কফির চাষ বেশী হয় বলিয়া দক্ষিণ ভারতে কফিই বেশী প্রিয় পানীয়। শীতপ্রধান দেশগুলির মত ভারতবর্ষে মদ্যপান বহুল প্রচলিত নহে। তবে য়ুরোপীয়

সভ্যতার প্রসারের ফলে বিশেষ করিয়া বড়ো বড়ো শহরগুলিতে মদ্যপানের প্রচলন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, নিম্নজাতীয় ও উপজাতীয়দের মধ্যেও মদ্যপান বহুল পরিমাণে প্রচলিত। তবে সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই মদ্যপান আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালীর খাদ্যাভ্যাস: ভাত ও মাছ বাঙ্গালীর জাতীয় খাদ্য বলা যাইতে পারে। প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও খরতাপের জন্য বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মায়। বাজরা বা গম জাতীয় খাদ্য বাংলা দেশে প্রায় জন্মায়ই না। তাই ভাতই বাঙ্গালীর অতি প্রিয় খাদ্য। বর্তমান "রেশনের যুগে", চালের অভাবই বাঙ্গালীকে কষ্ট দিতেছে সব চাইতে বেশী।

ভাতের মত মাছও বাঙ্গালীর জাতীয় খাদ্য। বাংলাদেশে প্রচুর খাল, বিল, নদী থাকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত। তাই স্বভাবতই বাঙ্গালী মাছ খাইতে শিখিয়াছে। তারপর, বাংলাদেশ প্রধানতঃ তন্ত্রের দেশ। তন্ত্রের মত অনুসারে আমিষ আহারে দোষ নাই। তাই অনেক বাঙ্গালীই মাছ, মাংস ও ডিম সবই খাইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পরে, বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হইলেও, সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব খাদ্যের উপর এত বেশী যে, অনেক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বাঙ্গালীরও মাছ খাইতে আপত্তি নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সকল বাঙ্গালী মৎস্যাহারী—প্রতিদিন মাছ না হইলে প্রায় কাহারও চলে না। প্রতিদিন অধিকাংশ বাঙ্গালী মাছ খান বলিয়া মাছকে বাঙ্গালীর **জাতীয় খাদ্য** বলা যাইতে পারে।

ভাত ও মাছ ছাড়া, শাক ও ডালও বাঙ্গালীর নিত্য আহার্য। বাংলা দেশের উর্বর মাটিতে নানারকমের শাক জন্মায় এবং দামেও শাক সস্তা। ডাল বাংলাদেশে প্রচুর না জন্মাইলেও, পাশের রাজ্য বিহার হইতে প্রয়োজনমত ডাল আমদানি করা চলে। কাজেই গরীব বাঙ্গালীর (শতকরা ৭৫ জন) ভাতের সঙ্গে শাক ও ডালই নিত্য খাদ্য।

বাঙ্গালীর খাদ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য তাহাতে সরিষার তৈলের ব্যবহার। যথাসাধ্য সুস্বাদু করিয়া খাদ্য গ্রহণ বাঙ্গালী সংস্কৃতির অঙ্গ বলা যাইতে পারে। খাদ্যকে সুস্বাদু করিতে হইলে তাহাকে ভর্জিত করা প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশ নিজে যথেষ্ট পরিমাণ সরিষা উৎপাদন না করিলেও, বাঙ্গালীর খাদ্যে সরিষার তৈলের ব্যবহারের প্রচলন রহিয়াছে। সরিষার তৈল ছাড়া বাঙ্গালীর একদিনও চলে না।

বাঙ্গালীরা আমিষ খাদ্য গ্রহণ করিলেও, মাংস ও ডিমের ব্যবহার বাঙ্গালীর খাদ্যে অপেক্ষাকৃত কম। প্রথমতঃ বাংলা দেশে মেষচারণ ক্ষেত্র বেশী না থাকায়, মাংসের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী। দ্বিতীয়তঃ জল বায়ুর জন্য মাংস হজম করাও বাংলাদেশে সহজ নহে। তারপর বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায়, ধর্মের অনুশাসনের জন্য অনেক বাঙ্গালী মাংস ও ডিম খান না। তবে শক্তি পূজা অর্চনাদিতে (যেমন দুর্গা ও কালীপূজা) পশুবলির ব্যবস্থা থাকায়, ডিম অপেক্ষা মাংসের প্রচলন বাঙ্গালী খাদ্যে বেশী।

বাংলা দেশে মুসলমান প্রভাব বেশী হওয়ার জন্য, বাঙ্গালীর খাদ্যে মশলার প্রয়োজনও বেশী। বাংলা দেশের গোরুগুলি তেমন দুধ দেয় না। তাই দুগ্ধ-জাত খাদ্য বাঙ্গালী পছন্দ করিলেও, উহা অধিকাংশ বাঙ্গালীরই নিত্য আহার্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

আসামী ও ওড়িয়াদের খাদ্যাভ্যাস

আসাম ও উড়িষ্যার জলবায়ু ও মাটি প্রায় বাংলা দেশের মতই। ঐ দুই দেশের সংস্কৃতিও অনেকখানি বাংলা দেশের অনুরূপ। বৈদিক ধর্মের প্রভাব আসাম বা উড়িষ্যা কোন দেশেই উত্তর প্রদেশের মত প্রবেশ করে নাই। উভয় দেশেই এক সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার ঘটিয়াছিল এবং তন্ত্র ধর্মের বিস্তার হইয়াছিল। তারপর উভয় দেশেই নদী, খাল, বিল প্রভৃতি হইতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তাই মাছ আসাম ও উড়িষ্যায় প্রায় বাঙ্গালীদের মতই জাতীয় খাদ্যরূপে পরিগণিত। উড়িষ্যা রাজ্যে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের জন্য বৈষ্ণব প্রভাব খুবই বেশী। আসামেও বৈষ্ণব প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রায় সকল আসামী ও ওড়িয়াই মাছ খাইয়া থাকেন। মাংসের ব্যবহার উড়িষ্যায় বাংলা দেশ হইতে কম। ইহার কারণ হয়তো, বাংলা দেশের মত উড়িষ্যায় শক্তিপূজা পদ্ধতির (দুর্গা পূজা, কালী পূজা) প্রচলন কম। আসাম ও উড়িষ্যা, উভয় দেশেই প্রচুর পরিমাণে চাল উৎপন্ন হওয়ার জন্য, ভাতই দুই দেশে জাতীয় খাদ্য। ইহার সঙ্গে ডালের প্রচলনও আছে। অধিকাংশ লোকই প্রতিদিন ভাত, ডাল ও মাছ খাইয়া থাকেন। শাকের প্রচলন, বাংলা দেশ হইতে উড়িষ্যা ও আসামে কম। রান্নাতে উভয় দেশেই বাংলা দেশের মত সরিষার তৈলের ব্যবহার

হয়। সংক্ষেপে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব মোটামুটি এক ধরনের হওয়ার জন্য আসাম, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের খাদ্য মোটামুটি একরূপ।

দক্ষিণ ভারতের খাদ্যাভ্যাস

প্রাকৃতিক কারণে, দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। তাই ভাতই দক্ষিণ ভারতের জাতীয় খাদ্য। কিন্তু তন্ত্রধর্মের প্রসার দক্ষিণ দেশে না হওয়ার জন্য, দক্ষিণের উচ্চবংশীয় হিন্দুদের মধ্যে নিরামিষ আহারের প্রচলন রহিয়াছে। দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে বলিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা (মুসলমান ও খৃষ্টান) মাছ খাইয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে শুকনো মাছ আহারের প্রচলনও আছে।

দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীর বাঙ্গালীর মত ভাত নিত্য আহার্য হইলেও, ইট্‌লি, দোসা প্রভৃতি চালের গুড়ার তৈয়ারী পিঠাও তাহারা প্রায়ই খাইয়া থাকেন। তাই চালের গুড়া করার জন্য বিরাট বিরাট পাথরের জাঁতি অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতীয়ের ঘরেই থাকে।

বাঙ্গালীদের মত ডালও দক্ষিণ ভারতীয়দের খাদ্যের অন্যতম। কিন্তু তাহারা ডালের সঙ্গে সবজি, বিশেষ করিয়া বেগুন খাইতে অভ্যস্ত। বেগুন ও ডাল দিয়া রান্না করা তরকারীকে মাদ্রাজে সম্বর বলা হয়।

উত্তর ভারতের খাদ্যের সহিত দক্ষিণ ভারতের খাদ্যের প্রধান পার্থক্য রন্ধন প্রণালীতে। প্রথমতঃ দক্ষিণ ভারতীয়েরা রান্নায় টক ব্যবহার করেন বেশী। নিরক্ষরেখার অপেক্ষাকৃত নিকটে বলিয়া দক্ষিণ ভারতীয় আবহাওয়ায় তাপ বেশী এবং ইহারই জন্য খাদ্যে টকের প্রচলন বেশী হইয়াছে। তেঁতুলকে দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রায় জাতীয় খাদ্য বলা চলে। খাদ্যে টক ব্যবহারের জন্য, দক্ষিণ ভারতীয় রান্নায় ঝালের প্রাধান্যও বেশী দেখা যায়। তেলের সাহায্যে দক্ষিণ ভারতেও রান্না হইয়া থাকে। কিন্তু সরিষার তেলের পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতে প্রধানতঃ নারিকেল তেলের ব্যবহার রান্নায় হইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ সমুদ্র উপকূলে প্রচুর নারিকেল জন্মিয়া থাকে।

টক ভালবাসেন বলিয়া, দক্ষিণ দেশীয়ের আহারে, দই একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দক্ষিণ দেশীয়েরা টক ও পাতলা দইই সাধারণতঃ খাইয়া থাকেন, বাঙ্গালীদের মত ঘন ও মিষ্টি দই খান না।

খাদ্যবস্তু মোটামুটি এক হইলেও খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীর জন্য বাঙ্গালী ও দক্ষিণ দেশীয়দের পরস্পরের কাছে পরস্পরের খাদ্য রুচিপ্রদ নহে।

কাশ্মীরের খাদ্যাভ্যাস

কাশ্মীরের আবহাওয়া, উত্তর-পশ্চিমের অন্যান্য দেশের (যথা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী ইত্যাদি) মত নহে। হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কাশ্মীর উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং সেখানে ধানের চাষ হয়। তাই কাশ্মীরের লোকেরা ভাতও খাইয়া থাকেন। প্রচুর পরিমাণে হ্রদ থাকার দরুন, কাশ্মীরে মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ওখানে মেষচারণ ক্ষেত্রও প্রচুর রহিয়াছে। কাশ্মীরের অধিকাংশ লোকই মুসলমান ; তাই কাশ্মীরীরা প্রধানতঃ আমিষভোজী। মাছ ও মাংস দুইই কাশ্মীরের লোক আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেখানকার বর্ণ-হিন্দুরা নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন।

কাশ্মীরে আপেল, আঙ্গুর, ন্যাশপাতি প্রভৃতি ফলও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কাজেই ফলও কাশ্মীরের লোকের আহার্য তালিকাভুক্ত।

বিহারের খাদ্যাভ্যাস

খাদ্যের দিক হইতে বিহার মিশ্র খাদ্যাঞ্চলে পড়ে। বিহারে ধান ও গমের চাষ উভয়ই হইয়া থাকে। তাই বিহারের লোক চাল ও আটা উভয়ই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। বিহারীদের মধ্যাহ্ন আহারে কিছু ভাত ও কিছু রুটি থাকে। বিহারের লোক অধিকাংশ হিন্দু ; তন্ত্রের প্রভাবও বিহারের উপর কখন পড়ে নাই। তাই বিহারের লোক উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য লোকের ন্যায় নিরামিষ আহার করিয়া থাকে। বিহারে নানা ধরনের সবজি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তাই নিরামিষ আহারে সাধারণ লোকের বিশেষ অসুবিধা হয় না। ডালের ফলনও বিহারে প্রচুর হইয়া থাকে। ফলে, রান্না করা ডাল ছাড়াও বিহারীরা ডালের ছাতু খাইতে বিশেষ ভালোবাসেন। দরিদ্র বিহারীদের মধ্যে ছাতু আহারের প্রচলন খুব বেশী।

খাদ্যের উপাদান

উপরে আমাদের যে সব খাদ্যদ্রব্যাদির আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাদিগকে মোটামুটি ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা চলে—যথা, কার্বোহাইড্রেট

বা শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, স্নেহ জাতীয় খাদ্য, লবণাদি পার্থিব খাদ্য, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য ও মসলা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক খাদ্য। ইহা ছাড়াও জলীয় পানীয়ও আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য এই সব প্রকার খাদ্যই প্রয়োজন।

আমাদের অধিকাংশ নিরামিষ খাদ্যই কার্বোহাইড্রেট পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত—যথা, চিনি, আলু, গম, ভুট্টা, মিষ্টি আলু, টাপিয়োকা প্রভৃতি। ইহার এইরূপ নামকরণ হইবার কারণ ইহাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নির্দিষ্ট মাত্রায় আছে। এই কার্বোহাইড্রেটই আমাদের শরীরকে ক্রিয়াশীল রাখার পক্ষে প্রকৃত দাহ্যস্বরূপ ইন্ধন। এই জাতীয় খাদ্যমাত্রই প্রথমে হজম হইয়া সহজদাহ্য গ্লুকোজ নামক পদার্থে পরিণত হয়। পরে ঐ গ্লুকোজ শরীরের প্রত্যেক কোষে কোষে ও রক্তের মধ্যে গিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনমত দগ্ধ হইয়া উত্তাপ ও শক্তির সৃষ্টি করে।

কার্বোহাইড্রেট
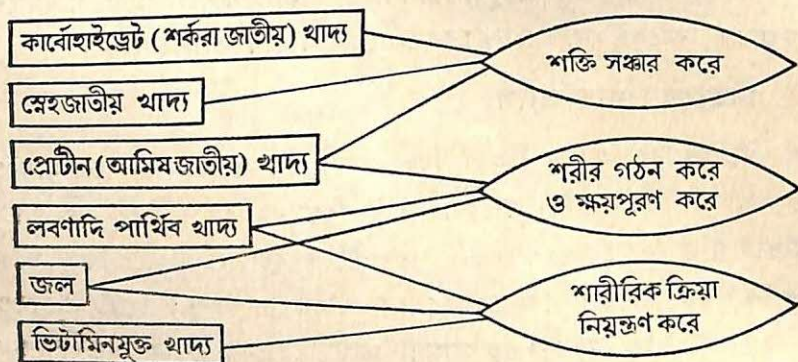
প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বলিতে বুঝায় নাইট্রোজেনযুক্ত আমিষ পদার্থ। এই জাতীয় খাদ্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাংস, ডিম, মাছ, দুধ, ছানা, পনির ইত্যাদি। এছাড়া ছোলা, মটরশুঁটি, বরবটি, বাদাম, পেস্তা এবং নানাপ্রকার ডালের মধ্যেও প্রোটিন আছে, কিন্তু এইগুলিকে অর্ধ-প্রোটিন বলা হইয়া থাকে। প্রোটিন আমাদের শরীর রক্ষার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য। তাহার কারণ, আমাদের শরীরের কোষসমূহ প্রোটিন দিয়াই গঠিত, এবং তাহাদের দৈনন্দিন ক্ষয়-ক্ষতি শুধুমাত্র প্রোটিন খাদ্য দিয়াই পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু শরীরের

প্রোটিন

প্রোটিন একজাতের, আর খাদ্যের প্রোটিন বিভিন্ন জাতের। তাই প্রথমে খাদ্য-প্রোটিন পেটে গিয়া অ্যামিনো অ্যাসিড নামক রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়, এবং তাহার পর উহাই শরীরের নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকারের প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। আমিষ খাদ্যে এই অ্যামিনো এসিডযুক্ত পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে বলিয়াই প্রোটিন খাদ্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ। তবে যাহারা নিরামিষাশী তাহারা ছানা, দুধ, দই, মটর ডাল প্রভৃতি খাইয়াও প্রোটিনের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা যায়। চাল বা গমেও প্রোটিন স্বল্পপরিমাণে আছে। তবে গমে যদিও চালের অপেক্ষা প্রোটিনের ভাগ বেশী, কিন্তু চালের প্রোটিনে আবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের ভাগ আবার গম অপেক্ষা অধিক। সেই কারণেই আমাদের চালের সহিত সমপরিমাণে গম খাওয়া শরীরের দিক হইতেই প্রয়োজনীয়।

যাবতীয় উদ্ভিজ্জ তেল (সরিষার তেল, নারিকেল তেল প্রভৃতি) এবং জান্তব ঘি, চর্বি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। এই খাদ্যের ক্রিয়াও

স্নেহজাতীয় খাদ্য

অনেকটা কার্বোহাইড্রেটেরই মত, তবে ইহার প্রধান গুণ শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করা। সমান পরিমাণ কার্বোহাই-ড্রেটের চেয়ে স্নেহজাতীয় খাদ্য দ্বিগুণেরও বেশী উত্তাপ সৃষ্টি করিতে পারে। খাদ্যের এই তাপ সৃষ্টির শক্তি মাপা যায় এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহার নাম দেওয়া হয় ক্যালোরি। এক হাজার গ্রাম অর্থাৎ প্রায় এক সের ওজনের জলের উত্তাপ ১° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বাড়াইতে হইলে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন তাহাকেই এক ক্যালোরি ধরা হয়। প্রত্যেক খাদ্যেরই এই ক্যালোরিমূল্য আছে ; তবে স্নেহজাতীয় পদার্থেরই ক্যালোরিমূল্য সর্বাধিক। তাই শীতপ্রধান অঞ্চলে ইহার প্রয়োজন অধিক, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে শুধু কার্বোহাইড্রেট দিয়াই শরীরের উত্তাপ রক্ষার কাজ বেশ চলিয়া যায়।

নুন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় খাদ্য। আমাদের শরীরের রস-রক্তাদির মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে নুন আছে এবং ঘাম প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাহার

লবণাদি

যে অপচয় ঘটে নুন দিয়া প্রত্যহই তাহার পরিমাপ বজায় রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি লবণও আমাদের খাদ্যরূপে প্রয়োজন। তবে সেগুলি পৃথকভাবে খাইবার প্রয়োজন হয় না, কারণ শাক-সবজি প্রভৃতি আমাদের নানা খাদ্যের মধ্যেই আমরা স্বাভাবিকরূপে তাহাদের পাইয়া থাকি।

ভিটামিন 'এ'
কড লিভার অয়েল
ঢেঁকিছাঁটা চাউল
পেঁপে
মাখন
BUTTER
দুধ
আলু
ভুট্টা
আঙুর
কমলা লেবু
কলা
বাঁধাকপি
ডিম
আম
শশা
মটর শুঁটি
টম্যাটো
অঙ্কুরিত গম

ভিটামিন 'বি'
ভুট্টা
বাঁধাকপি
পেঁয়াজ
কলা
ঢেঁকিছাঁটা চাউল
ডিম
আলু
মটর শুঁটি
অঙ্কুরিত গম
টম্যাটো

ভিটামিন 'সি'
বাঁধাকপি
দুধ
অঙ্কুরিত গম
মটর শুঁটি
আলু
ভুট্টা
পেঁপে
আঙুর
শশা
আম
কমলালেবু
টম্যাটো
লেবু
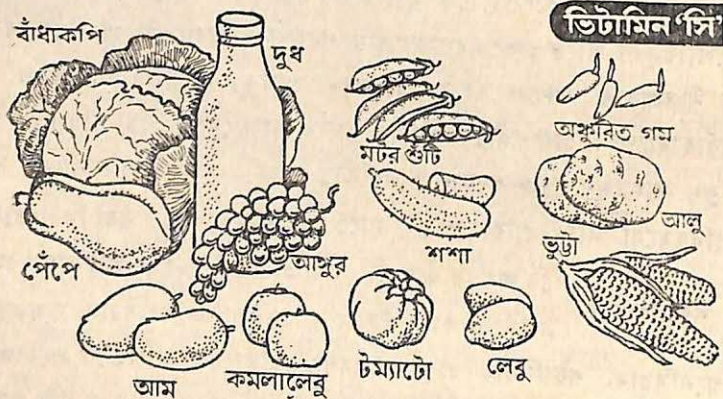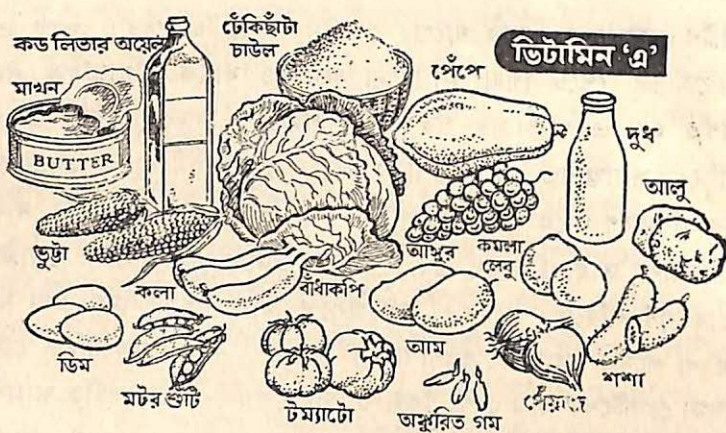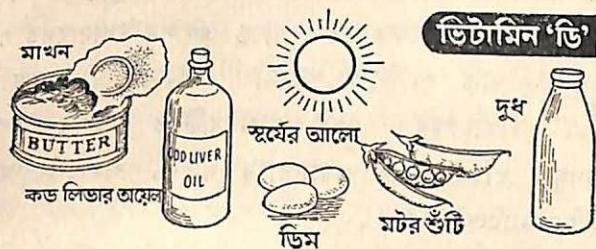
খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন এমন এক প্রকার উপাদান যাহার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অথচ সকল জাতীয় টাটকা খাদ্যদ্রব্যেই ইহা নানা আকারে নানা মাত্রায় বিদ্যমান এবং ইহার ক্রিয়াও অন্যান্য উপাদানের চেয়ে ভিন্ন। ফল এবং সবুজ রংএর শাক-সবজিতে ইহা প্রচুরভাবে বিদ্যমান। শুধুমাত্র সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য এবং কয়েকটি রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই ইহার প্রয়োজন। বর্তমানে আমরা দশ প্রকার ভিটামিনের অস্তিত্বের কথা জানি—ভিটামিন এ, বি (চার প্রকার), সি, ডি, ই, এইচ এবং কে। ইহাদের প্রত্যেকটির অভাবে মানবদেহে বিভিন্ন ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

ভিটামিন

খাদ্যকে মুখরোচক করার জন্য যে সব মসলাদি আনুষঙ্গিক খাদ্য আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি, খাদ্যহিসাবে তাহাদের কোনো নিজস্ব মূল্য না থাকিলেও তাহাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। খাদ্য সুস্বাদু না হইলে শরীরের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা খাওয়া যায় না। আবার সুস্বাদু খাদ্য মুখের গ্রন্থিরস নির্গমনে সাহায্য করে বলিয়াই খাদ্য হজম করিবার পক্ষে সুবিধা হয়। কিন্তু এইগুলির ব্যবহার যত কম হয় ততই ভালো ; কারণ অধিক মসলা প্রভৃতির দ্বারা পাকযন্ত্র বিকল হইয়া যাইতে পারে।

আনুষঙ্গিক খাদ্য

জল ঠিক খাদ্য না হইলেও, প্রয়োজন হিসাবে ইহার মূল্য আসল খাদ্য অপেক্ষাও বেশী। শরীরের সর্বত্রই জলের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি কোষ জলের মধ্যে তরল না হইলে কোনো খাদ্যই গ্রহণ করিতে পারে না। রক্তের তরলতাও জলের উপরই নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া দৈনিক ক্লেদ নির্গমনেও জল আমাদের সাহায্য করে।

জল

উপরোক্ত ছয়জাতীয় উপাদানই আমাদের শরীরের পুষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সকল খাদ্যে এই সব উপাদানের সব কয়টি নাও থাকিতে পারে। এইজন্যই মিশ্রখাদ্য খাওয়া প্রয়োজন। সেই খাদ্যসমষ্টিতে এইসব উপাদানের সবকয়টি উপযুক্ত পরিমাণে ও গুণানুসারে থাকে, তাহাকেই বলা যায় সুষম খাদ্য (balanced diet)।

সুষম খাদ্য

পরিমাণগতভাবে এইসব উপাদান কতটা হওয়া উচিত, তাহা বলা কঠিন। তবে বিজ্ঞান এই সম্পর্কে গড়পড়তা হিসাবে একটা মাত্রা নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে, খাদ্য আমাদের ইন্ধনস্বরূপ। যে খাদ্য যতটা উত্তাপ সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার খাদ্যমূল্য বা ক্যালোরিমূল্যও ততটা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আমাদের সাধারণ পরিশ্রমের অবস্থায় দৈনিক ৩০০০ হইতে ৩৫০০ ক্যালোরিমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন। ইহা অবশ্য কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয়—এই তিনজাতীয় খাদ্যের মধ্যেই ভাগ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রায় ৬০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের ও প্রায় ৬০ গ্রাম প্রোটিনের, দুয়েরই উত্তাপ মূল্য ২৩২ ক্যালোরি। কিন্তু স্নেহজাতীয় খাদ্যের উত্তাপমূল্য ইহাদের দ্বিগুণেরও অধিক ; প্রায় ৬০ গ্রাম এইজাতীয় খাদ্যের উত্তাপমূল্য ৫২৮ ক্যালোরি। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায়, দৈনিক অন্যূন প্রায় ৪৭০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, প্রায় ১২০ গ্রাম প্রোটিন এবং প্রায় ৯০ গ্রাম স্নেহজাতীয় খাদ্যই আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালোরি উত্তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিতে পারে। এছাড়া শাক-সবজি প্রভৃতি যেসকল খাদ্যে ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতব লবণ আছে, যেসকল খাদ্যে ভিটামিন আছে তাহাও দৈনিক কিছু কিছু খাওয়া প্রয়োজন। তবেই আমাদের খাদ্যতালিকা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে এবং শরীরের যথাযথ পুষ্টি হইবে।

অবশ্যই একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। উপরিউক্ত সুষম খাদ্যের তালিকায় যে মাত্রার উল্লেখ করা হইয়াছে, স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে তাহার অদল বদল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শীতপ্রধান দেশের লোক শীতের সময় বেশী খাইবে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক গ্রীষ্মের সময় খাইবে কম। বেশী পরিশ্রম যাহারা করিবে তাহাদের খাইতেও হইবে বেশী। আবার বিভিন্ন বয়সের লোকের খাদ্যের মাত্রারও বিভিন্নতা হইবে।

ছোটবেলায় বা যৌবনের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা যেমন বেশী হইবে, তেমনি মধ্য বয়স হইতে খাদ্যের মাত্রা আবার কমিতে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদেও এই পরিমাণে পার্থক্য ঘটে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদের খাদ্যের পরিমাণ কম হইলেও সন্তানসম্ভবা হইলে বা স্তন্যদানের সময়ে উহাদের খাদ্যের মাত্রা অবশ্যই বাড়িয়া যায়।

উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করাই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। কি করিয়া খাদ্য নির্বাচন করিতে হয়, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি নীতির আলোচনা এখন করা হইতেছে।

খাদ্যনির্বাচনের কয়েকটি নীতি

ব্যক্তিবিশেষকে নিজের আয় অনুসারে খাদ্য নির্বাচন করিতে হয়। অধিক মূল্যের খাদ্য খাইলেই যে তাহা পুষ্টিকর হয় এমন নহে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই গরীব। কাজেই আমরা যাহা খাইতে পাই তাহা হইতে খাদ্যপ্রাণের যাহাতে অপচয় না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভাতের ফেন, আলু, পটল প্রভৃতি তরকারীর খোসা, ছানার জল ইত্যাদি সাধারণতঃ আমরা ফেলিয়া দিয়া থাকি, অথচ উহাদের মধ্যেই প্রোটিন, ভিটামিন, লবণ ও শ্বেতসার প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ভাতের ফেনের সঙ্গে সামান্য লবণ এবং গুড় মিশাইয়া এবং ছানার জলের সঙ্গে সামান্য চিনি মিশাইয়া পুষ্টিকর পানীয় প্রস্তুত হইতে পারে। আবার তরকারীর খোসাগুলি সিদ্ধ করিয়া উহাতে সামান্য লবণ এবং মসলা যোগ করিয়া সূপ প্রস্তুত করা চলে। সংক্ষেপে, রন্ধন-প্রণালীর সংস্কার করিয়া, কি করিয়া খাদ্যের অপচয় দূর করা চলে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের মতো দরিদ্র দেশের লোকদের বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনানুসারেও খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১০।১১ বৎসরের একটি বৃদ্ধিশীল শিশুর খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন না থাকিলে তাহার দেহের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হইবে, অথচ ৭০ বৎসরের একজন বৃদ্ধের খাদ্যে প্রোটিনের অংশ কমাইয়া না আনিলে তাহার হজমের গোলমাল হইতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে খাদ্য নির্বাচন কালে ব্যক্তিবিশেষের রুচির দিকেও কিছুটা দৃষ্টি দিতে হয়। অনেকের অনেক খাদ্য অজ্ঞাত কারণে

সহ্য হয় না। তাহাকে সে খাদ্য না খাইতে দেওয়াই উচিত।

খাদ্য নির্বাচনের সময় দেশের আবহাওয়ার কথাও বিবেচনা করিতে হয়। গরম ও ঠাণ্ডা দেশের লোকের খাদ্যের প্রয়োজন এক নহে। অনেকের ধারণা শীতপ্রধান দেশে অধিক খাদ্য খাইতে হয়, কিন্তু এই ধারণা ভুল। শীতপ্রধান এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাদ্যের পরিমাণের প্রয়োজন সমানই থাকে, কিন্তু খাদ্যের প্রকারভেদ করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গরম দেশে অথবা গ্রীষ্মকালে অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্যগ্রহণ উচিত নহে।

খাদ্য নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, সুষম খাদ্য নির্বাচন করা। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য আমাদের গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে শরীরের ক্ষয়পূরণের জন্য প্রোটিন, শ্বেতসার, ভিটামিন প্রভৃতি যতরকম বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর প্রয়োজন তাহা আমাদের খাদ্যে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যদি একজন বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্য-তালিকা তৈরীর চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, স্বল্পমূল্যেও একটি সুন্দর সুষম খাদ্যতালিকা প্রস্তুত হইতে পারে। অবশ্য সেইজন্য প্রয়োজন হইবে খাদ্যসমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা এবং আমূল খাদ্যসংস্কারে যত্নবান হওয়া। মুখরোচক বা পুরুষানুক্রমে যাহা এতদিন খাওয়া হইয়াছে তাহাই খাইলে চলিবে না। প্রয়োজন হইবে শরীরের জন্য যাহা প্রয়োজন এবং আমাদের আর্থিক ক্ষমতায় যাহা কুলায় এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান।

বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যতালিকা : একটি প্রস্তাব

সাধারণ পরিশ্রম করে এইরূপ একজন বয়ঃপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকা নিচে দেওয়া গেল। অধিক অর্থব্যয় না করিয়াও অধিকাংশ লোকই চেষ্টা করিলে এইরূপ খাদ্য অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিবে ; এবং নিয়মিত আহার করিলে ইহাতেই তাহার স্বাস্থ্য উত্তমরূপে বজায় থাকিবে।

চাল—১৭৫ গ্রাম

ডাল—১১৫ গ্রাম

গম—১৭৫ গ্রাম

তরকারী—৩৫০ গ্রাম

তেল বা ঘি—১৫ গ্রাম

মুড়ি, চিড়া অথবা ছাতু—১১৫ গ্রাম

গুড়—৬০ গ্রাম

ইহার পরেও যদি আর্থিক সঙ্গতিতে সম্ভব হয়, তাহা হইলে ১১৫ গ্রাম মাছ (শুকনো মাছও চলিতে পারে) অথবা ১১৫ গ্রাম মাংস অথবা একটি ডিম এবং ২৩৫ গ্রাম দুধ খাইতে পারিলে খুবই ভালো হয়। কারণ এই সব জৈব খাদ্যে যেরূপ সম্পূর্ণ প্রোটিন থাকে, ডাল প্রভৃতিতে প্রোটিন যথেষ্ট থাকিলেও তাহাতে সেইরূপ সম্পূর্ণ প্রোটিন থাকে না।

অন্যান্য দেশের খাদ্যব্যবস্থা

আগেই বলা হইয়াছে, ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো দেশের জলবায়ু বা প্রাকৃতিক পরিবেশ যে খাদ্যশস্য চাষের অনুকূল, প্রধানতঃ সেই শস্যই সেই দেশের প্রধান খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। আবার যে অঞ্চলে পশুপালনের বা মৎস্য চাষের সুযোগসুবিধা বেশী, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সেই অঞ্চলের মানুষের খাদ্যতালিকায় যথাক্রমে মাংস ও পশুজাত খাদ্যের বা মৎস্যের পরিমাণ বেশী হইয়া থাকে। আবার শীতপ্রধান দেশে আমিষ ও স্নেহপদার্থ যতটা হজম হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ততটা হয় না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে আমিষজাতীয় খাদ্যদ্রব্যের আধিক্য ঘটে। কয়েকটি দেশের খাদ্য তালিকার আলোচনা করিলেই কথাটি পরিষ্কার হইবে।

ভারতবর্ষের পশ্চিমে এবং এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত
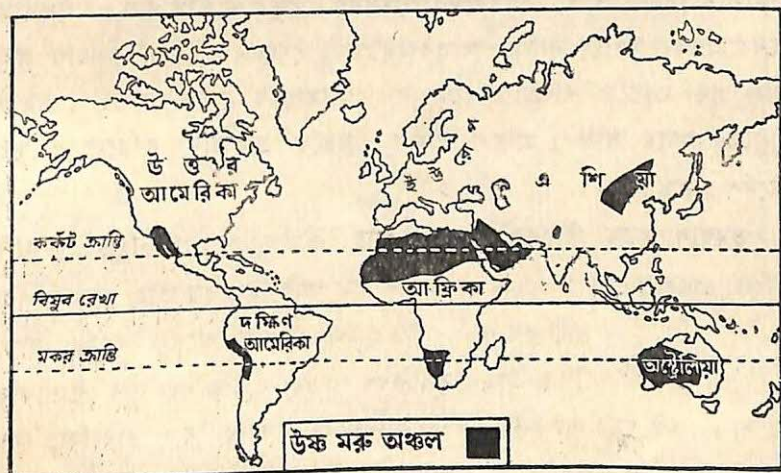
আরব দেশ। এই স্থান উষ্ণ মরু অঞ্চলে অবস্থিত। এদেশে বালুকাময় স্থানই বেশী। প্রাকৃতিক কারণে আরবদেশে বৃষ্টি প্রায় হয়ই না।

এইরূপ জলবায়ুর ফলে এখানে গাছপালা প্রায় জন্মিতেই পারে না। কেবল যেখানে বালির নিচে জল পাওয়া যায় সেইসব অঞ্চলে যে সব মরূদ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে খেজুর ও অন্যান্য কাঁটাযুক্ত গুল্মজাতীয় বৃক্ষ জন্মে। অবশ্য জলসেচের সাহায্যে মরূদ্যানগুলিতে কিছু কিছু যব, ভুট্টা প্রভৃতিরও চাষ হয়। এখানকার প্রধান জীব উট। মরুভূমিতে জলহীন অঞ্চলে চলিবার জন্য শরীরে বিশেষ জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা প্রকৃতি ইহাদের দিয়াছে।

এইরূপ জলবায়ু অঞ্চলে নিশ্চয়ই আমরা প্রধান খাদ্য হিসাবে আমাদের ভারতবর্ষের মত ভাত-রুটি শাক-সবজি আশা করিতে পারি না। বস্তুতঃ স্বাভাবিকভাবেই আরব দেশের বেশীর ভাগ লোকেরই প্রধান খাদ্য তাই খেজুর। এদেশের মাটি ও আবহাওয়ায় খেজুর গাছ প্রচুর জন্মায়। অবশ্য ভাত এবং রুটিও স্বল্প পরিমাণে যে পাওয়া না যায় তাহা নহে। উটের মাংস এবং দুধও আরববাসীর বিশেষ প্রিয় খাদ্য। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবশ্য মাছও খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। উটের মাংস ছাড়া ভেড়ার মাংসও আরববাসীরা খাইয়া থাকে।

বড়ো বড়ো উৎসবানুষ্ঠানে রুটি, কেক, ফলমূল, খেজুর ও দুধ প্রভৃতির সহিত মাংস ও ভাত একযোগে পরিবেষণ করা হয়।

উটের দুধের সহিত খেজুর মিশাইয়া খাইতে আরবরা বিশেষ ভালোবাসে। বাঙ্গালীর যেমন ভাত, আরবদের তেমনই খেজুর জাতীয় খাদ্য। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ নাকি, আরববাসীদের, খেজুরকে পিতা মাতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে ভাতই (অন্ন) মানুষের প্রধান খাদ্য (প্রাণ) বলিয়া, অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞান করিতে শাস্ত্রের নির্দেশ আছে।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিতে গ্রীষ্মকালে মোটামুটি উত্তাপ পাওয়া গেলেও সেখানে তখন যে আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা শুষ্ক বলিয়া বৃষ্টি হয় না। শীতকালে উত্তাপ অনেক কমিয়া যায়, কিন্তু উজ্জ্বল সূর্যকিরণ পাওয়া যায় বলিয়া তত শীতবোধ হয় না। এই সময় এই অঞ্চলের উপর দিয়া যে প্রত্যায়ন বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার ফলে এই সকল স্থানে যথেষ্ট বৃষ্টিও হয়।

এইজাতীয় জলবায়ুর জন্য এখানে সাধারণতঃ চিরহরিৎ গাছ জন্মে। তাহাদের মধ্যে চেষ্টনাট, সিডার, মালবেরি (তুঁত গাছ) প্রভৃতি প্রধান। পৃথিবীর মধ্যে এই অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা বেশী কমলালেবু ও আঙ্গুর জন্মায়। তাছাড়া এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাদাম, পিচ, আপেল, জলপাই প্রভৃতি ফল এবং গমও উৎপন্ন হয়। কিন্তু তৃণভূমি কম বলিয়া এখানে অল্পই পশুপালন হয় ; এবং তাহাও প্রধানতঃ কৃষিকার্যের সহায়তার জন্য।

এই অঞ্চলের অন্তর্গত কয়েকটি দেশের খাদ্যতালিকা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব প্রচুর। **স্পেনে** জলখাবার হিসাবে যে খাদ্যটি সবচাইতে বেশী প্রিয় তাহার নাম বানিউলস্ (bunuelos)। ইহা কেকজাতীয় খাদ্য, এবং ডিম ও ময়দা একত্রে মিশাইয়া তেলে ভাজিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। বস্তুতঃ, স্পেনে মাখন বা ঘি দুর্লভ বলিয়াই অত্যন্ত মহার্ঘ, এবং সেইজন্যই রন্ধনকার্যে বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ রান্নার কাজে জলপাইর তেল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অঞ্চলে রসুনও প্রচুর জন্মায় বলিয়া রান্নার কাজে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উৎসবানুষ্ঠানে ছাগশিশু আস্ত রোষ্ট করিয়া খাওয়ার রেওয়াজ থাকিলেও স্পেনীয়রা অল্পই মাংস খাইয়া থাকে। গমজাতীয় দ্রব্য স্পেনীয়দের প্রধান খাদ্য, তবে জলপাই, কমলালেবু, আঙ্গুর, পিচ, এপ্রিকট প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মায় বলিয়া এই সকল ফল উহাদের আহারের তালিকাভুক্ত।
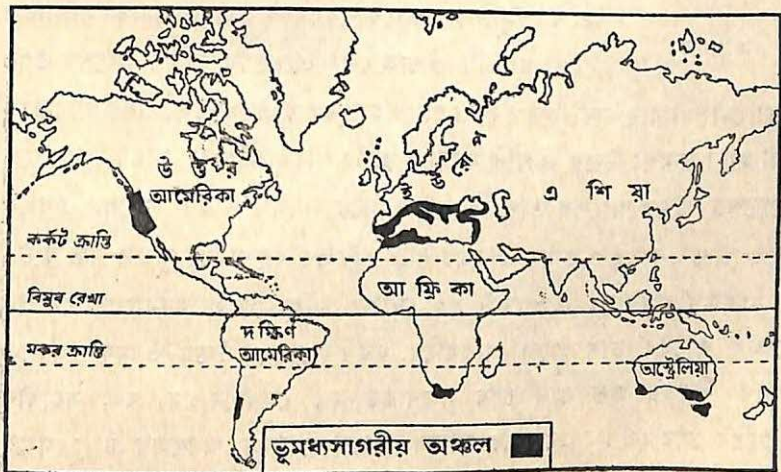
ফরাসী দেশের প্রধান খাদ্য গমজাত দ্রব্য, তরিতরকারী এবং নানাজাতীয় ফল। বিভিন্নজাতীয় খাদ্যপ্রস্তুতের ব্যাপারে ফরাসীদের নাম সুবিখ্যাত। কিন্তু তাহাদের খাদ্যতালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় যদি মদের উল্লেখ না করা হয়। মদ ফরাসীদের বিশেষ প্রিয় পানীয়। খৃষ্টের জন্মেরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে যখন গ্রীকরা প্রথম মার্সেলিস বন্দরে আগমন করে, তখন তাহারাই ফরাসীদেশে আঙ্গুরের চাষ প্রবর্তন করে। এখন আঙ্গুর ফরাসীদেশের অন্যতম প্রধান কৃষিসম্পদ। এই কারণেই এখানে আঙ্গুর-জাত মদের চাহিদা এবং প্রচলন এত বেশী। পর্তুগালেও এই জন্যই মদের প্রচলন খুব বেশী।

সিসিলি এবং ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপেও আমিষাশীর সংখ্যাই বেশী। তবে তাহাদের খাদ্যতালিকায় মাংসের পরিমাণ খুবই কম। গবাদি পশু প্রধানতঃ চাষের কাজেই ব্যবহৃত হয়, এবং কাজের অযোগ্য হইলেই শুধু কসাইখানায় প্রেরিত হয়। মাখন বা ঘি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে বলিয়া খুবই কম ব্যবহৃত হয়। ইহাদের প্রধান খাদ্য "কালো রুটি", বীন, পেঁয়াজ, স্বল্প পরিমাণ মদ এবং ছাগদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত একজাতীয় শক্ত চীজ। ফল উৎপাদন প্রচুর হইলেও সাধারণতঃ তা কমই ব্যবহৃত হয়; বেশীর ভাগই রপ্তানির জন্য সযত্নে সংরক্ষিত হয়।

এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত **জাপান দ্বীপপুঞ্জ** মোটামুটিভাবে চৈনিক জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে গ্রীষ্মকালে মোটামুটি উত্তাপ পাওয়া যায়।

জাপানে

তবে সামুদ্রিক প্রভাবে সবসময়ই আবহাওয়ায় সাম্যভাব দেখা যায়। গ্রীষ্মকালেই এদেশের দক্ষিণ অংশের উপর দিয়া মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং তাহার ফলে ঐ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ উত্তর ও পশ্চিম দিকে বৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া যায়। শীতকালে এদেশের উত্তর অংশের তাপ হিমাঙ্কের নিচে নামিয়া যায়। ফলে, এখানে উত্তর-পশ্চিম বায়ুর প্রভাবে ঐ সময় বৃষ্টি হইলেও বহু সময়ই তুষারপাত ঘটে।

এইরূপ জলবায়ুর প্রভাবেই এই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের দেশের মতোই ধানের চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। দেশের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে অধিক শীতের জন্য ধান চাষ সম্ভব হয় না। সেখানে গম, যব, সয়াবীন প্রভৃতির চাষ হয়। এদেশের দক্ষিণ অংশে পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু গায়ে যথেষ্ট পরিমাণে চা-ও উৎপন্ন হয়।

জাপান দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়া উষ্ণ কুরোসীয় স্রোত এবং শীতল বেরিং স্রোত প্রবাহিত হয়। এই দুই স্রোতের প্রভাবে এবং উপকূলে সমুদ্রের অগভীরতার ফলে এই দেশের পূর্বদিকে পৃথিবীর একটি প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে পৃথিবীর প্রায় সিকিভাগ মাছ ধরা পড়ে।

নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই জাপানবাসীদেরও প্রধান খাদ্য আমাদের মতই ভাত, সবজি এবং মাছ। মাছের অভাব অবশ্য তাহাদের কখনই হয় না। কিন্তু একর প্রতি ধান প্রচুর উৎপন্ন হইলেও (প্রতি একর জমিতে জাপানের মতো এত অধিক ধান একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোথাও হয় না) তাহাতে জাপানবাসীদের মোট চাহিদা মেটে না। ফলে, বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য জাপানকে বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। জাপানে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির একান্ত অভাব, সেই কারণে পশুপালন খুব কম হয় বলিয়া জাপানে মাংস ও দুধের অভাব দেখা যায়। এইজন্য জাপানীদের খাদ্যে মাংস ও দুধের অংশ নগণ্য। চা ইহাদের প্রিয় পানীয়।

ল্যাপল্যাণ্ড

যুরোপের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত **ল্যাপল্যাণ্ড** দেশ মোটামুটিভাবে তুন্দ্রা অঞ্চলের অন্তর্গত। সেখানে গ্রীষ্মকাল অল্পদিন মাত্র থাকে এবং তখন মাঝারি রকমের উত্তাপ পাওয়া যায়। সেখানে বৎসরের অবশিষ্ট সময় তীব্র শীত পড়ে এবং মাঝে মাঝে ভীষণ তুষারঝড় প্রবাহিত হয়। ঐ সময় ঐ অঞ্চলে অনেক দিন সূর্যকে দেখাই যায় না।
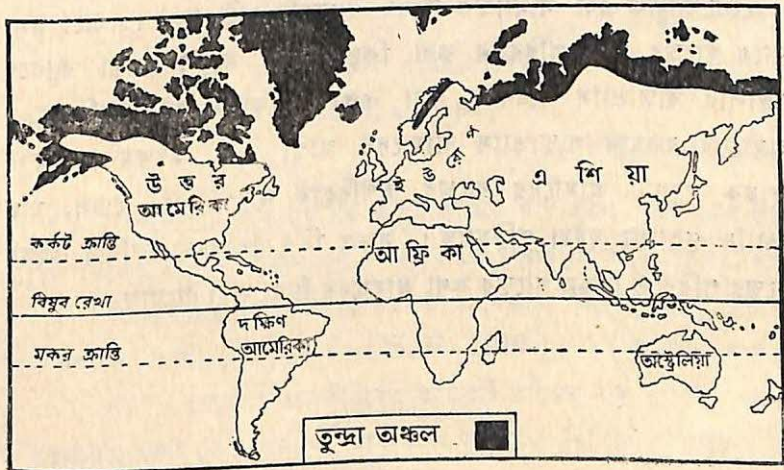
নির্দেশ কর। যে রাজ্যের অধিবাসী যে খাদ্য ব্যবহার করে, তাহার বাম দিকের সংখ্যা, মানচিত্রে ঐ রাজ্যের মধ্যে বসাও। এক রাজ্যে একাধিক সংখ্যা বসাইতে বাধা নাই।

খাদ্যের নাম—

১। পকৌড়া, ২। দোসা, ৩। শুকনো মাছ, ৪। চাল, ৫। গম, ৬। টেপিওকা, ৭। কফি, ৮। সরিষার তৈল, ৯। নারিকেল তৈল, ১০। ঘি।

(খ) কয়েকটি খাদ্যের নাম নিচে দেওয়া হইল। কার্বোহাইড্রেট্, প্রোটিন, চর্বি বা ভিটামিন, কোন্ খাদ্যে কোন্ খাদ্যপ্রাণ বেশী আছে বুঝাইবার জন্য, খাদ্যগুলির নামের নিচে যথাক্রমে, ১, ২, ৩ এবং ৪ সংখ্যাগুলি বসাও।

আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ

খাদ্যের পরেই আমাদের আরেকটি অন্যতম চাহিদা পোশাক-পরিচ্ছদ। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে একটি কাহিনী আছে। ভগবান আদিম মানব-মানবী আদম ও ঈভকে সৃষ্টির পর স্বর্গোদ্যানে রাখিয়া দেন। তাহারা সেখানকার যে কোনো জায়গায় যাইতে পারিত, যে কোনো গাছের ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত। শুধু মাত্র একটি গাছের—যাহাকে বলা হইয়াছে জ্ঞানবৃক্ষ—তাহার ফল ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন শয়তানের প্রলোভনে আদম ও ঈভ সেই গাছের ফলও খাইয়া ফেলিল। তাহার পর ভগবান যখন স্বর্গোদ্যানে আসিলেন তিনি তাহাদের দেখিতে পাইলেন না। বহু ডাকাডাকির পর তাহারা ঝোপের আড়াল হইতে সাড়া দিল। জানাইল, উলঙ্গ বলিয়া তাহারা বাহিরে আসিতে পারিতেছে না।

সভ্যতা ও পোশাক-পরিচ্ছদ

এই কাহিনী হয়তো কাল্পনিক। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি গভীর ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত নিহিত আছে। মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতেই পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। সভ্যতার পথে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের কাহিনীর সহিত বস্ত্রের ইতিহাসও তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আদিম মানুষ উলঙ্গ হইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা অচিরেই বস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করিল। নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদেই তাহারা হাতের কাছে যাহা পাইল তাহার দ্বারাই শরীরকে আবৃত করিতে শিখিল। এই সময় গাছের বাকল, পশুর চামড়া, ঘাস-পাতা প্রভৃতিই ছিল তাহাদের পরিধেয়। শুধু আত্মরক্ষাই নহে। আদিম মানুষের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসও বোধহয় তাহাদের বস্ত্র পরিধানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সমাজ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, খুব সম্ভবত কোন পশু শিকারের পর ঐ পশুর চামড়া পরিধান করিয়াই তাহারা তাহাদের শিকার-উৎসব পালন করিত। ঐসময় তাহারা বিভিন্ন আধিভৌতিক কাল্পনিক শক্তির কাছে শিকারে সাফল্যের কামনা জানাইত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র হিসাবে মানুষের

বস্ত্রের ইতিকথা

ফেল্টের (বিশেষভাবে প্রস্তুত চামড়া) ব্যবহার আরম্ভ করে, তারপর সুতার তৈরী কাপড়ের ব্যবহার শিখে। ক্রমে ক্রমে বস্ত্রের উপাদান হিসাবে, কার্পাস, পশম, রেশম ইত্যাদি ব্যবহার করিতে শিখে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের বস্ত্র প্রস্তুতের উপাদান, বস্ত্র প্রস্তুতের পদ্ধতি এবং বস্ত্র পরিধানের পদ্ধতি, সবকিছুই বহু বিচিত্র।

বস্ত্রাভ্যাসে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

আগেই বলা হইয়াছে, বস্ত্রের জন্য আমাদের যে চাহিদা তাহার মূল কারণ বস্ত্র আমাদের প্রধানত দুইটি প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। প্রথমত, বস্ত্র শীতাতপের হাত হইতে আমাদের রক্ষা করে। আর দ্বিতীয়ত, বস্ত্র দ্বারা মানুষ তাহার লজ্জা নিবারণ করে। ইহা ছাড়াও মানুষ বস্ত্র দ্বারা তাহার অলঙ্করণের প্রবৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধ চরিতার্থ করে। বস্ত্রের ব্যবহারে যথাক্রমে প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রভাব অনস্বীকার্য।

শীতপ্রধান দেশের লোকের বস্ত্র

স্বভাবতই, শীতপ্রধান দেশের লোক বস্ত্র তৈরীর জন্য যে উপাদান ব্যবহার করিবে বা যে জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক তাহা করিবে না। শীতপ্রধান দেশে অত্যধিক শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্যই বস্ত্রের প্রয়োজন। তাই সেখানে প্রধানত লোমশ চামড়ার এবং পশমের আঁটসাঁট বস্ত্রের চাহিদাই বেশী। বস্ত্রের উপাদান হিসাবে যদি তাহারা একান্তই সুতার ব্যবহার করে তাহা হইলেও ঠাস বুননি মোটা কাপড়ই তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কৃত্রিম বস্ত্রের ব্যবহারও একই কারণে শীতপ্রধান দেশে এত বেশী প্রচলিত হইয়াছে। শুধু উপাদানই নহে ; বস্ত্রের রং-এর উপরও প্রাকৃতিক প্রভাব লক্ষণীয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে কালো বা ঘন রং-এর বস্ত্রের সমাদর বেশী। কারণ ঐ কালো রং বা অন্য কোনো ঘন রং সূর্যের রশ্মিকে বেশী গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া ঐ রং-এর কাপড় শরীরকে গরম রাখিতে পারে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের পোশাক স্বভাবতই শীতপ্রধান দেশের লোকের পোশাক অপেক্ষা ভিন্ন।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের লোকের বস্ত্র

বস্তুত, নিরক্ষীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের বস্ত্রের কথা যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায়, তাহারা এক টুকরা বাকল বা গাছের পাতার তৈরী কাপড় দিয়াই তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। বর্তমান-কালে অবশ্য তাহারা সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বাকল বা পাতার পরিবর্তে পাতলা এক টুকরা কাপড়ই তাহাদের পরিধেয়। কোমরের চারিধারে উহা জড়াইয়াই তাহাদের বস্ত্রের প্রয়োজন মেটে। সুতীবস্ত্র বা লিনেনই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের বস্ত্রের প্রধান উপাদান। কারণ, গরমে যে ঘাম হয় তাহা এইজাতীয় কাপড় সহজেই শুষিয়া নেয় এবং ঠাস বুনুনি না হওয়ায় তাহাদের মধ্যেকার সূক্ষ্ম ছেঁদাগুলির মধ্য দিয়া বায়ু চলাচলের সুযোগও থাকে। এই অঞ্চলের বস্ত্রাদির রং প্রধানত শাদা, কারণ ঐ রংটিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় বলিয়া বস্ত্র পরিধানকারী কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা বোধ করিয়া থাকে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিধেয় বস্ত্রাদি শীতপ্রধান অঞ্চলের ন্যায় স্বভাবতই আঁটসাঁট নহে। আবার মরু অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত ঢিলা সুতীবস্ত্রের জামা পরিধান করিয়া থাকে। কারণ ঐরূপ ঢিলা জামা দিনের বেলায় যেমন তাহাদের প্রখর সূর্যরশ্মির উত্তাপের হাত হইতে রক্ষা করে, তেমনি আবার রাত্রির অত্যধিক ঠাণ্ডার হাত হইতেও আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করে।

আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন—কোথাও বেশ গরম, কোথাও বারোমাসই শীতল। এইজন্য এই দেশের লোকেরা শীত-গ্রীষ্মের বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকে।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব

প্রাকৃতিক প্রভাবের ন্যায় মানুষের বস্ত্রাভ্যাসে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। এক দেশের সামাজিক পরিবেশে যে পোশাক বরণীয়, অন্য দেশে তাহা হয়তো অচল। যেমন, ব্রহ্মদেশের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র লুঙ্গি; উহার ঔজ্জ্বল্য ও ব্যবহারের তারতম্যে সেখানকার লোকদের সামাজিক সত্তার পরিচয়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা যদি বা সেই লুঙ্গি বাড়িতে পরি, বাহিরে সেই লুঙ্গি পরিধান করিয়া কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়া আমাদের কল্পনারও বাইরে। আবার, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই যদিও পুরুষেরা এবং মেয়েরা বিভিন্ন রকমের পোশাক ব্যবহার করিয়া থাকে,

এস্কিমোদের মধ্যে পুরুষের ও মেয়েদের পোশাকের প্রায় কোনো পার্থক্যই নাই। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা স্কার্ট পরে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েদের পরিধেয় পাজামা, আর ভারতবর্ষে শাড়ী। আরব দেশে মেয়েরা মুখের সামনে বোরখা দ্বারা ঢাকিয়া রাখে; কিন্তু উত্তর আফ্রিকার টুয়ারেগদের (Tuaregs) মধ্যে পুরুষদেরই মুখ ঢাকিয়া রাখা রীতি।

বহুদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও বস্ত্রাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাজার বছর আগে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা যে পেলিয়াম (pallium) নামক পোশাক পরিত, রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা আজিও অনুরূপ পোশাক পরিয়া থাকেন।

একটি আদিম জাতির উদাহরণ দিলে বস্ত্রাভ্যাসে এই সাংস্কৃতিক প্রভাব কতোটা কাজ করে, তাহা আরও স্পষ্ট হইবে। বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) বিভিন্ন অধিবাসীদের রীতিনীতি বিশেষভাবে অনুশীলনের জন্য জাহাজে করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত টেরা-ডেল-ফুগোতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন সেখানকার অত্যধিক শীতের মধ্যেও সেখানকার অধিবাসীদের পরণে কোনো বস্ত্র নাই। তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ডারউইন তাহাদের কিছু রঙ্গিন বস্ত্র দান করিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখিতে পাইলেন যে তাহারা ঐসব বস্ত্র পরিধান না করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং ঐসব টুকরা তাহারা তাহাদের মাথায় জড়াইয়া লইয়াছে। বস্তুত, ঐ জায়গায় ঐ আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কাপড় পরিবার কোনো রীতিই নাই, কিন্তু অলঙ্করণের জন্য মাথায় খণ্ডবস্ত্র জড়ানোর রীতি রহিয়াছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রভাবের কথা উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অবশ্য জৈবিক প্রয়োজনের জন্যই পোশাকের ব্যবহার। পোশাক কি রকম হইবে তাহাও অবশ্য প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবেই স্থিরীকৃত হয়। তাহা হইলেও মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য-বোধ সেই পোশাকের অলঙ্করণের কাজটুকু করিয়া লয়। তাহা না হইলে একই দেশে একই সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে হয়তো আমরা সব সময়ই একই পোশাকের প্রচলন দেখিতাম। কিন্তু তাহা হয় না। মানুষের রুচির পরিবর্তনে নিত্য নূতন

সৌন্দর্যবোধ ও পোশাক

স্টাইলের উদ্ভবে পোশাকেরও বিবর্তন ঘটে। মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাদের এই সৌন্দর্যবোধই তাহাদের পোশাককেও পাল্টাইয়া চলিয়াছে ; নিত্য নূতন পোশাকের রীতির উদ্ভব ঘটিতেছে। শুধু সভ্য মানুষের কথাই বা বলি কেন। আদিম মানুষও তাহাদের সহজাত সংস্কারের বশেই পোশাকের দ্বারা তাহাদের জৈবিক প্রয়োজন মিটাইবার পরই তাহাকে সুন্দরতর করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। এইজন্যই দেখা যায়, পাখীর রঙ্গিন পালক প্রভৃতি খুঁজিয়া তাহারা তাহাদের পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যেখানে বস্ত্রাভাব সেখানে গায়ে-হাতে-পায়ে রঙ্গিন উল্‌কি আঁকিয়া তাহারা তাহাদের সৌন্দর্যস্পৃহা চরিতার্থ করে। জুতা, টুপী, দস্তানা, অলঙ্কার প্রভৃতি যেসব আনুষঙ্গিক পোশাক আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাদের কোনো কোনোটা শীতাতপ হইতে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলেও, তাহাদের বৈচিত্র্য আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রভাবের সাক্ষ্যই বহন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরা শাড়ী পরিলেও, পরার ভঙ্গির বিভিন্নতার ভিতর দিয়াই তাহাদের সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ পায়। একই কারণে তাহারা শাড়ীকে বিভিন্ন রঙেও রঞ্জিত করে।

পরনের কাপড়কে সুন্দরতর করার জন্য তাহার উপর নানা ধরনের কারুকার্য করা হয়। যেসব স্থলে কাপড়কে কাটিয়া সেলাই করিয়া পরা হয়, সেসব স্থলে তো নিত্য নূতন কাটার এবং সেলাই করার ভঙ্গি বাহির হইতেছে। পোশাকে সৌন্দর্যবোধের ব্যাপারে মেয়েরাই অগ্রণী। দেহের রং, পরিধেয় পোশাকগুলির পরস্পরের রং এমন কি আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরিচ্ছদের রং নির্বাচন করিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন। সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার নিমিত্তই মানুষ নানা ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্তমানে পুরুষদের মধ্যে অলঙ্কার ব্যবহারের রীতি কমিয়া আসিলেও, তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দেহসজ্জাকেও পরিচ্ছদের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়।

এ বিষয়ে মনে রাখিতে হইবে, দেহসজ্জায় অধিক কৃত্রিমতা এবং পরিচ্ছদে বাহুল্য উচ্চ রুচিবোধের পরিচয় নয়। সহজ সরলতার মধ্যেই প্রকৃত সৌন্দর্যের বিকাশ। পোশাকের ভিতর দিয়া আপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইলে তাহা উচ্চ রুচিবোধের পরিচায়ক।

পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি

উপরের আলোচনা হইতে ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে রীতিমত বিবেচনা করিয়া পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন করিতে হয়। আমাদের দেশে কাহারও কাহারও ধারণা যে পোশাক-পরিচ্ছদের উপর এতখানি দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন কি—নিতান্ত লজ্জা নিবারণ হইলেই হইল। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক নহে। লজ্জানিবারণ ছাড়াও, দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা, সৌন্দর্যবৃদ্ধি, সামাজিকতা প্রভৃতি নানারূপ উদ্দেশ্য যে পোশাক পরিধানের আছে তাহা তোমরা দেখিয়াছ। তাই নিতান্ত খেয়াল খুশীমত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত নহে।

পোশাক পরিধানের সময় প্রথমেই স্বাস্থ্যরক্ষার কথা মনে রাখিতে হইবে। দেহের তাপ-সৃষ্টি এবং তাপমোচনের মধ্যে সমতা সাধন করিয়া শারীরিক সুস্থতা রক্ষা করা যে পোশাক পরিধানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ইহা সর্বদা মনে রাখিবে। অধিকসংখ্যক এবং বেশী আঁটসাঁট জামা-কাপড় পরিলে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ কষ্টকর হইয়া গলরন্ধ্র-গ্রন্থি (adenoids) বৃদ্ধি পাওয়া আশ্চর্য নয়। আঁটসাঁট কাপড় জামা এবং জুতা পরিধান করিলে দেহের রক্ত-সঞ্চালনেও বাধা জন্মাইতে পারে। কোনো কোনো মেয়েরা কর্‌সেট্ পরিয়া থাকেন। দীর্ঘদিন কর্‌সেট্ আঁট করিয়া পরিলে, ফুস্‌ফুসের নীচের অংশ ক্রমশ সরু হইয়া আসে এবং কখনও কখনও যকৃতও স্থানচ্যুত হয়। আবার, ছেলেরা শক্ত আঁট কলার দীর্ঘদিন ব্যবহার করিলে ঘাড়ের দুই পাশের রক্তবাহী ধমনীগুলি চাপিয়া যায়। আমাদের দেশে কিছুটা ঢিলা এবং হালকা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করাই ভালো। সংক্ষেপে, ঋতু বুঝিয়া, আবহাওয়ার অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যে কার্যে লিপ্ত থাকা হয় তাহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এবং স্বাস্থ্যের কথা মনে রাখিয়া পোশাক নির্বাচন করিতে হয়।

পোশাকের পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ব্যবহারের ফলে চর্মরোগ এবং আরও নানাপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে। কাজেই যেসব জামাকাপড় সহজে ধৌত করা যায়, সেই সব জামাকাপড়ই সাধারণত ব্যবহার করা ভালো। আমাদের বাংলাদেশে অত্যধিক ঘাম হইয়া থাকে। ফলে, জামা-কাপড় নিয়মমত ধৌত না করিলে অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। বাহিরের পোশাক যেমন তেমন হউক, আমরা

অনেকে অন্তর্বাসের পরিচ্ছন্নতার কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। ইহারা লোকচক্ষে না পড়িলেও ইহাদের অপরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর।

দৈহিক সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধনের কথা মনে রাখিয়াও পোশাক নির্বাচন করিতে হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। পরিচ্ছদ নির্বাচন কালে দীর্ঘাঙ্গ কিংবা খর্বাকৃতি, ক্ষীণাঙ্গ কিংবা স্থূলকায় একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। দেহের ত্রুটিগুলি ঢাকিবার নিমিত্ত পরিচ্ছদের সাহায্য গ্রহণ করা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পরিচ্ছদ নির্বাচনের দ্বারা মোটা লোককেও কিছুটা ক্ষীণকায় এবং ক্ষীণকায় লোককেও কিছুটা মোটা দেখানো যাইতে পারে। আরেকটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে শালীনতা সৌন্দর্যের অঙ্গ। শালীনতা রক্ষা করিয়া পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বেশভূষা

আমাদের এই বিরাট দেশ মোটামুটিভাবে উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত হইলেও ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর বৈচিত্র্যের কথা আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাছাড়া, এই দেশের অধিবাসী হিসাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারক-বাহক বিভিন্ন জন যে তাহাদের স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহাও তোমরা জান। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের ন্যায় পোশাকেও বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতের পোশাক

পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের মতোই প্রাচীন ভারতবর্ষের আদিমতম অধিবাসীরা চামড়া বা গাছপালার পোশাক পরিয়াই শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিত। কিন্তু খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেই তাহারা যে কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছিল হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আর্যরা অবশ্য বল্কল এবং সুতীবস্ত্র উভয়ই পরিধান করিত। কিন্তু সেলাই করা বস্ত্র পরিধানের রীতি তখনও ছিল না। সেলাই করা বস্ত্রের প্রচলন হয় আরও পরে, উত্তর-পশ্চিমের বহিরাগত জাতিগুলির সহিত সংযোগের ফলে। পুরুষদের অধোবাস প্রাচীন বাঙ্গালী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে ছিল একান্তই ধুতি ; উত্তরাঞ্চলে

ধুতির সহিত পরবর্তীকালে ঢিলা বা চুড়িদার পাজামারও প্রচলন হয়। মেয়েদের অধোবাস ছিল শাড়ী ; পরবর্তীকালে অবশ্য ঘাগরারও প্রচলন হয়। মেয়েদের উর্ধ্বাঙ্গ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থাকিত অনাবৃত। তবে উত্তর-পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাবে কেহ কেহ যে কাঁচুলী বা ওড়নার সাহায্যে উর্ধ্বাংশ ঢাকিয়া রাখিত সমসাময়িক চিত্রে ও ভাস্কর্যে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। অবশ্য সাধারণ নিম্নবিত্ত ঘরের নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাঞ্চল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।

সঙ্গতিপন্ন পুরুষরাও উত্তরবাস হিসাবে উত্তরীয় ব্যবহার করিত। আরও পরে, মুসলমানদের আগমনের ফলেই, প্রধানত আমাদের বস্ত্রবাহুল্য বৃদ্ধি পায়, এবং প্রায় দুইশত বৎসর আগে য়ুরোপীয়দের আগমনের ফলে আমাদের পোশাকে পাশ্চাত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসীরা—কি পুরুষ কি নারী—অলঙ্কার ব্যবহার করিতে খুবই ভালোবাসিত। উভয়ের কাছেই কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ূর, মেখলা প্রভৃতি ছিল খুবই প্রিয়। বিবাহিত নারীরা বিশেষভাবে ব্যবহার করিত শঙ্খবলয়। পোশাকের উপাদান হিসাবে কার্পাসজাত বস্ত্রই ছিল প্রধান। তবে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকেও যে এই দেশে রেশমের বস্ত্র চালু ছিল, সমকালীন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে "চীনপট্টের" উল্লেখই তাহার প্রমাণ। এছাড়া ঐ গ্রন্থ হইতেই জানা যায় পূর্বাঞ্চলে পত্রোর্ণ বস্ত্র (পত্র হইতে জাত বস্ত্র = এণ্ডি ?) এবং বাংলাদেশের কার্পাসজাত দুকূল বস্ত্র খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, বাংলাদেশের এই দুকূল বা খুবই সূক্ষ্ম বস্ত্র বহুদিন পর্যন্ত পাওয়া যাইত। আরব বণিক সুলেমান (৯ম শতক), ভিনিসীয় মার্কোপোলো (১৩ শতক), পরিব্রাজক ফা হুয়ান (১৫ শতক) প্রভৃতি সবাই ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ঢাকার মসলীন ইহারই উত্তরসূরী। কিন্তু ইংরেজদের অত্যাচারে এই শিল্প ধ্বংস হইয়া যায়।

বর্তমান ভারতের পোশাক-পরিচ্ছদ

বর্তমানকালে এই দেশের বিভিন্ন অংশের বহু বিচিত্র বেশভূষা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে বলা যায়, গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ার সহিত খাপ খাওয়াইয়াই প্রায় সমস্ত ভারতীয় পোশাকই ঢিলা ধরনের এবং পাতলা কাপড়ের তৈরী। রঙ্গিন ও অলঙ্কৃত বস্ত্রাদি মেয়েরা ব্যবহার করিলেও ছেলেদের পোশাক

প্রায় সর্বত্রই শাদা। উত্তর ভারতে, বিশেষ করিয়া পূর্বাঞ্চলে ও দক্ষিণে, পুরুষদের অধোবাস হিসাবে ধুতিই প্রধান পরিধেয়। তবে উত্তর ভারতে যেমন কাছা-কোঁচা দিয়া ধুতি পরা হয় দক্ষিণে তাহা হয় না। সেখানে ধুতিকে লুঙ্গির মতো করিয়া পরিধান করা হইয়া থাকে। মধ্যভারত এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারত মুসলমান ও অন্যান্য বহিরাগত জাতির সংস্পর্শে বেশী আসিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় সেখানে পায়জামা—ঢোলা এবং চুড়িদার উভয়ই—বেশী প্রচলিত। হয়তো বা সেখানকার জলবায়ুতে

বাঙ্গালী মারাঠী অসমীয়া

রাজস্থানী মাদ্রাজী পাঞ্জাবী

শীতাধিক্যও সেখানকার লোকদের চাপা পায়জামা পরিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পুরুষদের উত্তরবাস হিসাবে ফতুয়া ও পাঞ্জাবীর ব্যবহার সুপ্রচলিত। দক্ষিণে, হয়তো বা গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যই, এখনও শুধু উত্তরীয়ের ব্যবহার প্রচলিত। ইহা ছাড়া, য়ুরোপীয় পোশাকও সর্বত্রই প্রচলিত। মুসলিম সংস্কৃতির অনুকৃতিতে গলাবন্ধ শেরওয়ানীর প্রচলনও পশ্চিম ও উত্তরে খুবই বেশী। মেয়েদের অধোবাস প্রধানত শাড়ী। কিন্তু পুরুষদের মতো তাহাদের শাড়ী পরিবার

পদ্ধতিও সর্বত্র এক নহে। আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা যেমন কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়া অধোবাস রচনা করিয়া আঁচলটিকে কোমরের ডান দিক হইতে তির্যকভাবে বক্ষের উপর দিয়া বা কাঁধের পিছনে ফেলিয়া কাপড় পরিয়া থাকে, অন্যত্র তাহা নহে। পশ্চিমে মেয়েরা কোমরের বাঁ দিক হইতে তির্যকভাবে পিছন দিক দিয়াই ডান কাঁধের উপর দিয়া শাড়ীর আঁচলকে সামনে আনিয়া উহার দ্বারা উত্তরবাস রচনা করে। আবার, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে মেয়েরা শাড়ীর মধ্যভাগ কোমরে জড়াইয়া এক প্রান্ত টানিয়া পশ্চাদ্দিকে পুরুষদের মত কাছা দিয়া এবং অপর প্রান্ত দিয়া উত্তরবাস রচনা করিয়া কাপড় পরিয়া থাকে। গুজরাট অঞ্চলে মেয়েরা ঘাগরা এবং আসাম অঞ্চলে মেয়েরা সায়া জাতীয় মেখলা অধোবাস হিসাবে ব্যবহার করে; উত্তরবাস হিসাবে অতীতের অনুকরণে তাহারা ওড়না ব্যবহার করে। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মেয়েদের মধ্যে শাড়ীর প্রচলন থাকিলেও তাহারা প্রধানত চুড়িদার পাজামাই অধোবাস হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার সহিত লম্বা হাতওয়ালা হাতকাটা জামা এবং ওড়না বা দোপাট্টা তাহারা পরিধান করে। গ্রামাঞ্চলে বা নিম্নবিত্ত পরিবারে মেয়েরা যদিও প্রায় সর্বত্রই এক বস্ত্র পরিয়াই লজ্জা নিবারণ করে, তবুও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারের ফলে ব্লাউজ, সায়া, সেমিজ প্রভৃতিরও যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে। বড়ো বড়ো শহরগুলিতে, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব খুব বেশী পরিলক্ষিত, সেখানে বিত্তবান ঘরের মেয়েদের মধ্যে স্কার্ট ও ফ্রক, স্ল্যাকস, ট্রাউজার ও সার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধরনের পোশাকের প্রচলনও দেখা যায়। তবে তাহা খুবই সীমিত। যুদ্ধোত্তরকালে মেয়েরাও বেশী বাহিরের কাজে যোগ দেওয়ার ফলেই বোধহয় এই জাতীয় আঁটসাঁট পোশাকের চাহিদা বাড়িয়াছে।

বস্ত্রের উপাদান জলবায়ু অনুযায়ী দেশের এক এক জায়গায় এক এক রকম। দক্ষিণাঞ্চলে কার্পাস বস্ত্রেরই একচেটিয়া প্রাধান্য। পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমে কার্পাস বস্ত্র বেশী পরা হইলেও শীতকালে মধ্যবিত্ত ও বিত্তবানরা পশমের পোশাকও ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্বাঞ্চলে এণ্ডি বা মুগা জাতীয় বস্ত্র এখনও খুব ভালো উৎপন্ন হয় বলিয়াই ঐ স্থানে শীতকালে এণ্ডির পোশাকও পরা হয়। মধ্যভারত, এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শীতকালে শীতের আধিক্য হেতু পশম বস্ত্রের চাহিদা খুব বেশী। ইহা ছাড়া ভারতের

সর্বত্রই বিত্তবানদের মধ্যে রেশম বস্ত্রেরও যথেষ্ট প্রচলন রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া উৎসবানুষ্ঠানে রেশম বস্ত্র পরিধান মেয়েদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। সাম্প্রতিককালে নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন প্রভৃতি কৃত্রিমবস্ত্রও বেশী টেঁকসই বলিয়া এবং সহজেই ধোয়া যায় বলিয়া যথেষ্ট সমাদৃত হইতেছে।

আনুষঙ্গিক পোশাক হিসাবে অলঙ্কার বর্তমান কালে ভারতীয় পুরুষরা আর বিশেষ পরে না। তবে ভারতের প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের কাছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এখনও খুবই প্রিয়। দক্ষিণ ভারতের মেয়েরা অবশ্য ফুলের অলঙ্কারও খুব ভালোবাসে। য়ুরোপীয়দের মত মস্তকাবরণ ভারতীয় পরিচ্ছদের অঙ্গরূপে সর্বত্র অপরিহার্য নয়। মস্তকাবরণের প্রয়োজনীয়তা জলবায়ুর উপর অনেকটা নির্ভরশীল। পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রীষ্মে গরম বেশী এবং শীতে শীতও বেশী। এইরকম চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বিশিষ্ট স্থানে শীত ও তাপ হইতে মস্তক রক্ষার জন্য মস্তকাবরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। দক্ষিণে বা পূর্ব অঞ্চলে মস্তকাবরণ বলিয়া সাধারণত কিছু নাই। পাঞ্জাবী শিখেরা ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসাবেই পাগড়ী মাথায় দিয়া থাকে। রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা বিভিন্ন রকমের পাগড়ী ব্যবহার করে। মুসলমানরা ফেজ বা অলঙ্কৃত চ্যাপ্টা টুপী মাথায় দেয়। পার্শীরা মাথায় দেয় কোণাকৃতি অলঙ্কৃত টুপী। এ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্রই সাধারণ মানুষ পাতা দিয়া মস্তক আচ্ছাদন তৈরী করিয়া সূর্যের খরতাপ হইতে আত্মরক্ষা করে। মেয়েদেরও মস্তকাবরণ বলিয়া কিছু নাই। তাহারা শাড়ীর আঁচল বা ওড়না দিয়াই সেই কাজ চালাইয়া লয়। তাছাড়া, নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশই তাহাদের শিরোভূষণ। তাহাদের কাহারও লম্বমান কেশ ঘাড়ের উপর খোঁপা করিয়া বাঁধা থাকে, কাহারও বা মাথার পিছন দিকে থাকে এলানো, আবার কাহারও বা মাথার উপরে থাকে প্যাঁচানো ঝুঁটি। সাম্প্রতিককালে বাহিরের প্রয়োজনে ও পাশ্চাত্য প্রভাবে ভারতীয় মেয়েরাও কেহ কেহ চুল "বব্" করিয়া ছোটো করিয়া থাকে।

জাতীয় পোশাক

বিদেশে এই বহুবিচিত্র বেশভূষা লইয়া এক জাতি হিসাবে আমাদের পরিচয় তুলিয়া ধরার অসুবিধা হয়। সেই কারণেই দেশ স্বাধীন হওয়ার

পরে আমাদের জাতীয় পোশাকের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আর সেই প্রয়োজনেরই তাগিদে কালো শেরওয়ানী এবং শাদা পাজামা বা ট্রাউজার আমাদের জাতীয় পোশাক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে পোশাক-পরিচ্ছদের সংস্কার

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের প্রভাবের ফলে পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বিশেষ পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। এই সময় পরিচ্ছদের প্রয়োজন কি এবং কি ধরনের পরিচ্ছদ পরিধান করিলে তাহাকে আদর্শ পরিচ্ছদ বলা যাইতে পারে, এই আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা, শ্লীলতা রক্ষাই পোশাক-পরিচ্ছদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। কিন্তু, আমরা দেখিয়াছি যে, অনেক আদিবাসী পোশাককে শ্লীলতা রক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার না করিয়া, দেহ অলঙ্করণের কাজে ব্যবহার করে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ডারউইন সাহেব একদল আদিবাসীকে কাপড় দিলে, তাহারা উহা দ্বারা লজ্জা নিবারণ না করিয়া, উহাকে পাগড়ির মতো ব্যবহার করে। কিন্তু সে যাহা হউক, সভ্যসমাজে শ্লীলতা রক্ষা করা নিশ্চয়ই পরিচ্ছদ পরিধান করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও পোশাকের প্রয়োজন রহিয়াছে। পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া, শরীরের উত্তাপের যথাযথ সংরক্ষণ ও মোচন সম্ভব নয়। শারীরিক শ্রম এবং দেহযন্ত্রে স্বতঃস্ফুরিত ক্রিয়াকলাপের ফলে, শ্বেতসার ও স্নেহ-পদার্থের সাহায্যে সব সময়ই দেহাভ্যন্তরে তাপের সৃষ্টি হইতেছে। অপর দিকে একই কারণে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, ঘর্মবিন্দুতে এবং মলমূত্রে দৈহিক তাপ বাহির হইয়া যাইতেছে। ঋতু, আবহাওয়া এবং শ্রমের তারতম্য অনুসারে মানুষের দেহের তাপরক্ষণ বা মোচন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আবহাওয়ার প্রভাবে শীতকালে আমরা কৃত্রিম উপায়ে দেহের তাপ সংরক্ষণের

পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন

জাতীয় পোশাকে ভারতীয়

ইউরোপীয় পোশাকে ভারতীয়

চেষ্টা করিতে বাধ্য হই এবং গ্রীষ্মকালে একই কারণে তাপমোচনের চেষ্টা করি। পোশাক-পরিচ্ছদ দেহের তাপ রক্ষা করা বা মোচন করার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু তথাপি উহা দেহকে উভয়বিধ কর্ম-সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। দেহের চামড়া এবং পরিচ্ছদের মধ্যে একটি বায়ুস্তর থাকে। দেহ হইতে বহির্গত উত্তাপ ঐ মধ্যবর্তী বায়ু-স্তরকে উত্তপ্ত করে। পরিচ্ছদ ঐ বায়ুস্তরটিকে দেহের সঙ্গে আটকাইয়া রাখে বলিয়া পরিচ্ছদ পরিধানে দেহ উত্তপ্ত হয়। শুধু উত্তাপ-সংরক্ষণের জন্য নহে, উত্তাপ-মোচনের জন্যও পরিচ্ছদের প্রয়োজন। এমন সব কাপড় আছে (যেমন, সুতার কাপড়, লিনেন ইত্যাদি) যাহা উত্তাপের সঞ্চালক। এই সব কাপড় উত্তাপমোচনে সাহায্য করে বলিয়া, গ্রীষ্মকালে পরিলে আরাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, পশমের পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের দৈহিক উত্তাপের ক্ষয়ও প্রতিরোধ করে। পশমের মধ্যে একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ আছে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই ইহা জল শোষণ করে। তাই শীতের দিনে পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিলে দেহ হইতে বহির্গত ঘাম উহা শোষণ করিয়া নেয়। দ্রুত দেহের তাপ ক্ষয় হইতে পারে না। অতএব, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, দৈহিক তাপের সৃষ্টি ও তাপমোচন এই দুয়ের মধ্যে সমতা সাধন করিয়া দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করা। বাহিরের ময়লা হইতে আমাদের দেহকে রক্ষা করিয়াও পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করে। তাই বিভিন্ন কর্মের জন্য উপযোগী পরিচ্ছদ আজকাল পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবহৃত হইতেছে। দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাও পোশাক-পরিচ্ছদের অন্যতম কাজ। মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যপ্রিয়।

সৌন্দর্যের উপলব্ধি ও প্রকাশের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাই সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্যপ্রীতিও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে পোশাক-পরিচ্ছদের সাহায্যে দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে আমাদের বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছে। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে বাড়াবাড়ি করিলে, তাহার একটা মন্দ ফলও আছে। সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের নিমিত্ত, পোশাক-পরিচ্ছদে অতিরিক্ত ব্যয় করার ফলে, অনেককে দৈনন্দিন খাদ্যে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইতেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের মন্দ দিক

ফলে, স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় হয়তো এমন পরিচ্ছদ পরা হইল যাহা দেহের তাপ সংরক্ষণ ও মোচনে সমতা বিধান না করিয়া উহা ঐ কার্যে কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করিল। অতিরিক্ত কৃত্রিম অঙ্গরাগ ইত্যাদি ব্যবহারের ফলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। পোশাক-পরিচ্ছদ কর্মোপযোগী না হইলে অনেক সময় উহা কর্মে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

নিচে ভারতের কয়েকটি দেশের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

বাংলা দেশ

অন্যান্য দেশের মত বাংলা দেশের পোশাক-পরিচ্ছদও প্রাকৃতিক কারণ, সাংস্কৃতিক কারণ ও সৌন্দর্য বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাঙ্গালী পুরুষের জাতীয় পোশাক ধুতি ও পাঞ্জাবী। ধুতি কাছা দিয়া পরা হয় এবং সামনের দিকে "কোচা" ঝোলানো থাকে। বাঙ্গালী সাধারণত সাদা রং-এর পাঞ্জাবী বেশী পছন্দ করে। পাঞ্জাবীর হাত ঢোলা বা চুড়িদার থাকে। পাঞ্জাবীর ব্যবহার সম্ভবত ঐসলামিক সংস্কৃতির প্রভাবেই প্রচলিত হইয়াছে। পাঞ্জাবীর নীচে অন্তর্বাস রূপে সাধারণত গেঞ্জি ব্যবহার করা হয়। গেঞ্জির ব্যবহার ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফল। বর্তমানে অনেকে ধুতির পরিবর্তে পায়জামা পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এখনও খুব বেশী নহে। পায়জামা পরা সম্পূর্ণরূপে ঐসলামিক সংস্কৃতির প্রভাবের ফল।

গরীব কৃষকরা কিন্তু এখনও প্রধানত গামছা পরিয়াই তাহাদের কাজ-কর্ম করেন। অনেকে, বিশেষ করিয়া মুসলমানেরা, লুঙ্গি পরিয়া থাকেন। গরীবদের উর্ধ্বাঙ্গ সাধারণত খালিই থাকে।

বাঙ্গালী মেয়েরা নানা বিচিত্র রংএর শাড়ী পরিয়া থাকেন। তাহাদের শাড়ী পরিবার ভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। নিম্নাঙ্গে লুঙ্গির মত শাড়ী পরিয়া, উহার অপর অংশ (অঞ্চল) কোমর হইতে পিছনে ঘুরাইয়া ডান কাঁধের উপর দিয়া সামনে ঝুলাইয়া বাঙ্গালী মেয়েরা শাড়ী পরিয়া থাকেন ; যাঁহারা বিবাহিতা তাঁহারা পিছনের কাপড়ের অংশ মাথায় দিয়া

ঘোমটার সৃষ্টি করেন। শহরে মেয়েরা ইউরোপীয় প্রথার অনুকরণে শাড়ীর নিচে নিম্নাঙ্গে সায়া এবং উর্ধ্বাঙ্গে বডিস্ ও ব্লাউজ পরিয়া থাকেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর প্রাকৃতিক পরিবেশে বস্ত্র পরিধানের প্রয়োজন প্রায় নাই বলিলেই চলে। দরিদ্র বাঙ্গালী পুরুষদের বস্ত্রের প্রয়োজন একখানা গামছাই মিটাইতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তে, সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং সৌন্দর্যবোধ বাঙ্গালীর পোশাক-পরিচ্ছদকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদে ঐসলামিক ও ইউরোপীয় প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়িয়াছে। আরব দেশের লোকের পোশাক-পরিচ্ছদ কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই যেন তাহাদের পরিধান। এস্কিমোদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে।

এস্কিমোদের পোশাকে সৌন্দর্যবোধ তৃপ্ত করার চেষ্টাও দেখা যায়। পশুর চামড়া ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহা নানাভাবে ডিজাইনের মত সাজাইয়া কঠোর পরিশ্রম দ্বারা সেলাই করিয়া তাহারা বিচিত্র পোশাক প্রস্তুত করে। চামড়ার উপর নানাধরনের নক্সার কাজেও এস্কিমোরা দক্ষ। তাহাদের পোশাক কেবল তাহাদের আত্মরক্ষার কাজেই লাগে না, তাহাদের সৌন্দর্যবোধও তৃপ্ত করে।

কাশ্মীর

কাশ্মীরের পুরুষগণ নিম্নাঙ্গে ধুতির পরিবর্তে পায়জামা পরিয়া থাকেন। দরিদ্র মুসলমানেরা লুঙ্গিও পরেন। কাশ্মীরের অধিবাসীরা চুড়িদার পায়জামা পরিতেই অভ্যস্ত—ইহা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত আঁটসাঁট, তারপর ঢিলা। উর্ধ্বাঙ্গে কাশ্মীরীরা ঢিলা, লম্বা, পুরাহাতের জামা (কুর্তা) পরিয়া থাকেন। শীতকালে কুর্তার নিচে আরও দুই একটি ছোট জামা থাকে। কাশ্মীরী হিন্দুরা পাগড়ী এবং মুসলমানেরা টুপি পরিয়া থাকেন।

মেয়েরা সাধারণত সালওয়ার পরেন। ইহা অনেকটা থলির মত পায়-জামা ; পায়ের পাতার কাছে উহা আংটার মত লাগিয়া থাকে। মেয়েরা রং ভালোবাসেন বলিয়া সালওয়ার নানা রংএর হইয়া থাকে।

কাশ্মীরের মেয়েরা উর্ধ্বাঙ্গে কামিজ পরেন। ইহা পুরাহাতা লম্বা ঝুল

বিশিষ্ট জামা, ঝুল প্রায় হাঁটুর উপর আসিয়া পড়ে। হিন্দু মেয়েরা কেহ কেহ **ফারাণ** নামে একপ্রকার জামা পরিয়া থাকেন। উহা কামিজেরই মত, কিন্তু ইহার ঝুল পায়ের পাতার উপর আসিয়া পড়ে। ফারাণ পরিলে নিম্নাঙ্গে পরার জন্য আর সালওয়ারের প্রয়োজন হয় না।

কাশ্মীরের মেয়েদের মধ্যে ওড়না ব্যবহারের প্রচলনও আছে। ইহা এক টুকরা পাতলা ছোট কাপড়, ইহার দ্বারা সাধারণত মাথা এবং বুকের দিক ঢাকা দেওয়া চলে।

বাঙ্গালীর পোশাক-পরিচ্ছদে সংস্কার

আমাদের বাঙ্গালীদের পোশাক-পরিচ্ছদে সংস্কারের প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রথমত, আমাদের পোশাক এত ঢিলা-ঢালা যে উহা কর্ম উপযোগী নহে। উহার কিছুটা রদবদল করিয়া এবং উহার পরিধান-ভঙ্গির পরিবর্তন করিয়া উহাকে অধিকতর কর্মোপযোগী করিয়া নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত অনেক ক্ষেত্রে, মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদে আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী শ্লীলতার অভাব দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণের ফলেই আমাদের মধ্যে এই বিভ্রম দেখা দিয়াছে। পোশাক নির্বাচনের সময় মনে রাখিতে হইবে যে, তাহা যত সরল হয় ততই ভালো। পোশাকের ব্যাপারে অনর্থক অধিক ব্যয় করাও উচিত নয়। পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্যের কথা সব সময় স্মরণ রাখিয়া পোশাক নির্বাচন করিতে হয়।

দেশ-বিদেশের পোশাক-পরিচ্ছদ

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পোশাক যদিও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তবু মেরু অঞ্চলে, আফ্রিকার অনগ্রসর অঞ্চলে বা আরবের মরু অঞ্চলে এখনও তাহাদের আদিম পোশাক-পরিচ্ছদ বহুল পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। বস্তুত, এই সব পোশাক সম্বন্ধে খোঁজ করিলে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব আমাদের বস্ত্রাভ্যাসকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে।

মেরু অঞ্চলে যে এস্কিমোরা বাস করে তাহাদের কাছে পোশাক তৈরীর জন্য কোনো কার্পাসজাত তুলা বা মেষজাত পশম লভ্য নহে। কারণ ঐরূপ

শীতে তুলার চাষ বা মেষপালন কোনোটাই সম্ভব নহে। আর পাওয়া গেলেও সেই তুলা বা পশমজাত বস্ত্রে সেখানকার শীতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। ইহারা প্রধানত শিকারী। তাই যে পশুর মাংস তাহাদের খাদ্য, সেই পশুর চামড়াকেই তাহারা শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য পোশাক তৈরীর কাজে লাগায়। গ্রীষ্মকালে ইহারা বল্‌গা হরিণের চামড়া দিয়া তৈরী আঁটসাঁট বস্ত্র পরিধান করে; চামড়ার লোমশ দিকটি গায়ের সহিত মিশিয়া থাকে। আমাদের ঐরূপ পোশাক পরিতে হইলে আমরা হয়তো গরমে দম বন্ধ হইয়াই মারা যাইতাম। শীতকালে ঐ পোশাকের উপরেই তাহারা বল্গা হরিণের চামড়ারই তৈরী আর এক প্রস্থ কোট পরে, কিন্তু ইহার লোমশ দিকটি থাকে বাহিরের দিকে। এই বাহিরের কোটটির সহিত একটি মস্তকাবরণও লাগানো থাকে, যাহা টানিয়া দিলে কান ও মাথা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়া যায়। তাহারা সীল মাছের চামড়া দিয়া লম্বা লম্বা জুতা পরিয়া থাকে কারণ উহা জলে ভেজে না বা নষ্ট হয় না। এই সীল মাছও তাহারা শিকার করিয়া থাকে। জুতার ভিতরে তাহারা পায়ে হরিণের চামড়ার মোজা পরিয়া থাকে। তাছাড়া, তাহারা চামড়ার তৈরী এক বিশেষ ধরনের দস্তানাও পরিয়া থাকে, যাহাতে গোটা হাতটাই ঢাকা পড়ে। প্রতিটি আঙ্গুলের জন্য আলাদা আবরণ থাকে না।

মেরুদেশে

এস্কিমো

ইহাদের পোশাকের ঠিক বিপরীত জাতীয় পোশাক আফ্রিকার কঙ্গো উপত্যকার পিগমীদের। ইহারাও এস্কিমোদের মতই শিকারী জাতি। সুতরাং এস্কিমোদের মত ইহারাও ইচ্ছা করিলে পশুর চামড়ার পোশাক পরিতে পারিত। কিন্তু নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়ায় চামড়ার পোশাক পরা এখানে অসম্ভব। তাই তাহাদের পুরুষেরা কোমরে গাছের বাকল জড়াইয়া এবং মেয়েরা পাতার তৈরী পোশাক পরিয়াই লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতিদের সংস্পর্শে আসার পর অবশ্য তাহারা সুতী কাপড়ের ব্যবহার শিখিয়াছে। কিন্তু তাও তাহারা সাধারণত সেলাই করিয়া পোশাক তৈরী

আফ্রিকায়

করিয়া পরিধান করে না। কোমরের চারিধারে বা বস্ত্রখণ্ড বড় হইলে কাঁধের চারিধারে জড়াইয়া তাহারা তাহাদের পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে। মধ্য আফ্রিকার অন্যান্য অনগ্রসর জাতিরাও সাধারণভাবে বলিতে গেলে অনুরূপভাবেই পোশাক পরিয়া থাকে। আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পুরুষদের কোমরে জড়াইয়া ধুতি পরিবার রীতির সহিত ইহাদের রীতির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

পিগমী

আরবের মরু অঞ্চলেও গরম অত্যধিক। কিন্তু সেখানে আফ্রিকাবাসীদের মতো স্বল্প পরিচ্ছদ পরিয়া আত্মরক্ষা করা চলিবে না। কারণ, শুধু গরমই নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধূলির ঝড় হইতেও আত্মরক্ষার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন। তাছাড়া রাত্রিকালে ঐ অঞ্চলে শীতের আধিক্যও যথেষ্ট। ঐসব প্রাকৃতিক প্রয়োজন, সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মিশিয়া মরুবাসী বেদুইনদের পোশাকের সৃষ্টি করিয়াছে। বেদুইন পুরুষদের জাতীয় পোশাককে **আব্বা** বলে। ইহা উটের লোম দিয়া তৈরী ঢিলেঢালা আলখাল্লা বিশেষ। ইহার হাত থাকে লম্বা। শীতের সময় ঐ হাতার মধ্যে হাত ঢুকাইয়াই দস্তানার কাজ চলিয়া যায়। ঢিলা আলখাল্লা যে শুধু শীতাতপ হইতে তাহাদের রক্ষা করে তাহাই নহে; উন্মুক্ত প্রান্তরে যখন কোনো মরুবাসী কোনো আস্তানার দিকে অগ্রসর হয়, তখন ঐ আলখাল্লা বাতাসে সঞ্চালিত করিয়াই সে জানাইয়া দেয় যে তাহার কোনো খারাপ অভিসন্ধি নাই, তাই তাহার সম্বন্ধে ভীত হইবারও কোনো কারণ নাই।

মরু অঞ্চলে

আরবীয়

আব্বার উপর সাধারণত ডোরাকাটা থাকে; রং না থাকিলে শাদা কালো ডোরাকাটা থাকে। আব্বার তলায় থাকে আঁটসাঁট ছোট কোর্তা, উহা রেশম বা তুলার তৈরী। ঢিলা আব্বা কোমরে, কোমরবন্ধ দ্বারা বাঁধা থাকে।

বেদুইন পুরুষদের শিরস্ত্রাণ তাঁহাদের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়। রঙিন ডোরাকাটা রেশম বা সুতীর কাপড় ডবল ভাঁজ করিয়া বেদুইনরা মাথায়

পরেন ; ইহা এমনভাবে জড়ানো থাকে যে মাথার দুই পাশে কানের উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়ে। তারপর, একগোছা পাকানো উটের লোম মাথার উপর হইতে চারিদিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই লোমের ঝালর বেদুইনদের চোখকে তপ্ত বালির হল্কা হইতে রক্ষা করে। উহা ঝোলানো থাকায় চোখ ছায়ায় ঢাকা থাকে।

বেদুইন মেয়েরাও পুরুষদের মত আব্বা পরিয়া থাকেন। কিন্তু উহাতে রংএর বৈচিত্র্য থাকে বেশী। মাথার আবরণ কিন্তু পুরুষদের মত নয়। মেয়েরা লাল, নীল বা হলুদ রং-এর একটি বড় রুমাল দিয়া মস্তক আবৃত করেন। বেদুইন শিশুদের মাথায়ও রঙিন কাপড় বাঁধা থাকে। কোন কোন মরু অঞ্চলের মেয়েরা বোরখার দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকিয়া থাকেন।

মরুবাসীদের পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাদের শরীরের কোন অংশ অনাবৃত থাকে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্যই তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন।

য়ুরোপে

আগেই বলা হইয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পোশাক পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু য়ুরোপের সর্বত্রও পোশাক একই রূপ নহে। বর্তমানকালে শীতপ্রধান অঞ্চলে লিনেন বা পশমের তৈরী ট্রাউজার, জ্যাকেট ও কোট, সুতীবস্ত্রের সার্ট এবং ফেল্টের টুপিই পুরুষদের প্রধান পরিধেয়। কিন্তু ঐ অঞ্চলেও বিভিন্ন দেশে মেয়েদের পোশাকের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আয়র্ল্যাণ্ডের মেয়েরা প্রধানত নীল চাদর, লাল 'বডিস' ও পেটিকোট পরিয়া থাকে এবং মাথায় মস্তকাবরণরূপে একটি রুমাল

বৃটিশ

সুইস

বাঁধিয়া নেয়। রুমেনিয়া, এস্‌থোনিয়া প্রভৃতি দেশের মেয়েরা কিন্তু মেষের চামড়ার পোশাক ও ফেল্টের তৈরী মোটা জুতা পরে। আবার চেকো-শ্লোভাকিয়ার মেয়েদের কাছে লাল টুপি ও চাদর, শাদা লম্বা হাতার জামা এবং নীল পেটিকোটই বেশী প্রিয়। তাহারা রেশম বা সাটিন সাধারণত পরে না, কিন্তু সোনালী সুতা দিয়া তাহাদের পোশাকে অতি সূক্ষ্ম যে কাজ

স্প্যানিয়ার্ড

ফরাসী

করিয়া নেয় তাহা অবাক হইয়া দেখিবার মতো। হাঙ্গেরীর মেয়েরা সাধারণত লাল মোজা, ধূসর রংয়ের "এ্যাপ্রন" এবং পুরা পেটিকোট পরিয়া থাকে। সময় সময় তাহারা দশবারোটি পেটিকোটও এক সঙ্গে পরিয়া থাকে। য়ুরোপের দক্ষিণাঞ্চলে ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুর দেশগুলিতেও পোশাকের বহুবৈচিত্র্য দেখা যায়। পর্তুগালের কি পুরুষ কি নারী উভয়েরই পোশাকে রং-এর বাহার লক্ষণীয়। মেয়েরা তাহাদের পোশাকে স্কার্ট, এ্যাপ্রন, বডিস এবং মাথার রুমাল সর্বত্রই বিচিত্র রং-এর সুতা দিয়া কাজ করিয়া নেয়। কিন্তু তাহাদের পোশাক উত্তরাঞ্চলের মতো আঁটসাঁট নয়; কিঞ্চিৎ ঢিলা। ফ্রান্স ও স্পেনের মেয়েদের পোশাকের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য জিনিস তাহাদের মস্তকাবরণরূপে ব্যবহৃত তাহাদেরই হাতে বোনা লেসের অবগুণ্ঠন এবং গায়ে দিবার জন্য হাতে বোনা ও প্রচুর কারুকার্যসমৃদ্ধ শাল (manton)। এছাড়া আমাদের দেশের মতো স্পেনের মেয়েরাও চুলে ফুলের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের সর্বত্রই রং-এর ও নক্সার আধিক্য। কি পুরুষ কি মেয়ে, সকলের পোশাকে ইহাই বৈশিষ্ট্য।

অনুশীলন

(আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ)

১। মেরু অঞ্চলে ব্যবহৃত পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ঐ পরিচ্ছদের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ঐ স্থানের অধিবাসীরা কিরূপে সংগ্রহ করে? (S. F. 1966, 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ৬৭)

২। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সহিত আরবের মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদের তুলনা কর। উভয়ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব উল্লেখ করিয়া উত্তর লেখ। (S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ৬৪-৬৫, ৬৮-৬৯)

৩। কাশ্মীর ও গুজরাটে ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (S. F. 1968, উঃ—পৃঃ ৬৫)

৪। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা সাদা পোশাক পছন্দ করে কেন? (S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ৫৩)

৫। একজন সাধারণ (ক) বাঙ্গালী, (খ) বিহারী, (গ) রাজস্থানী ও (ঘ) পাঞ্জাবী পুরুষের পোশাকের বিশেষত্ব কি লেখ। (S. F. 1965, Comp.) (উঃ—পৃঃ ৫৮-৫৯, ৬০, ৬৪-৬৫)

৬। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব এবং সৌন্দর্যবোধ পোশাক-পরিচ্ছদের উপর কিভাবে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ৫৩-৫৬)

৭। পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের যেসব সাধারণ নীতি মানিয়া চলা উচিত তাহা আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ৫৫-৫৭)

ঘরের চারিদিকের দেয়াল তৈরী হইত। তারপর উপরে কাঠের বর্গা ফেলিয়া আগের মতোই ঘাস-পাতা-খড় প্রভৃতির সাহায্যে ছাদ তৈরী হইত। পরে ঐসব ঘাস-পাতার উপরে মাটি দিয়া ছাদ প্রস্তুত করার প্রথাও প্রচলিত হয়। নব্য-প্রস্তর যুগের শেষ দিকে এবং ধাতু-প্রস্তর যুগের গোড়ার দিকে প্রাচীন মিশর, সিন্ধু উপত্যকা ও মেসোপোটেমিয়ায় যেসব সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে উচ্চস্তরের গৃহ নির্মাণের কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত, মানব সভ্যতার এইসব আদিম কেন্দ্রে যেসব উন্নত ধরনের ঘরবাড়ীর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলিকে অনায়াসেই বর্তমান যুগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ইট দিয়া ঘরবাড়ী নির্মাণ
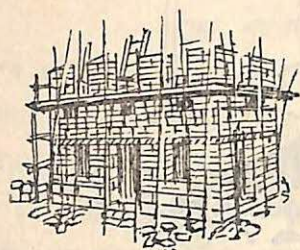
প্রাচীন কালের ইটের বাড়ী

এই সময়ই অবশ্য মানুষ শুধু মাটি উঁচু করিয়া বা পাথর জড় করিয়া দেয়াল তৈরীর বদলে মাটি দিয়া ইচ্ছামতো আকৃতির ইট তৈরী করিয়া তাহার দ্বারা
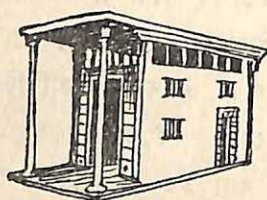
প্রাচীন মিশরের বাড়ী

মেসোপোটেমিয়ার বাড়ী

দেয়াল তৈরী করিতেও শিখিয়া ফেলিয়াছিল। গৃহ নির্মাণে এই ইটের ব্যবহারই মানুষকে সুযোগ করিয়া দিয়াছিল ইচ্ছামতো গৃহ তৈরীর। তারপর, যুগ যুগ ধরিয়া দেশে দেশে মানুষ গৃহ নির্মাণ লইয়া কতো না পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছে। একঘরবিশিষ্ট গৃহের বদলে উদ্ভব হইয়াছে বহুঘরযুক্ত গৃহের ; একতলা বাড়ীর জায়গায় দেখা দিয়াছে বহুতলবিশিষ্ট বাড়ী।

আমাদের দেশের আদিবাসীদের কাহারও কাহারও গৃহনির্মাণ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, প্রাচীনকালের গৃহনির্মাণ প্রথা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আন্দামানীদের গৃহনির্মাণ প্রথার সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

আন্দামানীদের গৃহ

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আন্দামানীদের বাস। ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া একই ধরনের জীবন যাপন করিতেছে। আন্দামানীদের মধ্যে এখনও কিছুটা যাযাবর ভাব রহিয়াছে। জীবশিকারের জন্য তাহারা অস্থায়ী বাসস্থান গড়িয়া তোলে। ঐসব বাসস্থানে তাঁবুই তাহাদের আশ্রয় দিয়া থাকে। ঋতু অনুযায়ী যখন যেখানে সুবিধা সেখানেই আন্দামানীরা তাঁবু ফেলিয়া শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। স্থায়ী বসতিকেন্দ্রে আন্দামানীরা গোষ্ঠী হিসাবে বিভক্ত হইয়া বসবাস করিয়া থাকে। এক একটি গোষ্ঠীর কয়েকটি পরিবার মিলিয়া এক একটি গ্রাম গড়িয়া তোলে। গ্রামের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে তাহারা সর্বপ্রথম দেখে পানীয় জলের সুব্যবস্থা আছে কি না। কাঠ এবং গাছের পাতাই তাহাদের গৃহনির্মাণের প্রধান উপকরণ। মধ্যে একখণ্ড জমি ছাড়িয়া দিয়া তাহার চারিদিকে বৃত্তাকারে বা উপবৃত্তাকারে প্রত্যেক পরিবারের জন্য তাহারা আলাদা আলাদা গৃহনির্মাণ করে। মধ্যের জমি নৃত্যভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক গৃহের মুখ নৃত্যভূমির দিকে থাকে। দুইটি গৃহ বড়ো করিয়া নির্মিত হয়। তাহাদের একটিতে গোষ্ঠীর কুমারেরা বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান পুরুষদের সঙ্গে একত্র বাস করে। অপরটিতে একই ভাবে গোষ্ঠীর কুমারীরা, বিধবা এবং নিঃসন্তান স্ত্রীলোকদের সঙ্গে একত্র বাস করে। পত্নীসহ সন্তানবান পুরুষেরাই পরিবার গৃহগুলিতে বাস করে।

গৃহনির্মাণে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব

কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এই বাসগৃহ বিভিন্ন আকৃতির রূপ লইয়াছে। আর মানুষের খাদ্যবস্ত্রের মতো এই বিভিন্ন আকৃতিও প্রভাবান্বিত হইয়াছে সমসাময়িক সামাজিক ধ্যানধারণার দ্বারা, ঐ স্থানের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দ্বারা, বা ঐ স্থানের সহজলভ্য উপাদানের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে বাসগৃহের ছাদের কথা। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্যই দেশে

প্রাকৃতিক প্রভাব

দেশে ছাদ তৈরীর কলাকৌশলে পার্থক্য দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান বৃষ্টিহীন দেশে সমতল ছাদের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত হইলেও, যেসব দেশে বৃষ্টিপাত প্রচুর সেইসব জায়গায় এইজাতীয় সমতল ছাদ
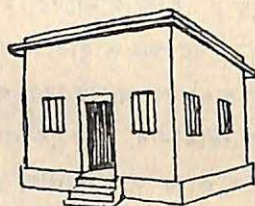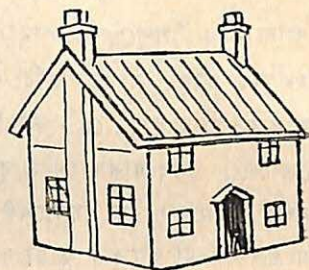
ঢালু ছাদ   সমতল ছাদ   অল্প ঢালু ছাদ

প্রায় অচল। কারণ, সেইসব জায়গায় ছাদ এইরকম হওয়াই প্রয়োজন যাহাতে ছাদে জল না জমিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে পারে। তাই নিরক্ষীয় বা মৌসুমী প্রভৃতি অঞ্চলের অন্তর্গত দেশগুলিতে দেখা যায় ঢালু ছাদের ব্যবহার। আবার, বিভিন্ন জলবায়ুতে ছাদের বিভিন্ন ঢালের প্রয়োজন। উষ্ণতর আবহাওয়ায় বৃষ্টি যেখানে স্বল্প, সেখানে ছাদ খুব ঢালু না হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু শীতলতর দেশে বৃষ্টি যেখানে অত্যন্ত বেশী সেখানে ছাদ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত খাড়া হওয়া প্রয়োজন। আবার, শীতপ্রধান দেশে যেখানে শুধু বৃষ্টিই নহে বরফও প্রচুর পরিমাণে পড়িয়া থাকে, সেখানে ছাদকে স্বল্প ঢালু করা হইয়া থাকে। কারণ, মানুষ দেখিয়াছে ঐরূপ ছাদে জমাট বরফে গৃহ যেমন উষ্ণতর হয়, তেমনি ছাদ স্বল্প ঢালু থাকায় বরফ-গলা জল সরিয়া যাইতেও অসুবিধা হয় না।

কিন্তু শুধু ছাদই নহে। গৃহনির্মাণের সমস্ত কলাকৌশলই প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। উষ্ণতর দেশে ঘরবাড়ীকে যতটা খোলামেলা রাখা দরকার, শীতপ্রধান দেশে ততটা নহে। সেখানে বরং বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত হইতে গৃহাভ্যন্তরকে রক্ষা করাই বেশী প্রয়োজন। অথচ সেরূপ করিতে গিয়া চারিদিকে দেয়াল তুলিয়া দিলে গৃহাভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় আলোর চাহিদা মেটে না। এইজন্যই দেখা যায়, ঐসব দেশে জানালায় কাঁচের প্রচলন এত বেশী।

আবার পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বাড়ী তৈরীর কাজে ইটের ব্যবহার চালু থাকিলেও যেখানে জঙ্গল বেশী, সেখানকার মানুষ স্বভাবতই কাঠের বাড়ীতে আজিও বাস করিয়া থাকে। কারণ, ইট অপেক্ষা কাঠই সেখানে সুলভ। জাপান প্রভৃতি ভূকম্প-প্রধান দেশগুলিতেও মানুষ প্রধানত কাঠের তৈরী বাড়ীতেই বেশী বাস করিয়া থাকে। সেখানে কাঠের বাড়ীতে বাস করার কারণ ভূমিকম্পে ঐজাতীয় বাড়ীর বেশী ক্ষতি করিতে পারে না বা করিলেও তাহার পুনর্গঠনের বিশেষ অসুবিধা হয় না।
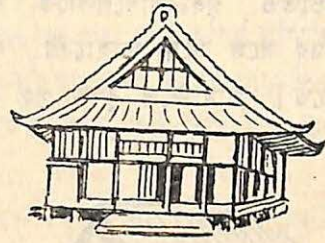
জাপানের কাঠের বাড়ী
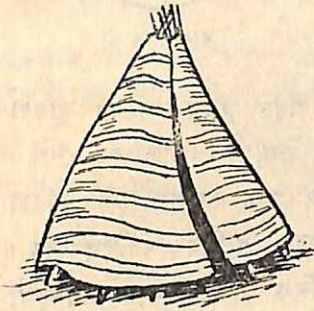
আবার মরু অঞ্চলে, যেখানে বালির ঝড় ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটাইতেছে, সেখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থায়ী বসবাস সম্ভবপর নহে। ফলে, সেখানে গৃহ হিসাবে তাঁবুর প্রচলনই বেশী।

মরু অঞ্চলের তাঁবু

প্রাকৃতিক প্রভাবের ন্যায় গৃহনির্মাণে সামাজিক প্রভাবও অনস্বীকার্য। আর এই প্রভাব নানাভাবে কাজ করিয়া চলে। উত্তরকালের গৃহনির্মাণ-রীতির উপর পুরাকালের গৃহনির্মাণরীতি সব সময়ই তাহার স্বাক্ষর রাখে। তবে কোনো কোনো সময় এই প্রভাব যতটা সুস্পষ্ট চোখে পড়ে, অন্য ক্ষেত্রে হয়তো ততটা প্রকট হয় না।

সামাজিক প্রভাব

একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন বাংলায় বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ নক্সার ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচাড়ির বেড়ায় ঘেরা খড়ের ধনুকাকৃতি চাল দিয়া ছাওয়া ঘর তৈরী হইত। মধ্য-যুগীয় ভারতীয় স্থাপত্যে তাহার অনুকরণের প্রয়াস সুস্পষ্ট। ইংরেজদের এদেশে আসার পর অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে একই রীতি বাংলো-বাড়ী নামে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজেও সমাদৃত হইয়াছে। পার্থক্য যাহা হইয়াছে তাহা শুধু উপাদানের, সমৃদ্ধি ও অলঙ্করণের। আবার, সমাজে লোক-

সংখ্যা, তাহাদের অর্থনৈতিক পটভূমি, নগর ও গ্রামীণ সমাজের পার্থক্য প্রভৃতিও গৃহনির্মাণশৈলীকে প্রভাবান্বিত করে। সমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আশ্রয়ের প্রয়োজনেই ঘরবাড়ীর চাহিদাও বাড়ে। গ্রামাঞ্চলে নূতন গৃহ তৈরীর জন্য জায়গা হয়তো পাওয়া যায়,
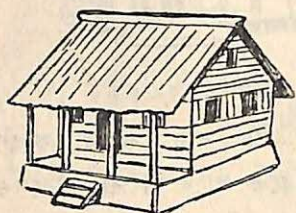
বাংলার কুটীর

বাংলো-বাড়ী

কিন্তু শহরাঞ্চলে সেইরূপ স্থান মেলে না। অথচ জীবিকার্জনের সুবিধা প্রভৃতি কারণে গ্রাম অপেক্ষা শহরাঞ্চলেই লোকের ভীড় হয় বেশী। ফলে, ঐ স্বল্প জায়গাতেই বেশী লোকের স্থান সঙ্কুলান কি করিয়া করা সম্ভব, স্থপতিকে তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। বস্তুত, তাহাদের এই প্রয়াস হইতেই আধুনিক স্থাপত্যকলার গগনচুম্বী গৃহনির্মাণের কলাকৌশলের উদ্ভব। আগেই বলা হইয়াছে, গৃহনির্মাণের উপাদান বহুলাংশে স্থিরীকৃত হয় উহাদের সহজলভ্যতা দ্বারা। কিন্তু এই সহজলভ্যতা শুধুই প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও ইহার নিয়ন্ত্রক। তাই দেখা যায়, শহরাঞ্চলেও গগনচুম্বী কংক্রীট বা ইটের বাড়ীর অদূরেই মাটির বা বাঁশের চাঁচাড়ির বেড়ায় ঘেরা টিন বা টালির ছাদে ছাওয়া ছোটো ছোটো ঘরের সারি অপ্রচুর নহে। মানুষের সহজাত সৌন্দর্যবোধও তাহার গৃহনির্মাণ প্রথার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাই সর্বদেশে, সর্বকালে, ধনী-দরিদ্র সকলের বাড়ীতেই নানারূপ অলঙ্কার প্রথার প্রচলন দেখা যায়। নিতান্ত যাহা প্রয়োজন তাহাতে মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। গৃহনির্মাণের ভিতর দিয়াও সে নানাভাবে তাহার সৃজনীশক্তি এবং সৌন্দর্যবোধকে সার্থক করিতে চেষ্টা করে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, কাঠের বা কাঁচের দরজা-জানলার উপর

সৌন্দর্যবোধ ও গৃহ-নির্মাণ প্রথা

এবং দেয়ালের গায়ে অনেক সময় নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করা বা খোদাই করা থাকে। নিতান্ত কুটিরের দেয়ালেও ছবি অঙ্কিত দেখা যায়।

আবার বাড়ীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য অনেক সময় সংলগ্ন জমিতে উদ্যান ইত্যাদি রচনা করা হয়। দরজা, জানলা এবং গৃহের আকৃতির নানারকম রূপ দিয়াও মানুষ তাহার সৌন্দর্য-প্রীতিকে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করে।

উপরিউক্ত গৃহ অলঙ্করণ রীতির উপরও সামাজিক প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ইউরোপে এই অলঙ্করণের প্রথা একরূপ, আমাদের দেশে তাহা অন্যরূপ। এমন কি প্রাচীন ভারতে মুসলমান যুগে এবং বর্তমান ভারতের মধ্যে গৃহ-অলঙ্কার পদ্ধতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

বর্তমান ভারতের ঘরবাড়ী—গ্রামাঞ্চল

ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চলের মানুষ আজিও সর্বত্র খড়-বাঁশ-কাঠ-মাটি প্রভৃতি ভঙ্গুর জিনিসের সাহায্যেই প্রধানত তাহাদের আশ্রয় তৈরী করে। অবশ্য বিভিন্ন অংশে তাহাদের আকৃতি হয়তো বিভিন্ন রকমের হয়। আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কুড়ে ঘরগুলি তৈরী হয় বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ
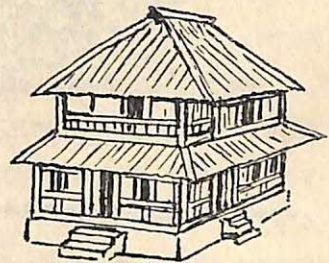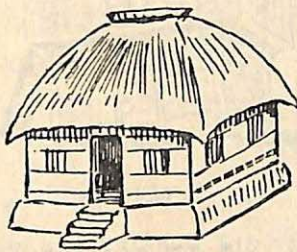
গ্রামাঞ্চলে বাঙ্গালীর বাড়ী

নক্সার ভিত্তিতে, মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচাড়ির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া। সাধারণত একচালা বা দোচালা হইলেও চৌচালা বা আটচালা ঘরও দেখা যায়। ইহাদের চালগুলি বিন্যস্ত হয় ক্রমহ্রস্বায়মান ধনুকাকৃতি রেখায়। এবং সেগুলি এই দেশের সুপ্রচুর বৃষ্টির হাত হইতে দেয়ালকে রক্ষার জন্য স্বভাবতই বাহিরের দিকে বাড়ানো থাকে। আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও একই ধারায় ঘর তৈরী হইয়া থাকে। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে, যেখানে বৃষ্টি খুব বেশী পরিমাণে হয় না, সেখানে

কাদামাটির দেয়াল দিয়া ঘেরা টালির ছাদযুক্ত ঘরের প্রচলন বেশী। যেহেতু এইসব অঞ্চলে গ্রীষ্মে উত্তাপ বেশী আবার শীতে শৈত্য বেশী, তাই এইসব দেয়াল পুরু করিয়া তৈরী করা হইয়া থাকে এবং তাহাতে জানলা থাকে খুবই কম। দক্ষিণাঞ্চলের ঘরগুলি অনেকটা পূর্বাঞ্চলের মতই তৈরী করা হয়। তবে সেখানে তালগাছ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মায় বলিয়া ছাদের
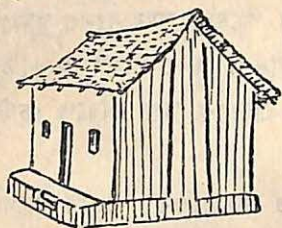
টালির ছাদযুক্ত ঘর

জন্য তালপাতার ছাউনী বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে অবশ্য কাঠ সহজলভ্য বলিয়া সেখানে কাঠের বাড়ীই বেশী তেরী হয়। জন্তু-জানোয়ার-দের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য এইসব বাড়ী সাধারণত মাচার মতো করিয়া মাটি হইতে অনেকটা উঁচুতে তৈরী করা হইয়া থাকে। সাম্প্রতিক-কালে সর্বত্রই অবশ্য ছাদের জন্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে
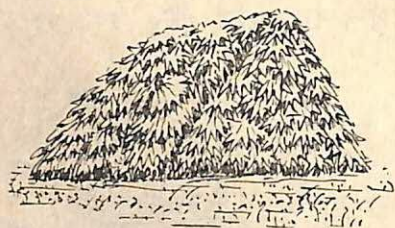
দক্ষিণ ভারতে তাল-পাতার ছাউনীর ঘর
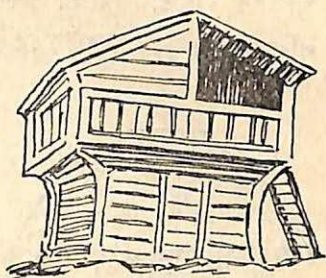
কাঠের বাড়ী

দেয়ালের জন্যও টিনের ব্যবহারও চালু হইয়াছে। বাঁশ প্রভৃতির চাইতে টিন যদিও বেশী স্থায়ী, তবুও টিনের ঘরে এত অধিক গরম হয় যে তাহার নীচে বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা ভিতরদিকে আচ্ছাদন (ceiling) না দিলে উহাতে বসবাস করা শক্ত হইয়া পড়ে। গ্রামাঞ্চলে বিত্তবানরা ইটের তৈরী গৃহ-নির্মাণও করিয়া থাকেন ; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা সীমিত।

শহরের সঙ্গে তুলনায় গ্রামাঞ্চলের বাড়ীগুলি বহুঘরবিশিষ্ট। সেখানে সাধারণত এক বা দুই ঘরবিশিষ্ট বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান হয় না। যৌথ পরিবারভুক্ত আত্মীয়-পরিজনদের জন্য বহু ঘরের প্রয়োজন হয়। তারপর যাঁহারা বিত্তবান তাঁহারা পূজা-পার্বণের জন্য এবং অতিথি-অভ্যাগতদের

জন্যও আলাদা আলাদা ঘরের প্রয়োজন অনুভব করেন। ইহা ছাড়া গৃহপালিত পশুদের আশ্রয়ের জন্য এবং শস্যাদি রাখার জন্য আলাদা ঘর তৈরী হইয়া থাকে। অবশ্য সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীরা কোনো মতে একটি চালা তুলিয়াই বসবাস করিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যাই বেশী। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহারা ঐ চালা-ঘরেই গৃহপালিত পশুদের আশ্রয় দিতে এবং শস্যের ভাণ্ডার রাখিতে বাধ্য হয়।

গ্রামাঞ্চল

শহরাঞ্চলের গৃহনির্মাণ-সমস্যা এবং তাহা সমাধানের প্রণালী উভয়ই ভিন্ন। শহরাঞ্চলের লোকেরা অধিকতর বিত্তবান, তাই ইটই এখানে গৃহ-নির্মাণের প্রধান উপাদান। গৃহনির্মাণে স্থানের অভাব শহরাঞ্চলের একটি প্রধান সমস্যা। জীবিকার বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে অধুনা শহরাঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমির দর এবং বাড়ীর চাহিদা দুইই খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

শহরাঞ্চল

শহরাঞ্চলের লোকেরা তাই গ্রামের মতো বিভিন্ন ঘরবিশিষ্ট বাড়ীর কথা কল্পনাও করিতে পারে না। অবশ্য শহরে সাধারণত যৌথ পরিবার না থাকায় এবং শস্যভাণ্ডার, গৃহপালিত পশুর জন্য ঘর ইত্যাদির প্রয়োজন না হওয়ায় ঐরূপ বাড়ীর প্রয়োজনও হয় না। শহরের বেশীর ভাগ লোকই থাকে ভাড়া বাড়ীতে।

কিন্তু লোকসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরাঞ্চলে বহুঘরবিশিষ্ট বাড়ী তো দূরের কথা, একঘরবিশিষ্ট "ফ্ল্যাটও" জোগাড় করা সবসময় সম্ভব হয় না। বাড়ীর ভাড়া অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর ভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা আইন করিয়াও তাহা দরিদ্রের ক্ষমতার মধ্যে রাখা যাইতেছে না। তাই, সাম্প্রতিককালে দেখা যাইতেছে, অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য বহু বাড়ীর মালিকই সাধ্যে কুলাইলে তাহাদের পুরানো বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেখানে বহুতলবিশিষ্ট ও বহুফ্ল্যাটযুক্ত বাড়ী তৈরী করাইতেছে। এইজাতীয় গৃহনির্মাণ অবশ্য নির্মাণশৈলীরও বিবর্তন ঘটাইতেছে। দেখা গিয়াছে, ইট দিয়া এইরূপ বাড়ী মজবুতভাবে গড়া সুবিধাজনক হয় না। ফলে, গৃহনির্মাণে পাশ্চাত্য দেশের মতো আমাদের শহরগুলিতেও ইস্পাত ও কংক্রীটের (reinforced concrete) ব্যবহার সুপ্রচলিত হইয়াছে। এখন আর আগেকার মতো তলদেশ হইতে একটির

পর একটি ইট গাঁথিয়া বাড়ী তৈরী করা হয় না। তাহার পরিবর্তে, প্রথমেই পূর্বে স্থিরীকৃত নক্সা অনুযায়ী গোটা বাড়ীর ভারবহনের উপযোগী ইস্পাতের কাঠামো তৈরী করা হয়। পরে ঐ কাঠামোর পূর্বনির্ধারিত জায়গায় জায়গায় কংক্রীটের সাহায্যে দেয়াল, ছাদ, মেঝে প্রভৃতি তৈরী করা হয়। এইজাতীয় গৃহ যদি নিচে দাঁড়াইয়া দেখ, তবে মনে হইবে যেন আকাশ ছুঁইয়া আছে। তাই এইরূপ গৃহকে অনেক সময় বলা হইয়া থাকে স্কাই-স্ক্র্যাপার (sky-scraper)।

আগেই বলা হইয়াছে, শহরাঞ্চলে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি সেখানকার লোকবসতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমাদের দেশের খণ্ডিত অংশ হইতে উদ্বাস্তুদের আগমনও এই লোকসংখ্যা বহুল পরিমাণে বাড়াইয়াছে। কিন্তু এই সব শ্রমিকরা বা উদ্বাস্তুরা বেশীর ভাগই অত্যন্ত গরীব। যাহারা রোজগার করে তাহারাও অত্যন্ত স্বল্প বেতন পাইয়া থাকে। ফলে, বেশী ভাড়া দিয়া আশ্রয় সংগ্রহ তাহাদের কাছে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। তাই তাহাদের অনেকেই বস্তীগুলিতে (slums) আশ্রয় লইয়া থাকে। শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বস্তীগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

আধুনিক বাড়ী ও ইহার পাশে বস্তী

বস্তী-সমস্যা

শিল্পপতিরা তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শিল্প হইতে অনেক অর্থ উপার্জন করেন বটে, কিন্তু শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা যে শিল্পের স্বার্থেই প্রয়োজন সেই বোধ তাহাদের নাই। রুচিবোধেরও তাহাদের মধ্যে অভাব। তাই তাহারা আরও অর্থলাভের আশায় ইট, টালি প্রভৃতি অত্যন্ত সাধারণ উপাদান দিয়া অত্যন্ত নীচু, প্রায় অন্ধকার যেসব সারি সারি একতলা ঘর তৈরী করিয়া শ্রমিকদের ভাড়া দিয়া থাকেন, তাহাদের সমষ্টিকেই বস্তী আখ্যা দেওয়া হয়। শহরাঞ্চলে অনেক কারখানার মালিকরা নিজেদের শ্রমিকদের জন্যও কোনোরূপ থাকার ব্যবস্থা করেন না। আবার, অফিস, দোকান ইত্যাদিতে অনেক অল্প বেতনের লোক কাজ করেন যাহাদের অল্প ভাড়ায়

থাকার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ফলে, শিল্পপতিরা ছাড়াও অনেক বিত্তবান লোক শহরে বস্তী তৈরী করিয়া দরিদ্রদের অসহায়তার সুযোগ লইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন। এইসব বস্তীতে বেশীর ভাগ পরিবারই আলো-বাতাসহীন এক একটি ঘরমাত্র লইয়া কোনোমতে মাথা গুঁজিয়া বসবাস করেন। এক পরিবার হইতে অপর পরিবারের গোপনতা রক্ষা করিবার উপায় নাই। একঘরেই সকলে ছেলেমেয়ে লইয়া ঘুমান,—এক ঘরেই রান্নাবান্না, এক ঘরেই সব কিছু। এইসব বস্তীতে জলের বা পায়খানার সুব্যবস্থা নাই। বস্তীগুলিতে ঢুকিলেই হয়তো দেখা যাইবে রাস্তার উপর ছেলেমেয়েরা পায়খানা করিতেছে, রাস্তার কল হইতে জল তুলিবার জন্য হয়তো তুমুল ঝগড়া চলিতেছে। এইজাতীয় পরিবেশে কি মন, কি শরীর কোনোটারই স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় থাকে না। যে-কোন সভ্যদেশের পক্ষেই এইজাতীয় বস্তী কলঙ্কস্বরূপ। কলিকাতা শহরে নাকি প্রতি চারজন অধিবাসীর মধ্যে একজন বস্তীতে থাকে।

আজিকার দিনে আমাদের সভ্যতা হইতে বস্তীর কলঙ্ক দূর করিবার নিমিত্ত নানাধরনের চেষ্টা চলিতেছে। প্রথমত বিভিন্ন শ্রমিক-কল্যাণ সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আন্দোলন এবং সরকারের সহানুভূতির ফলে বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণ আইন চালু হইয়াছে। ফলে, কলকারখানার মালিকগণ শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আস্তানা প্রস্তুত করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন। আশা করা যাইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে কারখানা-অঞ্চলে বস্তী-সমস্যার সমাধান হইবে।

শহরাঞ্চলে এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত Improvement Trust গঠিত হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক বড়ো বড়ো শহরেই এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। তাহারা সরকারী অর্থানুকুল্যে বস্তী ভাঙ্গিয়া সেখানে ছোটো ছোটো ফ্ল্যাটে বিভক্ত বহু বড়ো বাড়ী তৈরী করিয়া স্বল্প ভাড়ায় বস্তীবাসীদের ঐ সব ফ্ল্যাটে বসবাসের সুযোগ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের কলিকাতা শহরেও এইরূপ অনেক বস্তী ভাঙ্গিয়া নূতন ফ্ল্যাট-বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে।

আমাদের সরকার এই কার্যে বিশেষ অগ্রণী। আমাদের স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একাধিকবার অত্যন্ত আবেগের সহিত বস্তীর কলঙ্ক দূর করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য বস্তীদূরীকরণ কার্য আমাদের দেশে আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই।

আমাদের শাসনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি জোর করিয়া অধিকার করা যায় না। কাজেই বস্তীর মালিকদের জায়গা জোর করিয়া অধিকার করিয়া সরকার সেখানে দরিদ্র লোকেদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন না। বস্তীর মালিকরা মুনাফার লোভে সরকারের বস্তীদূরীকরণ ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার বাধা দিতেছেন। এদিকে বড়ো বড়ো শহরে একান্ত স্থানাভাব। শত শত দরিদ্র লোকের জন্য বসতিনির্মাণের স্থান কোনো বড়ো শহরেই নাই। জায়গা যদি বা কোথাও অল্পস্বল্প পাওয়া যায়, তাহার দাম এত বেশী যে, সেখানে জায়গা কিনিয়া দরিদ্রের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করা চলে না। এই কার্যে নিয়োগ করিবার মতো অর্থেরও সরকারের অভাব। চারিদিকেই আমাদের নানারকমের গঠনমূলক কার্য চলিতেছে। ঐগুলিকে বঞ্চিত করিয়া দরিদ্রদের গৃহনির্মাণ কার্যে অর্থব্যয় করিলে তাহাও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। তবু, প্রতি পাঁচশালা পরিকল্পনায়ই সরকার এই খাতে বেশ ভালো অর্থ মঞ্জুর করিতেছেন। কিন্তু আর এক মুস্কিল দেখা দিয়াছে। জায়গার অতিরিক্ত দামের জন্য নূতন প্রস্তুত বাড়ীগুলির ভাড়া এরূপ হইতেছে যে দরিদ্রেরা সেই ভাড়া দিতে পারিতেছে না। অনেকস্থলে দেখা যাইতেছে, বাড়ীগুলি হয়তো আংশিক খালিই পড়িয়া আছে, অথবা কোনো দরিদ্রের নামে কোনো বিত্তশালী লোক তাহা ভোগ করিতেছেন। যাহাকে বসবাসের জন্য বাড়ী দেওয়া হইয়াছে সে হয়তো কোনো বিত্তশালী লোকের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া তাহাকে ঐ বাড়ীতে বসবাসের অধিকার দিয়া নিজে পুনরায় গিয়া বস্তীতে আশ্রয় লইয়াছে।

বস্তী-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আমাদের আরও দৃঢ়সংকল্প হইতে হইবে এবং সামগ্রিকভাবে বৃহৎ শহরের বাস-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। “জরুরী অবস্থায়” সরকার যে-কোনো লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন। শহরের বাসগৃহের সমস্যা জরুরী পর্যায়ে উঠিয়াছে মনে করিলে, সরকার যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিয়া ব্যক্তিগত জমি বা গৃহ অধিকার করিতে পারেন। মনে হয়, এইভাবে সমগ্র সমস্যার কিছুটা সুরাহা হইতে পারে। তারপর, পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণে সরকার যদি গৃহনির্মাণের জন্য পৃথক ঋণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং গৃহের মালিকদের

(শহরের) উপর কর বসান, তাহা হইলে দরিদ্রদের জন্য গৃহনির্মাণের অর্থের অভাব হয়তো হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে গৃহনির্মাণ-সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের গৃহনির্মাণ-সমস্যার কথা আমরা একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিতে পারি। এই সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—গ্রামাঞ্চলের এবং শহরাঞ্চলের গৃহনির্মাণ-সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত অর্থাভাব, জ্ঞানাভাব এবং কুসংস্কার আদর্শ গৃহনির্মাণের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

গৃহ আমাদের শীত এবং উত্তাপের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট নহে। উহা যে স্বাস্থ্যসম্মত হওয়াও প্রয়োজন এ ধারণা আমাদের গ্রামাঞ্চলের খুব কম লোকেরই আছে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও অনেকে টিনের চাল এবং টিনের বেড়া দিয়া গৃহনির্মাণ করিয়া থাকেন। এইরূপ গৃহে বাস করার ফলে যে স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে একথা কেহ একবারও চিন্তা করেন না। আলো-বাতাসের প্রবেশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দরজা-জানলা খুব কম বাড়ীতেই থাকে। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা, গৃহনির্মাণের সময় মল-মূত্রত্যাগের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার উপর আমাদের গ্রামের অল্প সংখ্যক লোকই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া থাকেন। ফলে, মল-মূত্রের গন্ধ সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়া দূষিত করিয়া ফেলে। অনেক বাড়ীতে আবার রান্নাঘর এবং শোবার ঘরের দূরত্ব যথেষ্ট নহে। ফলে, রান্নাঘরের ধোঁয়া শোবার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতেছে সে জ্ঞান আমাদের নাই। আমাদের গ্রামাঞ্চলের বাড়ীগুলিতে পানীয়জলের উপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকে না। পুকুর হইতেই পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা সাধারণত পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুকুরের জল যে নানাকারণে দূষিত হইয়া পানীয় জলের উপযুক্ত থাকে না, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। তারপর, আমাদের মনের উপর গৃহেরও যে প্রভাব আছে, তাহা আমরা কল্পনাও করি না। গৃহের ভিতর এবং বাহির যে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন আছে, ইহা আমাদের অনেকেরই ধারণায় আসে না। প্রাচীনকালে গৃহনির্মাণে এবং গৃহসজ্জায় যে সৌন্দর্য-প্রীতি আমাদের চোখে পড়িত, বর্তমানে তাহা নাই। পল্লী-অঞ্চলে গৃহনির্মাণের

সর্বাপেক্ষা বড়ো বাধা অর্থাভাব। আমাদের গ্রামের অধিকাংশ লোকই এত দরিদ্র যে খড় ও বাঁশের একখানা ঘরও প্রস্তুত করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হয়। কোনোরকমে একখানা ঘর প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহাকে সবরকম কাজেই ব্যবহার করা হয়। এই ঘরের এক অংশে হয়তো ধান রাখা হয়; অপর অংশে হয়তো গৃহপালিত পশুর স্থান। ইহাদেরই মধ্যে গৃহের মালিক কোনো রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকেন। পায়খানা, পানীয় জল ইত্যাদির কথা কল্পনাও করা যায় না।

অস্পৃশ্যতার অভিশাপের জন্য গ্রামের কোনো কোনো শ্রেণীর লোককে গ্রামের বাহিরে বাস করিতে হয়। তাহাদের পানীয় জলের সমস্যা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, কারণ পুকুরগুলি হয়তো গ্রামের ভিতর। ঐসব শ্রেণীর লোকেরা দরিদ্রতর বলিয়া তাহাদের ঘরবাড়ীর অবস্থা আরও শোচনীয় থাকে। সভ্যজগতের মানদণ্ডে তাহারা ঠিক মানুষের মতো বাস করে না।

গ্রামবাসীদের আর্থিক মান উন্নততর না হওয়া পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গৃহসমস্যা সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নাই।

পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণ-সমস্যা কলিকাতা শহরের জন্য প্রধানত জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। অর্থোপার্জনের সুযোগ কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সকলে জীবিকার্জনের আশায় এই নগরের দিকে ছুটিয়া আসে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে আর কোনো শহর ভালোভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। আসানসোল এবং দুর্গাপুর শিল্প-শহর হিসাবে দুইটি ব্যতিক্রম মাত্র। যেসব শহর আছে তাহাতে সাধারণত অল্পবিত্ত লোক বাস করেন। উহাদের বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, পায়খানা, পানীয় জল সরবরাহ, নর্দমা প্রভৃতি সব কিছুই আধুনিক শহরের মান অপেক্ষা অনেক নিচে। ঐসব শহরে বাস করিবার স্বাভাবিক আকর্ষণ কাহারও হইতে পারে না।

কলিকাতা শহরের গৃহসমস্যা পৃথক ধরনের। অল্প সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গৃহাভাব অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক, যাহারা কলিকাতায় জীবিকার্জন করেন, তাহাদিগকে গৃহাভাবের জন্য প্রতিদিন বাহির হইতে ট্রেনে-বাসে আসিতে হইতেছে। লোকের অধিক চাপের জন্য কলিকাতার পরিবহন-ব্যবস্থা নগরের চাহিদা

মিটাইতে পারিতেছে না। পানীয়জলের সরবরাহও প্রয়োজনানুপাতে খুবই কম। অধিকাংশ বাড়ীতেই যত লোক থাকা উচিত তাহার চাইতে অনেক বেশী লোক থাকে। বাড়ীগুলি হইতে নিক্ষিপ্ত আবর্জনায় রাস্তা-ঘাট নোংরা হইয়া থাকে। বস্তীর সংখ্যাও কলিকাতায় প্রচুর। সুখের বিষয় পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কলিকাতার গৃহসমস্যাকে জাতীয় অন্যতম সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার কাছাকাছি পতিত জমি, যথা—সল্টলেক, বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন। পানীয় জলের সরবরাহের উন্নতি করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। কলিকাতার পাশাপাশি নূতন শহর স্থাপন করার পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। কলিকাতার সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্‌গ্যানাইজেসন নামে একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা উন্নয়নকার্যে ভারত-সরকারের সাহায্য পাওয়া যাইবে—এই আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। বিদেশী সাহায্যও পাইবার ভরসা আছে।

গৃহনির্মাণ বা নির্বাচন নীতি

গৃহ আমাদের কাছে একটা আশ্রয়স্থল অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। আমাদের অর্থ-সামর্থ্য যাহাই থাকুক না কেন, গৃহনির্মাণ বা নির্বাচনের সময় (যেমন, ভাড়া করা বাড়ী) কয়েকটি কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, বাসগৃহ এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ইহা আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়। তোমরা জান যে সূর্যকিরণ আমাদের জীবন-ধারণের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করিয়া সূর্যের উত্তাপ-রশ্মি রোগবীজাণু-গুলিকে ধ্বংস করে। তাই অধিক সূর্যালোকবিশিষ্ট বাসগৃহ স্বাস্থ্যকর। এইজন্য বাসগৃহের চারিদিকে অতিরিক্ত গাছপালা বা উঁচু উঁচু বাড়ী থাকা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। ঘরের অবস্থান এবং দরজা-জানলা এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ঘরের ভিতরেও প্রচুর পরিমাণে সূর্যরশ্মি ঢুকিতে পারে। এসব বিষয় বিবেচনা না করিয়া অস্বাস্থ্যকর গৃহে বসবাস করিলে স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য।

সূর্যরশ্মির মতো আমাদের স্বাস্থ্যের উপর নির্মল বায়ুর প্রভাবও খুব বেশী। বায়ু হইতেই আমরা অক্সিজেন আহরণ করি যাহা আমাদের কর্মপ্রবণতার যোগান দেয়। প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া অক্সিজেন আমাদের দেহের প্রত্যেকটি

কোষে নীত হয় এবং তাহাদিগকে জীবিত রাখে। কিন্তু দূষিত বায়ু আমাদের উপকার না করিয়া অপকার করিতে পারে। বায়ু দূষিত হওয়ার ফলে তাহাতে অক্সিজেনের অংশ যদি কম থাকে বা উহা যদি রোগ-বীজাণু বহন করে, তাহা হইলে ঐ বায়ুগ্রহণ আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। তাই এমন পরিবেশে গৃহনির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায়। গৃহের দরজা-জানলাও এমন হওয়া প্রয়োজন যে ঘরের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। ঘরে বায়ু প্রবেশ করিলে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর—এই ধারণা ভ্রান্ত। নির্মল বায়ু কোনো অবস্থায়ই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতে পারে না।

গৃহ যাহাতে স্যাঁতসেঁতে জমির উপর নির্মিত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আবর্জনার দ্বারা ভরাট জমি, গোরস্থান বা এঁদো পুকুরের কাছাকাছি জায়গায় গৃহ নির্মাণ করা উচিত নয়। কারণ, বৃষ্টি হইলে ঐ ধরনের জমি হইতে অসংখ্য রোগজীবাণু বাহির হয়। নীচু জমিতে গৃহ নির্মাণ করা ঠিক নহে। জমির আর্দ্রতার জন্য রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। বাসস্থানের জমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, ঢালু ও শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন।

শুধু গৃহনির্মাণ করিলেই চলে না, গৃহের পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে বাড়ীতে যথোপযুক্ত নর্দমার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শহরের বাড়ী সম্বন্ধে একথা বেশী প্রযোজ্য। রান্নাঘরের ধোঁয়া আসিয়া সমগ্র বাড়ীটি যাহাতে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে না পারে সে ব্যবস্থাও থাকা উচিত। বাড়ীর আবর্জনা ফেলিবার জন্য উপযুক্ত স্থান থাকা আবশ্যক। যে পাড়ায় বাড়ী সেই পাড়াটাও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত, না হইলে উহার দূষিত আবহাওয়া বাড়ীকে দূষিত করিবে। এই প্রসঙ্গে বাড়ীতে মলমূত্র পরিত্যাগের জন্যও যে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, একথার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আমাদের গৃহ-সমস্যা

আমাদের গৃহ-সমস্যা অত্যন্ত জটিল। গ্রামের লোকেরা এত দরিদ্র যে অনেকেই মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁইও গড়িয়া তুলিতে পারে না। যাহারা তাহা পারেও তাহারা কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব প্রভৃতির নিমিত্ত স্বাস্থ্যসম্মত বাড়ী তৈরী করিতে জানে না। ঘরের মধ্যে আলো-বাতাসের

অভাব, মানুষে-পশুতে একত্রে বাস, রান্না-শোয়ার একঘরে ব্যবস্থা, পানীয় জলের অব্যবস্থা ইত্যাদি তাহাদের বাড়ীকে সুস্থ মানুষের বাসের অযোগ্য করিয়া তোলে।

শহরাঞ্চলে তো নিদারুণ স্থানাভাব। বর্তমানে শহরের লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, লোকেরা কিছুতেই মাথা গুঁজিবার ঠাঁইও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। বাড়ীর মালিকরা চার-পাঁচ গুণ ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। বাস্তুহারাদের আগমনের ফলে, শহর এবং গ্রাম উভয় অঞ্চলেই, সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে।

সরকার শহরাঞ্চলের গৃহ-সমস্যা সমাধানের দিকে প্রথম দৃষ্টি দিয়াছেন। লোকেরা যাহাতে নিজেরা গৃহনির্মাণ করে তাহার জন্য উৎসাহ দিতেছেন। উদ্বাস্তুরা যে সব "জবর দখল" পল্লী স্থাপন করিয়াছিলেন, সরকার তাহা ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। উদ্বাস্তুদেরও দীর্ঘদিন ধরিয়া গৃহ-নির্মাণের জন্য টাকা ধারও দিয়া আসিতেছেন। সরকারী কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণের জন্য দুই বৎসরের মাহিনা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। সরকারী কর্মচারী ব্যতীত, স্বল্প উপার্জনকারী ব্যক্তিদেরও (Lower income group people) গৃহনির্মাণের জন্য টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকার নিজেও বহু ফ্ল্যাটযুক্ত বড়ো বড়ো বাড়ী তৈরী করিয়া উদ্বাস্তুদের ও সরকারী কর্মচারীদের স্বল্প ভাড়ায় ঐ সব ফ্ল্যাট ভাড়া দিতেছেন। বস্তী দূরীকরণের নিমিত্ত সরকার যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ তো পূর্বেই করা হইয়াছে। সরকার বিষয়টির উপর এত গুরুত্ব দিতেছেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গৃহসংক্রান্ত একটি দপ্তরের সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের গৃহ-সমস্যার সমাধান এখনও সুদূরপরাহত। বড়ো বড়ো শহরে ইহার গুরুত্ব বরং দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্যা সমাধানের তিনটি প্রধান অন্তরায় দেখা যায়: প্রথমত, দারিদ্র্য। আমাদের দেশের লোক এখনও এত দরিদ্র যে, গৃহ প্রস্তুতের উপাদান আরও অল্পমূল্যের না হইলে, সরকারের নিকট হইতে ধার লইয়াও তাহাদের অনেকের পক্ষেই গৃহনির্মাণ সম্ভব নহে। তাই অল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত প্রয়োজনানুরূপ গৃহনির্মাণ করা যায় কি না, এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। দ্বিতীয়ত, সময়ের অভাব। আমাদের

গৃহ-সমস্যা সমাধানের অন্তরায়সমূহ

দেশে বর্তমানে এত অধিকসংখ্যক লোক গৃহহীন যে খুব দ্রুতগতিতে গৃহ-নির্মাণ করিতে না পারিলে, এত লোকের গৃহহীনতার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। গৃহের বিভিন্ন অংশ যদি যন্ত্রের সাহায্যে অল্পসময়ে প্রচুর পরিমাণে কারখানায় প্রস্তুত করা যায় এবং যথাস্থানে লইয়া গিয়া অল্প সময়ের মধ্যে গৃহনির্মাণ করা যায়, তবেই গৃহ-সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে। রাশিয়া এবং আমেরিকা অনুরূপ প্রথায় গৃহনির্মাণ আরম্ভ করিয়াছে। তৃতীয়ত, শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের, অনেক সময় অর্থ থাকিলেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবের জন্য যে ধরনের গৃহ নির্মিত হইতেছে, তাহা স্বাস্থ্যসম্মত নহে।

দেশবিদেশের ঘরবাড়ী

শুধু আমাদের দেশেই নহে। পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যদেশেই এই গৃহসমস্যার প্রশ্নটি বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলিতেও শিল্প প্রসারের ফলে শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে, ঐসব দেশে কংক্রীট ও ইস্পাতের তৈরী স্কাই-স্ক্র্যাপারও বহুল প্রচলিত হইয়াছে। এই স্কাই-স্ক্র্যাপারের ব্যাপারে অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই সবচাইতে অগ্রণী। এইসব স্কাই-স্ক্র্যাপারের বৈশিষ্ট্যই হইল আলঙ্কারিক বাহুল্য বিসর্জন দিয়া প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্যই নির্মিত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমেরিকার স্থাপত্য জগতে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধই ঐসব গৃহকে প্রয়োজন মিটাইয়াও অলঙ্কৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাই সাম্প্রতিককালের মার্কিনী স্থাপত্য-কলায় কংক্রীট ছাড়াও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার হইতেছে। বিভিন্ন ধাতুর টুকরা ও প্রচুর পরিমাণে কাঁচের টুকরার সাহায্যে স্কাই-স্ক্র্যাপারগুলিকে সুন্দরতর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশের গগনচুম্বী বাড়ীগুলিতে এখনও কিন্তু সেই প্রয়াস বিশেষ চোখে পড়ে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শহরাঞ্চলের বাহিরের সাম্প্রতিক ঘরবাড়ীগুলিতে কাঠের ব্যবহারও অনেক বাড়িয়াছে। কাঠ প্রভৃতির সাহায্যেও যে অত্যন্ত সহজে সুন্দর বাড়ী তৈরী করা সম্ভব তাহা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

আজ সেখানে স্বীকৃত-সত্য। বাড়ীর দেয়াল, ছাদ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ প্লাইউড, এসবেস্‌টস্ প্রভৃতি উপাদানে ফ্যাক্টরীতে তৈরী করিয়া সেই সব টুকরা যে জায়গায় বাড়ী তৈরী হইবে সেখানে আনিয়া কাঠের খুঁটি প্রভৃতির সাহায্যে জোড়া দিয়া এই সব ঘর তৈরী করা হইয়া থাকে। ইহাদের বলা হয় Prefabricated house। অল্পসময়ে বাড়ী তৈরী করার ব্যাপারে এইজাতীয় বাড়ী অত্যন্ত সুবিধাজনক। ব্যয়ও ইহাতে অল্প। আমাদের গৃহনির্মাণ-সমস্যার সমাধানে আমেরিকার এই দৃষ্টান্ত আমরা মনে রাখিতে পারি।

য়ুরোপীয় দেশগুলিতে শহরাঞ্চলে যদিও একই ধারায় ঘরবাড়ী তৈরী হইতেছে, গ্রামাঞ্চলে এখনও তাহাদের নিজস্ব গঠনবৈচিত্র্য বজায় রহিয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের ঘরবাড়ী

ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে আজিও কাঠের বাড়ী বহু দেখা যায়। উহাদের ছাদগুলি স্বভাবতই ঢালু। কোথাও বা দেয়ালের নিম্নাংশ ইট দিয়া গাঁথিয়া উপরের অংশটুকু কাঠ বা কাঠের উপর সিমেণ্ট দিয়া প্লাষ্টার করিয়া বাড়ী তৈরী করা হইয়া থাকে। এই জাতীয় বাড়ীর সিঁড়িগুলি সাধারণত কাঠের তৈরী হয়। উহাদের দেয়ালে কাঁচের জানলাও থাকে প্রচুর। শীতপ্রধান জায়গা বলিয়া এখানকার সব বাড়ীতেই ঘর গরম রাখার জন্য চুল্লীর ব্যবস্থা রহিয়াছে। শহরাঞ্চলে এই জাতীয় চুল্লীর প্রয়োজন নাই, কারণ সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাড়ীগুলি খুব রুচিসম্মত এবং ছিমছাম। প্রত্যেক বাড়ীতেই ফুল এবং শাক-সবজির জন্য এক ফালি করিয়া জমি আছে। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে গ্রামগুলিতে "কবে"র (Cob) দেয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত ঘর বহুলপরিমাণে দেখা যায়। সাধারণ কাদা-মাটি ও খড় অথবা খড়, মাটি ও চুন মিশাইয়া এই "কব্" তৈরী করা হয়। ইহার প্রধান গুণ, ইহার দ্বারা তৈরী দেয়াল ঘরকে উষ্ণ রাখিতে সহায়তা করে।
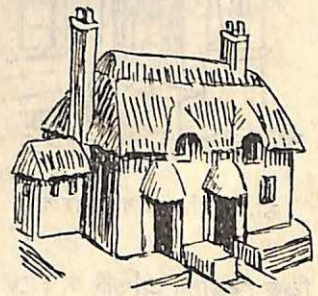
ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলের বাড়ী

ফরাসীদেশের গ্রামাঞ্চলে গৃহের স্থানসঙ্কুলান সমস্যার সমাধানের এক বিচিত্র ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে বিছানাগুলি রেলের "বাংকের" (bunk)

মতো একটির উপর আর একটি স্থাপিত হইয়া থাকে। দিনের বেলায় একটি ঠেলা দরজা দেয়ালের ন্যায় উহাদের ঢাকিয়া রাখে। আয়ার্ল্যাণ্ডে বা স্কটল্যাণ্ডে পাথর প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া সেখানকার গ্রামাঞ্চলের ঘরবাড়ী এখনও পাথরের দ্বারাই বেশী তৈরী করা হয়। উহাদের ছাদগুলি তৈরী হয় সাধারণত খড়ের দ্বারা। জার্মানীতে গ্রামাঞ্চলে অবশ্য লাল টালির ছাদের প্রচলনই বেশী। আগেই বলা হইয়াছে, এখানকার প্রচুর পরিমাণ শীত ও বরফের হাত হইতে ছাদগুলিকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই এইসব ছাদকে অত্যন্ত খাড়া করিয়া তৈরী করা হইয়া থাকে। দেয়াল ইট বা কংক্রীটের তৈরী হইলেও কাঠামো সাধারণত তৈরী করা হয় কাঠ দিয়াই। একই গৃহের মধ্যেই সাধারণত রান্নাঘর, বসতঘর, পশুদের ঘর (কুকুর ইত্যাদির) প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আবার, উত্তর অঞ্চলের ফিনল্যাণ্ডে, সুইজারল্যাণ্ডে, নরওয়ে বা সুইডেনে ঘরবাড়ী একান্ত কাঠের দ্বারাই তৈরী করা হয়।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ঘরবাড়ী

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বাংকসহ বাড়ী
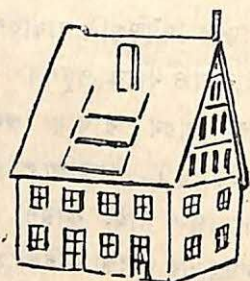
জার্মানীর খাড়া ছাদের বাড়ী

কিন্তু সেখানে প্রতিটি বাড়ীতেই শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইটের বা পাথরের তৈরী চুল্লীর ব্যবস্থা রহিয়াছে। মোটকথা, পাশ্চাত্যদেশে প্রাকৃতিক চাহিদা, সহজ সৌন্দর্যবোধ এবং ব্যয়-স্বল্পতা গৃহনির্মাণের নীতি প্রভাবিত করিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ পৃথিবীর যেসব দেশে আজিও ভালো-ভাবে হয় নাই সেইসব জায়গায় এখনও মানুষ তাহাদের ঘরবাড়ী তৈরীর ব্যাপারে প্রাচীন রীতিরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন একদিকে সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশকে

রোধ করিয়াছে, তেমনি সেখানকার খাদ্যবস্ত্রের মতো গৃহনির্মাণ-শৈলীকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

মেরু অঞ্চল

উত্তর মেরু অঞ্চলের এস্কিমোরা শীতের দিনে বরফের ঘর তৈরী করিয়া বাস করে। এইসব গৃহকে বলা হয় ইগ্‌লু (igloo)। জানলাবিহীন ও ছোটো ঢুকিবার পথযুক্ত ইহাদের অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয় বলিয়া সেখানকার প্রচণ্ড শীতে এই গৃহগুলি অত্যন্ত উপযোগী। সেখানকার স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালে যখন ঐ বরফ গলিয়া যায়, তখন এস্কিমোরা দক্ষিণের জলস্রোতে ভাসিয়া আসা কাঠ দ্বারা তৈরী কুঁড়ে ঘরে বা চামড়ার তৈরী তাঁবুতে (ইহাদের বলা হয় wigwam) বাস করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার পরে তাহারা এখন ক্যানভাসের তাঁবুও ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইগ্‌লু
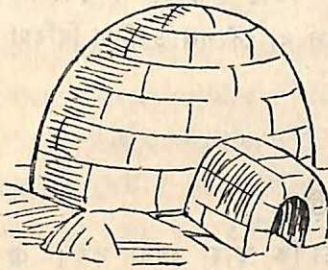
জুলুদের কুটির

আফ্রিকায়

আবার, ঠিক ইহার বিপরীত দেখা যায় আফ্রিকার অভ্যন্তরের উষ্ণ জঙ্গলপ্রধান অঞ্চলের কাফ্রি প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। সেখানে শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ঘরের প্রয়োজন নাই। কিন্তু দিনের প্রখর উত্তাপ ও রাত্রিতে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের হাত হইতে নিশ্চিন্ত থাকিবার জন্যই তাহাদের ঘরের প্রয়োজন। তাই দেখা যায় তাহারা মাটিতে বড়ো বড়ো গাছের শক্ত ডাল পুঁতিয়া তাহার উপর পুরু করিয়া মাটির প্রলেপ দিয়া তাহাদের

কাফ্রিদের ঘর

ঘর তৈরী করিয়া থাকে। গোবর, মাটি ও ছাই প্রভৃতি শক্ত করিয়া বসাইয়া উহাদের মেঝে তৈরী হয়। ইহারা দেখিতে হয় গোলাকৃতি এবং তাহাদের দেয়ালে জানলা বলিয়াও কিছু থাকে না। ইহাদের ছাদ তৈরী হয় বড়ো বড়ো ঘাস দিয়া। ইহারা আমাদের দেশের মাটির দেয়ালযুক্ত খড়ের ঘরের কথা মনে করাইয়া দেয়।

আরবের মরুভূমি অঞ্চলে কিন্তু এইজাতীয় স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ অসম্ভব। এখানে অধিবাসী বেদুইনরা যাবাবর। নিজেদের খাদ্য এবং তাহাদের ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুদের খাদ্যের খোঁজে তাহারা সবসময়ই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই তাহাদের বাসগৃহ হইল তাঁবু। উটের লোমে তৈরী বস্ত্র বা ভেড়া বা ছাগলের চামড়ায় তৈরী এই সব তাঁবু তাহারা সঙ্গে লইয়াই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যায়। ইহাদের নেতা বা "শেখে"র তাঁবুর সম্মুখে অবশ্য কিছুটা জায়গা গাছের ডাল বা ঝোঁপঝাড় দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

মরু অঞ্চলে

অনুশীলন

(আমাদের ঘরবাড়ী)

১। এস্কিমোদের ব্যবহৃত ঘরের বৈশিষ্ট্য কি তাহা বর্ণনা কর। ঐ সব ঘর কি পশ্চিমবঙ্গে যে সব কুটির দেখা যায় তাহাদের মত? যদি না হয়, তাহাদের পার্থক্য কি লিখ। (S. F. 1965) (উঃ—পৃঃ ৭৯, ৯৩)।

২। পশ্চিমবঙ্গের নগর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত বাসগৃহাদির মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পার কি? ঐ পার্থক্য কি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়? (S. F. 1965)
(উঃ—পৃঃ ৭৫-৭৮, ৯৩)

৩। এস্কিমোরা শীতকালে ইগ্‌লুতে বাস করে কেন? (S. F. 1968)
(উঃ—পৃঃ ৯৩)

৪। আমাদের শহরের বস্তী অঞ্চলের সমস্যার আলোচনা করিয়া সমাধানের ইঙ্গিত দাও। (উঃ—পৃঃ ৮২-৮৫)

৫। গৃহনির্মাণে কি কি সাধারণ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে হয় তাহা আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ৮৭-৮৮)

৬। আমাদের গৃহসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সমাধানের ইঙ্গিত দাও। (উঃ—পৃঃ ৮৮-৯০)

আমাদের অন্যান্য চাহিদা

আদিম মানুষ প্রধানত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের খোঁজেই ঘুরিয়া বেড়াইত। এই তিনটি মূল চাহিদার পূরণেই ছিল তাহাদের জীবনের চরিতার্থতা। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার সামগ্রীও ততই বাড়িতে লাগিল। আজিকার পৃথিবীতে আমাদের চাহিদার অন্ত নাই। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি যেমন একদিকে এইসব চাহিদার পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে নিত্য নূতন ভোগ্যদ্রব্য (consumers' goods) ও সেবার (services) চাহিদার সৃষ্টিও করিয়া চলিয়াছে। অনেক সময় মনে হয়, দিন দিনই যেন আমরা চাহিদার দাস হইয়া পড়িতেছি। অনেক জিনিস আছে যাহা জীবনধারণের জন্য আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই, তবু অভ্যাসের দরুন বা অন্য কারণে উহা আমাদের অপরিহার্য চাহিদার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চা, সিগারেট ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে সভ্যতার অর্থই যেন নিত্য নূতন চাহিদার সৃষ্টি এবং তাহাদের পূরণের চেষ্টা। এই বহুবিচিত্র চাহিদার সামগ্রিক বর্ণনা সম্ভবপর নহে ; তাই নিচে শুধু তাহার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ভোগ্যদ্রব্য

তোমরা জান, আদিম মানুষ পশু-পাখী মারিয়া কাঁচা অথবা আগুনে পোড়াইয়া তাহার মাংস অথবা ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত। কিন্তু মানুষ যখন রান্না করিবার কায়দা আয়ত্ত করিল, তখন স্বভাবতই রান্না করিবার জন্য পাত্রাদির প্রয়োজন অনুভূত হইল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেই যে নব্য-প্রস্তরযুগের সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাত্রাদি তৈরী হইত তাহার বহুল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সবই ছিল মাটির তৈরী। তারপর ধাতুর আবিষ্কারের ফলে পাত্রাদির নির্মাণ সহজতর হইল। বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পাত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হইল। আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই পাত্রাদির চাহিদা, বিভিন্ন প্রকারের পাত্র, আবার একই উপাদানে নির্মিত নয়।

বাসন-পত্র

ধাতব পাত্রের মধ্যে সুপ্রচলিত হইতেছে লোহা, তামা, কাঁসা, এলুমিনিয়াম, টিন বা কলাই করা পাত্রাদি। পোর্সিলিন, কাঁচ এবং ষ্টেন্‌লেস্‌ ষ্টীলের পাত্রাদিও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির ফলে এ্যালকাথিনের তৈরী পাত্রাদির চাহিদা খুব বেশী পরিমাণে দেখা দিয়াছে। লোহা, ষ্টেন্‌লেস্‌ ষ্টীল, তামা বা কাঁসার পাত্রাদি দুর্মূল্য বলিয়া সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যহানিকর হইলেও টিনের, এলুমিনিয়ামের বা কলাই করা পাত্রাদি বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা কাঁচের বা পোর্সিলিনের পাত্র ব্যবহার করা অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত। অবশ্য সাধারণ গৃহস্থালীতে ইহাদের ব্যবহার সুপ্রচলিত না হওয়ার কারণ এইগুলি ভঙ্গুর। এ্যাল-কাথিনের পাত্রাদি কিন্তু সেইদিক হইতে বেশী ব্যবহারযোগ্য, কারণ তাহারা কম ভঙ্গুরও বটে, আবার হাল্কাও বটে।

প্রসাধন দ্রব্য

মানুষের দেহকে সজ্জিত করার প্রচেষ্টাও আদিমকাল হইতেই দেখা যায়। প্রাচীনকালে মানুষ দেহে বিভিন্ন উল্কি কাটিয়া এই প্রয়োজন মিটাইত। একদিকে যেমন তাহাদের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, আধিভৌতিক বিশ্বাস এইসব উল্কি-কাটার সহিত জড়িত ছিল, তেমনি আবার তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধও ঐ ব্যাপারে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যে যার বিশ্বাসমতো জন্তু-জানোয়ার, ভূত-প্রেত, ঠাকুর-দেবতা ইত্যাদির ছবি যথাসাধ্য সুন্দরভাবে উল্কি কাটিয়া দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিত। পরবর্তীকালে ঐ সৌন্দর্যবোধের প্রেরণাই তাহাদের বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্য আবিষ্কারেরও প্রেরণা যোগাইয়াছে। জানা যায়, প্রাচীন ভারতে নারীরা কপালে পরিত কাজলের টিপ, সধবারা সীমন্তে দিত সিঁদুরের রেখা, ঠোঁটে ও পায়ে পরিত লাক্ষারস ও অলক্তক, দেহ ও মুখমণ্ডলের ত্বকের শ্রীবৃদ্ধি-উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিত ডাল-বাটা, হরিদ্রা বা নবনী। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দেহ ও মুখমণ্ডলের প্রসাধনে ব্যবহার করিত চন্দনের গুঁড়া ও চন্দনপঙ্ক, মৃগনাভি, জাফরাণ প্রভৃতি। কেশের সৌগন্ধের জন্য মেয়েরা তাহাদের চুল শুকাইত ধূপের ধোঁয়ায়। এইসব দ্রব্যাদির অধিকাংশই তাহারা নিজেরাই তৈরী করিয়া লইত। কিন্তু আজিকার দিনে একদিকে যেমন প্রসাধনদ্রব্য পুরুষেরা খুব বেশী ব্যবহার করে না, তেমনি মেয়েদের প্রসাধনদ্রব্যাদির সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; আর

সেইগুলির জন্য তাহারা অন্যের মুখাপেক্ষীও বটে। দোকান হইতে সুগন্ধী তেল, সাবান, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক, নেইল পলিশ, আই-ব্রো পেনসিল প্রভৃতি হাজারো রকমের প্রসাধনদ্রব্য কিনিয়া তবে তাহাদের প্রসাধন পর্ব সমাপন করিতে হয়। এই ব্যাপারে, আমরা দেহ-সর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতাকে খুব বেশী অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রসাধনের ভারে দেহের প্রকৃত সৌন্দর্য চাপা পড়িয়া যাইতেছে। আবার অর্থব্যয়ও হইতেছে প্রচুর। শহরের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারে দেখা যায় যে, অনেক সময় তাহারা শরীরের পুষ্টির জন্য যথাযথ খাদ্যের ব্যবস্থা না করিয়াও প্রসাধন সামগ্রীর পিছনে অর্থব্যয় করিতেছেন। স্নো, পাউডার, সুগন্ধি তেল ইত্যাদি তো ভাত-ডালের মতোই শহরের মেয়েদের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকায় আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যই দেহের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। অনেক সময় সস্তাদামের প্রসাধনদ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা আমরা স্বাস্থ্যের হানি এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করিতেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মাথায় সস্তা সুগন্ধি তেল ব্যবহার করিয়া আমরা চুলের আয়ু নষ্ট করিয়া থাকি। প্রাচীনকালে যেসব দ্রব্য ব্যবহার করিয়া আমাদের দেশের মেয়েরা দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেন, তাহাদের কোনো কোনোটা ব্যবহারে আমরা অধিক ফল পাইতে পারি।

আসবাবপত্র

মানুষ যেদিন প্রথম ঘর তৈরী করিতে শিখিয়াছিল, সেদিন তাহাই ছিল তাহার কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি। কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শীতাতপ বা বাহিরের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয়ই ছিল সেদিন তাহার কাছে বড়ো চাহিদা। তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। মানুষ যেমন তাহার গৃহকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর আকৃতি দিয়াছে, তেমনি গৃহাভ্যন্তরে স্বাচ্ছন্দ্যেরও বিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার সেই প্রয়াসের ফলেই উদ্ভব ঘটিয়াছে বিবিধ আসবাবপত্রের। শোবার জন্য খাটিয়া, চৌকী, খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি, বসার জন্য নানারকমের চেয়ার, বেঞ্চ, টুল, সোফা, মোড়া, জলচৌকী প্রভৃতি, জিনিসপত্র রাখার জন্য নানাবিধ সেল্‌ফ্‌, আলমারী, ক্যাবিনেট প্রভৃতি, জামাকাপড় রাখার জন্য আলনা, আলমারী, ব্র্যাকেট, ওয়ার্ডরোব প্রভৃতি, বা লেখাপড়ার জন্য টেবিল, ডেস্ক, সেক্রেটারিয়েট টেবিল প্রভৃতির সহিত তোমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। বাসনপত্রাদির ন্যায়

আসবাবপত্রাদিও নানা উপাদানে তৈরী হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অবশ্য কাঠই প্রধান। সাম্প্রতিককালে টেবিল, চেয়ার, ব্র্যাকেট, আলমারী প্রভৃতি নির্মাণে লোহা বা ষ্টীলও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

শুধু গৃহনির্মাণ করিলেই তাহা বসবাসের যোগ্য হয় না। রাত্রির অন্ধকারে সেখানে আলোর ব্যবস্থা করিতে হয়। আদিম গুহা-মানব পাথরে পাথর ঘষিয়া যেদিন প্রথম আগুনের আবিষ্কার করিয়াছিল, সভ্যতার সেই প্রথম উন্মেষেই সেই আগুনকে কাজে লাগাইয়া আলো জ্বালিয়া অন্ধকার দূর করিতেও মানুষ শিখিয়াছিল। সেইদিন হয়তো যে জন্তুজানোয়ারের মাংস তাহারা খাইত, তাহারই চর্বিকে প্রদীপ জ্বালাইবার কাজেও তাহারা ব্যবহার করিত। তারপর মানুষ বিভিন্ন তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের কায়দা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার দ্বারা প্রদীপ জ্বালাইতে শিখিয়াছে। আরও পরে হাওয়ার হাত হইতে আলোকে বাঁচাইবার জন্য প্রদীপের পাশাপাশি লণ্ঠন প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। আলোকে আরও উজ্জ্বল করার নিমিত্ত নানারকমের গ্যাসের বাতি বাহির হয়। বর্তমান যুগে যেসব জায়গায় বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব সেখানে মানুষ প্রদীপ, লণ্ঠন, গ্যাসবাতি প্রভৃতির উপর অন্ধকার দূর করার জন্য আর নির্ভর করে না। এইগুলির পরিবর্তে তাহারা বৈদ্যুতিক আলোই ব্যবহার করিয়া থাকে।

আলো

গৃহনির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তাই বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করাও আজিকার সভ্যদেশগুলিতে এক অন্যতম চাহিদা। শুধু আলোই নহে, গৃহাভ্যন্তরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, হাওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্যও বৈদ্যুতিক শক্তি ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির চাহিদা আজ সর্বত্রই অনিবার্যভাবে দেখা দিয়াছে। অবশ্য অনগ্রসর অঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি গিয়া পৌঁছায় নাই সেখানকার অধিবাসীদের কাছে বা শহরাঞ্চলেও যাহাদের সামর্থ্যে কুলায় না তাহাদের কাছে এই চাহিদা খুব বড়ো নয়।

বৈদ্যুতিক শক্তি

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজনে মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, দূরত্বের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দূর দূর দেশের সহিত যোগাযোগের চাহিদা অনিবার্য-ভাবে দেখা দিয়াছে। আর তাহারই ফলে মানুষ বিভিন্ন যানবাহনের

আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথম যুগে মানুষ পায়ে হাঁটিয়া, বা তারও পরে ঘোড়ায় চাপিয়া বা জলপথে ভেলা বা নৌকায় করিয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাতায়াত করিত। তারপর আবিষ্কৃত হয় মনুষ্যবাহিত বা পশুচালিত শকট। আরও পরে বাষ্পের ব্যবহার শিখিবার ফলে মানুষ আবিষ্কার করে রেলগাড়ী, ষ্টীমার প্রভৃতি। আরও দ্রুততর যানবাহনের চাহিদার ফলে এবং পেট্রোলের ব্যবহার জানিবার পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে উড়োজাহাজ, মোটর প্রভৃতি। শুধু তাহাই নহে। যোগাযোগ রক্ষার কাজকে আরও দ্রুতসম্পন্ন করার চেষ্টায়ই মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি। যদিও সাধারণ মানুষের এইসব জিনিসের মালিকানা অর্জনের উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতা নাই, তবু বিত্তবানদের কাছে ইহাদের চাহিদা যথেষ্ট। ইহাদের প্রত্যেকটিকে ঘিরিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের শত শত জিনিসের চাহিদা। ভাবিয়া দেখ, রেলগাড়ী বা জাহাজ তৈরী করিতে কত রকমের কত জিনিসের প্রয়োজন!

যানবাহন

কিন্তু মানুষ শুধু খাইয়া পরিয়া দেহগত জীবনধারণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকে না। জীবজগতের সর্বোচ্চ স্তরের প্রাণী হিসাবে তাহার একটা মানসগত জীবনও আছে। এই মানসজীবনের প্রকাশকেই বলা হয় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি সকল মানুষের এক নহে। সংস্কৃতির মূলে আছে কায়িক শ্রম হইতে অবসর। ফলে, যুগে যুগে যে জাতি যত বেশী সামাজিক ধনসঞ্চয় করিতে পারিয়াছে, সেই জাতিই তত বেশী সংখ্যক লোককে ধনোৎপাদনগত কায়িক শ্রম হইতে মুক্তি দিয়া অবসরের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। আর সেই সুযোগে তাহারা চিন্তা, অধ্যয়ন, সাহিত্যচর্চা, শিল্পচর্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়া নিজস্ব তথা সমাজগত মানসের ধ্যানধারণা মনন-কল্পনাকে রূপদান করিয়াছে, জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আধুনিককালে যান্ত্রিক সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কায়িক শ্রমের কাজ যন্ত্রের সাহায্যে যত বেশী হওয়া শুরু হইয়াছে, মানুষের অবকাশও তত বাড়িয়াছে। ফলে, মানস-সংস্কৃতির অনুশীলনেও মানুষ বেশী ব্রতী হইবার সময় পাইতেছে। তবে, কেহ বা এই সংস্কৃতিকে সমসাময়িক সমাজবিন্যাসের প্রয়োজনে সৃষ্টির প্রেরণায় সমৃদ্ধতর করিয়া চলিয়াছে, কেহ বা শুধু তাহাকে উপভোগ করিয়াই

সংস্কৃতি

ক্ষান্ত হইতেছে। অবশ্য, আধুনিককালেও যে সকল মানুষই সংস্কৃতির অনুশীলনের সমান সুযোগ পাইয়া থাকে সে কথা ভাবিলে ভুল হইবে। এই ব্যাপারেও অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য বহুলাংশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

সমাজে মানসের এই অভিব্যক্তি দেখা যায় সাহিত্যে, শিল্পকলায়, নৃত্যগীতে, আমোদপ্রমোদে। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই সাংস্কৃতিক চাহিদা আমাদের আরও কতকগুলি ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদার সৃষ্টি করিয়াছে। কাগজপত্র, দোয়াত, কালি, কলম, বই, নানাবিধ খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্রাদি, তুলি, রং প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে প্রধান। অবসর উপভোগের অন্যতম আনুষঙ্গিকরূপে রেডিও, গ্রামোফোন, রেডিওগ্রাম, টেলিভিসন প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

সাংস্কৃতিক অনুশীলনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

সেবার চাহিদা

বর্তমান সমাজ দিন দিনই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। এই সমাজে আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এখানে সার্থক জীবনযাপন করিতে হইলে পুলিশ, বিচারক, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি আরও অনেকের সাহায্য প্রয়োজন। আবার পুলিশ, বিচারক, ডাক্তার প্রভৃতি যদি আমাদিগকে আশানুরূপ সাহায্য দিতে চান, তবে তাহাদের প্রয়োজন হয় নানারূপ যন্ত্রপাতির ও দ্রব্যের। ঐসব প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের সেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা। যদিও এই চাহিদা-গুলি আমাদের অন্যান্য চাহিদা হইতে প্রকৃতিতে ভিন্ন, তবু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও তাহাদের গুরুত্ব কম নহে।

প্রথমই আমাদের শত্রু হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর। এই সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করা এবং যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া সেবা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের অন্যতম প্রধান চাহিদা। তাই, প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত চাহিদা না হইলেও, জাতীয় প্রয়োজনে গোলা, বারুদ, কামান, ট্যাঙ্ক, জঙ্গী বিমান ইত্যাদির চাহিদা আছে। দেশের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশবাহিনী এবং তাহার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রয়োজনও জাতির রহিয়াছে।

নিরাপত্তামূলক সেবার চাহিদা

তারপর সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজন হয় ডাক্তারের এবং নানাবিধ ঔষধের। আমাদের দেশে এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন আছে। এই তিন ধরনের চিকিৎসার জন্যই উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত যথেষ্টসংখ্যক চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত নির্ভরযোগ্য অসংখ্য রকমের ঔষধের প্রয়োজন। সভ্যতার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা যত জটিল হইতেছে, স্বাস্থ্যরক্ষা ততই কঠিন হইয়া পড়িতেছে এবং চিকিৎসক এবং ঔষধপত্রের উপর আমরা ততই নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছি। বিশেষ করিয়া নগর (city) এবং শহরের (town) উদ্ভবের জন্য বর্তমানে জনস্বাস্থ্যরক্ষার বিধিবদ্ধ চেষ্টা করাও আমাদের চাহিদার অন্যতম। অনেক লোক খুব কাছাকাছি বাস করার নিমিত্ত এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত থাকার জন্য নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখা, সংক্রামক রোগের ব্যাপকতা নিরোধ করা, ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করা ইত্যাদি কাজের জন্য জনস্বাস্থ্যবিভাগের বিশেষ প্রয়োজন। এই বিভাগের কর্মীরা যাহাতে যথোপযুক্ত শিক্ষা পায় এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ইত্যাদি যাহাতে সহজে পাওয়া যায়, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যমূলক সেবার চাহিদা

তারপর, বর্তমানে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষ হইয়াছে এবং চিকিৎসা-কার্যের জন্য যেভাবে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হইতেছে তাহাতে অধিকাংশ লোককেই হাসপাতালের চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই আমাদের চাই যথেষ্টসংখ্যক হাসপাতাল এবং এইগুলির জন্য ডাক্তার ব্যতীত নার্স এবং আরও নানাধরনের কর্মীর।

ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথার উদ্ভবের ফলে তাহার অবশ্যম্ভাবী উত্তরফল মালিকানা লইয়া নানাধরনের বিরোধ আছে। ইহা ছাড়া, মানুষে মানুষে মতের আমিল, নানাধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির ফলে ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি প্রভৃতি হইয়া থাকে। পূর্বে এই সব বিরোধ গোষ্ঠীপতি নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। কিন্তু সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে তাহা আর সম্ভব হয় না। ফলে, বহুবিচিত্র বিচারপ্রথার উদ্ভব হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহা চালু রাখিবার জন্য বিচারক, আইনজীবী, মুহুরী প্রভৃতি নানারকমের কর্মীর

আইনমূলক সেবার চাহিদা

প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা, পুস্তক এবং কিছুটা যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন।

গণতন্ত্রকে চালু রাখিতে লইলে, বিচারশীল গণমত গঠন করা অপরিহার্য। অপরদিকে, আমরা প্রত্যেকে যদি দেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হই, তবে দেশের, এমন কি বিদেশের কোথায় কি হইতেছে সে সম্বন্ধে নির্ভর-যোগ্য সংবাদ পাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। আমাদের এই দুই প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সংবাদপত্রের চাহিদা। আর সংবাদপত্রকে চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজন দেশে-বিদেশে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার প্রতিষ্ঠা। তারপর, সংবাদপত্রের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের কাগজ, ছাপার যন্ত্রপাতি, রেডিও, টেলিপ্রিন্টার ইত্যাদি সংবাদ সরবরাহের নানারকমের যন্ত্র এবং অসংখ্য ধরনের কর্মীর।

সংবাদপত্রমূলক সেবার চাহিদা

আমাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্তও আমাদিগকে অনেকের সেবা গ্রহণ করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের চুল-দাড়ি কাটিবার জন্য নাপিতের, জামা-কাপড় কাচিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য ধোপার এবং কর্মপ্রয়োজনে যখন আমাদের নিজ আবাসের বাহিরে থাকিতে হয় তখনকার জন্য হোটেল ইত্যাদির প্রয়োজন। আবার যন্ত্রসভ্যতা এত অগ্রসর হইয়াছে যে আমাদের অনেকের বাড়ীতেই কলের জল, ইলেকট্রিক বাতি ইত্যাদি নানারকমের যান্ত্রিক দ্রব্য আছে। ইহাদিগকে চালু রাখাও এক সমস্যা। ইহার জন্য আমাদের নানারূপ কারিগরের প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নলওয়ালা (plumber), ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ইত্যাদি নামের উল্লেখ করা যায়। ইহা ছাড়া বিত্তবানদের বাড়ীতে পাচক, পরিচারক প্রভৃতির সেবার চাহিদাও রহিয়াছে।

ব্যক্তিগত ও পারি-বারিক সেবাসংক্রান্ত চাহিদা

সভ্যতা জটিলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষামূলক সেবার চাহিদাও দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্বের মতো পরিবারের ভিতর দিয়া সমাজে বাস করিবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং বৃত্তিগত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নহে। তাই নার্সারি বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় (college) এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধাপে ধাপে

শিক্ষামূলক সেবার চাহিদা

গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্য কতরকম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সীমা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেক্‌নিক, শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয় ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সেবা ব্যতীত আমাদের জীবন কিছুতেই সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না, সার্থক হইতে পারে না।

আমাদের শিক্ষালাভের চাহিদা মিটাইবার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ব্যতীতও পাঠাগার (Library), যাদুঘর (Museum), বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি আরও অনেক রকমের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

অনুশীলন

(আমাদের অন্যান্য চাহিদা)

(ক) ১। খাদ্য, কাপড় এবং ঘরবাড়ী ব্যতীত আমাদের আর যে সব চাহিদা আছে তাহাদের নাম কর এবং ঐসব চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের কি কি ধরনের জিনিসের প্রয়োজন হয়, সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ৯৪-৯৯)

২। আমাদের সেবামূলক যে সব চাহিদা আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ৯৯-১০২)

(খ) ১। নিম্নলিখিত প্রজেক্ট গ্রহণ করা যাইতে পারে—

প্রত্যেক ছাত্রই একটি করিয়া মণিহারি দোকানে যাইবে এবং নিম্নলিখিত শীর্ষে দোকানের জিনিসগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(ক) জিনিসের নাম, (খ) কি প্রয়োজনে লাগে, (গ) কোথায় তৈরী হয়, (ঘ) দাম কত।

জীবনের চাহিদা পূরণের উপায়

আমাদের জীবিকা

সমাজে বৃত্তির সৃষ্টি

চাহিদা নিবৃত্তির জন্যই মানুষের যত কাজ! আগের কয়েকটি অধ্যায়ে মানুষের প্রধান চাহিদাগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। মানুষের যে কোন চাহিদা নিবৃত্তির জন্য, সমাজে হাজার রকমের কাজের ব্যবস্থা দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, মানুষের খাদ্যের চাহিদার কথা আলোচনা করিয়া দেখা যাক! ধরা যাক, খাদ্যের চাহিদা নিবৃত্তির জন্য আমাদের বাঙ্গালীদের চাষ করিতে হইবে। ধানের চাষ করিতে হইলে, লাঙ্গল, কাস্তে প্রভৃতি অনেকরকম যন্ত্র চাই। কাজেই সমাজের কিছু সংখ্যক লোককে কামারের কাজে নিযুক্ত হইতে হইবে।

চাষীর কাজের তো প্রয়োজন রহিয়াছেই। ধান কাটা প্রভৃতি কাজের জন্য মজুরও নিয়োগ করিতে হয়। তারপর গবাদি পশুর রক্ষণের জন্য গোচারকের প্রয়োজন আছে। ধান বহনের জন্য গরুর গাড়ী প্রভৃতি নির্মাণের জন্য সমাজকে শিল্পীর ব্যবস্থাও করিতে হয়। এখানেই শেষ হয় না, এই ধানকে চাউলে পরিণত করার জন্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের প্রয়োজন এবং ধানের কল বসাইয়া তাহার পরিচালনার জন্য লোকের প্রয়োজন। তারপর যে ধানের চাষ করিল, তাহার এত ধানের প্রয়োজন নাই; আবার অনেক লোক আছে, যাহারা ধানের চাষ করে নাই, কিন্তু তাহাদের চাউলের প্রয়োজন।

এই দুই-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন। স্থান হইতে স্থানান্তরে চাউল লইয়া যাইবার জন্য রেলগাড়ী, বাস প্রভৃতি এবং তাহাদের কর্মীর প্রয়োজন। এইভাবে খাদ্যের চাহিদা নিবৃত্তির জন্য সমাজকে আরও নানা ধরনের কাজের জন্য লোক নিয়োগ করিতে হয়। মানুষ নিজ প্রয়োজনে, নিজ রুচি, শিক্ষা, সুযোগ প্রভৃতি হিসাবে, মানুষের চাহিদা নিবৃত্তির জন্য, সমাজের বিভিন্ন ধরনের কাজে লিপ্ত হয়। এই সব কাজের বিনিময়ে, সমাজ কাজে লিপ্ত লোকদের পারিশ্রমিক দেয়। এই পারিশ্রমিকের সাহায্যেই মানুষ নিজ নিজ চাহিদার বিনিময়

মূল্য দিয়া থাকে। মানুষ সমাজের যে প্রয়োজন নিবৃত্তি করিয়া পারিশ্রমিক লাভ করে, তাহাকেই তাহার বৃত্তি বলে।

জীবিকা সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে অনেক চাহিদা নিবৃত্তির জন্যই আমরা পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে, আমাদের দেশে জীবিকার সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের অনেকেরই বিশেষ বিশেষ ঝোঁক এবং ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে। কেহ হয়তো কৃষিকাজ ভালোবাসে, আবার কেহ বা যন্ত্রপাতির কাজ ভালো পারে ; তৃতীয় জন হয়তো চারু-শিল্পের প্রতি অনুরাগী। বর্তমানে নানা রকমারী কাজের সৃষ্টি হওয়ায়, প্রত্যেককেই তাহার মনোমতো এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় তিন হাজার বিভিন্ন জীবিকার ব্যবস্থা রহিয়াছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও এই সংখ্যা ছিল দুই হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ। বিদেশে যান্ত্রিক সভ্যতার আরও উন্নতি হইয়াছে। সেখানে অবশ্য জীবিকার সংখ্যা আরও অনেক বেশী। এইসব জীবিকার কোনটিই হীন নহে। অথচ, ইহাদের অনেকের সম্বন্ধেই আমরা কিছুই জানি না। আমাদের এই অজ্ঞতার ফলে যেসব জীবিকার সন্ধান আমরা রাখি তাহার খোঁজেই বেশী সংখ্যক লোক ভিড় করে। তাহারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অন্যান্য জীবিকাগুলি অনাদৃতই থাকিয়া যায়, এবং সেইসব জীবিকাজাত দ্রব্যের চাহিদাও সবসময় ঠিকমত পূরণ হয় না। তাই নিজেদের স্বার্থে তথা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে এই সব বিভিন্ন জীবিকা সম্বন্ধে আমাদের জানা প্রয়োজন।

অবশ্য তিন হাজার জীবিকার প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই আলাদা আলাদাভাবে জানা সম্ভব নহে। তাই চাহিদা হিসাবে বৃত্তিগুলিকে ভাগ করিয়া নিচে আলোচনা করা গেল।

তোমরা জান, আমাদের প্রধান চাহিদা খাদ্য। কৃষির সাহায্যে প্রধানত খাদ্যের উৎপাদন হয়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্তমানে, দেশে শিল্প বিস্তারের পরও, কৃষিজীবীর সংখ্যা ভারতে শতকরা ৭০ জন। ইহার অর্থ প্রতি দশজন ভারতীয়ের মধ্যে ৭ জনই কৃষক এবং মাত্র ৩ জন অন্যান্য বৃত্তির সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। মোটামুটি ভাবে বলা

যায় যে বর্তমানে ভারতে কৃষিজীবীর সংখ্যা ২৭ কোটি এবং অন্যান্য বৃত্তিজীবীর সংখ্যা মাত্র ১৬ কোটি। ইহাতে চাষের জমির উপর খুব চাপ সৃষ্টি হইতেছে। দেশে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়া, অন্যান্য বৃত্তিজীবী লোকের সংখ্যা বাড়িলে চাষের জমির উপর চাপ কমিতে পারিত। আজিকার দিনে কৃষিকার্য-পদ্ধতি বহু জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে। একদিকে জমিতে কৃত্রিম সারের ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্ভব ঘটিয়াছে; অন্যদিকে বিজ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে জমি চাষ করিবার জন্য ক্রমেই উন্নততর ও অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে। ফলে, আগে যেমন কৃষিজীবী বলিতে আমরা শুধু চাষীদেরই বুঝিতাম, তাহার পরিবর্তে এখন চাষীরা ছাড়াও কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া বহু জাবিকা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই জীবিকাগুলির যে কোনোটির জন্য উপযুক্ত হইতে হইলে প্রয়োজন হয় দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। যেমন, কোন জমিতে বা কোন শস্যে কোন সার বেশী কার্যকরী হইবে, কোন শস্য কোন পোকায় নষ্ট করে এবং সেই পোকা কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়া মারা যায়—এই সব বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের চাহিদা আজ কৃষিকার্যের জন্য প্রচুর। ইহাদের এণ্টমলজিষ্ট বলা হয়। আবার কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ে ট্র্যাক্টর, মোটর লাঙ্গল, হ্যারো, রোলার প্রভৃতি জমিকর্ষণ যন্ত্র, ড্রিল প্রভৃতি বীজবপন যন্ত্র, হো প্রভৃতি আগাছা তুলিয়া মাটিকে আলগা করিয়া দিবার যন্ত্র, শস্যছেদন যন্ত্র, শস্যের দানাগুলিকে পৃথক ও উপরের আস্তরণ হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য শস্যমর্দন যন্ত্র, আবশ্যক হইলে স্থান ও অবস্থা অনুযায়ী জলসেচের জন্য ওয়াটার এলিভেটার, ড্রেনেজ পাম্প প্রভৃতি জলসেচন যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে ঐ সব যন্ত্রচালনে বিশেষজ্ঞ কর্মীদেরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সব যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রয়োগের খাতিরেই বড়ো বড়ো যৌথ খামার গড়িয়া ওঠার ফলে প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বৈজ্ঞানিক, কৃষিকাজে শিক্ষিত এবং বিশেষজ্ঞ ম্যানেজার, পরিদর্শক, ওভারসীয়ার প্রভৃতি জীবিকার কর্মীদের। সংক্ষেপে, এই কৃষিকার্যকে ঘিরিয়া হাজার রকমের জীবিকার সৃষ্টি হইয়াছে।

কৃষিকার্য ও তৎসংক্রান্ত জীবিকা

কিন্তু শুধু শস্য দিয়াই আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটে না। তাই অন্যবিধ খাদ্যের চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে কৃষিকার্যের পাশাপাশি

পশুপালন, হাঁস-মুরগী-পালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা মানুষ বহুদিন ধরিয়াই করিয়া আসিতেছে। তবে কৃষিকার্যের মতো পশুপালন ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সাম্প্রতিক কালের। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইউরোপ বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পশুখাদ্য উৎপাদন, পশুপ্রজনন, পশুচিকিৎসা, কুক্কুটাদির ডিম হইতে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা বাহির করা, পশু-মাংশ সংরক্ষণ, বা পশু-দুগ্ধ হইতে খাদ্যাদি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ প্রভৃতি সর্বকার্যেই যন্ত্রাদির ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপকরূপ ধারণ করিয়াছে। ফলে, সেই সব দেশে ঐ সব বিভিন্ন কাজে বিশেষজ্ঞদের চাহিদা খুবই বেশী। আমাদের দেশ এখনও এসব ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। অথচ, তোমরা জান, প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের চাহিদা আমাদের খুবই বেশী। তাই, জাতীয় স্বার্থেই কৃষিকার্যের ন্যায় পশুপালনের উপরও আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে গবাদি পশুর প্রজনন কেন্দ্র, পশুচিকিৎসালয়, হাঁসমুরগীর পালন ও প্রজনন কেন্দ্র, দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক কালে কৃষিকেন্দ্র করিয়া নানা ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যেমন, মাখন, চীজ প্রভৃতি তৈরীর কেন্দ্র, দুগ্ধ শুষ্কীকরণ কেন্দ্র, মাংস ও তরকারী তাজা রাখার জন্য হিম প্রকোষ্ঠ প্রভৃতি। এই ধরনের শিল্পগুলিকে কৃষিভিত্তিক শিল্প বলা হয় (Agro-industry)।

পশুপালন ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্প সংক্রান্ত জীবিকা

আমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলিতে কৃষির মতো, কৃষিভিত্তিক শিল্পের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা নগণ্য, তবু ইহাদের স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন আমাদের প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূর্বেকার তুলনায় বেশী মিটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে বহু নূতন নূতন জীবিকার উদ্ভব ঘটিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত বিভিন্ন পশুপালন, পশুজাত খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলির জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়াছে পশু-রসায়ন, প্রজনন, পশুর রোগবাহী জীবাণু ধ্বংসকরণ, দুগ্ধ শুষ্কীকরণ, দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী ও সংরক্ষণ, পশুজাত খাদ্যদ্রব্য তৈরী ও সংরক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য অভিজ্ঞ কর্মীর। উন্নততর কৃষিবিদ্যার মতো তাই উন্নততর পশুপালন ও খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন দিক শিক্ষাদানের জন্যও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত

হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুক্তেশ্বর ও ইজাতনগরের ইণ্ডিয়ান ভেটেরিনারী রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, বাঙ্গালোর ও কুর্ণুলে ডেয়ারী রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রধান। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতাস্থ বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজও ইহাদের অন্যতম।

মৎস্যচাষ-সংক্রান্ত জীবিকা

মৎস্যচাষের ক্ষেত্রেও নরওয়ে, ইংল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ যেরূপ অগ্রগামী রহিয়াছে তাহার তুলনায় আমাদের দেশ অনেক পিছাইয়া আছে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয় তাহা সুপ্রচুর নহে। তাই সাম্প্রতিককালে উন্নততর প্রথায় মৎস্যচাষের চেষ্টা শুরু হইয়াছে। তাছাড়া ট্রলার প্রভৃতি জেলে-ষ্টীমার আনিয়া গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবারও ব্যবস্থা ধীরে ধীরে করা হইতেছে। ফলে, একদিকে যেমন মৎস্যের প্রয়োজন কিছুটা মেটানোর আয়োজন হইয়াছে, তেমনি মাছের যকৃৎজাত তৈল প্রভৃতি মৎস্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। ইহার ফলে নূতন নূতন জীবিকারও উদ্ভব হইয়াছে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বা উন্নততর মৎস্যচাষের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের (Pisciculturist) প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, মৎস্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্যও ঐ কাজে বিশেষভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতাস্থ সেন্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিশারিজ রিসার্চ ষ্টেশন, মাদ্রাজের মণ্ডপম্-স্থিত সেন্ট্রাল মেরাইন রিসার্চ ষ্টেশন (ফিশারিজ), বোম্বাইর ডীপ সী ফিশিং রিসার্চ ষ্টেশন এবং কোচিনস্থ সেন্ট্রাল ফিশারিজ টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ষ্টেশন উল্লেখযোগ্য।

বনসংক্রান্ত জীবিকা

আমাদের অন্যতম চাহিদা খাদ্যের প্রসঙ্গেই জ্বালানী কাঠের কথাও আসিয়া পড়ে। খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য অপরিহার্য এই জ্বালানী কাঠ প্রধানত আমরা পাইয়া থাকি বন হইতে। অবশ্য শুধু জ্বালানী কাঠই নহে, বনজ দ্রব্যাদি হইতে মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু চাহিদা মিটিয়া থাকে। গৃহনির্মাণে, গৃহের নানারূপ আসবাবপত্র প্রস্তুত করিতে, যানবাহনের সম্পূর্ণ বা আংশিক নির্মাণকার্যে, বিভিন্ন খেলার বা বাদ্যযন্ত্রের অংশ তৈরী করিতে, আমাদের কাঠের প্রয়োজন হয়। আবার, বহু শিল্পদ্রব্য সৃষ্টির জন্য অনেক উপাদান বন হইতেই পাওয়া

যায় ; যথা, কাগজ তৈরীর জন্য নরম কাঠ, কৃত্রিম রেশম বস্ত্র নির্মাণের জন্য কাঠের আঁশ, চামড়া রং করার জন্য হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী গাছের উপাদান, মোম, লাক্ষা প্রভৃতি। বহুদিন পর্যন্ত মানুষ বন হইতে তাহার চাহিদা অনুযায়ী এই সব জিনিস সংগ্রহ করিয়াছে ; বসবাসের জন্য অথবা চাষের জন্য বন কাটিয়া ধ্বংস করিয়াছে। নূতন করিয়া বন আবাদের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন পর্যন্ত সে অনুভব করে নাই। অথচ, তাহার ফলে একদিকে যেমন বনজ সম্পদ ক্রমেই কমিয়া যায়, তেমনি দেশের সামগ্রিক ক্ষতিও হইয়া থাকে। কারণ, বন থাকিলে শিকড়ের বন্ধনে মাটি জলে ধুইয়া যাইতে পারে না, সন্নিহিত নদীতে সহজে জলবৃদ্ধি হইয়া বন্যা হইতে পারে না। আবার, বনের অবস্থিতিই সন্নিহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায় ও ঝড়ের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। এইসব কারণেই বিদেশে গত শতক হইতেই নূতন করিয়া বন আবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। বিভিন্ন শস্যের মতো নূতন নূতন বনেরও চাষ হইতেছে। আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে বন সংরক্ষণের কাজ কিছু পরিমাণে শুরু হইলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই এইদিকে আমাদের বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছে। বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া নূতন নূতন বনের আবাদও শুরু হইয়াছে। ইহার ফলে অরণ্য বিভাগেও নূতন নূতন জীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। একদিকে যেমন কনজারভেটার, ফরেষ্টার, এসিষ্ট্যাণ্ট ফরেষ্টার, রেঞ্জার, ফরেষ্ট অফিসার প্রভৃতি পদের জন্য অরণ্য-বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, তেমনি অরণ্য আবাদের জন্য মৃত্তিকা-বিশেষজ্ঞ, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, রাসায়নিক প্রভৃতিরও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাছাড়া, বৃক্ষাদি হইতে তার্পিন তেল, লাক্ষা প্রভৃতি নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাদি চালনে অভিজ্ঞ ডাইজেষ্টার অপারেটার, ডিষ্টিলার, ল্যাক ট্রিটার প্রভৃতি জীবিকারও উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই সব ব্যাপারে অনুশীলন ও সমীক্ষা পরিচালনের জন্য ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, যোধপুর ডেজার্ট এফোরেষ্টেশন রিসার্চ স্টেশন, এবং কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ডের অধীনে দেরাদুন, কোটাল, বাসদ, বেল্লারী, উটকামণ্ড, ছাতরা (নেপাল), চণ্ডীগড় ও আগ্রায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বনজ সম্পদের মতো অসংখ্য প্রকার খনিজ সম্পদও আমাদের বহু চাহিদা মিটাইয়া থাকে। কি আসবাবপত্রাদি বা রন্ধনের সরঞ্জামাদি সাংসারিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, কি বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রপাতি নির্মাণে, কি গৃহাদি নির্মাণে,

কি যুদ্ধের প্রয়োজনে কিংবা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রাদি তৈরী করিতে, কি টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যন্ত্রাদি, রেডিও, মোটর, ডাইনামো প্রভৃতি নির্মাণে সর্বত্র লোহার প্রয়োজন অতুলনীয়। নানাপ্রকার বাসন, জাহাজের আবরণ, বিদ্যুৎবাহী তার প্রভৃতি তৈরীর জন্য প্রয়োজন তামার। গৃহস্থালীর বিভিন্ন দ্রব্যাদি, আকাশযান, নৌকা, জাহাজ, ইলেকট্রিক সংক্রান্ত জিনিসপত্র তৈরীর কাজে হাল্কা অথচ শক্ত এলুমিনিয়ামের ; গ্যাস প্রভৃতি পরিচালনের নল, বন্দুকের গুলি, রং প্রভৃতি তৈরীর জন্য সীসার রং ; এবং ঘরের চাল, পাত্রাদি তৈরীর জন্য টিনের প্রয়োজন। শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম অপরিহার্য। আবার ঐ কয়লা হইতেই আলকাতরা, পীচ, স্যাকারিন প্রভৃতি, এবং পেট্রোলিয়াম হইতে লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যারাফিন বা মোম, এ্যাসফাল্ট বা পীচ প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। বালুজাত সিলিকা কাঁচের প্রধান উপকরণ। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্মাণের ব্যাপারে তাপ-অপরিবাহী অভ্র, তাপসহ চুল্লী নির্মাণের জন্য ক্রোমাইট, গৃহাদির চাল তৈরীর জন্য এ্যাসবেসটস, লবণ প্রভৃতি আরও হাজারো রকমের খনিজ দ্রব্য আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিয়া থাকি। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নূতন নূতন খনি আবিষ্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। বর্তমানে আমাদের যে সব খনি আছে তাহাদের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। ইতিমধ্যে অনেক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারপর নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া পুরাতন খনিগুলির যাহাতে পূর্ণ ব্যবহার হয় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। খনিকে কেন্দ্র করিয়া উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিয়াছে—দুর্লভ খনিজের পরিবর্তে সুলভ খনিজ দিয়া কাজ চালাইবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হইতেছে। এই সব প্রচেষ্টার ফলে দেখা যায় যে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মাত্র ৫০ জন কর্মীর বদলে ৩৫০ জন ভূ-তত্ত্ববিদ্ (Geologist), ভূ-পদার্থবিদ্ (Geophysicist) ও কারিগরী অফিসারের বিরাট বাহিনীতে পরিবর্তন, খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও সদ্ব্যবহারের উপায় নির্ধারণের জন্য ব্যুরো অব মাইনস্ স্থাপন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শক্তির উৎস নির্ধারণ ও যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যাচার‍্যাল গ্যাস কমিশন স্থাপন, আণবিক শক্তির উৎস বিভিন্ন খনিজের সন্ধানের জন্য এ্যাটমিক মিনারেলস ডিভিশন স্থাপন প্রভৃতি খনিজের প্রতি আমাদের ক্রমবর্ধমান

খনিসংক্রান্ত জীবিকা

গুরুত্ব জ্ঞাপনেরই নির্দেশক। আর ইহার ফলেই খনিকে কেন্দ্র করিয়া ড্রিলার, ম্যাড্ এ্যাটেনড্যাণ্ট, কোর হাউস এ্যাসিসট্যাণ্ট, প্রসেসম্যান, মাইন ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন জাতীয় ইঞ্জিনম্যান, স্ক্রিনিং প্ল্যাণ্ট এ্যাটেনড্যাণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া, বিভিন্ন খনিতে ম্যানেজারাদি দায়িত্বসম্পন্ন পদের জন্য খনির কাজে উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। এই সব কর্মীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ধানবাদের দি ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস এণ্ড এ্যাপ্লাইড জিওলজিকে নূতন করিয়া সুসংগঠিত করা হইয়াছে। ধানবাদেই বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত ন্যাশনাল স্কুল অব মাইনস নামক আরেকটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও কলেজ অব মাইনিং এণ্ড মেটালার্জি নামক প্রতিষ্ঠানে খনিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব শিখাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই ভূতত্ত্ব (Geology) পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

শিল্পসংক্রান্ত জীবিকা

কিন্তু কি বনজ, কি খনিজ কোনো পদার্থই সাধারণত স্বভাবজ অবস্থায় আমাদের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা মিটাইতে পারে না। খাদ্যাদি ছাড়া পাট, শণ প্রভৃতি বহু কৃষিজাত দ্রব্যও অনুরূপভাবে স্বভাবজ অবস্থায় আমাদের কাজে লাগে না। তাই, এই সব দ্রব্যকে নানা যন্ত্রের সাহায্যে, নানা পদ্ধতিতে নিজ চাহিদা অনুসারে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা মানুষকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই করিতে হইয়াছে। এই চেষ্টার ফলেই শিল্পজগতের উদ্ভব। বর্তমানকালে, বড়ো বড়ো যন্ত্রের সাহায্যে বিশাল শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাই রীতি—অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহাই অধিকতর লাভজনক।

আদিম মানুষ প্রাকৃতিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজেদের চাহিদা নিজেরাই মিটাইত। পাথর কাটিয়া হয়তো অস্ত্র প্রস্তুত করিল, গাছের ছাল দিয়া বস্ত্র হইল। শিল্পসৃষ্টির সেই প্রথম উদ্ভব। ধীরে ধীরে শিল্পকার্যে তাহারা দক্ষতা অর্জন করিল। ক্রমে দক্ষ শিল্পীরা দলবদ্ধ হইয়া (Guilds) কারখানা স্থাপন করিয়া যৌথভাবে কাজ করিতে লাগিল এবং ঐ সব শিল্পদ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিতে লাগিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কারখানা লোকবহুল অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করিল, ক্রমশ নূতন নূতন আবিষ্কার হইতে লাগিল এবং শিল্পরচনা নিত্য নূতন রূপ ধারণ করিয়া বর্তমানের বিরাট ও জটিল সর্জন শিল্পে পরিণত হইল। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য

পারিত। হয়তো নিজের অন্তর্নিহিত প্রবণতা অনুসারে পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন করে নাই বলিয়াই পড়াশুনায় তেমন ভালো করিতে পারে নাই—তাই অনার্স না লইয়া পাশ কোর্সে বি. এ. পড়িতে হইয়াছে। অনার্স না থাকার দরুন এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হইতে পারে নাই। এইভাবে পূর্ব হইতে ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা চিন্তা না করার জন্য অনেকের জীবন ব্যর্থ হইতেছে।

এইসব কথা বিবেচনা করিয়া সরকার বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন। বহুমুখী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার জন্য সাত রকমের বিশেষ পাঠ্যতালিকার প্রবর্তন করা হইয়াছে। এইগুলি হইতেছে **সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, চারুকলা, কৃষি** এবং **গার্হস্থ্য বিজ্ঞান**। ইহাদের মধ্যে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা শুধু মেয়েদের স্কুলেই এবং শিল্প-পাঠের ব্যবস্থা শুধু ছেলেদের স্কুলেই রহিয়াছে। এইসব এক এক ধরনের বিশেষ পাঠ্যতালিকার সহিত এক এক ধরনের বৃত্তির সম্পর্ক রহিয়াছে। কোনো কোনো ধরনের বিশেষ পাঠ্যতালিকার সহিত একাধিক ধরনের বৃত্তির সম্পর্ক আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃত্তিগত, শিল্পগত বা তৎসংক্রান্ত কর্মের সহিত শিল্প-পাঠ্যতালিকার, শাসন-সংক্রান্ত বা পরিচালনা-সংক্রান্ত কর্মের সহিত সাহিত্য-পাঠ্যতালিকার, বিক্রয়-সংক্রান্ত কর্মের সহিত বাণিজ্য-পাঠ্যতালিকার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে পাঠ্যকাল হইতেই ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা ভাবিবে এবং নিজ নিজ প্রবণতা, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া, কোন ধরনের বিশেষ পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি সংগ্রহ করা সহজতর হইবে তাহা স্থির করিবে। যাহারা দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়িতেছে, তাহাদের কাছেও যে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার অভাব হইবে তাহা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। তাহারা বিদ্যালয়ে পাঠকালে শুধু স্থির করিবে যে, বিজ্ঞান-সংক্রান্ত জীবিকা গ্রহণ করিলে তাহাদের পক্ষে ভালো হইবে, না অন্য কোনোরূপ জীবিকা গ্রহণ করার কথা তাহাদের চিন্তা করা উচিত। বিজ্ঞান-সংক্রান্ত জীবিকা গ্রহণ করিতে হইলে, গণিতকে তাহাদিগকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে পাঠ করিতে হইবে। প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশের পর, দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিভিন্ন ধরনের

বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যতালিকা এবং বৃত্তির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ

জীবিকার প্রস্তুতি হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বিষয়পাঠের সুযোগ পাইবে।

বর্তমানে কোন ধরনের পাঠ্যতালিকা এবং ভবিষ্যতে কোন ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করিলে সুবিধা হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিবেচনা করিতে হয়ঃ

পাঠ্যতালিকা এবং বৃত্তিনির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

১। নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা—সকল মানুষ সমপরিমাণ বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। আবার সকল ধরনের জীবিকায় সমপরিমাণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। আবার দুইটি ছাত্রের বুদ্ধির পরিমাণ হয়তো সমান, কিন্তু এক এক বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদের বুদ্ধির কার্যকারিতা কম বা বেশী। একটি ছাত্রের হয়তো গাণিতিক বিষয়পাঠে বুদ্ধি খোলে বেশী, আবার অপরের হয়তো সাহিত্যিক বিষয়পাঠে অধিকতর দক্ষতা প্রকাশ পায়। আমরা নিজেরা আবার নিজেদের বুদ্ধির পরিমাণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারি না। তাহার জন্য প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার। নিজেদের উপর মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারা আমাদের নিজেদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিয়া লইতে হইবে। পাঠ্যতালিকা নির্বাচনে যদি আমরা নিজেদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে যাই, তাহা হইলে কার্যক্ষেত্রে বিফলতার গ্লানি বহন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

২। নিজেদের আগ্রহ—মানুষের ভালো লাগা মন্দ লাগা বলিয়াও একটা কথা আছে। কাহারো সাহিত্য পড়িতে ভালো লাগে, আবার কাহারো বা অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্তি। সাধারণত ক্ষমতা এবং আগ্রহ একই পথে চলে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের দরুন সবসময় ইহারা একই পথে চলিতে নাও পারে। ধর, কোনো ছেলের বুদ্ধি সাহিত্য অপেক্ষা গাণিতিক বিষয়ে খোলে বেশী। কিন্তু অঙ্কের শিক্ষক ভালো না থাকার দরুন এবং সাহিত্যের শিক্ষক ভালো হওয়ার ফলে, সাহিত্যে তাহার অধিকতর আগ্রহ জন্মিয়াছে। আগ্রহ ছাড়া কোনো কার্যে সফলতা অর্জন করা যায় না। কাজেই ভবিষ্যৎ পাঠ্যতালিকা বা বৃত্তিনির্বাচনে আগ্রহের কথা সবসময় বিবেচনা করিতে হয়।

৩। বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ—ক্ষমতা ও আগ্রহের তারতম্য এবং আরও নানাকারণে সকলের সকল বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান সমান হয় না। অপরদিকে আবার কোনো বিশেষ পাঠ্যতালিকা অনুসরণে বা বিশেষ বৃত্তিগ্রহণে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানের

আমাদের খনিজ দ্রব্যাদি

উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থের মতো আমাদের চাহিদার আর এক জোগানদার হইতেছে খনিজ দ্রব্যাদি। খনিজ শব্দের মৌলিক অর্থ যাহা খনি বা মাটির নিচে হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু খনিজ মাত্রকেই যে মাটির নিচে হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয় এমন নহে, অনেক সময় ভূপৃষ্ঠের উপরও খনিজ পাওয়া গিয়া থাকে, যথা, মাটি ও জল। ইহারাও বিশেষ অর্থে খনিজ বলিয়া গণ্য। মোটকথা, স্বভাবজাত অজৈব পদার্থমাত্রকেই (তাহাদের মাটির নিচে বা উপরে যেখানেই পাওয়া যাক না কেন) আমরা খনিজ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। কাঠ বা হাড় যথাক্রমে উদ্ভিজ্জাত বা জীবদেহসম্ভূত বলিয়া জৈব পদার্থ। সেইকারণেই ইহারা খনিজ পদার্থ বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু কোনো উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থ যদি প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে খনিজের মধ্যে গণ্য করা হয়। যথা, কাঠ হইতেই বহু বছরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্ট পাথুরে কয়লা, বা হাড় হইতে সৃষ্ট খড়ি খনিজ পদার্থ। ভূবিজ্ঞানীরা অনুমান করিয়া থাকেন, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতির মূল বস্তু পেট্রোলিয়ামও কোনো জৈব পদার্থেরই রাসায়নিক রূপ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে খনিজের আর একটি অর্থ আছে। স্বভাবজাত যেসব অজৈব বস্তুর রাসায়নিক উপাদান ও গঠন সুনিয়ত, এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াবশে বা অবস্থা বিশেষে কেলাসিত (crystallised), অর্থাৎ মিছরির দানার মতো জ্যামিতিক আকার ধারণ করে, তাহাদিগকেও খনিজ বলা হয়। যথা, স্ফটিক, অভ্র, খনিজ লবণ প্রভৃতি।

ভারতের ভূপ্রকৃতি ও গঠন

আমাদের ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকার খনিজবস্তু পাওয়া যায়। কোথায় কি অবস্থায় খনিজ পাওয়া যায় তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে ভারতবর্ষের ভূমির উৎপত্তি, প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার। কারণ ভূপ্রকৃতির গঠনের সহিত খনিজদ্রব্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতি পুরাকালে হিমালয়ের কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না। উত্তর ভারতসহ তিব্বত, ব্রহ্মদেশ এবং চীনের এক

বিরাট অংশ ছিল এক বিশাল সমুদ্রে নিমগ্ন। তাহারা এই সমুদ্রের নাম দিয়াছেন টেথিস (Tethys)। কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত তখনও ছিল। আর ছিল দক্ষিণ ভারত, আরব সাগর, আফ্রিকা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া লইয়া গঠিত এক বিরাট মহাদেশ, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড (Gondwanaland)। পরবর্তীকালে, একদিকে যেমন কালক্রমে এই মহাদেশের বহু অংশ জলমগ্ন হওয়ার ফলে দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আলাদা হইয়া পড়ে, তেমনি অন্যদিকে সাইবেরিয়া অঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতের ভূমি ভূ-আন্দোলনের ফলে অতি ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে আগাইয়া যাইবার ফলে ঐ চাপে মধ্যবর্তী টেথিস সমুদ্রের তলদেশও ঠেলিয়া উঁচু হইয়া ওঠে, এবং বর্তমান সুবিশাল হিমালয় পর্বত-মালার ও তিব্বতের মালভূমি অঞ্চলের সৃষ্টি করে। আরও পরবর্তীকালে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বহু নদী নির্গত হইয়া যখন নিচে নামিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাদের স্রোতের বেগে ভাঙ্গিয়া বা ক্ষয় হইয়া যে পাথরের টুকরা, বালি, মাটি প্রভৃতি উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে, তাহাই ক্রমশ স্তরে স্তরে থিতাইয়া কালক্রমে উঁচু হইয়া উত্তর ভারতের সমভূমি তৈরী করিয়াছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা আরও বলিয়া থাকেন, হিমালয়ের শিলাদেহের প্রধান উপাদান মারবেলজাতীয়—সাগরতলের স্তরীভূত প্রাণীকঙ্কাল হইতে উৎপন্ন চুনাপাথরের পরিবর্তিত রূপ। উত্তরা-পথের বেশীর ভাগই পাললিক অথবা রূপান্তরিত শিলা। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশই ব্যাসল্টজাতীয় শিলা বা তাহার রূপান্তর। পুরাকালে বারে বারে অগ্ন্যুদ্গারণের ফলে নির্গত লাভা নামক পদার্থ ইহার মূল উপাদান।

ভারতে খনিজ পদার্থের অবস্থান

এই কারণেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ খনিজ সম্পদেরই আকর স্থান দাক্ষিণাত্যের এই প্রাচীনতম অংশ বা তৎসংলগ্ন অঞ্চল। বস্তুত, ভারতবর্ষে যত খনিজ পাওয়া যায় তাহার শতকরা ৪০ ভাগই আসে বিহার হইতে। বিহারের পূর্বভাগ ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম ভাগ কয়লার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন স্থান। এই অঞ্চলে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মিলনস্থানে লোহাপাথরেরও বিপুল ভাণ্ডার। তাছাড়া, এই অঞ্চল অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ,

ফোরম্যান, ইয়ার্ড সুপারভাইজার, গার্ড, ব্রেকস্‌ম্যান, কেবিনম্যান, সিগন্যাল-ম্যান, পয়েন্টসম্যান্, পাইলট, জমাদার, লোকো ইনস্পেক্টর, শেড ফোরম্যান, ড্রাইভার, শান্টার, ফায়ারম্যান, ওয়ে ইন্সপেক্টর, ট্রেন এক্‌জামিনার, টেপার, চেকার প্রভৃতি অন্তত চল্লিশ প্রকারের কর্মীর প্রয়োজন শুধু রেল চলাচলকে চালু রাখার জন্যই। রেল তৈরীর কারখানায় তো আরও বিচিত্র রকমের সুদক্ষ কারিগরের দরকার। রেলের মত জাহাজেও (বিশেষ করিয়া সমুদ্রগামী) বিভিন্ন ধরনের কর্মী দরকার। উড়োজাহাজের জন্যও আমাদের কর্মীর প্রয়োজন নিতান্ত কম নহে। পরিবহণের এই দুই মাধ্যমই আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নূতন চালু হইয়াছে বলিয়া, ইহাদের জন্য দক্ষ কর্মীর অভাব অধিক অনুভূত হইতেছে। পরিবহণ কর্মীদের শিক্ষার জন্য নানা স্থানে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা তাহাদের নিজেদের কর্মীদের শিক্ষা দিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা নিজস্ব আলাদা আলাদা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছে।

সেবামূলক জীবিকা

ভোগ্যদ্রব্য ছাড়াও আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ, শাসন, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি সংক্রান্ত বহুবিধ সেবারও (services) চাহিদা রহিয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন আমাদের দেশে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষার সকল স্তরেই আজকাল চেষ্টা করিয়াও যোগ্য শিক্ষক সংগ্রহ করা যাইতেছে না। শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করার নিমিত্ত সরকার নানাধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। সর্বস্তরের শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৮৫টির উপর দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমানের জটিল সমাজ-জীবনে স্বাস্থ্যরক্ষাও এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই যাহারা জীবিকা হিসাবে ডাক্তারী গ্রহণ করিবে, তাহাদের জন্য বহুস্বীকৃত (recognised) এ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী এবং আয়ুর্বেদীয় কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। হাসপাতালের সেবার জন্য নার্স এর প্রয়োজন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের শিক্ষার জন্যও অনেক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এ ছাড়া, সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগেও সেনিটারী ইনস্‌পেক্টার, ভেক্‌সিনেটর, হেল্‌থ্‌ ভিজিটর প্রভৃতি বহু জীবিকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও বহু বিচিত্র

রূপ ধারণ করিয়াছে। ফলে, সেই দিকেও জীবিকা সংস্থানের প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। অভিনেতা বা অভিনেত্রী হওয়া কিছুদিন আগেও সমাজের চোখে হেয় বৃত্তি ছিল। কিন্তু আজ সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গিয়াছে। বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী অভিনয়কেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে নৃত্য, গীত এবং অভিনয়ের শিক্ষাদানের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার অভিনয়, নৃত্য, গীত ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া কি মঞ্চে কি সিনেমা জগতে শব্দযন্ত্রী, আলো নির্দেশক, ফটোগ্রাফার প্রভৃতি বহুবিধ যান্ত্রিক কুশলীর প্রয়োজনও দেখা দিয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বা দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বজায় রাখার কাজেও সরকারের বহু যোগ্য লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সেই প্রয়োজনই বিভিন্ন স্তরের বিচারপতি হইতে শুরু করিয়া করণিক পর্যন্ত, বা সৈন্যবিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী বা আকাশবাহিনীর সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত বা উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার হইতে শুরু করিয়া সাধারণ আরক্ষক পর্যন্ত হাজারো রকমের জীবিকার দ্বার আমাদের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের বিদ্যালয় এবং ভবিষ্যৎ জীবিকার জন্য প্রস্তুতি

ভবিষ্যৎ জীবিকার কথা বিদ্যালয়-জীবন হইতেই ভাবিতে আরম্ভ করিতে হয়। লেখাপড়ার শেষে জীবিকার কথা ভাবিলে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। ধর, একজন ছাত্র সাধারণভাবে বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। তারপর জীবিকার সন্ধান করিতে গিয়া সে দেখিল যে এক কেরাণীগিরি ছাড়া আর কোন জীবিকার সে যোগ্য নয়। আবার কেরাণীগিরির জন্য শূন্য চাকুরীর তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। কেরাণীগিরি যে খুব ভালো চাকুরী এবং তাই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এমন নহে। সেই ছাত্রটিরই মতো, আরও অনেকে পাঠ্যজীবনে ভবিষ্যৎ জীবিকার কথা না ভাবিয়া নিতান্ত গড্ডালিকার প্রবাহে বি. এ. পাশ করিয়া কেরাণীগিরির প্রার্থী হিসাবে নাম লিখাইয়াছে। অথচ এই ছেলেদের মধ্যে অনেকেই হয়তো দক্ষ শিল্পী, দক্ষ কারিগর, বিচক্ষণ চিকিৎসক, বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি কতো কি হইতে

ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা না ভাবিলে পরে বিপদে পড়িতে হয়

প্রয়োজন হয়। ধর, গাণিতিক জ্ঞান খুব বেশী না থাকিলে, কেহ বিজ্ঞান-পাঠে কৃতকার্য হইতে পারে না। কাজেই নিজের অর্জিত জ্ঞানের কথা বিবেচনা না করিয়া বিশেষ পাঠ্যতালিকা নির্বাচন করিলে ভবিষ্যতে বিফলকাম হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

৪। সামাজিক পরিস্থিতি—কোনো কোনো বিষয়পাঠের জন্য আমাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে, আবার কোনোটিতে পাঠের ব্যবস্থা হয়তো তেমন ভালো নাই। তারপর কোনো বৃত্তিতে হয়তো কর্মের চাইতে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী। আবার কোনো কোনো বৃত্তি আছে যাহার জন্য কর্ম-প্রার্থীর সংখ্যা অল্প। বৃত্তির জন্য যেসব গুণ প্রয়োজন তাহা খুব কম লোকের মধ্যেই আছে। তারপর, আমাদের দেশে সকল ছাত্রের আর্থিক অবস্থাও সমান নহে। কাহারও হয়তো পরিবার হইতে দূরে থাকিয়া পড়াশুনার সঙ্গতি নাই। কাহারও বা পিতা-মাতা স্কুল ফাইন্যালের পর দীর্ঘদিন ছেলের পড়াশুনার ব্যয়-নির্বাহ করিতে সক্ষম হন না। এত সব কথা ভাবিয়া বিশেষ পাঠ্য-বিষয় বা ভবিষ্যতের বৃত্তি স্থির করিতে হয়।

বিশেষ পাঠ্যতালিকা নির্বাচনে এবং বৃত্তি নির্বাচনে আমাদের ছাত্রেরা যাহাতে উপযুক্ত পরামর্শ পায় তাহার চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব সংস্থা (ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ) করিতেছেন। এই সংস্থা ছাত্রদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং আগ্রহ জানিবার জন্য অভীক্ষা প্রস্তুত করিয়াছেন। কোথায় কোন কোন ধরনের বৃত্তির জন্য বিশেষ প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে পাঠের ব্যবস্থা আছে, সে সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সংস্থা হইতে বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষকেরা (Career Masters) বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতেছেন।

অনুশীলন

(আমাদের জীবিকা)

(ক) ১। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কি কি ধরনের কর্মসংস্থান হইতে পারে সে সম্বন্ধে রচনা লেখ—(ক) কৃষি, (খ) পশুপালন ও আনুষঙ্গিক কর্ম, (গ) অরণ্য, (ঘ) খনি, (ঙ) শিল্প, (চ) যানবাহন।

২। কোন বিশেষ ধরনের জীবিকার প্রস্তুতি হিসাবে, কোন বিশেষ ধরনের পাঠ্যসূচী নির্বাচনের পূর্বে কি কি বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়, সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ।

(খ) স্ক্র্যাপ বইএর জন্য—যে সব বৃত্তি তোমার ভাল লাগে, সেগুলি সম্বন্ধে যত তথ্য সংগ্রহ করিতে পার, তাহা সংগ্রহ কর।

আমাদের কৃষি

খাদ্যের চাহিদা মিটাইবার অন্যতম উপায় হিসাবে কৃষিকার্যের প্রচলন আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতেই ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় যে সকল পুরা-নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেও সেখানে উন্নত কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল। বস্তুত, সেখানে যেসব জাতীয় গম বা যব উৎপন্ন করা হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আশ্চর্যের বিষয়, আজিও পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে সেইসব জাতীয় গম ও যবই উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। বৈদিক সাহিত্যে পশুপালন, ভূ-কর্ষণ, শস্যপর্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষিপদ্ধতির বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে। পরবর্তী-কালের জাতক, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রাচীন ভারতের উন্নত কৃষি-প্রণালীর অজস্র প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে কৃষি

আমাদের দেশের মতো নদীনালাবিধৌত পলিপ্রধান মাটির দেশে অবশ্য ইহাই স্বাভাবিক। আজিও কৃষিকার্যই আমাদের দেশের দশ কোটি লোকের প্রধান জীবিকা। আমাদের জাতীয় আয়েরও প্রায় অর্ধেকের উৎস কৃষি। তাছাড়া কৃষিজ-দ্রব্য হইতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আয়ও কম নহে। শর্করা, পাট প্রভৃতি আমাদের কয়েকটি বড়ো বড়ো শিল্প কাঁচা মালের জন্য একান্তভাবে কৃষির উপরই নির্ভরশীল। আমাদের দেশ দরিদ্র। বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করা আমাদের পক্ষে কঠিন। আবার, আমাদের লোকসংখ্যাও প্রচুর। তাই প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন করিয়া স্বাবলম্বী হইতে না পারিলে আমাদের উপায় নাই।

ভারতে কৃষিকার্যের গুরুত্ব

কৃষিকার্যের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব

মাটির প্রকৃতি এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং সময়ের উপর কৃষিকার্য নির্ভর করে। ভারতে চারি প্রকারের মাটি দেখা যায় :—

১। পলিমাটি (Alluvial soil) : ধান, গম, পাট প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত। উত্তর প্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, গুজরাট, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকা (আসামে), প্রধানত পলিমাটি অঞ্চল।

২। কৃষ্ণমাটি (Black soil): কার্পাস, জোয়ার, তিসি প্রভৃতি চাষের বিশেষ উপযোগী। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর কোন কোন জায়গা কৃষ্ণমাটি অঞ্চল। ইহা চাষের খুব উপযোগী বলিয়া, ইহাকে Black cotton soil বলে।

৩। লোহিত মৃত্তিকা (Red soil): প্রচুর জল সেচন ব্যতীত এই ধরনের মাটিতে কিছুই জন্মায় না। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশ, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার), ঝাঁসি ও মির্জাপুর জেলা (উত্তর প্রদেশ), বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলা (পশ্চিমবঙ্গ), রাজস্থানের কোন কোন জায়গা এবং আরাবল্লী লোহিত মৃত্তিকা অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

৪। মাকৃড়া মাটি (Laterite): প্রচুর পরিমাণে সার ও জল সেচ ছাড়া এই মাটিতে কিছু জন্মায় না। দক্ষিণ ভারতে এবং আসামের চা বাগান অঞ্চলে এই মাটি পাওয়া যায়।

মাটি ছাড়া, বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের পরিমাণের উপরও কৃষিকার্য নির্ভর করে। ভারতের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাদের উপর কোন জায়গায় কোন ফসল ভাল হইবে এবং কি পদ্ধতিতে চাষ করা হইবে, তাহা নির্ভর করে। আমাদের দেশে দুইটি প্রধান শস্য-ঋতু রহিয়াছে—রবি ও খারিফ। বৃষ্টিপাতের ও উত্তাপের সহিত ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। খারিফ শস্যের জন্য প্রচুর জলের দরকার। সেই কারণে বর্ষার সময়ে খারিফ শস্যের চাষ হয় এবং কার্তিক—অগ্রহায়ণ মাসে শস্য কাটা হয়। রবিশস্যের জন্য কমঃজলের দরকার। সেইজন্য বর্ষার শেষে রবিশস্যের চাষ হয় এবং শীতের শেষে শস্য সংগ্রহ করা হয়। আমাদের দেশের প্রধান খারিফ শস্যগুলি হইতেছে ধান, পাট, ভুট্টা, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি। প্রধান রবিশস্যগুলি হইতেছে, গম, বার্লি, তিল, সরিষা।

রবি ও খারিফ শস্য

চাষের প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

মোটামুটি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ অনুযায়ী কৃষিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—আর্দ্র-চাষ, সেচন-চাষ এবং শুষ্ক-চাষ। যেখানে বৃষ্টিপাত প্রচুর, জমি জলে ডুবিয়া

কৃষির শ্রেণীভেদ

যায়, সেখানকার চাষকে আর্দ্র-চাষ বলে। মালাবারে, পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশে এবং নিম্নবঙ্গে এইজাতীয় চাষ হয়। আবার এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে অন্য সময় জল হইলেও চাষের সময় উপযুক্ত পরিমাণে হয়তো জল পাওয়া যায় না। এইসব জায়গায় জলসেচন দ্বারা যে কৃষিকার্য হয় তাহাকে বলা হয় সেচন-চাষ। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই সেচন-চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু বৃষ্টি যেখানে স্বল্প, জলসেচের সুবিধাও নাই, সেখানেও অন্য উপায়ে কৃষিকার্য সম্ভব। এইসব জায়গায় যেটুকু জল পাওয়া যায় তাহারই পূর্ণ সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মাটিকে খুব গভীরভাবে কর্ষণ করা হয়, পরে মাটিতে বীজ ছড়াইয়া ঐ মাটি উল্টাইয়া বীজ ঢাকা দিয়া উপরের মাটিকে খুব ভালোভাবে গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে বৃষ্টির জল সহজেই ভিতরে যাইতে পারে। তাহার পর বীজ হইতে চারা বাহির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। কোনোদিন বৃষ্টি হইলেই মই (harrow) দিয়া মাটি উল্টাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে জল মাটি চাপা থাকে। ইহাকে বলা হয় শুষ্ক-চাষ। দাক্ষিণাত্যে বা পশ্চিমের কোনো কোনো অঞ্চলে ঐজাতীয় শুষ্ক-চাষের প্রচলন রহিয়াছে।

কৃষির জন্য জলসেচ ব্যবস্থা

তোমরা জান, এদেশের প্রায় সর্বত্র কৃষির উপযোগী উত্তাপ পাওয়া গেলেও, একমাত্র মালাবার উপকূল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কিয়দংশ ব্যতীত অন্যত্র গ্রীষ্মকালে কৃষির পক্ষে উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য বৃষ্টিপাত হয় না। এদেশের বৃষ্টিপাতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের চরম পার্থক্য এবং বিভিন্ন বৎসরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের বৈষম্য। আসামে বৎসরে যেখানে গড়ে বৃষ্টিপাত হয় ১০০" উপর সেখানে রাজস্থানে বৃষ্টির পরিমাণ মাত্র ৩"। তারপর, ভারতবর্ষে প্রায় ৯০ ভাগ বৃষ্টি হয় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে, আর মাত্র ১০ ভাগ বৃষ্টি হয় বৎসরের অন্যান্য সময়ে। ফলে বৎসরের সকল সময়ে কৃষি উপযোগী বৃষ্টির জল পাওয়া যায় না। কাজেই, এদেশের অধিকাংশ স্থানেই কৃষির জন্য কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের প্রয়োজন বহুকাল হইতেই অনুভূত হইয়া আসিতেছে। এদেশে বিভিন্ন স্থানের ভূপ্রকৃতি এবং জল পাইবার উপায়ের পার্থক্যহেতু সুপ্রাচীনকাল হইতেই কূপ, জলাশয়, খাল প্রভৃতির সাহায্যে এই প্রয়োজন

মেটানো হইয়া আসিতেছে। যদিও এখনও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতেই সেচব্যবস্থা সব চাইতে বেশী, তবু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা সামান্য। এখনও ভারতের মোট আবাদী জমির মাত্র ৩৫% জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা আছে। সেচপ্রাপ্ত জমির সিকি ভাগ উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। অর্থাৎ সেচব্যবস্থায় জমির পরিমাণ বিবেচনায় ঐ রাজ্য প্রথম; তারপর ক্রমে ক্রমে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর স্থান। সরকার সেচব্যবস্থা বৃদ্ধি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৬৬ সালে ৭ কোটি একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল (১৯৬১ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি একর) এবং ১৯৬৯ সালে ইহার পরিমাণ ১০ কোটি একর ছিল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ঐরূপ সেচব্যবস্থা বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে।

দেশের কোন রাজ্যে জলসেচ ব্যবস্থা কতখানি উন্নত তাহার একটি তালিকা নিচে দেওয়া গেল :—

রাজ্য	আবাদী জমি (লক্ষ একর)	তার কত অংশে জলসেচ ব্যবস্থা আছে
পাঞ্জাব ও হরিয়ানা	২০২	৪১%
তামিলনাড়ুর (মাদ্রাজ)	১৬৮	৪০%
জম্বু ও কাশ্মীর	১৮	৩৮%
অন্ধ্র	২৯৮	২৯%
উত্তর প্রদেশ	৫০৬	২৭%
আসাম	৫৯	২৩%
কেরালা	৫২	২০%
পশ্চিমবঙ্গ	১৫০	১৯%
বিহার	২৫০	১৭%
উড়িষ্যা	১৫১	৪১%
রাজস্থান	২৮১	১২%
মহীশূর	২৫৩	৭%
মহারাষ্ট্র ও গুজরাট	৬৮৭	৬%
মধ্যপ্রদেশ	৪২৫	৫%

এদেশে প্রাচীনকাল হইতেই গভীর ইঁদারা বা কাঁচা কূপ অথবা বাঁধানো কূপের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। কূপ হইতে প্রধানত দণ্ডযন্ত্র, গোবাহিত যন্ত্র ও পারসিক চক্রের সহায়তায় জলসেচন হইয়া থাকে। একটি খুঁটির উপরে একদিকে দড়িসহ বালতি ও অপর দিকে একখণ্ড ভারী পাথরযুক্ত একটি দণ্ড বসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। দড়ি টানিয়া বালতি সহজেই যেমন জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তেমনি অন্য প্রান্তের ভারের ফলে জলসহ বালতিও

কূপ
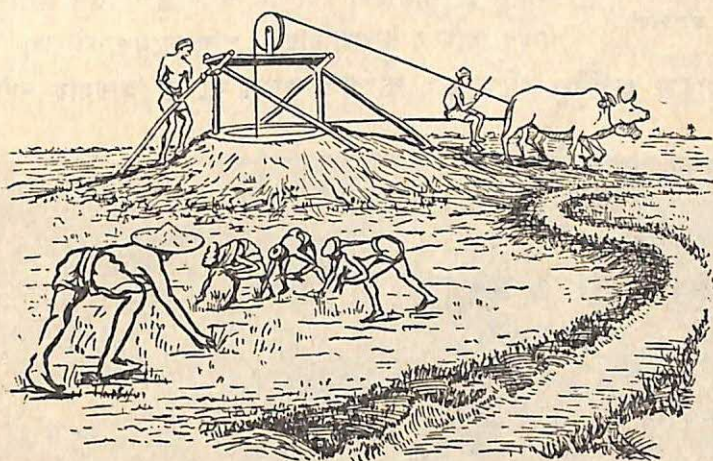
সহজেই উপরে উঠিয়া আসে। গোবাহিত যন্ত্রে একখণ্ড দড়ির একপ্রান্তে বাঁধা থাকে বালতি আর অন্য প্রান্ত একটি কাঠের চাকার উপর দিয়া একজোড়া গোরু বা মহিষের জোয়ালের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কূপের একপাশে কতকটা জমি ঢালু থাকে। ঐ ঢাল বাহিয়া গোরু উপরে উঠিতে থাকিলে বালতি স্বভাবতই নিচে জলে নামিয়া যায়, আবার গোরু নিচে নামিতে থাকিলে জলভরা বালতি উপরে উঠিয়া আসে। তখন ঐ জল মাঠে ঢালিয়া দেওয়া হয়। উত্তর প্রদেশে এইজাতীয় যন্ত্রকে "চরষা" বলা হইয়া থাকে। পারসিক চক্র নানা প্রকারের হইয়া থাকে। তবে সাধারণত এই প্রকার চাকার গায়ে একটি শিকল এমনভাবে জড়ানো থাকে যে তাহার কিয়দংশ সবসময়ই কূপের জলের মধ্যে ঝুলিতে থাকে। শিকলটিতে অনেকগুলি বালতি লাগানো থাকে। গবাদি পশুর সাহায্যে ঐ চাকা ঘুরাইয়া বালতিগুলিতে ক্রমাগত জল তুলিয়া ক্ষেতে দেওয়া হইয়া থাকে।

জলপথে ভ্রমণ, বন্যা নিবারণ, মৎস্যের চাষের উন্নতিবিধান, ম্যালেরিয়া নিবারণ, বন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রভৃতিও সম্ভব হইবে। এইরূপ পরিকল্পনার দ্বারা একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলিয়া ইহাকে "বহুমুখী পরিকল্পনা" বলে। ইহার ফলে ভারতবর্ষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভবপর হইবে। উদাহরণস্বরূপ নিচে কয়েকটি প্রধান বহুমুখী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

দামোদর পরিকল্পনা

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদীতে বৎসরে বৎসরে বন্যা লাগিয়াই থাকিত। ইহার কারণ, দামোদর নদ তাহার মধ্য ও নিম্নগতিতে বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও, ঊর্ধ্বগতিতে বিহারের পালামৌ, হাজারীবাগ ও মানভূম জেলার মালভূমি অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত, এবং সেখানে তাহার স্রোতও প্রখর। ফলে, ঐ মালভূমির মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া খরস্রোতা দামোদর কর্তৃক বাহিত হইয়া যখন বর্ধমান জেলার সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ
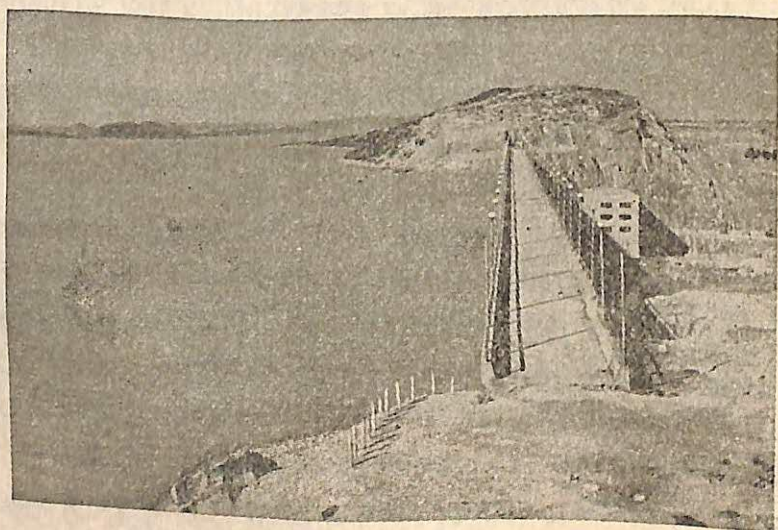
দামোদরের তিলাইয়া বাঁধ

করে তখন সেখানে স্রোতের বেগ কম বলিয়া ঐ মাটি নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়। এইভাবে ক্রমশ নদীর তলদেশ উঁচু হইয়া ওঠার ফলে এবং নদীর মোহানা সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ার ফলে দামোদরের অববাহিকায় অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলেই সেই অতিরিক্ত জল সহজেই বাহির হইয়া সমুদ্রে যাইয়া পড়িতে পারিত না।

ইহারই ফলে দামোদরে বৎসরে বৎসরে বন্যা দেখা দিত, বিহার ও বাংলার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ঘরবাড়ী ভাসিয়া যাইত, কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইত। ইহার প্রতিরোধকল্পে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (Damodar Valley Corporation বা সংক্ষেপে D. V. C.) নামক প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই অনুযায়ী ঐ নদীর প্রথমাংশে ছোটনাগপুর মালভূমির উপর ক্রমান্বয়ে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড় এই চারি জায়গায় চারিটি বাঁধ দিয়া জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোনার ছাড়া অন্য তিন জায়গায়ই ১,০৪,০০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (Hydel Power House) স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বোকারো ও দুর্গাপুরে একটি করিয়া তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র (Thermal Station) স্থাপিত হইয়াছে। তাছাড়া, দুর্গাপুরে একটি ৩৮ ফিট উঁচু ও ২,২৭১ ফিট লম্বা জাঙ্গাল (barrage) নির্মিত হইয়াছে। ফলে, একদিকে যেমন কলিকাতা, জামসেদপুর বা অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের মধ্য দিয়া শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তেমনি স্রোতের জল নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বন্যার আশঙ্কাও দূর হইয়াছে। দুর্গাপুরের জাঙ্গাল হইতে প্রায় ১৫৫০ মাইল লম্বা খালে প্রায় নয় লক্ষ একর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনুমান করা যাইতেছে, ইহার ফলে প্রায় ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন শস্য বেশী উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে। ইহা ছাড়াও, মৎস্যের চাষ, দুর্গাপুর হইতে নৌপথে কলিকাতা আগমনের ব্যবস্থা, নূতন বনসৃষ্টির মাধ্যমে ভূক্ষয় নিবারণ প্রভৃতিও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত।

দামোদরের মতো ময়ূরাক্ষীরও তলদেশ এত উঁচু হইয়া পড়িয়াছিল যে ইহারও তীরে ক্রমশই বন্যা এবং তাহার ফলে শস্যহানি লাগিয়াই ছিল। এই

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

অসুবিধা দূর করার জন্য যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা গৃহীত হয় সেই অনুযায়ী বিহারে মাসাঞ্জোর গ্রামে একটি ৬৬২ মিটার লম্বা ও ৩২ মিটার উঁচু বাঁধ নির্মাণ করিয়া একটি জলাধার তৈরী করা হইয়াছে। এখান হইতে জলসেচন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন দুইই করা হইয়া থাকে। আবার মাসাঞ্জোরের ২০ মাইল নিচে তিলাপাড়া নামক স্থানে একটি জাঙ্গাল এবং বক্রেশ্বর ও দ্বারকায় অপর দুইটি জাঙ্গালও নির্মিত হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন বিহারে ৩৫ হাজার একর ও

পশ্চিমবঙ্গে ৭.২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা গিয়াছে, তেমনি মোট প্রায় চার হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাঞ্জাবে কয়লা বা পেট্রোল না থাকায় সেখানে কোনো শিল্পসৃষ্টি বহুদিন পর্যন্ত সম্ভব হইতেছিল না। ইহারই প্রতিকারকল্পে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলায় যে ভাখরা-নাঙ্গল পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইয়াছে, তাহাই ভারতের বৃহত্তম বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শতদ্রু নদীর উপরে ভাখরা নামক স্থানে প্রায় ২২৬ মিটার উঁচু বাঁধ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পাদদেশে দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহার আট মাইল নিচে নাঙ্গল নামক স্থানে ইতিমধ্যেই শতদ্রু নদীর উপর একটি অপসারণ জাঙ্গাল

ভাখরা-নাঙ্গল পরিকল্পনা

বাঁধিয়া নদীটিকে ৪০ মাইল দীর্ঘ নাঙ্গল জলবিদ্যুৎ-প্রজনন খালে (Hydel chanel) প্রবেশ করানো হইয়াছে, এবং এই খালের উপর গাঙ্গুয়াল ও কোটলাতে দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদক-কেন্দ্রও স্থাপন করা হইয়াছে। নাঙ্গল খালের শেষে রুপারের জলসেচ খাল শুরু হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ৬৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের এবং প্রায় ৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। এই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে পাঞ্জাবের শিল্পসম্প্রসারণ সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

অন্যান্য পরিকল্পনা

অন্যান্য যেসব বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইয়াছে বা সম্পূর্ণ হওয়ার পথে আগাইয়া চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে উড়িষ্যার মহানদী পরিকল্পনা, বিহারের কুশী পরিকল্পনা, অন্ধ্র ও মহীশূরের তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা, অন্ধ্র ও উড়িষ্যার মাচকুন্দ পরিকল্পনা, মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানের চম্বল পরিকল্পনা, মহীশূরের ভদ্রাবতী পরিকল্পনা, মহারাষ্ট্রের তাপ্তী পরিকল্পনা, কয়না পরিকল্পনা, গুজরাটের মাহী পরিকল্পনা, তামিলনাড়ুর কৃষ্ণা-পেন্নার পরিকল্পনা, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মধ্য প্রদেশের রিহান্দ পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য

তোমার জান, আমাদের দেশে যেসব কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার সবই খাদ্যশস্য নহে। ইহাদের মধ্যে ধান, গম প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, আর পাট, শন প্রভৃতি বাণিজ্যিক বা অর্থপ্রসূ ফসল ব্যবহৃত হয় নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরীর কাজে। এতদ্ব্যতীত চা, কফি প্রভৃতি এক-ফসলী আবাদী শস্যও (Plantation crops) আমাদের দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

খাদ্যশস্য

এদেশের বিভিন্ন অংশে যেসব খাদ্যশস্য জন্মায় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত শস্যাদি উল্লেখযেগ্যে—

(১) **ধান**—ধান আমাদের দেশের সর্বপ্রধান কৃষিজ দ্রব্য ও খাদ্যশস্য। এদেশের শতকরা ৩০ ভাগ আবাদী জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। পলিমাটি, উষ্ণ জলবায়ু ও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইলে ধানের ফলন ভাল

হয়। ধান্য উৎপাদক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির স্থান নিম্নরূপ— তামিলনাড়ু, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা,

আসাম ও মহারাষ্ট্র। কিন্তু ভারতে ধান বেশী উৎপন্ন হইলেও এখানে জমি প্রতি ফলন বেশী নহে। নানারূপ চেষ্টার ফলে ভারতে জমি প্রতি ধানের

ফলন এবং ধান চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রতিবৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে ধান হইতে চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন; ১৯৬৮-৬৯ সালে তাহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

(২) **গম**—খাদ্যশস্য হিসাবে ধানের পরেই গমের স্থান। মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের ইহাই প্রধান খাদ্যশস্য। ধানের মতো পলিমাটিতেই গমের ফসল ভাল হয়; কিন্তু উহার জন্য ধানের মত উষ্ণ জলবায়ু ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না। ইহা শীতকালীন শস্য। এদেশের আবাদী জমির প্রায় শতকরা ১২ ভাগে গমের চাষ হয়। ভারতে মোট যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই আসে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশ হইতে। বাকী গম উৎপন্ন হয় গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহার প্রমুখ রাজ্যে।

আমাদের দেশে গমের চাষও প্রতিবৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। যেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে গমের উৎপাদন ছিল ৮৭ লক্ষ মেট্রিক টনের মতো, ১৯৬৮-৬৯ সালে তাহা বাড়িয়া ১ কোটি ৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন হইয়াছে।

(৩) **যব** (Barley)—গমভোজীদের অপর একটি প্রিয় খাদ্যশস্য। এদেশের আবাদী জমির মাত্র শতকরা তিন ভাগ অঞ্চলে প্রায় ২৪ লক্ষ টন যবের চাষ হয়। অবশ্য ইহার বেশীর ভাগই জন্মে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে।

(৪) **রাগি, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি** (Millets)—দাক্ষিণাত্যের দরিদ্র কৃষিজীবীদের প্রধান খাদ্যশস্য। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কাঁকরযুক্ত শুষ্ক জমিতে জলসেচ ভিন্নই ইহা জন্মে। এইজাতীয় অপর একটি শস্য, ভুট্টা, উত্তর ভারতের বহু লোকের প্রিয় খাদ্যশস্য। যদিও ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ভুট্টা জন্মায়, উত্তর প্রদেশ ও বিহারেই ইহার চাষ বেশী হয়।

১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে জোয়ার, বজরার উৎপাদন ছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন।

(৫) **ডাল** (Pulses)—ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছোলা, মটর, খেসারি, মুগ, মসুর, অড়হর, কলাই প্রভৃতি কোনো-না-কোনো রকমের ডাল জন্মায়। ডাল ভারতবাসীর একটি প্রধান খাদ্য। বস্তুত, নিরামিষাশীদের জন্য ইহা প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের অভাব দূর করিয়া থাকে।

(৬) **মসলা** (Spice)—ভারতবর্ষে বিভিন্ন মসলা যদিও অত্যন্ত

স্বল্প পরিমাণে জন্মায়, তবু লঙ্কা, এলাচি, আদা এবং হরিদ্রা যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রধানত কেরালায় এবং কিয়ৎ পরিমাণে মহীশূর, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে লঙ্কা উৎপন্ন হয়। এলাচির চাষ প্রধানত সুদূর দক্ষিণে হইয়া থাকে। আদারও প্রধান উৎপাদক রাজ্য কেরালা। অবশ্য উত্তর প্রদেশেও কিয়ৎ পরিমাণে আদার চাষ হয়। হরিদ্রার চাষ প্রধানত অন্ধ্র ও উড়িষ্যায় হইয়া থাকে। তাছাড়া, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও কেরালায়ও কিছু পরিমাণ হরিদ্রা জন্মায়।

বাণিজ্যিক ফসল

এদেশের বিভিন্ন অংশে নিম্নলিখিত বাণিজ্যিক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে ঃ

(১) **আখ**—পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে জন্মায় আমাদের দেশে ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগই জন্মায় উত্তর প্রদেশ ও বিহারে। পূর্ব পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মহীশূর ও তামিলনাড়ুতেও আখের চাষ হয়।

আখের জন্য প্রচুর তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন ; তবে আখের গাছ বড় হইয়া গেলে আর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না। উত্তর প্রদেশ আখের চাষে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে আখের চাষ ভাল হয়।

(২) **তৈলবীজ** (Oilseeds)—আখের মত তৈলবীজও পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে আমাদের দেশেই জন্মায়। ইহাদের মধ্যে চিনাবাদাম ও নারিকেল পাওয়া যায় গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে ; সরিষা উত্তর ভারতের সর্বত্রই উৎপন্ন হয় ; তিল জন্মায় প্রধানত মধ্যপ্রদেশ, বিহার আর উত্তর প্রদেশে ; আর রেড়ি জন্মায় তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে।

খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য যেসব তৈলবীজ আমাদের দেশে জন্মায় তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে কার্পাস বীজ, তিসি প্রভৃতি। ভারতের তৈল-বীজাদির মধ্যে চিনাবাদামের পরেই কার্পাস বীজের স্থান। তাহা অধিক পরিমাণে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, তামিলনাড়ু ও পাঞ্জাবে জন্মে। তিসি প্রধানত জন্মায় মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উত্তর প্রদেশে।

(৩) **পাট**—পাট উৎপাদনে পূর্ব পাকিস্তানের পরেই পৃথিবীতে

ভারতের স্থান। আর এই পাটের অর্ধেকই উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও উত্তর প্রদেশে বাকী পাট জন্মায়।

পাট চাষের জন্য প্রয়োজন পলিমাটি, উচ্চ তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত। ইহা ব্যতীত সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন। ভারত বিভাগের পর আমাদের দেশে পাট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে পাটের ফলন ছিল ৩৩.৯ হাজার বেল (১ বেল = ১৮০ কিলোগ্রাম) ১৯৬৬-৬৭ সালে ৫৩৪৮ হাজার বেল। পাট চাষের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে।

(৪) **কার্পাস**—ভারতের প্রধান অর্থপ্রসূ শস্য। কার্পাস উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পরেই ভারতের স্থান। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্য-প্রদেশের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত নিকৃষ্ট কার্পাস জন্মে। মধ্য ও দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস জন্মায় পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে। মধ্যম রকম বৃষ্টি হইলেই তুলা চাষ করা চলে। কিন্তু তুলা চাষের জন্য প্রখর রৌদ্রের প্রয়োজন হয়। রোদ পাইলে তুলার গাছে ফুল বেশী হয় এবং বেশী ফুল হইলেই তুলার গুটি বেশী হয়। কিন্তু গুটি পাকিলে ঠাণ্ডা ও ভিজা হাওয়া প্রয়োজন—বৃষ্টিতে তুলার ক্ষতি হয়। মাটির দিক হইতে তুলার জন্য কৃষ্ণ-মৃত্তিকা বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। ভারত বিভাগের পর তুলার ফলন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে—২৮ লক্ষ বেল হইতে ৫৪ লক্ষ বেলে উঠিয়াছে।

(৫) **শণ** (Hemp)—ইহার চাষ ভারতে খুব বেশী না হইলেও মধ্য-প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে যে শণ জন্মায় তাহা প্রধানত বস্তা ও ক্যানভাস তৈরীর কাজে লাগে।

(৬) **রেশম**—ভারতবর্ষে যে পরিমাণ রেশম জন্মায় তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসে মহীশূর হইতে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বীরভূম, উত্তর প্রদেশের পর্বতগড় ও দেরাদুনে, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে এবং কাশ্মীরেও রেশমের চাষ হয়। তুঁতগাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশম-কীট প্রতিপালন করিয়া সেই কীট হইতে এই রেশম উৎপাদন করা হয়। রেশমের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে তসর বিহারের ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও উত্তর প্রদেশে; এণ্ডি আসামে ও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়; মুগা আসামে ও মণিপুরে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আবাদী ফসল

এদেশের আবাদী ফসলের চাষ হয় প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে, আসামে, নীলগিরি পর্বতাঞ্চলে এবং কেরালায়। আবাদী ফসলের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

(১) **চা**—ভারতবর্ষে প্রায় ৬০০০ আবাদে ৭ লক্ষ একর জমিতে চা-র চাষ হইয়া থাকে। ইহার প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগই চাষ হয় উত্তর-পূর্ব ভারতে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় এবং আসামে। বাকী চা উৎপন্ন হয় তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, কেরালা, উত্তর প্রদেশের দেরাদুন অঞ্চল এবং পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়। চা চাষের জন্য প্রয়োজন—১। এমন জমি যেখানে জল দাঁড়াইতে পারে না (পাহাড়ের গায়ের ঢালু অঞ্চল); ২। তাপ—৭৫ ফাঃ মতো; ৩। বৃষ্টিপাত ৮০ ইঞ্চির মতো। ১৯৬৮-৬৯ সালে আমাদের দেশে চায়ের ফলন ছিল ৩৮২ হাজার মেট্রিক টন।

(২) **কফি**—প্রায় ১০,৮৫১ আবাদে মোটামুটি ২ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহার বেশীর ভাগই উৎপন্ন হয় দক্ষিণে মহীশূর, তামিলনাড়ু, কুর্গ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি স্থানে। বাকী কফির চাষ হয় উড়িষ্যা, আসাম এবং মধ্যপ্রদেশে। চায়ের মতো কফির জন্যও প্রয়োজন ঢালু জমি, তাপ ও বৃষ্টিপাত।

(৩) **রবার**—ইহার চাষ কেরালা, মালাবার, কুর্গ ও মহীশূরে হইয়া থাকে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে রবার ভাল হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতে ইহার উৎপাদন ছিল ৫০ হাজার মেট্রিক টন।

(৪) **সিংকোনা**—ভারতবর্ষে এই গাছের চাষ সরকারের অধীন। প্রধানত নীলগিরি, আসাম ও দার্জিলিংএর পার্বত্য অঞ্চলে সিংকোনার চাষ হইয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে ধানের চাষ

তিন প্রকারের ধানের ফলন

তোমাদের যে বিভিন্ন রকমের ধান-চাষের কথা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে সেই সবরকমের ধান-চাষই হয়। শীতের শেষে পশ্চিমবঙ্গের নদীর ধারে, বিলের ধারে বা জলা জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়। এই ধান খুব তাড়াতাড়ি জন্মায়। কথায় বলে, বোরো ধান যাট দিনের মধ্যেই পাকিয়া যায়। এই ধানের

ভারত
বাণিজ্যিক কৃষি-সম্পদ
ও
উৎপাদন-ক্ষেত্র
জম্মু ও কাশ্মীর
পাঞ্জাব
রাজস্থান
উত্তর প্রদেশ
বিহার
আসাম
পশ্চিম বঙ্গ
গুজরাট
মধ্য প্রদেশ
উড়িষ্যা
মহারাষ্ট্র
অন্ধ্র প্রদেশ
মাদ্রাজ
তৈলবীজ
চীনাবাদাম
নারিকেল
সরিষা
তিল
রেড়ি
আখ
পাট
কার্পাস
রেশম
শন
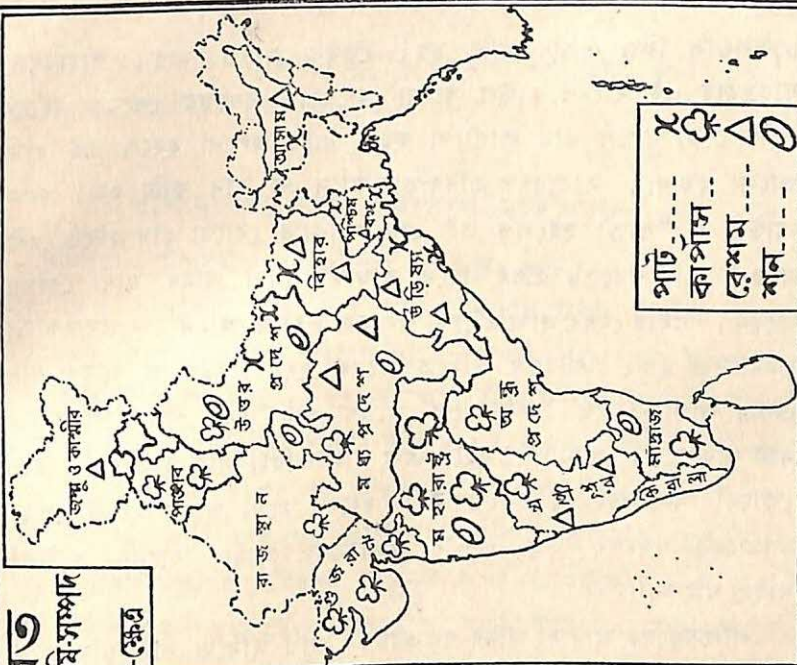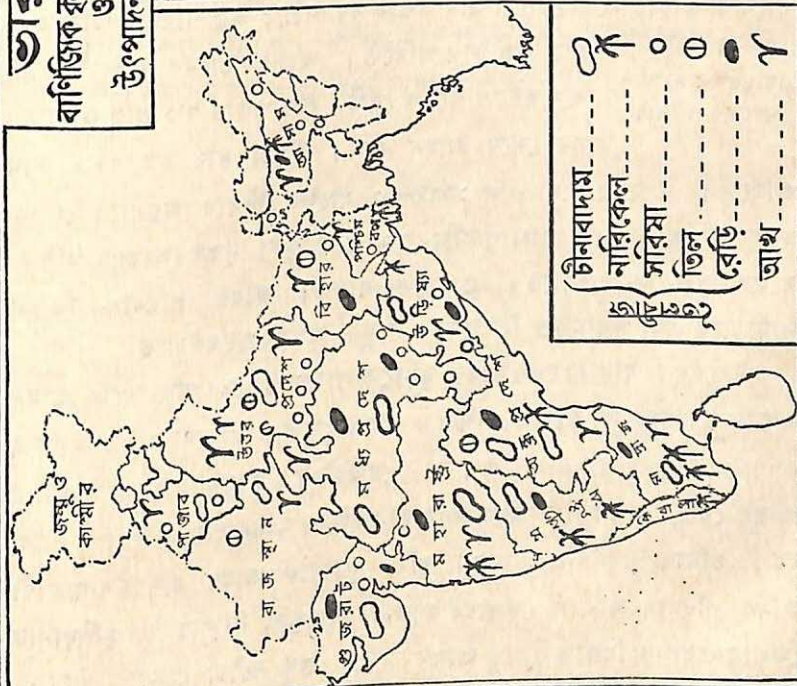
চাউলগুলি কিন্তু একটু মোটা হয়; তেমন স্বাদও নাই। সাধারণত দরিদ্ররাই এই ধানের চাউল খাইয়া থাকে। বসন্তের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে আউশ ধান লাগানো হয়। প্রচুর জল না হইলে এই ধান ভালো হয় না। সাধারণত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এই ধান কাটা হয়। নাম আউশ বা "আশু" হইলেও এই ধান পাকিতে বোরো ধান হইতে বেশী সময় নেয়। শরতের প্রথম দিকে বাঙ্গালী চাষী আমন ধান রোপণ করেন। বর্ষায় যেসব জমিতে বেশী জল হয়, উহাতে আমন ধান বসন্তকালে লাগাইতে হয়। এইরকম জমিতে অনেক সময় আউশ ও আমন ধান একত্র লাগানো হয়। বর্ষাকালে আউশ ধান এবং শীতকালে আমন ধান ঘরে ওঠে। জমি উর্বর হইলে এবং ভাল করিয়া সার ব্যবহার করিলে কোনো ফসলেরই ক্ষতি হয় না। ধানের মধ্যে আমন ধানই শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আমন ধানের চাউলই খাইয়া থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে ধান চাষ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বোরো ধান জন্মায় সব চাইতে অল্প পরিমাণ জমিতে—

বিভিন্ন ধরনের ধান ফলনের পরিমাণ

মাত্র ০'৪ ভাগ জমিতে। আউশ ধানের ফলন বোরো ধান হইতে অনেক বেশী। ইহা জন্মায় ৭'১ ভাগ জমিতে। সব শেষে আমন ধান। ইহার চাষ হয় ৭১'৯ ভাগ জমিতে। উপরের সংখ্যাগুলি ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাব অনুসারে দেওয়া হইল। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে কিছুটা নূতন জায়গা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহাতে আবাদী জমির পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়াছে এবং উপরিউক্ত হিসাবেরও কিছুটা অদলবদল হইয়াছে।

উপরের হিসাব হইতে তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের উৎপাদন সব চাইতে বেশী। বর্ধমান জেলায় আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে আমন ধান জন্মায়। মেদিনীপুরে আমন ধানের উৎপাদন আরও বেশী; শতকরা ৯৩ ভাগ আবাদী জমিতে আমন ধানের রোপণ করা হয়। চব্বিশ পরগণায় আবাদী জমির তুলনায় আমন ধান উৎপন্নকারী জমির পরিমাণ বর্ধমান জেলারই মতো। বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যও আমন ধান। শুধু নদীয়া জেলার আবাদী জমির শতকরা ৭৫ ভাগে আউশ ধান জন্মায়। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর

জেলায় বোরো, আউশ ও আমন এই তিনরকম ধানেরই ফসল হয়। কোচ-বিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার ধানও আমন।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার সমস্যা

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসমস্যা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর নিত্য খাদ্য চাউল তাহার কাছে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশ যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নহে। আবাদী জমি নিতান্ত অল্প, তাহার উপর কৃষিপ্রথায় নানারূপ দোষ-ত্রুটি থাকার ফলে ধান উৎপাদন আমাদের বেশী হয় না। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানাভাবে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সাহায্যে কি করিয়া আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে, সে কথা তোমাদের পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আমেরিকার সাহায্যে, বর্ধমান জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করার এক বিশেষ পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ধানের ফলন বৃদ্ধি করার যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ

পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষের গুরুত্বও বেশী। পাট হইতে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করার যেসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার সবকয়টিই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। তারপর, পাটজাত দ্রব্য আমাদের বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পাটজাত দ্রব্যের বাজার ভারতের এবং পাকিস্তানের প্রায় একচেটিয়া। দেশ বিভাগের ফলে, পাট উৎপাদনকারী অধিকাংশ জমি পূর্ব পাকিস্তানে থাকিয়া যায় এবং আমাদের পাটশিল্প গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যের জমি পাট-উৎপাদনের জন্য তেমন উপযোগী নহে। পরপৃষ্ঠার হিসাব হইতে বুঝিতে পারিবে যে ভারতবর্ষে বর্তমানে পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে—

পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষের গুরুত্ব

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্যের নাম	মোট আবাদী জমির অংশ	মোট ফলনের শতাংশ
১।	পশ্চিমবঙ্গ	৪৪·৭	৪৭·৯
২।	আসাম	২১·৫	২৫·৮
৩।	বিহার	২৫·৩	১৯·২
৪।	ত্রিপুরা	৪·৯	৪·১
৫।	উত্তর প্রদেশ	২·৩	১·৮

কিন্তু, আমরা ধান-চাষ সম্বন্ধেই স্বাবলম্বী নহে। তোমরা দেখিয়াছ, আমরা যে পরিমাণ ধান উৎপাদন করি, তাহাতে আমাদের চাউলের প্রয়োজনের নিবৃত্তি হয় না। এখন যদি আমরা পাট-চাষ বৃদ্ধি করিতে গিয়া ধান-চাষের জমি পাট-চাষের জন্য ব্যবহার করি তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসংকট বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়াছেও। পাট-চাষ অধিক লাভজনক বলিয়া অনেক কৃষক আজকাল ধানের জমিতে পাট-চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই আমাদের পাটের চাষ বাড়াইতে হইলে নূতন নূতন জমিতে পাট-চাষ বৃদ্ধি না করিয়া, জমি প্রতি পাট উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার তাই পাট কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই কেন্দ্র হইতে পাট-চাষের এক নূতন পদ্ধতি বাহির করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে সোজা সারিবদ্ধভাবে পাটের বীজ বপন করিতে হয়। এক ধরনের ড্রিল যন্ত্রের সাহায্যে লাইনে বীজ বোনা হয় এবং "হুইল হো" যন্ত্রের সাহায্যে ঘাস নিড়ানো হয়। এই পদ্ধতিতে চাষ করিলে, অল্প খরচে শ্রেষ্ঠতর পাট একর প্রতি অধিকতর পরিমাণে জন্মায়। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের পাট-চাষপ্রথা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশের অধিকাংশ কৃষকই নিরক্ষর। তাহারা এই প্রথায় পাট-চাষে এখনও অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই।

নূতন পদ্ধতিতে পাট-চাষ

পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায়ই এখন পাট চাষ হয়। বর্ধমান জেলায় আজকাল পাট-চাষ বেশ ভালোভাবেই হইতেছে। আগে পাট-চাষ শুধু কালনা ও জামালপুর থানায়ই হইত। বর্তমানে ইহা বর্ধমান জেলার প্রায় সকল অঞ্চলেই বিস্তৃত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ, হুগলী, নদীয়া, হাওড়া এবং

বিভিন্ন জেলায় পাট-চাষ

চব্বিশ পরগণা—এইসকল জেলায়ও পাট-চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোচবিহারেও ধানের চাষ কমিয়া পাটের চাষ বাড়িতেছে। দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলেও প্রচুর পাট জন্মায়। ধান-চাষের জমি কমাইয়া পাট-চাষের জমি ক্রমেই বর্ধিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের দেশে যে পাট-চাষ হয় তাহা প্রধানত দুই ধরনের, তিতা পাট ও মিঠা পাট। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম হইতেছে যথাক্রমে ক্যাপসুলারিস (Capsularis) এবং ওলিটোরিয়াস (Olitorius)। তিতা পাট হইতে খুব মোটা আঁশ পাওয়া যায়, কিন্তু উহা মিঠা পাটের আঁশের মতো ততো সূক্ষ্ম ও নরম নহে। পশ্চিমবঙ্গে মিঠা পাটের চাষই অধিক হইয়া থাকে।

দুই ধরনের পাট

পাট-চাষে বীজ বপন করিতে হয়; চারা রোপণ করা হয় না। গাছ বড়ো হইলে গোড়ার ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করিয়া পাট গাছ যখন যতখানি বড়ো হইবার ততখানি হইয়া যায়, তখন উহার পাতা কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং ডাঁটাগুলি বাঁধিয়া জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। যখন ডাঁটাগুলি ভিজিয়া নরম হইয়া যায়, তখন উহাদের আঁশ রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়। এই আঁশগুলিই পাট। রৌদ্রে শুকাইবার পর পাট ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়।

পাট-চাষের পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গে চা-চাষ

চা-ও পশ্চিমবঙ্গের আর একটি প্রধান কৃষিসম্পদ। ইহার সাহায্যেও ভারত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকে। পূর্বে চা-চাষের ব্যাপারে ইংরেজরাই অগ্রণী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে অনেক চা-কর চা-বাগান করিয়া প্রচুর লাভ করিতেছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর অনেক ইংরেজ কোম্পানীই নিজেদের ব্যবসা গুটাইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। ফলে, বর্তমানে চা-চাষের ব্যাপারে নিযুক্ত অধিকাংশ মূলধনই ভারতীয়।

বিশেষ ধরনের জলবায়ু ব্যতীত চা-গাছ জন্মাইতে পারে না। ইহার জন্য ভঙ্গুর মাটি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত (কিন্তু দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা-সহ) প্রয়োজন। পাহাড়ের ঢালু জমিতে তাই চা-চাষ ভালো হয়। উত্তর

বঙ্গে চা-চাষের জন্য আদর্শ জমি আছে। আমাদের জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স ও দার্জিলিংএর চা পৃথিবী বিখ্যাত।

চা-গাছও বীজ হইতে জন্মায়। কিন্তু চায়ের চারা তিন বছর পর্যন্ত আলাদাভাবে নার্সারীতে বড়ো করিতে হয়। তারপর সেই চারা গাছ তুলিয়া একটি একটি করিয়া, পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব রাখিয়া, রোপণ করিতে হয়। চা-গাছ পূর্ণ বাড়ন্ত হইতে প্রায় সাত বৎসর লাগে। ১০০ বছরের পুরানো চা-গাছও দার্জিলিংএর কোনো কোনো বাগানে আছে। চা-গাছ দীর্ঘদিন ধরিয়া চা পাতা যোগাইলেও দুই তিন বৎসর অন্তর অন্তর উহাদের পাতা ছাটাই করিয়া দিতে হয়।

চা-গাছের ডগার দুইটি পাতা ও একটি কুঁড়ি হইতে চা হয়। প্রায় দেড় দিন ঐগুলিকে রৌদ্রে শুকাইতে হয়। তারপর আরও কয়েকটি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া গিয়া উহা পূর্ণতা লাভ করে। আমরা বাজারে যে চা পাতা কিনিতে পাই সেইটিই চায়ের পূর্ণ রূপ।

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা

আমাদের কৃষি-ব্যবস্থার সহিত অন্যান্য কয়েকটি দেশের কৃষি-ব্যবস্থার তুলনা এইস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কৃষি-পদ্ধতি, কৃষিজ দ্রব্যাদি ও ফসলের পরিমাণ এই তিন পর্যায়ে আমাদের আলোচনাকে ভাগ করিতে পারি।

কৃষি পদ্ধতি

আমাদের দেশে, তোমরা জান, এখনও বলদের বা মহিষের সাহায্যে ইস্পাতের ফলাযুক্ত লাঙ্গল টানিয়া মাটি চাষ করা হইয়া থাকে। চাষের পর কাঠের মই অথবা বিদের উপর মানুষ দাঁড়াইয়া পশুর সাহায্যে উহা টানিয়া লয়। এইভাবে চাষ করা মাটির ঢেলাগুলি গুঁড়ানো হইয়া থাকে। তাহার পর ঐ ভাঙ্গা গুঁড়ানো মাটি নিংড়াইয়া আগাছা বাছিয়া ফেলিয়া দিবার পর হয় বীজ ছড়াইয়া নচেৎ চারা রোপণ করিয়া আমাদের চাষের কাজ হইয়া থাকে। বিদেশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই জমি চাষের কাজে শক্তিশালী যন্ত্রেরও প্রয়োগ হইতেছে। সেইসব দেশে আজকাল ইঞ্জিনচালিত মোটর-লাঙ্গল অথবা ট্র্যাক্টর দ্বারা জমি চাষ করা হয় এবং তারপর হ্যারো, রোলার প্রভৃতির সাহায্যে ঐ মাটি গুঁড়াইয়া

দেওয়া হয়। অনেক সময় ইঞ্জিনচালিত বিপুল মোটর-লাঙ্গল দিয়া এক সঙ্গেই চাষ এবং জমির ঢেলা ভাঙ্গিয়া সমতল করা হয়। ঐসব মোটর-লাঙ্গলের সহিত যে অনেকগুলি ধাতুনির্মিত ধারালো দাঁত সংযুক্ত থাকে উহারাই ঢেলাগুলিকে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেয়। আগাছা উৎপাটনের জন্য হো-জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তবে মিশরে অবশ্য এখনও প্রধানত আমাদের দেশের মতোই প্রাচীন পদ্ধতিতেই চাষের কাজ হইয়া থাকে। রাশিয়া বা আমেরিকায় বপন-কৃষিরই প্রাধান্য। আর সেই বপনকার্যের জন্যও তাহারা ড্রিল প্রভৃতি বীজ-বপনযন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। ফলে, অল্প সময়ে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষ সম্ভব হয়। জাপানে কিন্তু রোপণ-কৃষিই বেশী হইয়া থাকে। তবে সেখানে আমাদের দেশের মতো যেনতেনপ্রকারে ধানাদির চারা রোপণ করা হয় না। সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধভাবে সেখানে চারাগুলি রোপণ করা হয়। ফলে, শস্যের ফলনও বেশী হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও সাম্প্রতিককালে জাপানীপ্রথায় ধান-চাষ শুরু হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। আমাদের দেশের কৃষকেরা বীজ ছড়ানো বা বোনার সময় তাহা বাছিয়া দেখার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন না। কিন্তু ভালো বীজ না হইলে ভালো শস্যও পাওয়া সম্ভব নহে। বিদেশে তাই বীজ বোনার আগে নীরোগ বীজগুলিই বাছিয়া লওয়া হয়। তাছাড়া, তুঁতের জল বা ফরমালিন মিশ্রিত জল প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যেও বিদেশে বীজকে শোধন করা হয়। তেমনি আবার বিভিন্নজাতীয় রাসায়নিক সারের সাহায্যে বিদেশীরা মাটিকেও সবসময়ই সতেজ রাখিতে সচেষ্ট থাকেন। আমাদের দেশের কৃষকেরা এখনও গোবরের সার ছাড়া অন্যবিধ রাসায়নিক সার ব্যবহারে খুব বেশী উৎসাহী নহে। শস্যাবর্তনের মধ্য দিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির প্রতিও বিদেশের কৃষক-সমাজ আগ্রহী। তবে আমেরিকায় কিন্তু চাষের জমি বিস্তর হওয়ার ফলে একই জমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের চেষ্টা হয় না, বরং এক এক অংশে পৃথক পৃথক ফসলের চাষ হইয়া থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়া

ইহা সুবিশাল দেশ। আমাদের দেশের মতো এই দেশের বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু; তাই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক জায়গা বরফে ঢাকা, আবার অনেক অঞ্চল পাহাড়ে পরিপূর্ণ। তাই সেখানকার মোট জমির শতকরা ১০ ভাগের বেশী চাষ আবাদ করা সম্ভব হয় না।

রাশিয়ার মধ্যভাগের ও দক্ষিণ-পশ্চিমের ষ্টেপ অঞ্চলের স্বল্পবৃষ্টি ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলের মতোই গম, যব, বীট, রাই, তিসি প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বদিকের সমভূমিতে ধান ও সয়াবীনের চাষ হয়। পাট চাষের উপযোগী জলবায়ু এদেশে নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্তে কেনাফ গাছের চাষ এখানে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ককেশাস অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে চা-ও যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়া

ভারত ও সোভিয়েট দেশের মধ্যে কৃষির তুলনা

প্রথমেই বলিতে হয় যে, খাদ্য-সমস্যা সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের মতো এত জটিল নহে। এই দেশের আয়তন, আমাদের দেশের প্রায় সাতগুণ হইলেও, লোকসংখ্যা আমাদের চাইতে অর্ধেকেরও কম। কিন্তু আমাদের দেশে আবাদী জমির হার অপেক্ষাকৃত বেশী। সোভিয়েট দেশে সমগ্র জমির মাত্র ১০ ভাগে ফসল ফলে। আমাদের দেশে কিন্তু আবাদী জমির হার প্রায় ১৬ ভাগ। কিন্তু আমাদের দেশে আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে ১.৭৪ ভাগ, সোভিয়েট দেশে ঐরূপ পতিত জমি নাই। যে সব জমিতে কখনও ফসল জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না, সেই সব জমিতেও বর্তমানে নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে ফলন হইতেছে। জমি প্রতি ফলনও সোভিয়েটে আমাদের দেশের চাইতে অনেক বেশী। আমাদের দেশের মতো চাষের জমিগুলি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত নহে। অনেকখানি জায়গা লইয়া এক একটি কৃষিক্ষেত্র বা খামার। ফলে ভারী-ভারী যন্ত্রপাতির সাহায্যে সোভিয়েট দেশে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। সারের ব্যবহারও ঐ দেশে আমাদের চাইতে অনেক বেশী।

ফসলের বিভিন্নতার দিক হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের দেশেরই মতো। সেখানেও ধান, গম, যব, কার্পাস, তৈলবীজ, চা, প্রভৃতি ভারতেরই মতো উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সোভিয়েট দেশে পাটের চাষ নাই। আবার ভারতে যেমন ধানই সব চাইতে বেশী উৎপন্ন হয়, সোভিয়েট

ইউনিয়নে গম সব চাইতে বেশী উৎপন্ন হয়—গম উৎপন্নের পরিমাণের দিক হইতে সোভিয়েটের স্থান সর্বপ্রথম।

জাপানে কৃষি

জাপানের মাত্র ১৫% যায়গা সমভূমি। কাজেই চাষের সামান্যতম সম্ভাবনা থাকিলেই জাপানে ঐ জমিও আবাদের চেষ্টা করা হয়। চাষের জমি যাতে নষ্ট না হয়, তাই এদেশের অধিকাংশ বাড়ী পাহাড়ের গায়ে গায়ে তৈরী। আবার পাহাড়ের গায়ে ধাপ তৈরী করিয়াও চাষ হয় (Terrace cultivation)। তারপর এক খণ্ড জমি হইতে অপর খণ্ড জমিকে পৃথক করিবার জন্য যে আল দেওয়া হয়, তাহাতেও তুঁত গাছ, ভট কলাই (Soyabin) ইত্যাদি জন্মাইয়া কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহার হয়।

আমাদের দেশে চাষযোগ্য অনেক জমি কিন্তু এখনও নানা কারণে চাষ হয় না। এত করিয়াও জাপানের মাত্র ১৩-১৬% জমিতে চাষ আবাদ হয়। জাপানে ৪০% লোক চাষী, আমাদের দেশে চাষীর সংখ্যা ৭০%। জমির তুলনায় চাষীর সংখ্যা বেশী, উৎপাদনের তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেশী, তাই জাপানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক জমিতে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। জাপানের জমিতে প্রচুর সার দেওয়া হয় ; সর্বত্র জলসেচের যথাযথ ব্যবস্থা রহিয়াছে। জাপান কৃষি-কার্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীও অবলম্বন করিয়াছে। তারপর অনেক জমিতেই বৎসরে অন্ততঃ ২।৩ বার ফসল উৎপন্ন করা হয়। ফলে একর প্রতি শস্যের ফলন জাপানে আমাদের দেশ হইতে অনেক বেশী।

ভারতবর্ষের মতো, জাপানেরও প্রধান কৃষিদ্রব্য ও খাদ্য ধান। দেশের ½ অংশ আবাদী জমিতে অর্থাৎ সমগ্র দেশের ১০% জমিতে ধান চাষ হয়। জাপানের ধানচাষ পদ্ধতির কিছুটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ধানের চারা-গাছগুলি সারি বন্দী করিয়া রোপণ করা হয়। রোপণ করার সময় চারাগাছ-গুলির দূরত্ব সমান রাখা হয়। জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দিতে হয়। এই প্রথায় চাষ করিলে ধানের ফলন অনেক ভালো হয়। ১৯৫৩ সাল হইতে আমাদের দেশে জাপানী প্রথায় ধান চাষের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে এই প্রথায় চাষ করিলে একর প্রতি ২৭ মণ (আমাদের প্রথায় ১৭ মণ) পর্যন্ত ধান জন্মাইতে পারে।

সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক জায়গা বরফে ঢাকা, আবার অনেক অঞ্চল পাহাড়ে পরিপূর্ণ। তাই সেখানকার মোট জমির শতকরা ১০ ভাগের বেশী চাষ আবাদ করা সম্ভব হয় না।

রাশিয়ার মধ্যভাগের ও দক্ষিণ-পশ্চিমের ষ্টেপ অঞ্চলের স্বল্পবৃষ্টি ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলের মতোই গম, যব, বীট, রাই, তিসি প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বদিকের সমভূমিতে ধান ও সয়াবীনের চাষ হয়। পাট চাষের উপযোগী জলবায়ু এদেশে নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্তে কেনাফ গাছের চাষ এখানে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ককেশাস অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে চা-ও যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়া

ভারত ও সোভিয়েট দেশের মধ্যে কৃষির তুলনা

প্রথমেই বলিতে হয় যে, খাদ্য-সমস্যা সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের মতো এত জটিল নহে। এই দেশের আয়তন, আমাদের দেশের প্রায় সাতগুণ হইলেও, লোকসংখ্যা আমাদের চাইতে অর্ধেকেরও কম। কিন্তু আমাদের দেশে আবাদী জমির হার অপেক্ষাকৃত বেশী। সোভিয়েট দেশে সমগ্র জমির মাত্র ১০ ভাগে ফসল ফলে। আমাদের দেশে কিন্তু আবাদী জমির হার প্রায় ১৬ ভাগ। কিন্তু আমাদের দেশে আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে ১.৭৪ ভাগ, সোভিয়েট দেশে ঐরূপ পতিত জমি নাই। যে সব জমিতে কখনও ফসল জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না, সেই সব জমিতেও বর্তমানে নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে ফলন হইতেছে। জমি প্রতি ফলনও সোভিয়েটে আমাদের দেশের চাইতে অনেক বেশী। আমাদের দেশের মতো চাষের জমিগুলি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত নহে। অনেকখানি জায়গা লইয়া এক একটি কৃষিক্ষেত্র বা খামার। ফলে ভারী-ভারী যন্ত্রপাতির সাহায্যে সোভিয়েট দেশে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। সারের ব্যবহারও ঐ দেশে আমাদের চাইতে অনেক বেশী।

ফসলের বিভিন্নতার দিক হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের দেশেরই মতো। সেখানেও ধান, গম, যব, কার্পাস, তৈলবীজ, চা, প্রভৃতি ভারতেরই মতো উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সোভিয়েট দেশে পাটের চাষ নাই। আবার ভারতে যেমন ধানই সব চাইতে বেশী উৎপন্ন হয়, সোভিয়েট

ইউনিয়নে গম সব চাইতে বেশী উৎপন্ন হয়—গম উৎপন্নের পরিমাণের দিক হইতে সোভিয়েটের স্থান সর্বপ্রথম।

জাপানে কৃষি

জাপানের মাত্র ১৫% যায়গা সমভূমি। কাজেই চাষের সামান্যতম সম্ভাবনা থাকিলেই জাপানে ঐ জমিও আবাদের চেষ্টা করা হয়। চাষের জমি যাতে নষ্ট না হয়, তাই এদেশের অধিকাংশ বাড়ী পাহাড়ের গায়ে গায়ে তৈরী। আবার পাহাড়ের গায়ে ধাপ তৈরী করিয়াও চাষ হয় (Terrace cultivation)। তারপর এক খণ্ড জমি হইতে অপর খণ্ড জমিকে পৃথক করিবার জন্য যে আল দেওয়া হয়, তাহাতেও তুঁত গাছ, ভট কলাই (Soyabin) ইত্যাদি জন্মাইয়া কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহার হয়।

আমাদের দেশে চাষযোগ্য অনেক জমি কিন্তু এখনও নানা কারণে চাষ হয় না। এত করিয়াও জাপানের মাত্র ১৩-১৬% জমিতে চাষ আবাদ হয়। জাপানে ৪০% লোক চাষী, আমাদের দেশে চাষীর সংখ্যা ৭০%। জমির তুলনায় চাষীর সংখ্যা বেশী, উৎপাদনের তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেশী, তাই জাপানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক জমিতে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। জাপানের জমিতে প্রচুর সার দেওয়া হয় ; সর্বত্র জলসেচের যথাযথ ব্যবস্থা রহিয়াছে। জাপান কৃষি-কার্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীও অবলম্বন করিয়াছে। তারপর অনেক জমিতেই বৎসরে অন্ততঃ ২।৩ বার ফসল উৎপন্ন করা হয়। ফলে একর প্রতি শস্যের ফলন জাপানে আমাদের দেশ হইতে অনেক বেশী।

ভারতবর্ষের মতো, জাপানেরও প্রধান কৃষিদ্রব্য ও খাদ্য ধান। দেশের ৳ অংশ আবাদী জমিতে অর্থাৎ সমগ্র দেশের ১০% জমিতে ধান চাষ হয়। জাপানের ধানচাষ পদ্ধতির কিছুটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ধানের চারা-গাছগুলি সারি বন্দী করিয়া রোপণ করা হয়। রোপণ করার সময় চারাগাছ-গুলির দূরত্ব সমান রাখা হয়। জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দিতে হয়। এই প্রথায় চাষ করিলে ধানের ফলন অনেক ভালো হয়। ১৯৫৩ সাল হইতে আমাদের দেশে জাপানী প্রথায় ধান চাষের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে এই প্রথায় চাষ করিলে একর প্রতি ২৭ মণ (আমাদের প্রথায় ১৭ মণ) পর্যন্ত ধান জন্মাইতে পারে।

ধান ছাড়া, জাপানে গম, যব, রাই, ওট প্রভৃতি খাদ্যশস্য জন্মাইয়া থাকে এবং এই খাদ্যশস্যগুলি শীতকালেই জন্মায়।

জাপানের আবহাওয়া (মৃদু উষ্ণ এবং শীত ও গ্রীষ্ম উভয় কালে বৃষ্টি) তুঁত গাছ জন্মানোর বিশেষ উপযোগী বলিয়া এ দেশে প্রচুর পরিমাণে তুঁতের চাষ হয়।

জাপানে চা ও কর্পূরও জন্মাইয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতীত, দেশের নানা স্থানে তামাক, ডাল, সয়াবীন, প্রভৃতি জন্মায়। সামান্য পরিমাণে কার্পাস, কমলা লেবু, কলা, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতিরও চাষ হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি

আগেই বলিয়াছি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক একটি অংশে পৃথক পৃথক ফসলের চাষ হইয়া থাকে। ফলে, এদেশে বিভিন্ন কৃষি-বলয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

এদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মেক্সিকো সাগরের উপকূল অঞ্চলে যেখানে উত্তাপ ও বৃষ্টি দুইই প্রচুর সেখানে আমাদের দেশের মতোই ধান ও আখের চাষ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে আটলান্টিক উপকূল হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত অঞ্চলে যেখানে উত্তাপ
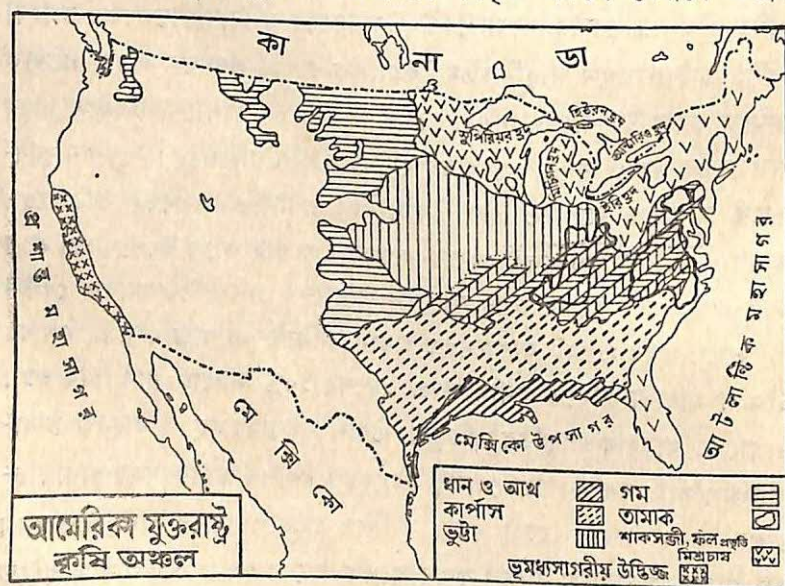
অপ্রচুর নহে সেখানে প্রচুর কার্পাসের চাষ হয়। কার্পাস-বলয়ের উত্তরে গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট তাপ ও শীতকালে শীত খুব বেশী না হওয়ার ফলে ভুট্টা ও শীতকালীন গমের চাষ হয়। এই অঞ্চলের পূর্বাঞ্চলের জলবায়ু তামাক-

চাষের উপযোগী বলিয়া সেখানে তামাকের চাষ হইয়া থাকে। উহার উত্তরে শীতকালে বহুদিন প্রচুর তুষারপাত হয় বলিয়া সেখানে বসন্তকালীন গমের চাষ হয়। আবার ইহার পূর্বদিকের হ্রদ অঞ্চলে লোকবসতি খুব ঘন বলিয়া নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের বিবিধ খাদ্য-চাহিদা মিটাইবার জন্য এখানে শাক-সবজি, ফল প্রভৃতির মিশ্র চাষ হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দেখা যায় বলিয়া সেখানে জলপাই, আঙ্গুর, কমলা প্রভৃতি প্রচুর ফল এবং গম ও তুঁতগাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কৃষির ব্যাপারে ভারতের পৃথিবীতে স্থান

কৃষিজ খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থানই আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে প্রথম। এখানেই পৃথিবীর প্রায় ২২% ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ধানের পরিমাণ পৃথিবীর সমস্ত ধানের মাত্র ২'৪%। কিন্তু ভারতে ধান বেশী উৎপন্ন হইলেও এখানে ফলন বেশী নহে। জাপানে যেখানে হেক্টর প্রতি ধানের ফলন ৪৮'১ শত কিলোগ্রাম, সেখানে ভারতের ফলন হেক্টর প্রতি মাত্র ১২'২ শত কিলোগ্রাম। দেশহিসাবে সর্বপ্রধান গম-উৎপাদন স্থান খুব সম্ভবত রাশিয়ার। তাহার পরেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন গমের প্রায় শতকরা ১৮ ভাগই এখানে উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদক হিসাবে ভারতের স্থান পঞ্চম (৫'৪%), চীন এবং কানাডার নিচে। মিশর প্রভৃতি অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে যবও অনেক কম চাষ হয়। বিভিন্ন মসলার চাষ যদিও স্বল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে তবু বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহা ভারতকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে। ফলের উৎপাদনও অবশ্য আমাদের দেশ অপেক্ষা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বেশী।

বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে আখ ভারতবর্ষেই সবচাইতে বেশী ফলিয়া থাকে। আখ উৎপাদক হিসাবে ভারতবর্ষের পরে আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার পরে মিশরের স্থান। চিনি তৈরীর অপর অন্যতম উপাদান বীট উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান প্রথম ও তাহার পরই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। তৈলবীজের মধ্যে তিসির উৎপাদন সবচাইতে বেশী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। তাহার পর রাশিয়া ও ভারতবর্ষের স্থান। পৃথিবীতে যত তিসি জন্মায় তাহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ আমাদের দেশে জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য তৈলবীজের মধ্যে কার্পাস বীজ, সয়াবীন,

সরিষা প্রভৃতিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই বেশী হইয়া থাকে। কিন্তু আবার তিল, চিনাবাদাম, নারিকেল, রেড়ি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ফলনের দিক হইতে অন্যান্য দেশগুলি অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান। পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় (অর্থাৎ পাকিস্তানের পরেই)। সেদিক হইতে পাট এদেশের সর্বপ্রধান অর্থপ্রসূ চাষ। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অন্যান্য দেশে পাটের বদলে সমগোত্রীয় অন্য বৃক্ষাদির চাষের চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার কেনাফ গাছের কথা তোমাদের আগেই বলা হইয়াছে। কার্পাস উৎপাদনেও সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদক দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ)। তারপর হয়তো রাশিয়া এবং তারও পরে ভারতবর্ষ (প্রায় ১২%) এবং মিশর (প্রায় ৫%)। ইন্দ্রশন বা ফুলশন উৎপাদনে সবচাইতে অগ্রণী রাশিয়া ; তাহার পরেই ভারতের স্থান। সর্বশেষে রেশম উৎপাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান কিন্তু জাপানের (পৃথিবীর প্রায় ৬০ শতাংশ) ; তাহার পরেই শ্রেষ্ঠ উৎপাদন স্থান রাশিয়া। ভারতবর্ষে পৃথিবীর প্রায় ৫ শতাংশ রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আবাদী ফসলের মধ্যে চা উৎপাদনে মোটামুটি হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় (চীনের পরেই)। আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে ভারতের পরে জাপানের স্থান। আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতেই কফি ও রবারের চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে ঐ দ্রব্যাদির উৎপাদনে কিন্তু ভারতের স্থান বহু নিম্নে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পৃথিবীর সমস্ত রবারের মাত্র এক-শতাংশের মতো ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মিশরে কৃষিকার্য

শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত ব্যতীত মিশরে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই চলে। তাই মিশরের কৃষিকার্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে নীল নদের জলের উপর নির্ভরশীল।

নীলনদ মিশরে প্রবেশ করিয়াছে একটি সংকীর্ণ উপত্যকার ভিতর দিয়া ; কিন্তু কিছুদূর হইতেই উপত্যকাটি চওড়া হইয়া ১০ হইতে ১৪ মাইল বিস্তৃত হইয়াছে। এই উপত্যকার বিস্তার প্রায় কায়রো পর্যন্ত। কায়রোর উত্তরে নীলনদ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহার ব-দ্বীপের অবিচ্ছিন্ন সমভূম

ক্রমে প্রায় ১৫০ মাইল বিস্তৃত উর্বর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। নীলনদই মরুভূমির দেশ মিশরকে শস্যশ্যামলা করিয়াছে। তাই মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।

নীলনদের তুই ধারের জমিগুলি (১০০০ হইতে ৪০,০০০ একর পর্যন্ত) উঁচু বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইত। ঐসব বাঁধের ভিতরের বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রগুলিও ছোট ছোট মাটির আল দিয়া পৃথক করিয়া রাখা হইত। নীলনদের জল ফাঁপিয়া উঠিলে ছোট ছোট খাল দিয়া ঐজল বাঁধের ভিতরের কৃষিক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশ করাইয়া আটকাইয়া রাখা হইত। ঐ জল দেড় মাস হইতে তুই মাস পর্যন্ত আবদ্ধ থাকার ফলে কৃষিক্ষেত্রগুলি ভরাট হইয়া যাইত। জল নামিয়া গেলে মিশরের কৃষকেরা (কেল্লাই) চাষ করিত।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় মিশরের খাদ্যশস্যের চাহিদা মিটিত না ; বিশেষ করিয়া লোকসংখ্যা যখন দিনে দিনেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে মিশরের মাত্র ৩% জমিতে চাষ হইয়া থাকে। তাই বর্তমানে নীলনদের উপর বহু স্থানে বাঁধ দিয়া স্থায়ী সেচব্যবস্থা করা হইতেছে। এই বাঁধ-ব্যবস্থাগুলি আমাদের দেশের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মতো। মিশরের দক্ষিণ অংশে আসোয়ান শহরের পাশে আসোয়ান বাঁধ নীলনদের উপর সর্বপ্রধান বাঁধ। উহা ৩২ মাইল দীর্ঘ, আধমাইল চওড়া এবং ৩৫০ ফুট উঁচু। ইহা পৃথিবীর দীর্ঘতম সেচ বাঁধ। এই বাঁধের ফলে সৃষ্ট ৪০০ মাইল দীর্ঘ নাসের সাগর (পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয়) হইতে খাল কাটিয়া জলকে কৃষিক্ষেত্রে প্রবাহিত করা হইতেছে। এইভাবে জলসেচের ফলে মিশরে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস, গম, যব, তামাক, আখ, ধান, ভুট্টা, পেঁয়াজ, চীনাবাদাম প্রভৃতি জন্মায়। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার সাহায্যে যে চাষ-আবাদের চেষ্টা হইতেছে তাহাই মিশর এবং আমাদের দেশের মধ্যে চাষ-আবাদের সাদৃশ্য। কিন্তু আমাদের দেশের চাষ-আবাদ বৃষ্টির জলের উপর প্রধানত নির্ভরশীল ; মিশরে কিন্তু তাহা নহে।

আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার সমস্যা

ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। অনেক চাহিদা মিটাইবার সঙ্গতিই আমাদের নাই। কিন্তু খাদ্যের চাহিদা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহা না মিটিলেই নয়। খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে আমাদের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে। আমরা

চোখের উপরই দেখিতেছি খাদ্যদ্রব্যের দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে এবং আমাদের দেশবাসীদের অনেকেই অর্ধাহারে, অনাহারে দিন যাপন করিতেছে।

নিচে এই অবস্থার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

আমাদের দেশের খাদ্যাভাবের অন্যতম প্রধান কারণ, লোকসংখ্যার অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত হিসাব দেখিলে দেখা যায় যে, গত ১৫ বৎসরে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ১৫ কোটি বাড়িয়াছে ; অর্থাৎ প্রতি বৎসর লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার প্রায় ১ কোটি। আমাদের প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটির মতো অতিরিক্ত লোকের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখাইতেছেন যে ১৯৭৬ সাল হইতে ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১৮০ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইহা বাড়িয়া ২৭০ লক্ষ অতিরিক্ত লোকে দাঁড়াইবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইতে চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের অভাব, নীতিগত আপত্তি প্রভৃতি নানা কারণে উহা কতদূর সম্ভব হইবে জানা নাই। তারপর মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে লোকসংখ্যার যে বৃদ্ধি হইবে, তাহা তো আটকান যাইবে না।

কাজেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াই এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। একজন বিখ্যাত খাদ্য বিশারদের মতে কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিবার মতো খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইলেও একজন লোকের অন্তত ০'৪৯ হেক্টেয়ার জমি প্রয়োজন ঃ আর ভালোভাবে খাইয়া বাঁচিতে হইলে ১'২৫ হেক্টেয়ার জমির দরকার। ভারতবর্ষে মাথা পিছু জমি পাওয়া সম্ভব মাত্র ০'৩২ হেক্টেয়ার। কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকার মতো জমির সঙ্গতিও আমাদের নাই।

আমরা আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতে পারি। সেচ-ব্যবস্থার অভাবে যে সব জমি পতিত আছে, বা মালিকের ঔদাসিন্য প্রভৃতি কারণে যে সব জমি আবাদ হইতেছে না, তাহার কারণ দূর করিয়া আবাদ করিতে পারি। কিন্তু ঐরূপ ভাবে আবাদী জমির পরিমাণ খুব বেশী

বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। মনে রাখিতে হইবে যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অনেক আবাদী জমিও হয়তো বা ঘর-বাড়ী নির্মাণ, যাতায়াতের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হইবে। জমি বাড়াইবার আর এক পন্থা হইতে পারে দেশের বনাঞ্চল কাটিয়া আবাদযোগ্য করা। কিন্তু আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য বনসম্পদেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। তারপর বনাঞ্চল কমিয়া গেলে দেশে বৃষ্টি পতনের হার কমিয়া কৃষিকার্যের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কাজেই একদিকে যেমন আমরা জন্মের হার কমাইতে চেষ্টা করিব, তেমনি অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণও বৃদ্ধির চেষ্টা চলিবে। তবু বর্তমান অবস্থায়, জমি প্রতি ফসলের হার বৃদ্ধি করার চেষ্টা প্রধানত আমাদেরই করিতে হইবে। কিন্তু এইক্ষেত্রে, ১৯৫১ হইতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আমাদের চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। ১৯৫০-৫১ সালে, ভারতে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ছিল ৫৪০ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহা বাড়িয়া হইয়াছিল ৮০০ লক্ষ মেট্রিক টন। অতএব খাদ্যের উৎপাদনের হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে আমরা দেখিতে পাই যে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির হার ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে বিদেশ হইতে আমরা খাদ্য আমদানি করি ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন; ১৯৬৫-৬৬ সালে তাহা বাড়িয়া হয় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন।

তবে খাদ্য-সমস্যার সমাধানের কি কোন উপায় নাই? খাদ্য উৎপাদনের হার কি প্রয়োজনানুরূপ আমরা বাড়াইতে পারিব না? উপায় বাহির করার জন্য, আমাদের দেশে ফসলের কম ফলনের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

ফসলের হার বৃদ্ধি করার অন্তরায়

(১) বৈজ্ঞানিক চাষের পদ্ধতির অনুপস্থিতি, (২) ভালো বীজের অভাব, (৩) জলসেচের সুবিধার অভাব, (৪) উপযুক্ত সারের অভাব, (৫) এক-ফসলী চাষ ইত্যাদি। সংক্ষেপে এই কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের দেশের চাষপদ্ধতি এখনও মধ্যযুগীয়। তাহার অন্যতম কারণ আমাদের দেশের জমির আয়তন খুব ছোটো। একজন কৃষকের জমি অনেকগুলি ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত। আবার এই খণ্ডগুলি দূরে দূরে বিভিন্ন জায়গায়

অবস্থিত। যৌথপরিবার প্রথা দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়ার ফলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন এবং আমাদের উত্তরাধিকার আইনের জন্য (পিতার মৃত্যুর পর সকল ভাই-বোনের উপরই জমির উত্তরাধিকার বর্তায়) জমি এত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে চাষের ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে এবং জমির ফলন কমিয়াছে। জমি একত্র থাকিলে একখানা লাঙ্গল ও একজোড়া বলদ দিয়া একজন চাষী যে জমি চাষ করিত, জমি খণ্ড খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে সেই জমি চাষ করিতে তাহার তিনখানা লাঙ্গল, তিন জোড়া বলদ ও তিন-জন চাষীর প্রয়োজন। তারপর, জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িলে, প্রত্যেক খণ্ডের সীমানা মাটির আল দিয়া বাঁধিয়া স্থির করিতেও কিছুটা জমি নষ্ট হয়। ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত চাষের জমির সব চাইতে বড়ো অসুবিধা হইতেছে যে. উহাতে আধুনিকতম যন্ত্রের সাহায্যে চাষ চলে না।

দীর্ঘদিনের সংস্কারের বশে অথবা চাষীদের সামাজিক অস্বীকৃতির জন্য আমাদের দেশে কৃষিকাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। অবশ্য, অন্যান্য দেশে জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা কম হওয়ায় যন্ত্রের প্রয়োজন যে পরিমাণে অনুভূত হইয়াছে, আমাদের দেশে জমির আয়তনের তুলনায় কৃষকের সংখ্যা খুব বেশী হওয়ার জন্য যন্ত্রের জন্য প্রয়োজন ততো বেশী দেখা দেয় নাই। তাছাড়া, আমাদের দেশের মাটি পাললিক হওয়ায়, বিশেষ কঠিন নহে বলিয়াও, শক্তিশালী ভারী যন্ত্রের চাহিদা বিশেষ অনুভূত হয় নাই। তাই আমাদের দেশে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করিতে হইলে কতকগুলি ব্যাপারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়:—

(ক) আমাদের কৃষক সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে যন্ত্রবিদ্যা শেখানো;
(খ) আমাদের কোমল ভূমির উপযোগী শক্তিশালী যন্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা;
এবং, (গ) দ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্রের মালিকেরাও যাহাতে এইসব যন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্য যৌথ খামারের প্রচলন।

আমাদের দেশের কৃষকদের মূলধনের অভাবও কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহারের অন্যতম বাধা। অধিকাংশ কৃষকেরই আজ খাইলে কাল খাওয়ার নাই। অধিকন্তু তাহারা ঋণভারে জর্জরিত। এই অবস্থায় দামী যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার কথাও তাহারা ভাবিতে পারে না। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার

উন্নতি না হইলে আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত বিক্রয়-ব্যবস্থা না হইলে চাষীদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হওয়ার উপায় নাই। নানা কারণেই চাষীরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উচিত মূল্য পায় না। অভাবের তাড়নায় অনেকেই ফসল উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। স্বভাবতই সেই সময়ে ফসলের দাম কম থাকে। অনেকে তো আবার ফসল উৎপন্ন হইবার পূর্বেই মহাজনের নিকট হইতে দাদন লইয়া রাখে, এবং উৎপন্ন ফসল সোজাসুজি গিয়া মহাজনের ঘরে ঢোকে। ফলে, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও চাষীদের কোনো সুবিধা হয় না। মহাজন, দালাল ইত্যাদি লাভ করে। অনেক স্থানে উপযুক্ত রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের অভাবেও কৃষিজাত দ্রব্য বাজার অনুপাতে সঠিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না।

শুধু কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত বিক্রয়-ব্যবস্থার দ্বারাই চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা যাইবে না। শুধু কৃষির আয় কাহারও পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না। তাহার সঙ্গে উপজীবিকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কৃষিকার্য করিয়া কৃষকের হাতে সময়ও থাকে প্রচুর। কাজেই ইচ্ছা করিলে সে নানাধরনের উপজীবিকা গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশে পূর্বে ঘরে ঘরে বিভিন্ন শিল্পকার্য করা হইত। কিন্তু বৃটিশ আমলে তাহাদের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। উহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, কৃষকদের উপজীবিকার সুযোগ না দিতে পারিলে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে না। চাষের সঙ্গে সঙ্গে বিধিবদ্ধভাবে পশু ও পক্ষীপালন এবং দুধের ব্যবসাও চাষীরা করিতে পারে।

ভালো বীজের অভাব যে কৃষিকার্যের উন্নতির অন্যতম অন্তরায় একথা আগেই বলা হইয়াছে। বিদেশে চাষীরা নীরোগ বীজের ব্যবহার করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের দেশেও চাষীরা উদ্যোগী হইলে এই সমস্যার সমাধান করা দুঃসাধ্য হইবে না।

বৃষ্টির অনিশ্চয়তাও বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের কৃষিকার্যের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল। বর্তমানে বিভিন্ন নদী-পরিকল্পনার কল্যাণে অবশ্য এই সমস্যার অনেকটা সমাধান সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, জলসেচনের মতো জলনিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবও চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক। বেশী জল দাঁড়াইয়া থাকিলে

একদিকে যেমন জমির ক্ষার বেশী গলিয়া গিয়া জমি ক্রমেই অনুর্বর হইয়া পড়ে, তেমনি অন্যদিকে গাছের শিকড়ের যে বায়ু চলাচল প্রয়োজন, সেই বায়ু গাছের শিকড়ে পৌঁছাইতে পারে না, ফলে গাছের পুষ্টিসাধনও হয় না, তাই জমিতে জলসেচনের মতো জলনিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আমাদের কৃষকেরা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সারের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রায় একেবারেই অজ্ঞ। তাহারা শুধু গোবরের সারের ব্যবহারই জানে। অথচ আমাদের দেশে যে পরিমাণ গোবর পাওয়া সম্ভব, তাহার বহুলাংশই জ্বালানীরূপে আমরা অপচয় করিয়া ফেলি। সুতরাং কৃষির উন্নতি করাইতে হইলে আমাদের কৃষকদের বিভিন্ন প্রকার সারের গুণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত করানো যেমন প্রয়োজন, তেমনি স্বল্পমূল্যে তাহারা যাহাতে ঐসব সার পাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার।

আমাদের দেশে ধান কাটার পর বেশীর ভাগ সময়ই সমস্ত গবাদি পশুকে ক্ষেতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং সেইহেতু ঐসব ক্ষেতে আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। অথচ শস্য পরিবর্তন শুধুই যে খাদ্যাভাব পূরণের কাজেই সহায়তা করিবে তাহাই নহে, উহার ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাইয়া পরোক্ষভাবে দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানেও সাহায্য করিবে।

আমাদের কৃষকদের স্বাস্থ্যও ভালো নহে। ম্যালেরিয়া, জ্বর, আরও নানা ধরনের অসুখ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহারা জর্জরিত। সুস্থ শরীর এবং সবল মন লইয়া তাহারা কার্য পরিচালনা করিতে পারে না। কিন্তু সব কিছুর উপরে রহিয়াছে কৃষকদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। এতক্ষণ পর্যন্ত কৃষিকার্যের উন্নতির অন্তরায় হিসাবে যেসব কারণের উল্লেখ করা হইল, তাহাদের প্রায় সব কয়টির অন্তত আংশিক প্রতিকার হইতে পারে, যদি কৃষকেরা যথাযথ শিক্ষা পায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই নিরক্ষর। তারপর, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এখনও প্রবর্তিত না হওয়ার ফলে, কৃষকদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইবে সে ভরসা নাই।

কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করার উপায়

কি করিলে আমাদের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তাহা কৃষি-ব্যবস্থার অবনতির কারণ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতেই তোমরা অনুমান করিতে পার।

প্রথমেই জমির একত্রীকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। যতদিন কৃষকদের জমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আধুনিক প্রথায় কৃষির প্রবর্তন করা সম্ভব নহে। এইভাবে সমস্যা সমাধানের আলোচনা করা যায়। প্রথমত, পাঞ্জাবে যেরূপ সমবায় প্রথায় খণ্ড খণ্ড জমি একত্রিত করিয়া, জমির মালিকেরা মিলিয়া মিশিয়া জমি চাষ করিয়া থাকে সেইরূপ সমবায় প্রথার প্রবর্তন করা যায়। পাশাপাশি জমির মালিকগণ যদি তাহাদের অন্যস্থানে অবস্থিত জমি পরস্পরের মধ্যে বদল করিতে পারেন তবে ইহার ফলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থা কার্যকরী করা প্রথম ব্যবস্থা হইতে আরও কঠিন। আর একটি উপায় আছে। সরকার বাধ্যতামূলক আইন করিয়া চাষে সমবায় প্রথার প্রবর্তন করিয়া দিতে পারেন। গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে অবশ্য ঐরূপ আইন করা খুব বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি কৃষকদের মঙ্গলের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য ঐ ধরনের আইন প্রণয়নের কথা ভাবা যাইতে পারে।

আমাদের সেচব্যবস্থার উন্নতি যে একান্ত আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহারেও আমাদের কৃষকদের অভ্যস্ত হইতে হইবে। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তাহাদিগকে সহজ ঋণ-দানের ব্যবস্থা এবং কৃষিজাত-দ্রব্যের উপযুক্ত বিক্রয়ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষীদের বিভিন্ন উপজীবিকার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে ডাক্তারখানার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে এবং বয়স্কদের জন্য সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ বই না পড়িয়াও যাহাতে আধুনিক যুগে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্ঞান তাহারা পায়, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। একই পদ্ধতিতে কৃষিকার্য বিষয়ে তাহাদিগকে বিস্তারিত জ্ঞান দিতে হইবে।

পরিশেষে, আধুনিকতম পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উন্নত বীজ ব্যবহারের সুযোগ চাষীদের দিতে হইবে। যন্ত্রপাতির ব্যবহারেও তাহাদের উৎসাহিত করিতে হইবে।

কৃষিকার্যে সরকারের উন্নতির চেষ্টা

বলা বাহুল্য, উপরে যাহা আলোচিত হইল, রাষ্ট্রের সরকারী সহায়তা

ব্যতীত তাহার দ্রুত রূপায়ণ সম্ভব নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের সমস্ত সামর্থ্য লইয়া কৃষির উন্নতির কাজে ব্রতী হইয়াছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে আমাদের জাতীর সরকারও এই উদ্দেশ্যে প্রচুর প্রয়াস পাইতেছেন। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে কৃষিখাতে বরাদ্দ ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে (দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫৬৮ কোটি টাকার স্থলে তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪৭৫ কোটি টাকা)। কৃষির সামগ্রিক উন্নতিবিধানে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রে কৃষিবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। কৃষিসংক্রান্ত বিবিধ গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেমন অর্থসাহায্য দিয়া পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে, তেমনি সরকারী অর্থানুকূল্যেই কটকে সেণ্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, সিমলায় সেণ্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, কুলুতে সেণ্ট্রাল ভেজিটেবল ব্রীডিং স্টেশন, কানপুরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজি, কোয়েম্বাটুরে ও কুর্ণুলে সুগার-কেন ব্রীডিং ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার সরকারী অর্থানুকূল্যেই বিভিন্ন কৃষিদ্রব্য সম্বন্ধে গবেষণা চালানোর জন্য বোম্বাইতে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি, কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি, ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল অয়েল-সীডস্ কমিটি, কানপুরে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল সুগার-কেন কমিটি, কয়ানগুলমে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোকোনাট কমিটি, রাজমহেন্দ্রীতে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল টোবাকো কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন Commodity Committee স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে মাধ্যমিক স্তরে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি রাজ্যে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণীতে বিড়লা কৃষি মহাবিদ্যালয় এই জাতীয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এছাড়া, সরকারী অর্থানুকূল্যেই উত্তর প্রদেশের রুদ্রপুরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। সর্বোপরি, জাতীয় সরকার একদিকে যেমন বিভিন্ন জলসেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেছেন, বা কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন কার্যকরী কল্পনাকে (Work schemes) রূপ দিতেছেন, তেমনি অন্যদিকে চাষীদের উন্নততর বীজাদি, সার প্রভৃতি সহজে ও সুলভে যোগান দিবারও (Supply

schemes) ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভূমি-সংস্কার আইন প্রবর্তনের দ্বারা মধ্যস্বত্ব বিলোপ এবং প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ভূমি সংস্কার কৃষি প্রগতির পথ সৃষ্টি করে এবং কৃষকরা অধিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত বোধ করে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সরকার এবং তোমরা যাহারা কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করিবে তাহাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আমাদের দেশের কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে।

অনুশীলন

(আমাদের কৃষি)

১। ভারতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সেচপদ্ধতিগুলির অঞ্চল হিসাবে বিবরণ লিখ। (S. F. 1965, Comp.) (উঃ—পৃঃ ১২৩-২৫)।

২। ভারতীয় কৃষিতে সেচব্যবস্থা কেন প্রয়োজনীয়? এই সূত্রে ভারতের নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির ভূমিকা দৃষ্টান্ত সহ নির্দেশ কর। (S.F. 1966) (উঃ—পৃঃ ১২১, ১২৫-২৮)

৩। ধান, তুলা, পাট, চা, কফি, রবার ও আখ উৎপাদনে কি কি অবস্থা প্রয়োজনীয়? ভারতের কোন কোন অঞ্চলে, কি কি কারণে এই সকল পণ্য উৎপন্ন হয়? (S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ১২৯-৩২)

৪। জাপান ও মিশরের কৃষিপদ্ধতি ও উৎপন্ন ফসলের তুলনা কর। (S. F. 1965) (উঃ—পৃঃ ১৪৩-৪৪, ১৪৬-৪৭)

৫। পশ্চিমবঙ্গ ও মিশরে কোন কোন প্রধান কৃষিজদ্রব্য উৎপন্ন হয়। সেগুলি কোথায় কোথায় জন্মায়? এই দুইটি অঞ্চলের উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্য ও চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে কি কি প্রধান পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? (S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ১৩২-৩৪, ১৩৭-৪০ ১৪৬-৪৭)

৬। কার্পাস উৎপাদনের জন্য কি কি অবস্থা প্রয়োজন? ভারতের কোন অঞ্চলগুলি তুলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত এবং কেন? (S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ১৩৩)

৭। ভারতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য এখন পর্যন্ত সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন লিখ। (S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ১৫৩-৫৫)

৮। উৎপাদিত দ্রব্য ও কৃষিব্যবস্থা অনুসারে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনা কর। (S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ১৪২-৪৩)

৯। উৎপাদিত শস্য ও কৃষিব্যবস্থা অনুসারে ভারত ও জাপানের মধ্যে তুলনা কর। (S. F. 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ১৩৪-৩৯, ১৪৩-৪৪)

১০। কেন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ সম্ভব নহে তাহার কারণ বর্ণনা কর। (S. F. 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ১৩৭)

১১। আসামে চা ও কেরালায় রবার উৎপন্ন হয় কেন ? (S.F. 1970) (উঃ—পৃঃ ১৩৪)

১২। ধান ও গম চাষের জন্য অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা কি কি ? ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ইহাদের অধিক উৎপাদন হয় ? (S. F. 1970) (উঃ—পৃঃ ১২৯—৩১)

১৩। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা দ্বারা কি বুঝ ? ইহাদিগকে "বহুমুখী পরিকল্পনা" বলা হয় কেন ? দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা অথবা ভাখরা-নাঙ্গল পরিকল্পনা বর্ণনা কর এবং উক্ত পরিকল্পনার অঞ্চলে উহার গুরুত্ব উল্লেখ কর। (S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ১২৫-২৯)

(ক) স্ক্র্যাপ বইএ পৃথক পৃথক ভারতের ম্যাপ আঁকিয়া নিচের জিনিসগুলি বসাও—(১) বিভিন্ন স্থানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ; (২) বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন।

(খ) নিম্নলিখিত প্রজেক্ট নেওয়া যাইতে পারে—

(১) যে কোন নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা মডেল প্রস্তুত করণ ;

(২) যে কোন শস্যোৎপাদন ক্ষেত্রের পরিকল্পনা, সেচ-ব্যবস্থা, কৃষিকর্ম ও শস্যোৎপাদনের গড় ইত্যাদি নির্ণয়।

কৃষিসংশ্লিষ্ট কার্যাদি

ভারতে কৃষিসংশ্লিষ্ট কার্যাদির উন্নতির প্রয়োজন

শুধু কৃষিজাত দ্রব্যাদি দ্বারাই আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন তাহার অন্যতম অঙ্গ প্রোটিন ও চর্বি-জাতীয় খাদ্য কৃষিজ দ্রব্যাদি হইতে বিশেষ পাওয়া যায় না। ইহা পাওয়া যায় জীবদেহজাত মাংসাদি বা পশুজাত দুগ্ধাদি খাদ্য হইতে। তাই খাদ্য হিসাবে ভাত-ডাল-গম প্রভৃতির সহিত মাছ-মাংস-দুধ প্রভৃতিও আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে আমাদের দেশের অবস্থা এখনও খুব আশাপ্রদ নহে। তাহার কারণ, কি গো-জাতীয় পশুপালনে, কি হাঁস-মুরগী প্রভৃতি পালনে, বা কি মৎস্য-চাষে কৃষির মতই আমরা এখনও বহু পিছাইয়া আছি। উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রথায় পশুপালন বা প্রজনন, মাছের চাষ প্রভৃতি আমাদের দেশে সরকারী প্রচেষ্টায় শুরু হইলেও এখনও সর্বত্র স্বীকৃত ও সমাদৃত হয় নাই। পশুপালন বা মৎস্য-চাষ প্রভৃতি জীবিকা হিসাবে এখনও তাহাদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায় নাই।

শুধু খাদ্যের উৎস হিসাবেই নহে, পশুজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন খাদ্য-শিল্প, চর্ম-শিল্প, বস্ত্র-শিল্প, সারতৈরী-শিল্প প্রভৃতির কাঁচা মাল হিসাবেও একান্ত প্রয়োজনীয়। এইসব শিল্পের উন্নয়নের জন্যও তাই আমাদের পশু-সম্পদের উন্নতি একান্ত দরকার। তাছাড়া, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের দেশে পুরাপুরি যন্ত্রের ব্যবহার কৃষিকার্যের জন্য শুরু হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত কৃষিকার্যের জন্য গবাদি পশুর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে এই কারণেই উন্নততর পশুপালন-পদ্ধতি ও প্রজনন ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

পশুপালন

ভারতবর্ষের পশ্বাদিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা চলে—(১) গো-জাতীয় (Bovine)—যথা, গোরু, ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি ; মেষ-জাতীয় (Ovine)—যথা, ছাগল, ভেড়া, প্রভৃতি এবং (৩) অন্যান্য—যথা, ঘোড়া, গাধা, শুকর প্রভৃতি।

গো-জাতীয় পশু আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য দুধের যোগান দেয়। ভারতবর্ষে প্রায় ষোল কোটি গোরু ও ষাঁড় এবং প্রায় সাড়ে চার কোটি মহিষ রহিয়াছে। তুলনামূলকভাবে বলা চলে, পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গোরু ও ষাঁড় এবং দুই-তৃতীয়াংশ মহিষ ভারতবর্ষেরই সম্পদ। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের গোরু নিতান্ত অল্প দুধ দেয়। যেখানে হল্যাণ্ডে প্রতি গোরু বৎসরে গড়ে ৮০০০ পাউণ্ড, অস্ট্রেলিয়ায় ৭০০০ পাউণ্ড, সুইডেনে ৬০০০ পাউণ্ড এবং আমেরিকায় ৫০০০ পাউণ্ড দুধ দেয়, সেখানে ভারতবর্ষে ঐ হার মাত্র ৪১৩ পাউণ্ড। ফলে, ভারতবর্ষের অধিবাসীরা খুব অল্পই দুধ খাইতে পায়। যেখানে হল্যাণ্ডে লোকে মাথাপিছু দৈনিক দুধ পায় ২৪৪ আউন্স, ডেনমার্কে ১৪৮ আউন্স, ইংল্যাণ্ডে ১৪০ আউন্স, আমেরিকায় ২৭ আউন্স সেখানে ভারতবর্ষে ঐ হার মাত্র ৫.৮ আউন্স।

গো-জাতীয় পশু

ইহার কারণ, ভারতবর্ষে ভালোজাতের গোরু-মহিষ খুব বেশী পাওয়া যায় না। অবশ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গো-পালন আমরা জানিও না। আমাদের দেশের গোরু ও ষাঁড়গুলিকে সিন্ধী, শাহীওয়াল, হরিয়ানা, গির প্রভৃতি পঁচিশটি সুনির্দিষ্ট ও উৎকৃষ্ট জাতে, এবং মহিষগুলিকে জাফেরবাদী, মূরা, সুরাটী প্রভৃতি
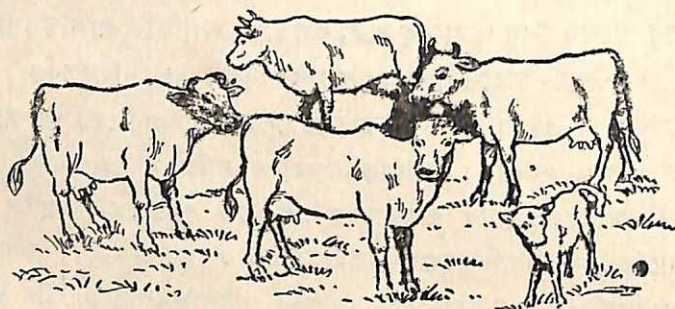
বিভিন্ন জাতির গোরু

ছয়টি জাতে ভাগ করা চলে। কিন্তু এইসব জাতের গোরু বা ষাঁড় বা মহিষ প্রায় সবই ভারতের মধ্যভাগে বা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই দেখা যায়। পূর্বাঞ্চলে বা দক্ষিণে যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী সেখানে এইসব জাতের গো-মহিষাদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের দুধের মাথাপিছু ব্যবহারের (per capita consumption) পরিমাণ

লক্ষ্য করিলেই এই কথা সুস্পষ্ট বোঝা যাইবে। যেখানে পাঞ্জাবে মাথাপিছু দুধ সরবরাহ হয় ১৪'৭৫ আউন্স, উত্তর প্রদেশে ৮'২ আউন্স, বা রাজস্থানে ৮'১ আউন্স, সেইজায়গায় মাদ্রাজে উহার পরিমাণ মাত্র ২'৭ আউন্স, কেরালায় ১'৪ আউন্স, আসামে ১'৯ আউন্স, উড়িষ্যায় ১'৮ আউন্স এবং পশ্চিম বঙ্গে ২'৬ আউন্স। চাষের ব্যাপারেও বলা হইয়া থাকে, যেখানে পূর্বাঞ্চলে এক জোড়া বলদ মাত্র ৭'৬ একর জমি চাষে সহায়তা করিতে পারে, সেখানে পশ্চিমাঞ্চলে একজোড়া বলদ পারে ১৯'২ একর জমি চাষে সহায়তা করিতে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের বৃষ্টিপাতের মানচিত্রের সহিত এখানকার গো-জাতীয় পশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

সাম্প্রতিককালে আমাদের সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে কৃষির ন্যায় উন্নত পশুপালন পদ্ধতির উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ স্কীম, গোসাধন স্কীম, গোশালা স্কীম প্রভৃতি পশু-প্রজনন ও উন্নত ধরনের পশুপালনের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বাঙ্গালোরে সেণ্ট্রাল ষ্টাড্ ফার্ম নামক কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারী কলেজ গড়িয়া উঠিতেছে। রিণ্ডারপেষ্টজাতীয় গবাদি পশুর প্রধান শত্রু বিনষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় রিণ্ডারপেষ্ট কণ্ট্রোল কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, এবং রাণীপেট, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, হিসার ও ইজ্জাৎনগরে রিণ্ডারপেষ্টের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে টীকা তৈরীর কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

মৎস্য চাষ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অসংখ্য খাল, বিল, পুষ্করিণী, নদী, নালা, হ্রদ প্রভৃতি রহিয়াছে। তার উপর অসংখ্য উপসাগর, খাড়ি, অন্তর্মুখী বাঁক প্রভৃতি যুক্ত বিস্তৃত উপকূল রেখা-সংলগ্ন প্রায় একলক্ষ দশ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী মৎস্যচারণ ক্ষেত্র আছে। এইখানে ভারতে প্রতিবছর গড়ে প্রায় আট লক্ষ মেট্রিক টন আভ্যন্তরীণ মৎস্য ও প্রায় তিন লক্ষ মেট্রিক টন সামুদ্রিক মৎস্য ধরা হইয়া থাকে।

ভারতে মৎস্য চাষের সুযোগ

মৎস্যবিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে ভারতের অভ্যন্তরে এবং

উপকূলবর্তী সমুদ্রে প্রায় ১৮০০ বিভিন্নজাতীয় মাছ রহিয়াছে। কিন্তু খাওয়ার জন্য যেসব জাতীয় মাছ ধরা হয় তাহাদের সংখ্যা সীমিত। সমুদ্রজাত মৎস্যের মধ্যে ইলাসমোব্রঞ্চেশ (elasmobranches) ইল (eel), ক্যাট ফিস (cat fish), সিলভার বার (silver bar), হেরিং (herring), বোম্বে ডাক (bombay duck), ম্যাকারেল (mackerel), সিলভার বেলি (silver belly), পমফ্রেট (pomfret), মুলেট (mullet), স্যামন (salmon), জু ফিস (jew fish), ক্রাস্টেশ্‌ন্‌ (crustacean) প্রভৃতি পনেরোটি প্রধান।

বিভিন্ন জাতীয় মাছ

আভ্যন্তরাণ মৎস্যকে ক্যাট ফিস (cat fish), প্রন (prawn), মুরেল (murrel), হেরিং (herring) প্রভৃতি আটটি প্রধান জাতে ভাগ করা হইয়া থাকে। অবশ্য আভ্যন্তরীণ মৎস্যের প্রায় শতকরা ৩৪ ভাগই হইতেছে কার্প-জাতীয় মাছ, যথা, রুই, কাতলা, মিরগেল, কালিবাউস
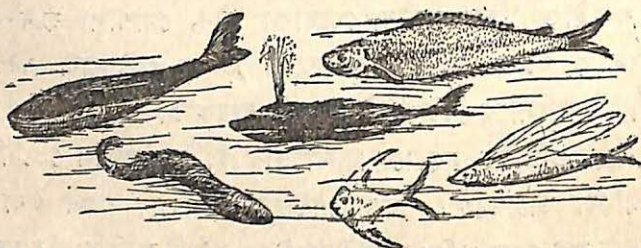
সামুদ্রিক মৎস্য

প্রভৃতি। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ মৎস্যের শতকরা প্রায় ৭২ ভাগই আসে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসাম হইতে।
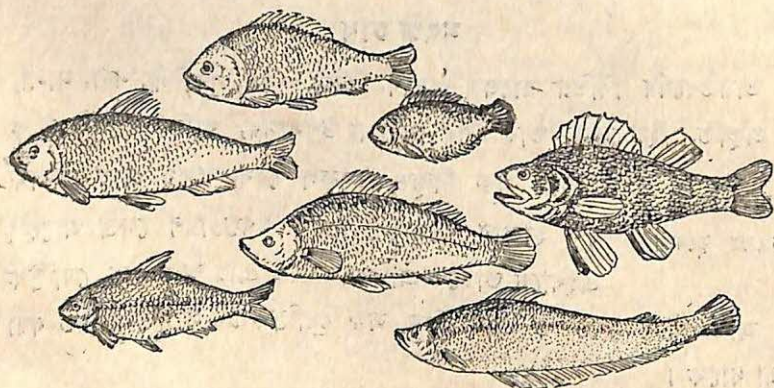
আভ্যন্তরীণ মৎস্য

মাদ্রাজ, গুজরাট, কানাড়া, মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলে এবং মান্নার উপসাগরে প্রধানত সামুদ্রিক মৎস্য শিকার হইয়া থাকে।

মৎস্যের প্রয়োজনীয়তা

পরিপূরক খাদ্য হিসাবে মৎস্য একটি বিশিষ্ট স্থানে রহিয়াছে। মৎস্য আহার দ্বারা আমরা প্রাণিজ প্রোটিন সংগ্রহ করিতে পারি। প্রোটিনযুক্ত খাদ্যদের মধ্যে মৎস্য সহজপাচ্য; দুর্বল পাকস্থলীর ইহা বিশেষ উপযুক্ত। বাঙ্গালীর যে ইহা জাতীয় খাদ্য তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অধিকাংশ বাঙ্গালীই প্রতিদিন মাছ খাইতে না পাইলে অসুবিধা বোধ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষকে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে পরিমাণ মাছ খাওয়া প্রয়োজন, আমরা সে পরিমাণ মাছ খাই না। বছরে ভারতবাসী মাথা পিছু মাছ খাইয়া থাকে মাত্র ৩'৯৮ পাউণ্ড। অবশ্য ইহার কারণ, খাদ্যাভ্যাস ও ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে মাছের ব্যবহার খুবই কম (উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি)।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেরালার লোকেরা মাথা পিছু সব চাইতে বেশী মাছ খাইয়া থাকেন (২১ পাউণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা মাথা পিছু ১৩ পাউণ্ড মাছ খাইয়া থাকে।

খাদ্যের যোগান ছাড়াও মৎস্যাদি হইতে তেল, সার, পাকাশয় (maw) প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে তেল। বর্তমানে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে হাঙ্গরের তেল ও সার্ডিন তেল তৈরী হইয়া থাকে। রং, নরম সাবান তৈরী, পশুর চামড়া নরম করা প্রভৃতি কাজে এই তেল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৎস্যের যকৃৎজাত তেলে প্রচুর পরিমাণে 'এ' ও 'বি' ভিটামিন থাকায় ক্ষয়জাত রোগের চিকিৎসায় ইহা অপরিহার্য। মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও কেরালা সরকার প্রচুর পরিমাণে হাঙ্গরের যকৃতের তেল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্যামন, জু ফিস, ক্যাট ফিস প্রভৃতি হইতে ইসিন গ্লাস (Isin-glass) নামক যে পদার্থ তৈরী হয়, মদ পরিষ্কারের জন্য তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজের পূর্ব উপকূল ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে এই ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

ছোটো ছোটো মৎস্যাদিকে পশ্বাদির জন্য অতিরিক্ত প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হিসাবে রূপান্তরিত করা হইয়া থাকে। যেসব মাছ নষ্ট হইয়া যায় তাহাদের

পচাইয়া বা মাছের ডানা, হাড়, আঁশ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ভালো সার তৈরী করা হয়। এতদ্ব্যতীত, মৎস্য শুষ্ক করা বা লবণাক্ত করাও ভারতবর্ষের মৎস্য-সংক্রান্ত একটি বিশেষ শিল্প।

মৎস্য চাষের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

আমাদের দেশের মৎস্য চাষের প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাহার সদ্ব্যবহার হইতেছে না। খাল, বিল, পুষ্করিণী, নদী, নালা, হ্রদ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেই আভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের সুযোগ থাকে; আর সমুদ্রের উপকূল লম্বা হইলে এবং তাহা মৎস্য-শিকারের উপযুক্ত হইলে সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের সুবিধা থাকে। ভারতবর্ষে দুইই রহিয়াছে।

কিন্তু ইহার সুযোগ আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আমাদের সমুদ্র উপকূলের মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত দরিদ্র; তাহারা একটু দূর সমুদ্রে মাছ ধরার উপযুক্ত নৌকা সংগ্রহ করিতে পারে না। ফলে উপকূল হইতে ৬০-৭০ ফিট দূরে যাওয়া তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মাছ ধরার জাল ও যন্ত্রপাতিও তাহাদের নাই। তারপর সমুদ্র উপকূলে প্রচুর মাছ ধরা পড়িলেও উহা দেশের সর্ব্বত্র দ্রুত পাঠাইবার মত যান-বাহনের অভাবও আমাদের দেশে রহিয়াছে। কি ভাবে একটু গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিতে হয় সে জ্ঞানও আমাদের নাই।

আভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের কাজেও আমরা অনগ্রসর। মনে রাখিতে হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গ আভ্যন্তরীণ মৎস্যের উপরই নির্ভরশীল। কারণ গঙ্গার মোহনা ব্যতীত, পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রোপকূল নাই। নদী-নালা প্রভৃতির মাছ বৃদ্ধি করিতে হইলে, মাছেদের যখন ডিম পাড়ার সময়, তখন মাছ ধরা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কারণ মাছেরা প্রচুর পরিমাণে ডিম ছাড়িলে নদী-নালায় মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আবার পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গা; ইহা অল্প দূরে গিয়াই সমুদ্রে পড়িয়াছে। তাই বাঙ্গালীর প্রিয় মাছ ইলিশ সমুদ্র হইতে আসিয়া এই নদীতে প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়িত। কিন্তু বর্তমানে পলি পড়িয়া গঙ্গা নদী অগভীর হইয়া পড়ার জন্য এবং সমুদ্রের প্রভাবে ইহার জল লবণাক্ত হইয়া পড়ার জন্য মিষ্টি জলের আকর্ষণে ইলিশ মাছ আর সমুদ্র

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য চাষের বৈশিষ্ট্য

হইতে গঙ্গা নদীতে আকর্ষিত হইতেছে না। ফলে গঙ্গায় ইলিশ ধরার পরিমাণ আরও কমিয়া গিয়াছে।

মাছের দুষ্প্রাপ্যতার সময় ভেড়ি হইতে মাছ সরবরাহ করা পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য ব্যবসায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য। নীচু জমিতে বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া ভেড়ির সৃষ্টি হয় এবং সেখানে মাছ পোষা হয় ; প্রয়োজন মতো ঐ মাছ ধরিয়া বাজারে পাঠানো হয়। বর্তমানে জমিদখলের আন্দোলনের ফলে ভেড়ির বাঁধ কাটিয়া, উহাদের আবার চাষের জমিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং জমিহীন কৃষকেরা উহা দখল করিয়া নিয়াছে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া দুষ্প্রাপ্যতার কালে, মাছের সরবরাহ খুবই কমিয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে হ্রদ নাই, বিলের সংখ্যাও কম। তাই এখানে নদী-নালার পরই পুষ্করিণীর স্থান। ইহার উপর মাছের জন্য বিশেষ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু মূলধন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে পুষ্করিণীগুলিতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ হইতেছে না।

মৎস্য-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য-শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন :

১। রোহিতাদি প্রধান প্রধান মৎস্যের পোনা সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত জলাশয়ে রক্ষা করা।

২। কোনো রাজ্যে উদ্বৃত্ত পোনা থাকিলে, তাহা অন্য রাজ্যে প্রেরণ করিয়া উহার সদ্ব্যবহার করা।

৩। মৎস্যরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ মাছের ডিম পাড়ার সময় (মাস দেড়েক) নদী-নালার মাছ শিকার নিষিদ্ধ করা ; নিতান্ত শিশু মাছ ধরা বন্ধ করা ইত্যাদি।

৪। সমুদ্র উপকূল হইতে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ শিকারের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ, যন্ত্রচালিত নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা ; উপকূল ভাগে মৎস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

৫। মৎস্যের চালান ও রক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

৬। মৎস্য লবণাক্ত ও শুষ্ক করার উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ৪নং ও ৫নং ব্যবস্থা যথাযথভাবে অবলম্বন করিতে পারিলে এক জায়গার উদ্বৃত্ত মাছ দেশের অপর জায়গায় ব্যবহার করা যাইতে পারে ; এমন কি মাছকে

বিদেশে প্রেরণও অধিকতর সুবিধাজনক হইবে (উল্লেখযোগ্য যে বৈদেশিক রপ্তানিতে মাছ হইতে আমাদের বর্তমান আয় প্রায় ১৭ কোটি টাকা)।

৭। মৎস্য চাষ ও মৎস্য শিকার সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়া নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করা, যাহাতে মাছের ফলন ও পুষ্টি অধিকতর হয় এবং যাহাতে সমুদ্র হইতে অধিকতর মৎস্য শিকার করা যায়।

৮। মৎস্যজীবীদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের এবং বিশেষ করিয়া মৎস্যের চাষ ও শিকার সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশের মৎস্যজীবীদের অধিকাংশ এখনও নিরক্ষর।

৯। মৎস্যজীবীদের মধ্যে যৌথ মৎস্য চাষ প্রচলন করার চেষ্টা করা। যৌথ চাষব্যবস্থা প্রচলিত হইলে মৎস্যজীবীদের মূলধনের সমস্যা কিছুটা দূর হইবে।

সরকারী প্রচেষ্টা

মৎস্য চাষের উন্নতির বিষয়ে সরকার উদাসীন নহেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১ কোটি টাকা এবং রাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রে এবং প্রতি রাজ্যেই মৎস্য চাষ উন্নতির জন্য বিশেষ বিভাগ রহিয়াছে।

১৯৫৬ সালে, আমেরিকার নিকট হইতে ভারত সরকার ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা সাহায্য পান। আবার নরওয়ের নিকট হইতেও ৬৬ লক্ষ টাকা সাহায্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মৎস্য চাষের জন্য ১০ কোটি রাখা হয়। ফলে ১৯৫৬ সাল হইতে আমাদের দেশে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৬ সালে মাছের উৎপাদন ১০ লক্ষ মেট্রিক টন হইতে ১১ লক্ষ মেট্রিক টন হয় (১০% বৃদ্ধি পায়)। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাছের উৎপাদন হয় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন (৩০% বৃদ্ধি পায়)। কিন্তু ইহার পর মাছের উৎপাদন আর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নাই।

মৎস্য চাষে বিভিন্নভাবে আয়ে সাহায্য করা ব্যতীত এই বিষয়ে অনেকগুলি গবেষণা কেন্দ্রও সরকার স্থাপন করিয়াছেন।

মৎস্য-শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চালানোর জন্য কলিকাতায়

সেণ্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ রিসার্চ স্টেশন, মাদ্রাজের মণ্ডপমে সেণ্ট্রাল মেরাইন রিসার্চ স্টেশন, কোচিনে সেণ্ট্রাল ফিসারিজ টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ স্টেশন ও বোম্বাইতে ডিপ সীজ ফিসিং স্টেশন নামক চারিটি গবেষণাকেন্দ্রও স্থাপন করা হইয়াছে।

কুক্কুটাদি পক্ষীপালন

ভারতে প্রতিপালিত বিভিন্ন জাতীয় পাখীর মধ্যে পাতিহাঁস, রাজহাঁস, মুরগী, পেরু (Turkey) নামক মুরগীজাতীয় পাখী, পায়রা প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের মধ্যে অবশ্য সর্বপ্রধান মুরগী। ১৯৫৬ সালের গণনা অনুযায়ী ভারতে প্রায় নয় কোটি সত্তর লক্ষ কুক্কুটাদি গৃহপালিত পাখী রহিয়াছে। আমাদের দেশে কুক্কুটাদি পাখী বৈজ্ঞানিক প্রথায় পালিত হয় না। উন্নতজাতীয় হাঁস-মুরগীরও আমাদের দেশে অভাব। ইহাদের যথোপযুক্ত খাদ্যও দেওয়া হয় না। রোগে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা নাই। বৈজ্ঞানিক প্রথায় ডিম হইতে বাচ্চা জন্মানোর পদ্ধতিও আমাদের অজ্ঞাত। ফলে, পাশ্চাত্য দেশগুলির কুক্কুট-সম্পদের সহিত আমাদের কুক্কুট-সম্পদ কোনো-দিকেই তুলনা করা চলে না। কুক্কুট-সম্পদের মধ্যে মুরগীই শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে তিন কোটি ষাট লক্ষ মুরগী আছে। এইসব মুরগীর প্রতিটি গড়ে বছরে ৫৩টি করিয়া ডিম দিয়া থাকে। অবশ্য পৃথিবীর পক্ষীপালনে সেরা দেশগুলি যেখানে গড়ে বছরে এক একটি মুরগী ১২০টি করিয়া ডিম দিয়া থাকে, তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। কুক্কুটাদির মাংসও আমাদের দেশে খুব বেশী খাওয়া হয় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে গড়ে মাথাপিছু বাৎসরিক কুক্কুটমাংস প্রয়োজন হয় ২৯·৩২ পাউণ্ড, সেখানে আমাদের দেশে গড়ে মাথাপিছু প্রয়োজন হয় মাত্র ·২৯ পাউণ্ড। কুক্কুটাদি প্রতিপালনে ভারতে সবচাইতে অগ্রগামী মাদ্রাজ রাজ্য (২৫·২%)। তারপর যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ (১২·৬%), বিহার (১১·২%), আসাম (৮·৯%), গুজরাট ও মহারাষ্ট্র (৮·৫%) এবং মধ্যপ্রদেশ (৬%)। ভারতের সমস্ত হাঁসের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগই পশ্চিমবঙ্গ এবং মাদ্রাজেই পালন করা হইয়া থাকে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, পশ্বাদি প্রতিপালনে আমাদের দেশের যেসকল অঞ্চল অনগ্রসর, বা যে সকল অঞ্চলে পশ্বাদি ভালো জাতের হয় না, আশ্চর্যের বিষয়, কুক্কুটাদি কিন্তু সেইসব অঞ্চলেই বেশী প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

কুক্কুটাদি উন্নত পদ্ধতিতে পালনেও ভারত সরকার বিশেষ অগ্রণী হইয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই উদ্দেশ্যে পাঁচটি আঞ্চলিক খামার এবং ৩০০টি কুক্কুটাদি পাখী প্রতিপালনের প্রসার ও উন্নয়নমূলক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য প্রায় ২৫৯ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যকে উন্নত জাতের মুরগী সরবরাহ করিবার জন্য আমেরিকা হইতে একদিন-বয়স্ক ত্রিশ হাজার মুরগীর বাচ্চাও আকাশপথে আনানো হইয়াছে।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতীকরণ

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের দেশে গবাদি পশু পালন করা প্রধানত দুধের জন্যই। অথচ, তোমরা দেখিয়াছ, আমাদের চাহিদার তুলনায় কতো অল্প দুধই পাওয়া যাইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ, এতদিন পর্যন্ত দুগ্ধ সরবরাহ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের দায়িত্ব প্রধানত ব্যষ্টিগতভাবে গোয়ালারাই বহন করিয়াছে। উন্নতপ্রথায় উহা বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া, তোমরা জান, গবাদি পশুর উন্নয়নের জন্যও এদেশে এতদিন পর্যন্ত বিশেষ কোনো প্রচেষ্টাই হয় নাই। গোজাতির বা মেষজাতির সামগ্রিক উন্নতিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধসরবরাহ ও ঘি, মাখন, চীজ প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের দিকেও জাতীয় সরকার বিশেষ নজর দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে, প্রথম উন্নয়ন পরিকল্পনাকালে ৭·৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, ১৭·৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৬টি শহর এলাকায় দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায়, ৩০টি গ্রামীণ মাখনাদি তৈরীর কেন্দ্র ও ৮টি দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরীর কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, এই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাদি ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী সায়ান্স এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী কাউন্সিল, পাঞ্জাবে কর্ণালে ন্যাশন্যাল ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, বাঙ্গালোরে ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হইয়াছে।

তোমরা হয়তো জান যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে হরিণঘাটায় একটি দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতায় আর একটি দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্রেও কাজ শুরু হইয়াছে। ভারতের
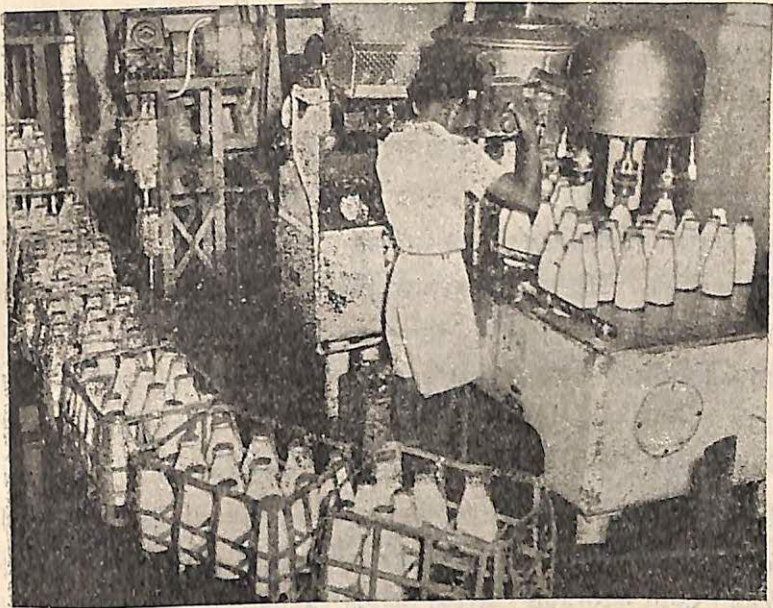
হরিণঘাটার দুগ্ধকেন্দ্র

বিভিন্ন স্থানেও দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র এবং ডেয়ারী স্থাপনের কাজ চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে, বোম্বের (Aarey Milk Colony), মাদ্রাজের (Madhavaran Milk Colony) এবং দিল্লীর (Central Dairy) দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আহমদাবাদ, পুনা, গুণ্টুর, চণ্ডীগড়, গয়া, আগরতলা ইত্যাদি আরও অনেক স্থানে দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র এবং ডেয়ারী প্রতিষ্ঠার কার্য অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের দেশের খাদ্যসমস্যার একটি প্রধান কারণ এদেশে খাদ্য সংরক্ষণের কোনো সুব্যবস্থাই প্রায় নাই। বিভিন্ন ঋতুতে যেসব ফল জন্মায় তাহা অনেক সময়ই প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া অপচয় হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয় তাহারও এক বিরাট অংশ পরিবহণের সুব্যবস্থার অভাবে অনেক সময় অন্যান্য অঞ্চলের চাহিদা মেটানোর কাজে লাগে না। দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

অবশ্য মাছের ব্যাপারে পূর্ব হইতেই মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে প্রাচীন প্রথায় মাছ কাটিয়া শুকাইয়া বা লবণ মিশাইয়া সংরক্ষণের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। মাখনাদির ব্যাপারেও বোম্বাইর

আমূল, পলসন কোম্পানী বা আলিগড়ের ক্যাভেণ্ডার কোম্পানী প্রভৃতি কতিপয় প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ার্থে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় এইসব ব্যবস্থা প্রায় নগণ্য।

খাদ্য সংরক্ষণ

আমাদের খাদ্যসমস্যার সমাধানের অন্যতম অঙ্গ হিসাবেই তাই আজ খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই শিল্প ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। প্রধানত দুইভাবে এই সংরক্ষণ কাজ হইয়া থাকে—(১) বিদেশের ন্যায় এদেশেও কাঁচা খাদ্যদ্রব্যাদিকে ভিনিগার প্রভৃতির সাহায্যে কৌটায় ভরিয়া অথবা ঐ সব খাদ্যদ্রব্যাদি হইতে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া (যথা, বিভিন্ন জেলি, জ্যাম, জুস্ প্রভৃতি) তাহা কৌটায় বা শিশিতে ভরিয়া সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এখনও পর্যাপ্ত নহে। (২) খাদ্যবস্তুর রূপ পরিবর্তিত না করিয়া, ঠাণ্ডা ঘরের (cold storage) ব্যবস্থা করিয়া সেখানে কাঁচা খাদ্যদ্রব্যাদিকেও বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। এই প্রথায় খাদ্য সংরক্ষণের জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন শহরে ঠাণ্ডা গুদামঘরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং হইতেছে। সরকারও এই কার্যে বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। ইহার ফলে অবশ্য একদিকে যেমন অনেক ফল, মাছ প্রভৃতি খাদ্য অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে এবং অসময়ের খাদ্য পাওয়া যাইতেছে, তেমনি আবার অন্যদিকে মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের আরও লাভ করিবার প্রচেষ্টার ফলে বহু কাঁচা মাল ঠাণ্ডাঘরে আবদ্ধ হইয়া দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে ঠাণ্ডাঘর জনকল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডাকিয়া আনিবে।

অনুশীলনী

(কৃষিসংশ্লিষ্ট কার্য্যাদি)

১। ভারতের এবং বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য-শিল্পের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা কর। (S. F. 1965, Comp.) (উঃ—পৃঃ ১৬২)

২। মৎস্য-শিল্পের উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক কি কি অবস্থা প্রয়োজনীয় আলোচনা কর। (S.F.1968) (উঃ—পৃঃ ১৬২-৬৪)

৩। ভারতে দুগ্ধ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (উঃ—পৃঃ ১৬৬-৬৮)

আমাদের বনজ দ্রব্যাদি

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে বনজ দ্রব্যাদির দানও কম নহে। দেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অথবা প্রায় ২.৮ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চল বনাবৃত। এই বহুবিস্তৃত বন হইতে প্রতি বৎসরে ৫০ কোটি কিউবিক ফিট শক্ত কাঠ এবং ৫ কোটি কিউবিক ফিট নরম কাঠ ছাড়াও নানাপ্রকারের ওষধি এবং কাগজ, দেশলাই, রবার, তারপিন তেল প্রভৃতি তৈরীর কাঁচা মাল পাওয়া যায়। বনের কল্যাণে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের জীবিকার সংস্থান হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পরোক্ষভাবে অরণ্যের প্রয়োজনীয়তাও কম নহে। অরণ্য বৃষ্টির জলধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহার বেগ কমাইয়া দেয়। ফলে, মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ হয়, বন্যার কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নদীগর্ভে কম পলি সঞ্চিত হয়। জলবায়ুর উপর অরণ্যের প্রভাব সামান্য নহে। অরণ্য অধিক বৃষ্টিপাত ঘটাইতে সাহায্য করে এবং জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন করিয়া তোলে।

অরণ্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা

ভৌগোলিক অবস্থিতি, মাটির প্রকৃতি আর জলবায়ুর বিভিন্নতার ফলে অরণ্যের প্রকৃতিও বিভিন্ন হইতে পারে। সেই কারণে আমাদের দেশের জলবায়ুর বৈচিত্র্য অনুযায়ী অরণ্যানী আবার বিভিন্ন জাতের। যে-সব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয় সেখানে চিরহরিৎ ঘন বন; মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ভেজা পর্ণমোচী বৃক্ষের বন; আবার যেখানে বৃষ্টিপাত খুবই কম সেখানে শুধুই শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষ বা কাঁটাগাছের বন। যেমন, যে জাতীয় পাথর চূর্ণ হইয়া মাটির সৃষ্টি করিয়াছে, সেই মাটির উপর কি জাতীয় বৃক্ষের বন সৃষ্ট হইবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে। আবার জায়গাটা সমতল কি পার্বত্য তাহাও বনকে প্রভাবান্বিত করে। জলবায়ুর মধ্যে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের ফলেই বনের প্রকৃতির পার্থক্য হয়।

অরণ্যের বিভিন্নতার কারণ

উপরিউক্ত তিনটি কারণের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিভিন্নজাতীয় অরণ্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে মোটামুটিভাবে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) **পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য**—প্রধানত সরলবর্গীয় বৃক্ষের এই অরণ্যে প্রধান গাছ হইতেছে দেওদার, স্প্রুস, চিলপাইন, সিলভার ফার প্রভৃতি। তাছাড়া, নানারকমের ওকগাছ, রোডোডেনড্রন গাছ, চিরপাইন গাছ প্রভৃতি এখানে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে নানাজাতীয় লরেন্স, শিরীষ, কাঞ্চন প্রভৃতি গাছের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।
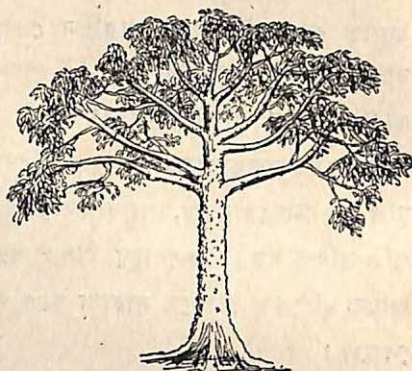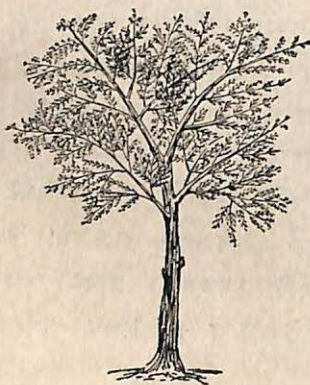
(২) **পূর্ব হিমালয়ের অরণ্য**—এই অরণ্যের প্রধান গাছ সিলভার ফার। এর ফাঁকে ফাঁকে আছে নানাজাতীয় রোডোডেনড্রন গাছ। নিচের

দিকে আছে বিভিন্ন রকমের ওক গাছ, ইউট্রি, স্প্রুস গাছ প্রভৃতি। আরও নিচে দেখা যায় লাল ও সাদা চাঁপা, চেষ্টনাট, পিপলি, শিরীষ, শিমূল প্রভৃতি বৃক্ষ।

(৩) **শাল অরণ্য**—শাল অরণ্য দুইটি সারিতে বিস্তীর্ণ। এক সারি হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে দেরাদুন অঞ্চল হইতে পূর্বে কুমায়ুন, নেপাল, তরাই, ডুয়ার্স, গোয়ালপাড়া হইয়া গারো পাহাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। আর এক সারি মধ্য প্রদেশ হইতে শুরু করিয়া পূর্বে সিংভূম, উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া হইয়া পূর্ব পাকিস্থান পর্যন্ত, এবং দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৪) **সুন্দরবনের অরণ্য**—ইহাকে বলা হইয়া থাকে জোয়ারের অরণ্য। এই অঞ্চলে জোয়ারের সময় জল দাঁড়ায়, ভাটার সময় জল নামিয়া গিয়া হয় কাদা। এইজাতীয় মাটিতে কেওড়া, সুন্দরী, গরাণ, গেঁউয়া প্রভৃতি গাছ ছাড়া অন্য গাছ বাঁচিতে পারে না। এখানকার অরণ্য প্রধানত এইসব গাছের।

(৫) **পাঞ্জাব ও রাজস্থানের অরণ্য**—এই শুষ্ক অঞ্চলে বাবলা ও কুল-জাতীয় বৃক্ষের বনই শুধু দেখা যায়।

(৬) **দাক্ষিণাত্যের অরণ্য**—মধ্য ভারত হইতে দক্ষিণাঞ্চলে সেগুন, ধাওরা, বিজাশাল, কদম প্রভৃতি পর্ণমোচী গাছের বনই প্রধান।

আলোচনা আরও একটু বিশদ করার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হিসাবে অরণ্য অঞ্চলের বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

১। মধ্যপ্রদেশ—এখানে ৭০টি অরণ্য অঞ্চল রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১২টি সরকারী সংরক্ষিত ; ৩২টি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট থাকায় বর্তমানে ব্যবহার নিষিদ্ধ ; ২৬টি অরণ্য অঞ্চল প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়।

২। আসাম—আসামে মোট অরণ্য অঞ্চলের সংখ্যা ৩১টি। এখানে কোন সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চল নাই। ৭টি অরণ্য ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য রাখা হইয়াছে এবং ২৪টি বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

৩। উড়িষ্যা—এখানে ২১টি অরণ্য অঞ্চল রহিয়াছে, ১১টি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য এবং ১০টি সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। বর্তমানে ব্যবহারের জন্য কোন অরণ্য অঞ্চল নাই।

অন্যান্য রাজ্যের অরণ্য অঞ্চলের তালিকা নিচে দেওয়া হইল—

রাজ্যের নাম	অরণ্যের মোট সংখ্যা	ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত	সরকারী সংরক্ষিত	জনসাধারণের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত
৪। বোম্বাই	২৬	২০	১	৫
৫। অন্ধ্রপ্রদেশ	১৮	১৫	২	১
৬। বিহার	১৩	১	১	১১
৭। উত্তর প্রদেশ	১৩	১০	২	১
৮। মহীশূর	১২	১০	২	১
৯। কাশ্মীর	১১	১০	০	১
১০। তামিলনাড়ু	৯	৮	১	০
১১। পশ্চিমবঙ্গ	৫	৩	০	২
১২। পাঞ্জাব	৫	১	৫	০
১৩। কেরালা	৫	৪	০	০
১৪। হিমাচল	৩	১	২	০
১৭। ত্রিপুরা	৩	১	২	০
১৬। আন্দামান	৪	২	২	০

বনজ সম্পদের ব্যবহার

এই বিচিত্র বনজ সম্ভারকে মানুষ বহুভাবে তাহার বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর কাজে লাগাইয়া থাকে। প্রথমেই কাঠের কথা ধরা যাক।

কাঠ

প্রধানত বড়ো বড়ো গাছ কাটিয়া যে কাঠের তক্তা বাহির করা হয় তাহা বাড়ীর দরজা, জানলা, কড়ি, বরগা, দেয়াল, মেঝে, পুলের পাটাতন, রেলিং ; ঘরের বা বেড়ার খুঁটি, রেলওয়ে স্লীপার ; সেচ খালের মাঝের দরজা, নদীর বাঁধের ধার ; তেলের ঘানি, চরকা, তাঁত ; জাহাজ, নৌকা, মাস্তুল, দাঁড়, হাল ; চেয়ার, টেবিল, আলমারী, আলনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের আসবাব ; গোরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রেলগাড়ীর বিভিন্ন অংশ ; বাটি, থালা, চামচ, খেলনা, শৌখীন বাক্স, মূর্তি ; পেন্সিল, কলম, দেশলাই বাক্স ও কাঠি ; চাষের কাজের জন্য লাঙ্গল, মই, জলসেচের জন্য ডোঙ্গা ; বন্দুকের বা অন্য অস্ত্রের হাতল ; হারমোনিয়াম, বেহালা, সেতার প্রভৃতি বাজনার খোল ; ক্রিকেট, হকি, টেনিস প্রভৃতি

খেলার সরঞ্জাম—ইত্যাদি হাজারো রকমের জিনিস তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঠের মণ্ড (ঘাস এবং বাঁশের মণ্ডও) কাগজ তৈরীর প্রধান উপাদান। কাঠের উর্ধ্বপাতিত ও ক্ষারিত দ্রব্যাদির মধ্যে চন্দনের তেল, দেওদার গাছের তেল, খয়ের, অগুরু কাঠের আতর, পাইন ও সেগুন হইতে আল-কাতরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রায় সব কাঠই জ্বালানী কাঠ হিসাবেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অরণ্যে যে বাঁশ পাওয়া যায় তাহা ঘরের খুঁটি, বেড়া প্রভৃতির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, বাঁশ হইতে চাটাই, ধামা, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরী হয়। নদীপ্রধান অঞ্চলে বাঁশ বাঁধিয়া যে চালি (raft) তৈরী হয় তাহাতে নদীর উপর চলাচল করা যায়। এছাড়া, বাঁশের মণ্ড হইতে যে কাগজ তৈরী করা হয় সে কথাতো আগেই তোমাদের বলা হইয়াছে।

বাঁশ

ঘাসের ব্যবহার প্রধানত তিন রকমের। ঘাসের মণ্ড হইতে কাগজ তৈরী তো করা হয়ই, ঘাস দিয়া ঘর ছাওয়াও হইয়া থাকে। আবার রোশা ঘাস বা লেমন ঘাস হইতে এসেন্সও তৈরী করা হয়।

ঘাস

অল্প বাতাসের মধ্যে কাঠ পোড়াইলে কাঠকয়লা ছাড়াও পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড নামক যে পদার্থ পাওয়া যায়, উহা হইতেই অ্যাসেটিক এসিড, ক্রিয়োজোট, পিচ, আলকাতরা প্রভৃতি উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। চন্দন তেল, অগুরু তেল প্রভৃতি এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই বনজ দ্রব্যাদি হইতে উৎপন্ন করা হইয়া থাকে।

বনজ দ্রব্যাদি হইতে রাসায়নিক দ্রব্য

বাবলা, পলাশ, জিওল প্রভৃতি গাছের রস হইতে আঠা এবং শাল, সলাই প্রভৃতি গাছ হইতে রজন পাওয়া যায়। পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্যজাত পাইন গাছ হইতে রেজিন নামক যে জিনিস বাহির করা হয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা হইতে তার্পিন তেল ও রজন পাওয়া যায়। রবার অবশ্য খুব বেশী আমাদের অরণ্য হইতে পাওয়া যায় না।

ভারতের বিভিন্ন বনজ গাছ-গাছড়া হইতে অসংখ্য প্রকার ওষধি ইত্যাদি তৈরী করা হইয়া থাকে। যথা, কুরচি হইতে আমাশয়ের ঔষধ, বাসক হইতে জ্বর ও কাশির ঔষধ, চিরেতা হইতে টনিক, জরিনা হইতে ব্ল্যাকওয়াটার জ্বরের ঔষধ প্রভৃতি।

বনজ ঔষধ

বনজ ফল-ফুলের মধ্যে চালতা, মহুয়া ফুল, আমড়া, কুল, স্ট্রবেরী, ডুমুর, আমলকী, আখরোট প্রভৃতি মানুষ খাদ্যহিসাবেও গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রায় সবরকম বাঁশ, বেত প্রভৃতিই চুপড়ি, টুকরি ইত্যাদি তৈরীর কাজে লাগিয়া থাকে। অনেক সময় বড়ো বড়ো ঘাস, বনঝাউ, নিসিন্দে, পলাশ, কাঞ্চন, শাল প্রভৃতি গাছের পাতা দিয়াও এই কাজ হইয়া থাকে।

বনজের অন্যান্য ব্যবহার

সর্বশেষে, বন হইতে যেমন বিভিন্নজাতীয় পশু শিকার করিয়া খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো যায়, তেমনি আবার কুলজাতীয় গাছে একজাতীয় কীট যে গালা তৈরী করে, বা বনের সুউচ্চ গাছে মৌমাছিরা যে মধু ও মোম সংগ্রহ করিয়া জড় করে, সেগুলিও মানুষের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইয়া থাকে। এছাড়া পশুমাংসের কথা বাদ দিয়াও হরিণের শিং, হাতীর দাঁত প্রভৃতিও মানুষের নানা কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতের বনসম্পদ যে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো হইয়া থাকে একথা মনে করা ভুল হইবে। ফরাসী দেশে যেখানে একরপ্রতি বছরে ৫৬·৮ কিউবিক ফিট কাঠ পাওয়া যায়, বা জাপানে ৩৭ কিউবিক ফিট বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ কিউবিক ফিট, সেখানে ভারতের অরণ্য হইতে প্রতি একরে পাওয়া যায় মাত্র ২·৫ কিউবিক ফিট কাঠ। তাছাড়া, অন্যান্য বনজ দ্রব্যাদির তালিকা পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় বনজ উৎপন্ন দ্রব্যাদি একটি ছোটো অংশ পরিপূরণে মাত্র সমর্থ হয়। ইহার অন্যতম কারণ, বিদেশী শাসকদের আমলে তাহাদের স্বার্থে এদেশে যে পরিমাণ বন কাটিয়া ফেলা হইয়াছে সেই পরিমাণ নূতন বন আবাদ করা হয় নাই। বস্তুত, রাশিয়ায় যেখানে মাথাপিছু (per capita) বনের আয়তন ৩·৫ হেক্টর (১ হেক্টর = ২·৪৭১ একর), বা আমেরিকায় ১·৮ হেক্টর, ভারতবর্ষের মাথাপিছু বনের আয়তন সেক্ষেত্রে মাত্র ·২ হেক্টর। ইহার ফলে শুধুই যে বনজসম্পদলাভে আমাদের দেশ বঞ্চিত হইতেছে তাহাই নহে, বনের অনুপস্থিতির ফলে একদিকে যেমন মৃত্তিকা ক্ষয়ীকরণও দ্রুততর হইতেছে, তেমনি বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমিয়া যাইতেছে। অরণ্যের ধ্বংস বন্যাও ডাকিয়া আনে। ইহা ব্যতীত অসংখ্য শিল্প কাঁচা মালের জন্য অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। এই সকল কারণে অরণ্যের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী।

আমাদের দেশে বনজ সম্পদের ব্যবহার

এইসব কারণে ১৯৫২ সালে ভারত সরকার একটি জাতীয় বননীতি ঘোষণা করেন (National Forest Policy Resolution, 1952)। এই নীতি অনুসারে ভারতের বনাঞ্চল ২২% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩৩.৩% করা হইবে স্থির হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতের ⅓ অংশ বনাঞ্চল হইবে। পাহাড় অঞ্চলে বনভূমির বৃদ্ধি হইবে ৬০% আর সমতল অঞ্চলে তাহা হইবে ২০%।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫০ হাজার একর জমিতে দেশলাই-এর কাঠের উপযোগী গাছ লাগানো হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আর ২ লক্ষ একর জমিতে বাণিজ্য উপযোগী কাঠের গাছ লাগানো হইবে। যে সব বনাঞ্চল ব্যক্তি-সম্পত্তি এবং ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে না, সেইগুলি সরকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, নিম্নলিখিতরূপে বনাঞ্চল বৃদ্ধি করা স্থির হইয়াছিল :

১। উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ—৫০ হাজার একরব্যাপী শাল ও সমজাতীয় গাছ রোপণ করা হইবে।

২। মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, মহীশূর ও বিহারে সেগুন ও অন্যান্য গাছ লাগানো হইবে।

প্রায় ১০ লক্ষ একর নষ্ট বনভূমি এই সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার করার সংকল্পও গ্রহণ করা হয়। বনের মধ্য দিয়া রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫০০০ মাইল এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৫০০০ মাইল বনপথ নির্মাণের সঙ্কল্প নেওয়া হয়।

এইসব কারণেই ভারত সরকার বন সংরক্ষণ ও নূতন নূতন বৃক্ষ রোপণের বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৫২ সালে বন-সংক্রান্ত যে নীতি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের জমিতে বনের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কোথায় কি পরিমাণ জমিতে বন আবাদ হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই অনুসারে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায়, যেখানে মৃত্তিকার ক্ষয় একটা বড়ো সমস্যা নহে, সমগ্র অঞ্চলের শতকরা ২০ ভাগে বন আবাদ হইবে। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকাক্ষয় দুইই বেশী সেখানে অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ অঞ্চলে বন আবাদ করিতে হইবে। এর অর্থ হইতেছে, ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ

এলাকায় বনের আবাদ করা হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে উর্বর জমিতে গাছ লাগাইয়া জমিকে অরণ্যে পরিণত করা। যেসব জমিতে চাষ-আবাদ ভালো হয় না, সেইসব জমিকেই অরণ্যে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই চেষ্টা বিশেষভাবে চলিতেছে।

এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র প্রতি বৎসর বনমহোৎসব সপ্তাহ পালনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য জনসাধারণকে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করা। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফরেষ্ট্রী নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহার লক্ষ্য উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য বনবিভাগীয় কর্মী সৃষ্টি, বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে বন-সংক্রান্ত যেসব গবেষণাদি হইবে তাহার সমন্বয় বিধান, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অরণ্য নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনমত আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা, বর্তমানে যে অরণ্য রহিয়াছে তাহার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা। দেরাদুন, কোটাল, বাসদ, বেল্লারী, উটকামণ্ড, ছাতরা, চণ্ডীগড় ও আগ্রায় সেন্ট্রাল সয়েল কনজারভেশন বোর্ডের অধীনে যে সব প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সেগুলি মৃত্তিকা সংরক্ষণ-সংক্রান্ত কাজ ব্যাপকভাবে করিয়া চলিয়াছে। যোধপুরে অবস্থিত ডেজার্ট এফোরেস্টেশন রিসার্চ ষ্টেশনে নূতন নূতন বৃক্ষ রোপণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার কাজ পরিচালিত হইতেছে। ইহারই অধীনে রাজস্থানের নয়টি জেলায় নূতন নূতন বন আবাদ করিয়া মরুভূমির প্রসার রোধের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এছাড়াও, বনবিভাগীয় বিভিন্ন কার্যাদিতে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্মীদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট কলেজ, বাঙ্গালোর ফরেষ্ট কলেজ, কোয়েম্বাটুর ফরেষ্ট কলেজ ও দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট রেঞ্জার্স কলেজকে সমৃদ্ধতর করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

অনুশীলন

(আমাদের বনজ দ্রব্যাদি)

১। অরণ্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখ। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে প্রধান বনভূমিগুলি অবস্থিত ? (S. F. 1965)

(উঃ—পৃঃ ১৬৯-৭২)

২। ভারতের প্রধান অরণ্য অঞ্চলগুলি এবং ঐসকল অঞ্চল হইতে সাধারণত পাওয়া যায় এরূপ বনজ সম্পদগুলির বর্ণনা কর। (S.F. 1967)

(উঃ—পৃঃ ১৬৯-৭৪)

৩। ভারতের অরণ্য অঞ্চলগুলি প্রধানত কোথায় কোথায় অবস্থিত ? অরণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। ভারত সরকার অরণ্য সংরক্ষণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ? (S. F. 1970)

(উঃ—পৃঃ ১৭৪-৭৬)

তামা, বক্সাইট প্রভৃতি বহু খনিজেরও আকরস্থান। তারপরেই তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহীশূর ও কেরালার স্থান। মধ্যপ্রদেশেও কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের অন্যান্য নবসৃষ্ট পলিমাটি গঠিত অঞ্চলে খনিজ পদার্থ প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। একমাত্র আসামে কিছু পরিমাণে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজ্যহিসাবে খনিজ দ্রব্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কোথায় কোন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার একটি মোটামুটি তালিকা নিচে দেওয়া গেল :—

আসাম—পেট্রোলিয়াম, কয়লা, চুনাপাথর, সিলিম্যানাইট।

পশ্চিমবঙ্গ—কয়লা, লোহা, লবণ।

বিহার—কয়লা, লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বক্সাইট, ক্রোমাইট, চুনাপাথর, টাংস্টেন, এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট, কোয়ার্ট্জ্, ষ্টিয়াটাইট।

উড়িষ্যা—লোহা, কয়লা, এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট, সিলিম্যানাইট।

উত্তর প্রদেশ—বেলেপাথর, ক্ষারলবণ, কোয়ার্ট্জ্।

মধ্যপ্রদেশ—ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, চুনাপাথর, মারবেল, কয়লা, এ্যাসবেসটস, সিলিম্যানাইট।

রাজস্থান—লবণ, মারবেল, জিপসাম, কয়লা, গ্রাফাইট, এ্যাসবেসটস, সীসা, কোবাল্ট।

পাঞ্জাব—লবণ, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, জিপসাম।

জম্মু-কাশ্মীর—বক্সাইট, জিপসাম।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাট—লবণ, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, এ্যাসবেসটস, জিপসাম, লোহা।

কেরালা—মোনাজাইট, ইলমেনাইট, সিলিম্যানাইট, গ্রাফাইট।

মহীশূর—সোনা, রূপা, লোহা, এ্যাসবেসটস, বক্সাইট, ক্রোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ, গ্রাফাইট।

অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু—লবণ, ম্যাগনেসাইট, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট।

বলাবাহুল্য, এই তালিকায় শুধু প্রধান প্রধান খনিজেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিল্পোন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য

শিল্পোন্নয়নের জন্য দুইটি খনিজ সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হয়, ইহারা হইতেছে কয়লা ও লৌহ।

কয়লা ও তাহার ব্যবহার

কয়লা আমাদের দেশের সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ। কয়লা উৎপাদনে আমাদের স্থান এশিয়াতে দ্বিতীয় এবং পৃথিবীতে অষ্টম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খনি হইতে নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ ভারতবর্ষে ২,০০০ কোটি টন। কিন্তু সবশুদ্ধ নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, উৎকৃষ্ট জাতের নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ ভারতে মাত্র ৫০০ কোটি টন। নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার অনুপাতে, উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ খুবই কম। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত ভারতে মোট কয়লা উৎপন্ন হইত বৎসরে মাত্র ৩৬০ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ছয় কোটি টন করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সালে আমাদের দেশে কয়লার উৎপাদন ছিল ৬৫/৬ কোটি টন। কয়লা সম্পদ আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বেশীর ভাগ কলকারখানার কাজ ও রেলগাড়ী, স্টীমার প্রভৃতি এখনও কয়লার দ্বারাই চলে। এদেশে উৎপন্ন অর্ধেক কয়লা শিল্পকার্যে এবং ১/৩ অংশ রেলগাড়ী চলাচল প্রভৃতি কাজে ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট কয়লা রান্নার কাজে, বন্দর, নগর প্রভৃতিতে তাপবিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে লাগে। কয়লার খনিগুলি আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থানের যায়গাও বটে—প্রায় ৪ লক্ষ লোক কয়লার খনিতে কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কয়লা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে বোম্বাই, তামিলনাডু প্রভৃতি দূর অঞ্চলে কয়লা পাঠানো ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখিয়া থাকিবে যে রেলগাড়ীর ওয়াগনের অভাবের জন্য কয়লা পাঠানো যাইতেছে না বলিয়া কোনো কোনো স্থানে কয়লা-সংকট দেখা দিয়াছে। বর্তমানে নদীপথে নৌকার সাহায্যে কয়লা পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

তামা, বক্সাইট প্রভৃতি বহু খনিজেরও আকরস্থান। তারপরেই তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহীশূর ও কেরালার স্থান। মধ্যপ্রদেশেও কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের অন্যান্য নবসৃষ্ট পলিমাটি গঠিত অঞ্চলে খনিজ পদার্থ প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। একমাত্র আসামে কিছু পরিমাণে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজ্যহিসাবে খনিজ দ্রব্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কোথায় কোন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার একটি মোটামুটি তালিকা নিচে দেওয়া গেল :—

আসাম—পেট্রোলিয়াম, কয়লা, চুনাপাথর, সিলিম্যানাইট।

পশ্চিমবঙ্গ—কয়লা, লোহা, লবণ।

বিহার—কয়লা, লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বক্সাইট, ক্রোমাইট, চুনাপাথর, টাংস্টেন, এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট, কোয়ার্ট্‌জ্‌, ষ্টিয়াটাইট।

উড়িষ্যা—লোহা, কয়লা, এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট, সিলিম্যানাইট।

উত্তর প্রদেশ—বেলেপাথর, ক্ষারলবণ, কোয়ার্ট্‌জ্‌।

মধ্যপ্রদেশ—ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, চুনাপাথর, মারবেল, কয়লা, এ্যাসবেসটস, সিলিম্যানাইট।

রাজস্থান—লবণ, মারবেল, জিপসাম, কয়লা, গ্রাফাইট, এ্যাসবেসটস, সীসা, কোবাল্ট।

পাঞ্জাব—লবণ, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, জিপসাম।

জম্মু-কাশ্মীর—বক্সাইট, জিপসাম।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাট—লবণ, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, এ্যাসবেসটস, জিপসাম, লোহা।

কেরালা—মোনাজাইট, ইলমেনাইট, সিলিম্যানাইট, গ্রাফাইট।

মহীশূর—সোনা, রূপা, লোহা, এ্যাসবেসটস, বক্সাইট, ক্রোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ, গ্রাফাইট।

অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু—লবণ, ম্যাগনেসাইট, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, এ্যাসবেসটস, গ্রাফাইট।

বলাবাহুল্য, এই তালিকায় শুধু প্রধান প্রধান খনিজেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিল্পোন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য

শিল্পোন্নয়নের জন্য দুইটি খনিজ সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হয়, ইহারা হইতেছে কয়লা ও লৌহ।

কয়লা আমাদের দেশের সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ। কয়লা উৎপাদনে আমাদের স্থান এশিয়াতে দ্বিতীয় এবং পৃথিবীতে অষ্টম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খনি হইতে নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ ভারতবর্ষে ২,০০০ কোটি টন। কিন্তু সবশুদ্ধ নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, উৎকৃষ্ট জাতের নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ ভারতে মাত্র ৫০০ কোটি টন। নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার অনুপাতে, উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ খুবই কম। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত ভারতে মোট কয়লা উৎপন্ন হইত বৎসরে মাত্র ৩৬০ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ছয় কোটি টন করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সালে আমাদের দেশে কয়লার উৎপাদন ছিল ৬৪/৫ কোটি টন। কয়লা সম্পদ আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বেশীর ভাগ কলকারখানার কাজ ও রেলগাড়ী, স্টীমার প্রভৃতি এখনও কয়লার দ্বারাই চলে। এদেশে উৎপন্ন অর্ধেক কয়লা শিল্পকার্যে এবং ১/৩ অংশ রেলগাড়ী চলাচল প্রভৃতি কাজে ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট কয়লা রান্নার কাজে, বন্দর, নগর প্রভৃতিতে তাপবিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে লাগে। কয়লার খনিগুলি আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থানের যায়গাও বটে—প্রায় ৪ লক্ষ লোক কয়লার খনিতে কাজ করে।

কয়লা ও তাহার ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কয়লা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে বোম্বাই, তামিলনাড়ু প্রভৃতি দূর অঞ্চলে কয়লা পাঠানো ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখিয়া থাকিবে যে রেলগাড়ীর ওয়াগনের অভাবের জন্য কয়লা পাঠানো যাইতেছে না বলিয়া কোনো কোনো স্থানে কয়লা-সংকট দেখা দিয়াছে। বর্তমানে নদীপথে নৌকার সাহায্যে কয়লা পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতের ৯টি রাজ্যে কয়লার খনি রহিয়াছে; ইহাদের মোট সংখ্যা ৮৬০টি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ কয়লা উৎপাদনের স্থান। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লা প্রধানত বিটুমিনাস জাতীয়; ইহা একেবারে প্রথম শ্রেণীর কয়লা না হইলেও মোটামুটি ভাল। বিহারের ঝরিয়া অঞ্চলে এদেশের সর্বপ্রধান কয়লার খনিগুলি অবস্থিত। তাহার পরই পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জের খনিগুলির (মাত্র ১৫-১৬ মাইল দূরে) স্থান। এই দুই স্থানের খনি হইতে ভারতের প্রায় ৮০% কয়লা উৎপন্ন হয়। ইহাদের পর বিহারের বোকারো, করণপুরা, রামগড় ও গিরিডি প্রভৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল, রামনগর প্রভৃতি কয়লা খনির স্থান। অন্যান্য রাজ্যে কয়লা উৎপাদনের স্থান নিচে দেওয়া গেল—

বিভিন্ন রাজ্যে কয়লা উৎপাদন

১। উড়িষ্যা—তালচের; ২। আসাম—মাকুম; ৩। মধ্যপ্রদেশ—উমারিয়া, সিঙ্গারাউলি, মেহপানী; ৪। মহারাষ্ট্র—ওয়ার্ধা, ওয়ারোরা ও নাগপুরের নিকটবর্তী কাম্পাতের চারিপাশের খনি; ৫। অন্ধ্রপ্রদেশ—সিঙ্গরেণী; ৬। তামিলনাড়ু—আর্কট, সালেম; ৭। রাজস্থান—বিকানীর।

এদেশের কয়লা খনিগুলি একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকায়, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যগুলি কলকারখানার জন্য কয়লা ব্যবহারের সুযোগ পায় না। দূরের রাজ্যগুলিতে কয়লা নিয়া যাইতে হইলে খরচ পড়ে খুব বেশী। তাই ঐসব রাজ্যের কলকারখানা জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল।

শিল্পোন্নয়নে লৌহের প্রয়োজনও অপরিহার্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ মজুত আছে। ভারতে মজুত লৌহের পরিমাণ নাকি প্রায় ৮০০ কোটি টন। ভারতে যে পরিমাণ লৌহ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা দিয়া শুধু ভারত কেন সমগ্র পূর্ব এশিয়ার চাহিদা পূরণ সম্ভব। ভারতের লৌহ-খনিগুলি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত। মধ্য প্রদেশ ও মহীশূরের কয়েকটি অঞ্চলেও লৌহখনি আছে। মজুত কয়লার মতো লৌহের পরিমাণের তুলনায় লৌহের উৎপাদনও ভারতে কম। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ২০ লক্ষ টন লৌহ এবং ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই উৎপাদনে দেশের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটে

লৌহ

না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিনটি নূতন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় লৌহের উৎপাদন ভারতে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে লৌহের চাহিদাও দিন দিনই বাড়িতেছে। তথাপি প্রতি বৎসর ভারত হইতে কিছু পরিমাণ আকরিক লৌহ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

ম্যাঙ্গানিজ

লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক ও কাঁচ শিল্পে ম্যাঙ্গানিজের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই ধাতুতে ভারত যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ। একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোনো দেশে ভারতের মতো এত ম্যাঙ্গানিজ নাই। মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ উৎকৃষ্ট ধরনের।

অভ্রের উৎপাদনে ভারতের স্থান সর্বপ্রথম। বৈদ্যুতিক শিল্পে অভ্রের খুবই প্রয়োজন। কাঁচের বদলেও অনেক সময় অভ্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। ভারতে সব চাইতে বেশী অভ্র পাওয়া যায় বিহারে। তামিলনাড়ু ও রাজস্থানেও কিছু কিছু অভ্রের খনি আছে।

অভ্র

ভারতে স্বর্ণের উৎপাদন খুবই কম। স্বর্ণ উৎপাদনের জন্য মহীশূরের কোলার খনি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ুতেও কিয়ৎ পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। স্বর্ণের উৎপাদন আমাদের দেশে অল্প হইলেও ইহার দ্বারা আমাদের শিল্পের চাহিদা মোটামুটি মিটিয়া যায়। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে, স্বর্ণকে অলংকার হিসাবে পরিবার রীতি আমাদের মধ্যে খুব বেশী। তারপর স্বর্ণকে সঞ্চয় করিতেও আমরা দীর্ঘ দিন হইতে অভ্যস্ত। ফলে, বর্তমানে আমাদের দেশে স্বর্ণের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই, "গোল্ড কণ্ট্রোল অর্ডার" দ্বারা সরকার ১৪ ক্যারেটের অধিকতর বিশুদ্ধতাযুক্ত সোনার গহনা নূতন করিয়া নির্মাণ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিশুদ্ধ সোনা মজুত রাখাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

স্বর্ণ

ক্রোমাইট, বক্সাইট, জিপসাম, তামা, দস্তা, সীসা, টিন, গন্ধক ইত্যাদিও শিল্পবিস্তারের জন্য প্রয়োজন। ক্রোমাইট ব্যবহারের জন্য কোনো বিশেষ শিল্প এখনও আমাদের দেশে হয় নাই তাই আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ক্রোমাইট বিদেশে রপ্তানী হয়। বিহার, মহীশূর, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে ক্রোমাইট পাওয়া যায়। বক্সাইট দ্বারা অ্যালুমিনিয়াম তৈরী হয়। বিহার, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যে বক্সাইট পাওয়া যায়। যে পরিমাণ বক্সাইট আমাদের দেশে পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। জিপসামের প্রয়োজন হয় রাসায়নিক সার ও সিমেন্ট প্রস্তুতের কাজে। রাজস্থানে প্রচুর পরিমাণে এই খনিজ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সিংভূম অঞ্চলে (বিহার) তামা এবং জয়পুর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে সীসা ও দস্তা পাওয়া যায়। দেশ হিসাবে ইহাই আমাদের খনিজ প্রাপ্তির হিসাব।

অন্যান্য খনিজ

খনিজ তৈল

দেশের শিল্পোন্নয়নে পেট্রোলিয়ামের গুরুত্ব খুব বেশী। কলকারখানার যন্ত্রপাতি, যানবাহনাদি চালাইবার জন্য শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তির উৎস পেট্রোলিয়াম। পূর্বে কয়লা খনির নিকটে নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিত, কিন্তু শক্তি হিসাবে পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হইবার পর হইতে খনির নিকটে কলকারখানা গড়িয়া উঠিবার প্রয়োজন হয় না; কারণ পেট্রোলিয়াম নলযোগে দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠানো যায়।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ভারতে খনিজ তৈলের উৎপাদন বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন নূতন স্থানে তৈল সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দেশ বিভাগের পূর্বে আসামে এবং পাঞ্জাবে তৈলের খনি ছিল। দেশ বিভাগের পরে পাঞ্জাবের খনি পাকিস্থানে চলিয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে গুজরাট রাজ্যে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত স্থানে খনিজ তৈল পাওয়া যায়ঃ

১। আসামের উত্তর-পূর্ব অংশ—ডিগবয় ও তাহার নিকটে অবস্থিত নাহারকাটিয়া, হুগ্‌রিজান, মোরান প্রভৃতি স্থানে।

২। দক্ষিণ সুরমা উপত্যকা—বদরপুর, পাথুরিয়া, খাজিমপুর প্রভৃতি স্থানে।

৩। গুজরাট রাজ্যের কাম্বে উপসাগর অঞ্চলে—লুনেজ, বাদসের, এঙ্কলেশ্বর প্রভৃতি স্থানে।

তৈল শোধনাগার

খনি হইতে উৎপন্ন তৈল শোধিত করিয়া উহা হইতে পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, লুব্রিকেটিং অয়েল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বর্তমানে নিম্নলিখিত স্থানে তৈল শোধনাগার রহিয়াছে—

১। আসামে—নুনমাটি (গৌহাটির নিকটে)

২। বিহারে—বারাউনি

৩। অন্ধ্রপ্রদেশে—বিশাখাপট্টনম

৪। মহারাষ্ট্রে—ট্রম্বে

৫। গুজরাটে—কয়ালি (বরোদার পাশে)

৬। কেরালায়—কোচিন

৭। পশ্চিমবঙ্গে—হলদিয়া (স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে মাত্র)

অনুশীলন

১। ভারতের ছয়টি প্রধান খনিজ দ্রব্যের নাম কর। ভারতের প্রধান আকরিক লৌহ উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ লিখ। (S.F. 1965)

(উঃ—পৃঃ ১৮১-১৮৪)

২। ভারতের কয়লার আঞ্চলিক বণ্টন, ব্যবহার ও সঞ্চিত পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। (S. F. 1965, Comp.)

(উঃ—পৃঃ ১৮১-১৮২)

৩। ভারতের চারটি তৈলশোধনাগারের নাম কর। কাঁচামাল ঐ স্থানগুলিতে কোথা হইতে আসে? (S. F. 1968, Comp.)

(উঃ—পৃঃ ১৮৫)

৪। (১) শিল্পোন্নয়নে (ক) কয়লা এবং (খ) পেট্রোলিয়ামের গুরুত্ব নির্দেশ কর। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এই দুইটি খনিজ পাওয়া যায়। (S. F. 1969) (উঃ--পৃঃ ১৮১-১৮২, ১৮৪)

(২) স্ক্র্যাপ বইএর জন্য—

ভারতের ম্যাপ আঁকিয়া, কোথায় কোন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা দেখাও।

আমাদের শিল্প

শিল্প কাহাকে বলে

কৃষিজ, বনজ বা খনিজ দ্রব্যাদি অনেক সময়ই স্বভাবজ অবস্থায় আমাদের সকল চাহিদা মিটাইতে পারে না। আদিম অবস্থায় অবশ্য মানুষ প্রাকৃতিক উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া নিজেদের অভাব নিজেরাই মিটাইত। কিন্তু কালক্রমে যতই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, ততই যেমন তাহার চাহিদা বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে, তেমনি ঐ বহুবিচিত্র চাহিদা মেটানোর তাগিদে স্বভাবজ উপকরণাদিকে বিভিন্ন ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদিতে পরিণত করার তাগিদও অনুভূত হইয়াছে। আর ইহার ফলেই ঘটিয়াছে শিল্পের উদ্ভব। প্রকৃতপক্ষে বস্তুর (স্বভাবজাত বা কৃত্রিম) পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাকে মানুষের প্রয়োজন-উপযোগী করার নামই হইতেছে শিল্প। তাই সকল শিল্পের জন্যই আবশ্যক কাঁচা মাল বা উপাদান (বস্তু)। উপাদানের পরিবর্তন সাধনের নিমিত্ত আবার প্রয়োজন হাতিয়ার বা যন্ত্র, এবং কায়িক শ্রম বা ক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বয়ন শিল্পে উপাদান বা বস্তু সুতা বা রেশম বা পশম, যন্ত্র তাঁত, আর ক্ষমতা তাঁতীর পায়ের ও হাতের শক্তি অথবা এঞ্জিন বা মোটরের শক্তি।

কুটির শিল্প ও ভারী শিল্প

শিল্পে এই তিনের রকমফেরের উপর নির্ভর করিয়া শিল্পকে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যে শিল্পে বেশী দামী যন্ত্রাদি সরঞ্জাম দরকার হয় না, যাহার জন্য বেশী শ্রমিকেরও প্রয়োজন হয় না, আর যাহার উপাদান অল্প মূলধনেই সংগ্রহ করা যায়, তাহাকে বলা হয় কুটির শিল্প। অন্যদিকে, যে শিল্পে বিরাট বিরাট যন্ত্রাদির প্রয়োজন, প্রয়োজন বহু শ্রমিকের ও প্রচুর মূলধনের, তাহাকে বলা হইয়া থাকে ভারী শিল্প (heavy industries)। খুব সম্ভবত, এই জাতীয় শিল্পে উৎপাদনের জন্য ভারী ভারী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় বলিয়াই ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। অবশ্য কালক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্বে যেগুলি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল,

তাহাদের অনেকগুলিই বর্তমানে বিরাট আকারের যন্ত্রপাতির সাহায্যেই উৎপাদিত হইতেছে।

ভারী শিল্প

আমাদের দেশে স্বাধীনতালাভের পূর্বে বিশেষ কোনো ভারী শিল্প গড়িয়া ওঠার সুযোগ পায় নাই। কারণ বিদেশী শাসকেরা একদিকে যেমন এই দেশ হইতে কাঁচামাল সস্তায় সংগ্রহ করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে এই দেশের বাজারে চড়া দামে তাহাদের নিজেদের দেশের তৈরী মাল বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এই দেশে কোনো বৃহৎ শিল্প গড়িয়া ওঠার সম্ভাবনাকে সুনজরে দেখে নাই। কিন্তু দেশ স্বাধীনতালাভের পরেই এই
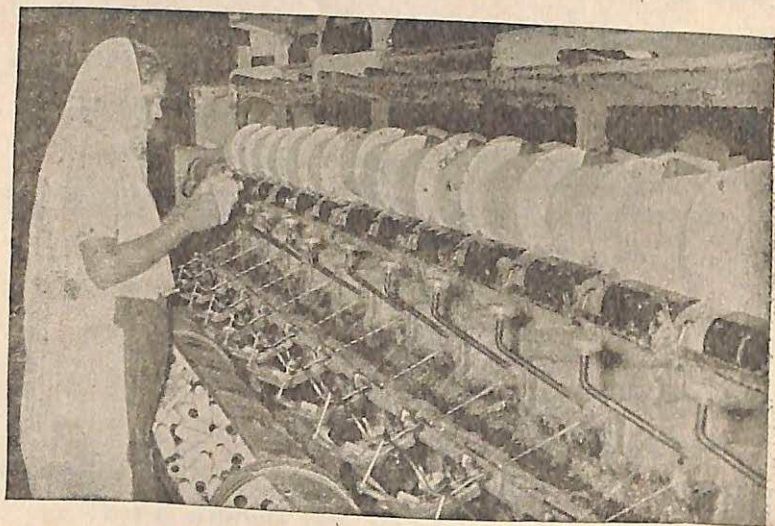
কাপড়ের কলের একাংশ

দিকে আমাদের জাতীয় সরকারের নজর পড়িয়াছে। দেশে কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক শিল্পায়নেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং হইতেছে আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় খনি ও বৃহৎ শিল্পখাতে মোট ১৭৯ কোটি টাকার জায়গায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮৯০ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ভারী শিল্পের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বেরই স্বীকৃতি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় সরকারের ভারী শিল্পসংক্রান্ত নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্বাধীনতালাভের পর প্রথমই প্রশ্ন উঠিল, এতদিন যেমন চলিয়া আসিতেছে—অর্থাৎ অর্থশালী লোকেরা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং দেশের স্বার্থ এবং শ্রমিকদের ভালো-মন্দের কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শুধু ব্যক্তিগত মুনাফার দিকে ষ্টি রাখিয়া শিল্প পরিচালনা করিতেছেন, তেমনি আর চলিবে না, সরকারই নিজে দেশের স্বার্থ, শ্রমিকদের স্বার্থের নিমিত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইবেন। স্বাধীনতা-লাভের পরই জাতীয় স্বার্থে ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল ভারত সরকার এক শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। তাহাতে শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানার সহিত সরকারী মালিকানার উপর জোর দেওয়া হয়, এবং শিল্পের মূল নীতি মুনাফা অপেক্ষা জনকল্যাণের দিকে ঘুরিবার সুযোগ লাভ করে।

আমাদের জাতীয় শিল্পনীতি

১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকার আর এক নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাতে ১৯৪৮ সালের শল্পনীতির পরিবর্তন করিয়া শিল্পের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃত্ব চালু করিয়া শিল্পোন্নয়নের অধিকতর দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই নূতন শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :—

(ক) প্রথম শ্রেণীতে নিম্নলিখিত যে ১৭টি শিল্প আছে তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে যেগুলিতে বেসরকারী মালিকানা সরকার অনুমোদন করিয়াছেন সেগুলি ছাড়া পুরাতন সব শিল্প সরকার নিজের হাতে আনিবেন এবং এই শ্রেণীর নূতন শিল্প সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে :—(১) অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দেশরক্ষার সরঞ্জাম; (২) আণবিক শক্তি; (৩) লৌহ ও ইস্পাত; (৪) লৌহ ও ইস্পাতের ভারী ঢালাই; (৫) কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন, খনি, যন্ত্রপাতি উৎপাদন, ও অন্যান্য মৌলিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম নির্মাণ; (৬) বৃহদাকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি; (৭) কয়লা; (৮) খনিজ তৈল; (৯) খনি হইতে লৌহের মাক্ষিক (ore), ম্যাঙ্গানিজ-মাক্ষিক, ক্রোম-মাক্ষিক, জিপসাম, গন্ধক, সোনা ও হীরক উত্তোলন; (১০) তামা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি খনি হইতে

সরকারী পরিচালনাধীন মূলশিল্প (key industries)

উত্তোলন ও কার্যোপযোগীকরণ; (১১) ১৯৫৩ সালের আণবিকশক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নির্দেশে উল্লিখিত খনিজসমূহ; (১২) বিমান; (১৩) আকাশপথ পরিবহণ ব্যবস্থা; (১৪) রেলপথ পরিবহণ; (১৫) জাহাজ নির্মাণ; (১৬) টেলিফোন ও টেলিফোনের তার, টেলিগ্রাফ ও বেতারের যন্ত্রপাতি; এবং (১৭) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও বণ্টন।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিম্নলিখিত ১২টি শিল্প স্থান পাইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে এই সব শিল্পে সরকার অধিকতর অংশ গ্রহণ করিবেন। অবশ্য সরকার কর্তৃক এই শ্রেণীর নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী প্রচেষ্টাও এই সব শিল্পের প্রসারের সুযোগ দেওয়া হইবে:—(১) ১৯৪৯ সালের খনিজ সুবিধা দান আইনে উল্লিখিত "অপ্রধান খনিজসমূহ" ছাড়া অন্যান্য খনিজ; (২) এলুমিনিয়াম ও উপরিউক্ত প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত লোহসম্পর্কহীন ধাতুগুলি বাদে অন্যান্য লোহসম্পর্কহীন ধাতু; (৩) যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম; (৪) লৌহমিশ্রিত ধাতু ও যন্ত্রের ইস্পাত; (৫) ঔষধ, রং, প্ল্যাষ্টিক প্রভৃতি রাসায়নিক পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মৌলিক ও মধ্যবর্তী পণ্যসমূহ; (৬) এ্যাণ্টিবাওটিক্‌স্ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ঔষধ; (৭) সার; (৮) কৃত্রিম রবার; (৯) কয়লার অঙ্গার-উৎপাদন (carbonisation of coal); (১০) রাসায়নিক মণ্ড (pulp); (১১) রাজপথ পরিবহণ; এবং (১২) সামুদ্রিক পরিবহণ।

সরকারী ও বেসরকারী পরিচালনাধীন শিল্প

(গ) উপরিউক্ত দুই শ্রেণীতে উল্লিখিত শিল্পসমূহ ছাড়া বাকী শিল্পগুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি হইতেছে, এইগুলি প্রধানত বেসরকারী পরিচালনাধীন থাকিবে। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাহারা যথাসম্ভব সরকারী আর্থিক সাহায্য পাইতে পারিবে। তাহা ছাড়া, সরকার প্রয়োজন বোধ করিলে এই শ্রেণীর কোনো শিল্পেরও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

বেসরকারী পরিচালনাধীন শিল্প

উপরিউক্ত শিল্পনীতি অনুযায়ী শিল্পোন্নয়নের ফলে আমাদের দেশে যে সব প্রধান প্রধান ভারী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে নিম্নে তাহাদের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল:—

(১) **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প**—বর্তমান সভ্যতাকে অনেক সময় লৌহ

সভ্যতা বলা হয়। লৌহ ব্যতীত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যানবাহনাদি, ঘরবাড়ী প্রভৃতি কিছুই প্রস্তুত হইতে পারে না। কাজেই প্রচুর পরিমাণে লৌহ নিজের আয়ত্তের মধ্যে না থাকিলে কেহ যন্ত্র সভ্যতায় অগ্রগামী হইতে পারে না। ভারতের লৌহ শিল্পকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারেঃ (ক) মৌলিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (basic iron and steel industries), এবং (খ) পুনর্গঠন লৌহ ও ইস্পাত (rerolling iron and steel industries)। লৌহপ্রস্তর হইতে যে কাঁচা লোহা ও ইস্পাত কারখানায় তৈরী হয় তাহাকেই মৌলিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পদ্রব্য বলা হয়। আর বৃহৎ ইস্পাত শিল্প যন্ত্রের ছোটো ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা লইয়া অথবা ভাঙ্গা গাড়ী, ভাঙ্গা লোহার জিনিস, ভাঙ্গা রেলের টুকরা প্রভৃতি হইতে যে সকল লৌহদ্রব্য পুনরায় গঠন করা হয় তাহাদের পুনর্গঠন লৌহ শিল্পদ্রব্য বলা হইয়া থাকে।

মৌলিক ও পুনর্গঠন : লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

স্বাধীনতালাভের পূর্বে এদেশে মৌলিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রধানত তিনটি কেন্দ্র ছিল—(১) পশ্চিমবঙ্গে হারাপুর, কুলটি ও বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ইস্পাত শিল্পের কারখানা, (২) বিহারের জামসেদপুর টাটা কোম্পানীর কারখানা, এবং (৩) মহীশূরে ভদ্রাবতীতে মহীশূর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কারখানা। লৌহ শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান এইসব অঞ্চলে সহজে ও সুলভে পাওয়া যাইবার ফলেই এই তিন জায়গায় লৌহ শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে বার্ণপুর অঞ্চলে লৌহখনি কিছু দূরে অবস্থিত হইলেও কয়লা অঞ্চল একেবারেই নিকটে। কয়লা আনিবার কোনো খরচ না থাকাতে লৌহের পরিবহণের জন্য যা কিছুটা বেশী খরচ হয় তাহাতে কোনো ক্ষতি হয় না। লৌহ গলাইবার জন্য আবশ্যকীয় বিদ্রাবক ম্যাঙ্গানিজ বা ডলোমাইটের প্রাপ্তিস্থান বার্ণপুর হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে। ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় মধ্য প্রদেশে আর চুনাপাথর ও ডলোমাইট আসে বিস্‌রা ও গাংপুর হইতে। এ অঞ্চলে যেমন শ্রমিক প্রচুর ও সুলভ, তেমনি দামোদর হইতে প্রয়োজনীয় জল পাইবারও সুবিধা আছে।

মৌলিক লৌহ শিল্পের কারখানা

জামসেদপুর কারখানার জন্য আবশ্যকীয় লোহার প্রাপ্তিস্থান

গুরুমহিষানি, সুলাইপেত, নোয়ামুণ্ডি, বাদাম পাহাড় অঞ্চল মাত্র ৫৫ মাইল দূরে, এবং কয়লা প্রাপ্তির স্থান ঝরিয়া অঞ্চল ১১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট, চুনাপাথর প্রভৃতির প্রাপ্তিস্থানও ১১০ মাইল অপেক্ষা দূরে নহে। নিকটেই সাঁওতাল পরগণা থাকায় সুলভে বিস্তর শ্রমিক পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া কারখানার নিকটেই খরখৈ ও সুবর্ণরেখা নদী থাকায় প্রয়োজনীয় প্রচুর জল পাইবারও কোনো অসুবিধা নাই। বস্তুত, এই সব সুবিধার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের এই অঞ্চল ভারতের প্রধান লৌহ শিল্প-অঞ্চল হিসাবে গড়িয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মহীশূরের কারখানার লৌহপ্রাপ্তিস্থান বাবাবুদান পাহাড়ে কেম্মানগুণ্ডি খনিও মাত্র ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় চুনাপাথরও মাত্র ১৪ মাইল দূরবর্তী ভাণ্ডিগুড্ডা হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ অঞ্চলে কোক কয়লার বিশেষ অভাব থাকায় উহার পরিবর্তে নিকটবর্তী বন হইতে কাঠ-কয়লা ও জগ জলপ্রপাত হইতে আহরিত জলবিদ্যুৎ শক্তি কারখানার কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বার্ণপুর, জামসেদপুর এবং মহীশূর এই কারখানা তিনটির বৎসরে ২২ লক্ষ ২১ হাজার টন কাঁচা লোহা (pig iron) ও ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার টন পাকা ইস্পাত (finished steel) প্রস্তুত করার ক্ষমতা আছে। [দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মহীশূরের কারখানার ইস্পাত উৎপাদন আরও এক লক্ষ টন বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।]

ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত তিনটি কারখানা ছাড়াও ভারত সরকার আরও তিনটি ইস্পাত তৈরীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

১। **উড়িষ্যার রাউড়কেল্লায় কারখানা**—কলিকাতা-নাগপুর রেল লাইনের মধ্যস্থলে রাউড়কেল্লা অবস্থিত। বিখ্যাত জার্মান কোম্পানী ক্রুপ ডেমাগের সহযোগিতায় ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত সরকার এই লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই রাউড়কেল্লায় সহজলভ্য। প্রথমত : রাউড়কেল্লার কাছেই প্রচুর পরিমাণ লৌহের আকর পাওয়া যায়। আসানসোল দূরে নহে এবং উহার সহিত রাউড়কেল্লা রেলওয়ে দ্বারা সংযুক্ত। সেখান হইতে কারখানার কাজের জন্য প্রয়োজনমতো কয়লা লইয়া

আসা তেমন ব্যয়সাপেক্ষ নহে। হিরাকুঁদ প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে; সেখানে উৎপন্ন বিদ্যুৎও কারখানার কাজে লাগে। চারিপাশের অধিবাসীরা শ্রমিকের কাজ করে। কাজেই লৌহ এবং ইস্পাত কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় লোহার আকর, কয়লা, জল এবং শ্রমিক সব কিছুই রাউড়-কেল্লায় সহজলভ্য। এই কারখানা প্রথম দিকে, বৎসরে পাঁচ লক্ষ টন এবং পরে বৎসরে দশ লক্ষ টন লোহা ও ইস্পাত উৎপাদন করিবে আশা করা যাইতেছে।

২। **মধ্যপ্রদেশে ভিলাই কারখানা**—ভারত ও রুশ সরকারের সহযোগিতায় প্রায় ১৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানার জন্য যাহা প্রয়োজন ভিলাইএর কারখানায়ও তাহা সহজলভ্য। এখানে কয়লা আসে কোরবা অঞ্চল হইতে এবং লৌহের আকর আসে ডাল্লিরাজহারা খনি হইতে। কারখানার জন্য স্থানীয় শ্রমিকেরও অভাব নাই।

৩। **পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুরে কারখানা**—কয়েকটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহযোগিতায় এবং প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত সরকার এই কারখানাটি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই কারখানার সুবিধা এই যে নিকটস্থ রাণীগঞ্জ হইতে উহা সহজেই কয়লা সংগ্রহ করিতে পারিবে। রাউড়কেল্লা খুব দূরে নহে; সেখান হইতে প্রয়োজনমতো লৌহের আকর আনা হইতেছে। দামোদর নদের সাহায্যে ষ্টিমার চলাচলের উপযুক্ত একটি খাল খনন করিয়া দুর্গাপুরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়ায়, দুর্গাপুর হইতে মাল আমদানী-রপ্তানী সহজ হইয়াছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে কাঁচা লৌহের উৎপাদন একেবারে কম না হইলেও লৌহজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে আমরা এখনও স্বাবলম্বী হইতে পারি নাই। লোহ দ্বারা ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে এখনও প্রস্তুত হইতেছে না। ছোটো ছোটো যন্ত্রপাতি কিছু কিছু প্রস্তুত হইলেও তাহা যথেষ্ট নহে। এখন আমাদের দেশে লৌহ দ্বারা ভারী ও পাতলা কড়ি, ভারী রেলের পাটি, টিন-প্লেট, লোহার তার, চাকা, স্প্রিং প্রভৃতি প্রস্তুত

লৌহদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী

হইতেছে। এদেশে এই উদ্দেশ্যে পাকা ইস্পাতের (finished steel) প্রয়োজন প্রতি বৎসরে প্রায় ২৪'৪ লক্ষ টন। কিন্তু আমরা প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ প্রস্তুত করিতে পারি। ফলে, অবশিষ্ট ইস্পাত আমদানী করিতে হয়। প্রধানত যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান হইতে আমরা এই সব জিনিস আমদানী করিয়া থাকি। অবশ্য কাঁচা লোহা ও ইস্পাত যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ও জাপানে রপ্তানী করাও হইয়া থাকে।

পুনর্গঠন লৌহশিল্প

এদেশের পুনর্গঠন লৌহ শিল্প দ্রব্যাদির মধ্যে টিন-প্লেট (লৌহপাতের উপর টিন লাগাইয়া টিন-প্লেট তৈরী হয়), দস্তামোড়া লৌহদণ্ড (galvanised iron bar), রেলপথের বল্টু, ওয়াগন, ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রধান। এজন্য আমাদের দেশে প্রায় ১৪২টি পুনর্গঠন লৌহ শিল্প কারখানা (rerolling mills) রহিয়াছে।

(২) **কার্পাস বয়ন শিল্প**—ভারতে বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অর্থপ্রসূ হইতেছে কার্পাস বয়ন শিল্প। মোটামুটি হিসাবে, ইহার মূলধন প্রায় ১২০ কোটি টাকা। প্রায় ৯ লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে কাজ করিয়া থাকে। এই শিল্পে নিযুক্ত মিলের সংখ্যা ৪৮২টি এবং এই সব মিলে এক কোটি ত্রিশ লক্ষের বেশী টাকু এবং দুই লক্ষের অধিক তাঁতের কাজ হইতেছে। ভারতবর্ষে উৎপন্ন কার্পাস দ্রব্যের মূল্য মোটামুটি হিসাবে প্রায় ৪০০ কোটি টাকারও অধিক।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের কার্পাস শিল্প : বোম্বাই

ভারতবর্ষে কার্পাস বয়ন শিল্পে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর হইতেছে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চল। এখানে প্রায় দুইশত মিল রহিয়াছে এবং ভারতবর্ষের মোট উৎপন্ন কার্পাসদ্রব্যের প্রায় অর্ধেক এই সব মিলেই প্রস্তুত হয়। মহারাষ্ট্রের বোম্বাই ও গুজরাটের আমেদাবাদ অঞ্চলে কার্পাস শিল্প কেন্দ্রীভূত হইবার কারণ, অবস্থান, মূলধন, শ্রমিক, কাঁচামাল এবং পরিবহণের সুব্যবস্থা—শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুরই এই দুই অঞ্চলে অপূর্ব যোগাযোগ ঘটিয়াছে। বোম্বাই বন্দরের অবস্থানের ফলে এই অঞ্চলে আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা যেমন বেশী, তেমনি বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনিবার পক্ষেও এই স্থানই নিকটতম। এই অঞ্চলের পার্শী সম্প্রদায় ইতিপূর্বেই ইংল্যাণ্ড ও চীনের মধ্যে তুলাসংক্রান্ত বাণিজ্যে

আংশিকভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, যখন এদেশে কার্পাস বয়ন-শিল্পের পুনরভ্যুত্থান ঘটে, তখন এই অঞ্চলের মিলগুলি ধনী পার্শী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রচুর মূলধন লাভে সমর্থ হয়। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল তুলা উৎপাদনের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র; সুতরাং কাঁচামাল প্রাপ্তির দিক দিয়াও এই অঞ্চলের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। বোম্বাই বা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সুলভে শ্রমিক সংগ্রহ করাও এখানকার মিলগুলির পক্ষে কষ্টকর হয় নাই। ইহা ব্যতীত এই অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু কার্পাস বয়নশিল্পের পক্ষে খুব সহায়ক।

মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের পরই কার্পাস শিল্পে দ্বিতীয় স্থান তামিলনাড়ু রাজ্যের। বলা হইয়া থাকে ভারতবর্ষের কার্পাস বয়নশিল্পে যে পরিমাণ সুতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশই নাকি ব্যবহৃত হয় তামিলনাড়ুতে। প্রথমদিকে অবশ্য প্রধানত এই অঞ্চলে সুতার কলই শুধু গড়িয়া উঠিয়াছিল; কয়লার অভাবে বড়ো বড়ো মিল স্থাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে এই অঞ্চলে যন্ত্র পরিচালনার জন্য শক্তির অভাব দূর হইয়াছে এবং বড়ো বড়ো কার্পাস বস্ত্র তৈরীর কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে তামিলনাড়ুতে ও অন্ধ্রপ্রদেশে মোট মিলের সংখ্যা প্রায় ১৪৫টি।

তামিলনাড়ু

পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস বস্ত্র বয়নের মিলগুলি প্রধানত কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটবর্তী হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলায় গড়িয়া উঠিয়াছে। নিকটবর্তী কলিকাতা বন্দরের অবস্থিতি প্রয়োজনীয় আমদানী-রপ্তানীর পক্ষে যেমন সহায়ক হইয়াছে, তেমনি কলিকাতা বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক ও ধনীব্যবসায়ীর মিলনস্থল হওয়ার ফলে এই শিল্পের মূলধন লাভেও বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। বাংলাদেশে স্বদেশী যুগে বিদেশী বস্ত্র ত্যাগের ও স্বদেশী বস্ত্র পরিধানের যে আন্দোলন শুরু হয়, তাহাও এই দেশে এই শিল্পকে গড়িয়া উঠিবার ব্যাপারে প্রচুর সহায়তা করে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে তুলার বিশেষ অভাব; ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল বা বিদেশ হইতে তাহাকে প্রয়োজনীয় তুলা আমদানী করিতে হয়। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে বোম্বাই বা তামিলনাড়ুর মতো কার্পাস বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি ঘটিতে পারে নাই।

পশ্চিমবঙ্গ

বোম্বাই, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য যেসব অঞ্চলে কার্পাস বয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মহীশূর, মধ্য প্রদেশ ও কেরালা। এ ছাড়া, পাঞ্জাব, দিল্লী, পণ্ডিচেরী, বিহার ও উড়িষ্যায়ও কয়েকটি করিয়া মিল স্থাপিত হইয়াছে।

কার্পাস বয়ন-শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র

বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিমাণ কাপড় তৈরী হয় নিজের দেশের মধ্যে বিক্রয় ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে তাহার একটি বৃহৎ অংশ রপ্তানী করা হইয়া থাকে। শুধু মধ্য বা সুদূর প্রাচ্যই নহে, ভারতবর্ষের কোনো কোনো কাপড় যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও রপ্তানী করা হয়। অন্যদিকে ১৯৪৯ সালের পর হইতে শাদা ধোওয়া ধুতি, কোরা কাপড়, রংঙ্গিন কাপড়, ছাপানো কাপড়, ছাতার কাপড় প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাপড় ছাড়া অন্য কাপড়ের আমদানী এদেশে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রধানত যুক্তরাজ্য, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি জায়গা হইতে এই সব কাপড় আমদানী করা হইয়া থাকে।

কার্পাস দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী

(৩) **পাট শিল্প**—পাট শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। বস্তুত, ইহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একচেটিয়া সম্পদও বলা যাইতে পারে। বর্তমানে ভারতে পাটশিল্পে নিয়োজিত মূলধন প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা। গড়ে প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পের কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে।

পূর্বে অবশ্য পাটের এদেশে বিশেষ কোনো মূল্যই ছিল না। গৃহস্থরা ঘরেই পাটের মোটা সুতা কাটিয়া তাহার দ্বারা গৃহস্থালীর জন্য দড়ি প্রভৃতি তৈরী করিয়া লইত। পরে ধীরে ধীরে চট, থলে প্রভৃতি তৈরী করা শুরু হইল এবং বিদেশেও তাহা রপ্তানী করা হইত। এক প্রাচীন হিসাবে দেখা যায় শুধু ১৮৫০-৫১ সালেই বিদেশে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকার পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করা হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজরা কার্পাস শিল্পের মতো পাট শিল্পেরও অগ্রগতি ব্যাহত করে। এদেশে এই শিল্প গড়িয়া ওঠার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডাণ্ডি হইতে আমদানীকৃত পাটজাত দ্রব্য। এই দেশ হইতে পাট ডাণ্ডিতে পাঠাইয়া সেখান হইতে ঐ সব

পাট শিল্পের ইতিবৃত্ত

পাটজাত দ্রব্য এদেশে আমদানী করা শুরু হয়। কিন্তু পরে য়ুরোপীয়রাই নিজেদের স্বার্থে বাংলা দেশের হুগলী নদীর দুই তীরে চটকল স্থাপন করা শুরু করে। ১৮৫৯ সালে বরাহনগরে প্রথম বিদ্যুৎচালিত পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে শুধু পশ্চিমবঙ্গে ১০১টি পাটকল রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্ধ্রপ্রদেশে ৪টি, বিহারে ৩টি, উত্তর প্রদেশে ৩টি ও মধ্য প্রদেশে ১টি চটকল আছে। এইসব কল প্রধানত চট, হেসিয়ান, কার্পেট, কম্বল, টারপলিন প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্য বর্তমানে তৈরী করিয়া থাকে।

কলিকাতার সন্নিকটে পাট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুবিধা

পশ্চিমবঙ্গের ১০১টি পাট-কলের মধ্যে ৮৪টিই কলিকাতার নিকটে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার কারণ, এই অঞ্চলে পাট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে।

১। কলিকাতা বন্দর পাট-কল স্থাপনের বিশেষ সুযোগ করিয়া দিয়াছে। পাট-কলজাত জিনিস বিশেষ করিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে ইহা হইয়া থাকে। পাটকলের জন্য যন্ত্রপাতিও ঐ বন্দরের মাধ্যমে সহজে বিদেশ হইতে আমদানী করা যায়।

২। এই অঞ্চল হইতে কয়লার খনিগুলিও বেশী দূরে নহে। বিশেষ করিয়া রেল ও স্টীমারে কয়লা নিয়া আসার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে।

৩। এই অঞ্চলে শ্রমিক সংগ্রহও সহজ। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রমিকেরা কাজের আশায় কলিকাতায় আসিয়া জড় হয়। কলিকাতা হইতে পাট-কলের জন্য শ্রমিক সহজেই পাওয়া যায়।

৪। এই অঞ্চলে পাট শিল্প গড়িয়া উঠার ঐতিহাসিক কারণও রহিয়াছে। ইংরেজরাই বিশেষ ভাবে পাট শিল্প গড়িয়া তোলেন। ভারতের রাজধানী হিসাবে কলিকাতার সহিতই তাহাদের বিশেষ পরিচিতি হয়। তাই সুযোগ দেখিয়া তাহারা কলিকাতার আশেপাশে পাট শিল্প গড়িয়া তোলেন।

৫। বাংলা দেশেই পাট প্রধানত জন্মায়। ঐ রাজ্যের অভ্যন্তর হইতে, স্থলপথে ও জলপথে কলিকাতায় পাট-কলের জন্য পাট নিয়া আসা অতি সহজ।

৬। তারপর একটি কল যদি কোথাও স্থাপিত হয়, তবে তাহার

দেখাদেখিও কিছুটা ঐ ধরনের কল কাছাকাছি স্থাপিত হয়। পাট-কলের ব্যাপারেও তাহা হইয়াছিল। একবার যখন একজন ইংরেজ একটি পাট-কল কলিকাতার পাশে স্থাপন করিলেন, অমনি তাহার কাছাকাছি আরও কল গড়িয়া উঠিল।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাট শিল্পের সমস্যা

ভারত বিভাগের পরে অবশ্য ভারতবর্ষের পাট শিল্পকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। উৎকৃষ্ট পাট পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সামগ্রিকভাবে এই উপ-মহাদেশের অধিকাংশ পাটই উৎপন্ন হয় সেখানেই। পশ্চিমবঙ্গে অপকৃষ্ট পাটের সহিত পূর্ববঙ্গের পাটের উৎকৃষ্ট আঁশ না মিশাইলে ভালো হেসিয়ান তৈরী সম্ভব নয়। অথচ, ভারত বিভাগের পরে প্রথম দিকে ভারত-পাকিস্তান চুক্তির ফলে পাকিস্তান হইতে পাট পাওয়া গেলেও সাম্প্রতিককালে ঐ দেশ হইতে পাটের আমদানীর পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। ইহার একটি কারণ, ইতিমধ্যেই সেখানে খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় কয়েকটি পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ষ্টার্লিং মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস হইলে ভারতবর্ষ যদিও মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে, কিন্তু পাকিস্তান তাহা করে নাই। ফলে, পাটের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, এবং পাট আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে সমূহ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব অসুবিধা দূরের জন্য অবশ্য সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের সহিত ভারত সরকারের কয়েকটি বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে সাময়িকভাবে কিছু সুবিধাও হইয়াছে। আমরা নিজেরাও পাট উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছি।

(৪) **রেশম শিল্প**—সিল্কের বস্ত্রাদি পরিধান করিতে এদেশের লোকেরা চিরদিনই ভালোবাসে। পূজা-পার্বণে রেশমের বস্ত্রকে আমরা পবিত্র মনে করি। প্রাচীন ভারতের রেশম শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও পরবর্তীকালে এই শিল্পে ভাটা পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে পুনরায় এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে মোট যে পরিমাণ কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় অর্ধেকই উৎপন্ন হয় মহীশূরে। কাঁচা রেশম উৎপাদনে অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে যথাক্রমে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং জম্মু ও কাশ্মীরের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে রেশম শিল্পের উন্নতিকল্পে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড আইন পাশ করিয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৫৮ সালে বিভিন্ন জাতীয় রেশম-কীটের উৎপাদনের ব্যাপারে গবেষণার জন্য শ্রীনগরে কেন্দ্রীয় রেশম-কীট কেন্দ্র (Central Silkworm Station) স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে বহরমপুরে যে রেশম-চাষ গবেষণা কেন্দ্র (Sericulture Research Station) স্থাপিত হইয়াছিল, ভারত সরকার উহাকে বর্ধিত করিয়া সর্বভারতীয় শিক্ষাসংস্থায় পরিণত করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

রেশম শিল্প উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগ

(৫) **পশম শিল্প**—পশম শিল্পে আজ অবধি আমরা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই। তাহার কারণ আমাদের দেশে ভালো জাতের পশম উৎপাদন হয় না। ভারতবর্ষ বছরে প্রায় সাত কোটি পাউণ্ড পশম উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু এর অধিকাংশই লোমশ এবং মোটা জাতের। ইহার প্রায় অর্ধেকই বিদেশে রপ্তানী হয়; রপ্তানীকৃত পশমের মূল্য আনুমানিক চৌদ্দ কোটি টাকা। কিন্তু উন্নত ধরনের পশমদ্রব্য উৎপন্ন করার জন্য বিদেশ হইতে আমাদের পশম আমদানী করিতে হয়। প্রতি বছর এদেশে আমদানীকৃত পশমের পরিমাণ প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড, এবং তাহার মূল্যও প্রায় এগারো কোটি টাকার কম নহে।

সম্ভবত ভালো জাতের পশম উৎপন্ন হয় না বলিয়াই ভারতবর্ষে পশম শিল্পের যে সব কারখানা রহিয়াছে তাহাদের বেশীর ভাগই ছোটো ছোটো। কিন্তু সংখ্যায় ইহারা নিতান্ত কম নয়। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৮৭৫টি। ইহাদের অধিকাংশই পাঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানায় অবস্থিত। অবশিষ্ট কারখানাগুলি উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী ও বোম্বাইতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই সব কারখানায় প্রধানত পশমজাত বস্ত্রাদি তৈরী করা হয়। অবশ্য বস্ত্রাদি ছাড়াও কোনো কোনো কারখানায় পশম হইতে তোয়ালে কম্বল, ফেল্ট, ফার-কোট প্রভৃতিও উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

(৬) **রেয়ন শিল্প**—সূতী, রেশম বা পশম ছাড়াও কৃত্রিম বস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারেও সাম্প্রতিককালে ভারত ব্রতী হইয়াছে। বর্তমানকালে ভারতবর্ষে উৎপন্ন রেয়নের পরিমাণ বছরে প্রায় দুই কোটি পাউণ্ড।

অথচ এদেশে প্রথম রেয়ন শিল্পের মিল প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র ১৯৫০ সালে ; উহা ত্রিবাঙ্কুরে অবস্থিত এবং নাম ত্রিবাঙ্কুর রেয়ন লিমিটেড। এতদ্ব্যতীত এদেশে অপর যে চারিটি রেয়ন মিল রহিয়াছে তাহারা হইতেছে— বোম্বাইর অন্তর্গত কল্যাণে ন্যাশনাল রেয়ন করপোরেশন, হায়দ্রাবাদের সিরসিল্ক লিঃ (Sirsilk Ltd.), গোয়ালিয়রের গোয়ালিয়র রেয়ন সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, এবং নবপ্রতিষ্ঠিত কল্যাণের সেঞ্চুরী রেয়ন লিমিটেড।

(৭) **রাসায়নিক শিল্প**—বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাহার বহুবিচিত্র চাহিদা মেটানোর জন্য দিন দিনই রাসায়নিক শিল্পের উপর উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। দুই বা ততোধিক বস্তু মিশ্রিত করার পর যদি তাহাদের প্রত্যেকটির গুণ অব্যাহত থাকে এবং প্রত্যেকটিকে সাধারণ উপায়ে সহজেই পৃথক করা যায় তাহা হইলে সেই মিশ্রিত বস্তুসমূহকে বলা হইয়া থাকে সামান্য মিশ্র বা mechanical mixture। কিন্তু যদি দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ এমন ভাবে মিশিয়া যায় যাহার ফলে মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে ব্যবহৃত পদার্থগুলির কোনো গুণ দেখা যায় না এবং উহা হইতে পূর্বের বস্তুগুলিকে সহজে আলাদা করা যায় না, তাহা হইলে তাহাকে বলা হইয়া থাকে রাসায়নিক সম্মিলন বা Chemical compound। এইজাতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হয় বা করা যায়, তাহারাই রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। কালি, সাবান, সার, বিভিন্ন রং-দ্রব্য, গন্ধ দ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী, প্লাস্টিক দ্রব্য প্রভৃতি আমাদের চাহিদার অনেক সামগ্রী, রাসায়নিক শিল্পেরই দান।

রাসায়নিক শিল্পের সংজ্ঞা

রাসায়নিক শিল্পকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—(১) সালফিউরিক এসিড ও তাহা হইতে উৎপন্ন ফটকিরি, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, এমোনিয়ম সালফেট প্রভৃতি এবং সোডা, কষ্টিক সোডা প্রভৃতিকে বলা হইয়া থাকে হেভি কেমিক্যালস্ (Heavy Chemicals) বা ভারী রাসায়নিক পদার্থ ; আর, (২) ইহাদের সাহায্যে অন্যান্য কাঁচামাল হইতে উৎপন্ন ঔষধপত্রাদি সাধারণত ফাইন কেমিক্যালস্ (Fine Chemicals) বা লঘু রাসায়নিক পদার্থ বলিয়া পরিচিত।

রাসায়নিক শিল্পের দুই বিভাগ

রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে

পারে—খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ। **খনিজ** কাঁচা মালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বিভিন্ন ধাতুপ্রস্তর (ore), পাথুরে কয়লা, গন্ধক, লবণ, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি। ইহারা উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর রাসায়নিক শিল্পের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কয়লা শুধুই যে শক্তির উৎস তাহাই নহে, কয়লা অসংখ্য অত্যাবশ্যক রাসায়নিক শিল্পের অপরিহার্য কাঁচা মালও বটে। আবার পাথুরে কয়লা হইতে উৎপন্ন বেনজিন, জাইলিন, টলুয়িন ন্যাপথলিন প্রভৃতি দ্রব্য ও বহুবিধ রাসায়নিক শিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষে এই জাতীয় কাঁচা মালের যেমন অভাব নাই, তেমনি রাসায়নিক শিল্পের উপযোগী **উদ্ভিজ্জ** কাঁচা মালেরও অভাব নাই। খনিজ কাঁচা মালের মতো এইজাতীয় কাঁচা মাল হইতেও যেমন একদিকে নাইট্রিক এসিড, ট্যানিক এসিড, নিকোটিন, ষ্ট্রিকনিন, ক্যাফিন, কুইনিন প্রভৃতি হাজারো রাসায়নিক শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হইয়া থাকে, তেমনি অন্যদিকে এই জাতীয় কাঁচা মাল হইতে উৎপন্ন অ্যাসিটোন, অ্যাসেটিক এসিড, অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড, ইথাইল এসিটেট প্রভৃতি পদার্থ অন্যান্য নানাপ্রকারের রাসায়নিক শিল্পের জন্য একান্ত দরকারী। **প্রাণিজ** কাঁচা মাল বলিতে বোঝা যায় নিহত গবাদি পশুর হাড়, চামড়া, গণ্ড প্রভৃতি। গণ্ড হইতে ইনসুলিন, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনালিন পিটুইট্রিন প্রভৃতি ঔষধ, হাড় হইতে ভালো ফসফেট সার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; আবার নিহত পশুর রক্ত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে যে সক্রিয় কার্বন বা জান্তব কয়লা প্রস্তুত করা যায় তাহা বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী।

রাসায়নিক শিল্পের কাঁচা মাল

আগেই বলা হইয়াছে কাঁচা মালের অভাব আমাদের নাই। খনিজ দ্রব্য এদেশে প্রচুর আছে। এদেশে বিভিন্ন প্রধান প্রধান শহরে যে প্রায় মোট ৩০ লক্ষাধিক গবাদি পশু খাদ্যের জন্য বছরে নিহত হয়, তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রাণিজ কাঁচা মালও সংগৃহীত হয়। উদ্ভিজ্জ কাঁচা মালেরও অনেক-গুলিতেই আমাদের একচেটিয়া অধিকার। তবু ভারতবর্ষে উপযুক্ত সংখ্যায় রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। তাহার প্রধান কারণ, উপযুক্ত কর্মীর ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব। ভারী রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে সাল-ফিউরিক এসিড, বিভিন্ন ক্ষার দ্রব্য, এলম বা ফটকিরি, এপসম সল্ট, কপার সালফাইড, হাইড্রোক্লরিক এসিড প্রভৃতি এদেশে প্রস্তুত হয়। এক

সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতের জন্যই আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৫০টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ফাইন কেমিক্যালের মধ্যে এসিটিক এসিড, এ্যালকোহল, গ্লিসারিন, ক্রিয়োজোট তেল, ন্যাপথলিন প্রভৃতি প্রাণিজ রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য, এবং ক্যাফিন, ষ্ট্রিকনিন, মেফাক্রিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ঔষধের ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে উৎপাদন শুরু হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রে পেনিসিলিনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাছাড়া এদেশে প্রায় ৩০টি রঞ্জনদ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সিন্ধ্রিতে রাসায়নিক সারের যে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা। ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে ৭টি এবং ত্রিবাঙ্কুরে ১টি কারখানা রহিয়াছে।

রাসায়নিক শিল্পদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী

ভারতবর্ষে বর্তমানে যেসব রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পটাসিয়াম ব্রোমাইড, পটাসিয়াম বাইক্রোমেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি এদেশের চাহিদা মিটাইয়াও বিদেশে কিছু পরিমাণে রপ্তানী হয়। এদেশে যে ব্লিচিং পাউডার, নাইট্রিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্রভৃতি উৎপন্ন হয় তাহা হইতে আমাদের চাহিদা কোনো রকমে মেটে মাত্র। এ্যামোনিয়া সালফেট যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের সারের চাহিদার এক-সপ্তমাংশ মেটায় মাত্র।

(৮) **জাহাজ নির্মাণ শিল্প**—এদেশে জাহাজ নির্মাণের এবং একটি আধুনিক জাহাজ নির্মাণ জেটি স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা করেন সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী, ১৯১৯ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টায় সিন্ধিয়া কোম্পানী ১৯৪১ সালে বিশাখা-পত্তনমে একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ "জলউষা"-র নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঐ জাহাজ জলে ভাসানো হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারত সরকার ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে বিশাখাপত্তনমের জাহাজ তৈরী ঘাঁটির কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। বর্তমানে উহা সরকারী নিয়ন্ত্রিত হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড

লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হয়। উহার মূলধনের দুই-তৃতীয়াংশ জাতীয় সরকারের এবং এক-তৃতীয়াংশ সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর। এখন পর্যন্ত এই জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রে ২০টি সমুদ্রগামী জাহাজ এবং ২টি ছোটো জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে কোচিনে আর একটি জাহাজ নির্মাণ ঘাঁটি তৈরীর পরিকল্পনা চলিতেছে। বোম্বাই ও কলিকাতাতে জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(৯) **রেলগাড়ী নির্মাণ শিল্প**—স্বাধীনতা পরিবর্তীকালে ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয় রেলগাড়ী প্রভৃতি নির্মাণের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। এই ব্যাপারে সরকার জামসেদপুরস্থ টাটা লোকোমোটিভ এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিয়া ঐ কোম্পানীকে রেলগাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারীর ব্যাপারে উৎসাহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস নামক যে প্রতিষ্ঠান ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই কারখানা হইতেও প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন পাওয়া যাইতেছে। ১৯৫৫ সালে মাদ্রাজের অন্তর্গত পেরামবুরে যে ইনটিগ্র্যাল কোচ বিল্ডিং ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে তাহাও যাত্রীবাহী কামরার ব্যাপারে ভারতবর্ষকে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তাছাড়া বাঙ্গালোরস্থ হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্‌ট লিমিটেডও সম্পূর্ণ ইস্পাতের যাত্রীবাহী তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নির্মাণ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে কাঁচড়াপাড়া ও খড়্গপুরে, বিহারের জামালপুরে ও উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে রেলগাড়ী মেরামত হইয়া থাকে।

(১০) **মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প**—ভারতবর্ষে প্রথম মোটর গাড়ী আমদানী হয় ১৮৯৮ সালে। তাহার পর হইতে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত এই দেশে কোনো মোটর শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। এমন কি স্বাধীনতালাভের পরেও বিদেশ হইতে গাড়ীর বিভিন্ন অংশ আমদানী করিয়া এদেশে তাহাদের একত্র (assemble) করা হইত। কিন্তু ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার এই শিল্পের ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ বছরই ভারত সরকার স্থির করেন, শুধুমাত্র সেইসব প্রতিষ্ঠানকেই মোটর নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হইবে যাহারা ধীরে ধীরে এই দেশেই সমস্ত প্রয়োজনীয় অংশ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী থাকিবে। বর্তমানে এদেশে এই জাতীয়

ছয়টি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে:—কলিকাতাস্থ হিন্দুস্থান মোটরস; বোম্বাইর প্রিমিয়র অটোমোবাইলস ও মহীন্দ্র এ্যাণ্ড মহীন্দ্র; তামিলনাড়ুর অশোক লেল্যাণ্ড, ও স্ট্যাণ্ডার্ড মোটর প্রোডাক্টস; এবং বোম্বাইস্থ টাটা লোকোমোটিভ এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী। ১৯৫৭ সালের হিসাবে জানা যায় এই সব কোম্পানীর সেই বছরের নির্মিত মোটরের সংখ্যা ৩৬,৪৬৮।

(১১) **উড়োজাহাজ নির্মাণ শিল্প**—উড়োজাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এখনও অনেক পিছাইয়া আছে। কি অসামরিক, কি সামরিক—উড়োজাহাজাদির জন্য আমাদের এখনও বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। তবে হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট লিমিটেড সাম্প্রতিককালে উড়োজাহাজ নির্মাণ করিতেছে। ১৯৫৯ সালে ঐ কোম্পানী ২৫টি লঘু "পুষ্পক-১" নামক উড়োজাহাজ নির্মাণ করিয়াছে। সামরিক উড়োজাহাজের ব্যাপারে ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার বৃটিশ হকার সিড্‌লে এভিয়েশন কোম্পানীর সহিত একটি চুক্তি করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী এই কোম্পানীকে পুরানো ডাকোটাগুলিকে বদলানোর জন্য "এভরো-৭৪৮" নামক উড়োজাহাজ তৈরীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কানপুরে এয়ার ফোর্সের মাটিতে এই উড়োজাহাজ নির্মাণ করা হইতেছে।

(১২) **অন্যান্য শিল্প**—পশ্চিমবঙ্গে বাটানগর এবং উত্তর প্রদেশের কানপুর চর্ম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যও চর্ম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি গোচর্ম, সাড়ে তিন কোটি ছাগচর্ম ও এক কোটি সত্তর লক্ষ মেষচর্ম উৎপাদন হয়। এদেশে মোট প্রায় ৭২৫টি চামড়া শোধন কারখানা রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র ৭৪টিতে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা পঞ্চাশের বেশী। অন্যান্যগুলি অল্পসংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যেই পরিচালিত হয়। বর্তমানে এদেশে ১২টি জুতা তৈরীর বড়ো কারখানা রহিয়াছে।

চর্ম শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে টিটাগড়, রাণীগঞ্জ, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি প্রভৃতি স্থানে; উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, সাহারাণপুর ও কানপুরে; বিহারের ডালমিয়ানগরে, এবং বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যে কাগজ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ভারতের একটি অন্যতম শিল্প বলিয়া পরিগণিত। ১৯৫৯ সালে এদেশে প্রায় ২,৯২,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার মূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা। বর্তমানে বৎসরে প্রায় তিন

কাগজ শিল্প

লক্ষ ২৪ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উহা বৃদ্ধি করিয়া নয় লক্ষ টন কাগজ উৎপাদন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত এই শিল্পে প্রধানত বিদেশী মণ্ড ব্যবহার করা হইত; এক্ষণে ক্রমশ দেশীয় গাছ, বাঁশ ও সাবুই ঘাসের মণ্ড ব্যবহৃত হইতেছে।

এলুমিনিয়াম শিল্প

ছোটনাগপুরের মুরিতে, উড়িষ্যার হিরাকুঁদে, কেরালার আলোয়েতে, পশ্চিমবঙ্গের বেলুড়ে ও আসানসোলের নিকটবর্তী অনুপনগরে এলুমিনিয়ামের কারখানা রহিয়াছে। সাম্প্রতিককালে উত্তর প্রদেশের রিহাঁদ বাঁধে এবং তামিলনাড়ুর মেটুরে দুইটি নূতন এলুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।
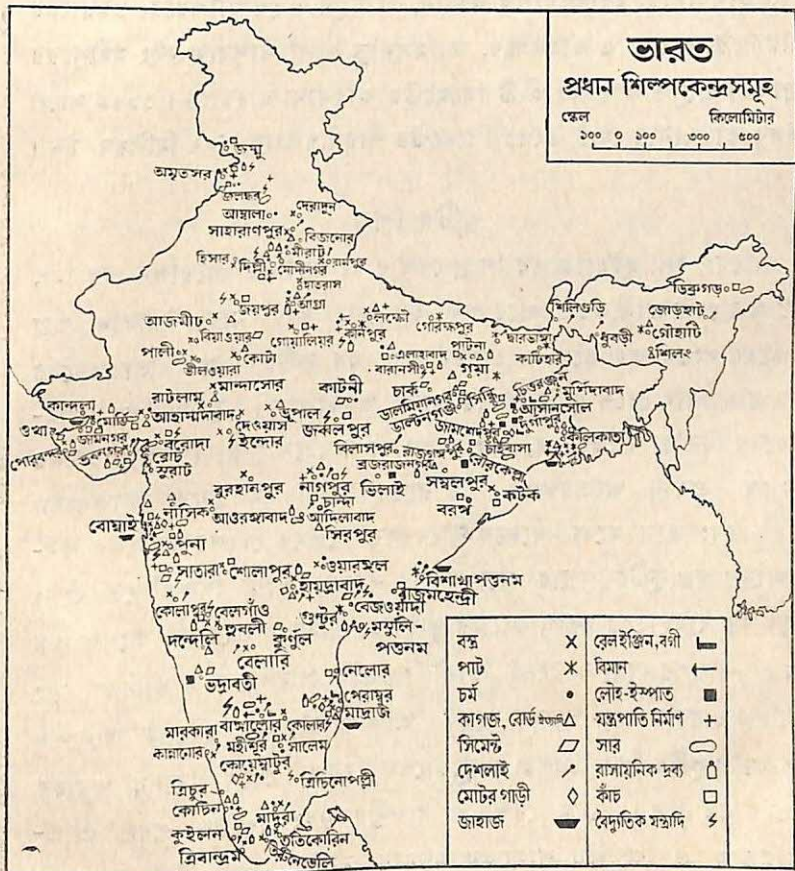
ভারতবর্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী চিনি ও গুড় উৎপাদন হইয়া থাকে। এই শিল্পে প্রায় ৭২ কোটি টাকার মূলধন ও প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক খাটিতেছে। বর্তমানে উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে প্রায় ১৫৭টি কারখানা চিনি উৎপাদন করিয়া চলিতেছে।

চিনি শিল্প

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তামিলনাড়ুতে প্রথম সিমেণ্টের উৎপাদন শুরু হইলেও পরবর্তীকালে এই দেশে এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। ১৯৪৮ সালে এদেশে মাত্র ১৮টি সিমেণ্টের কারখানা ছিল এবং তাহাদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.৪৪ মিলিয়ন টন। বর্তমানে বিহারের ডালমিয়ানগরে, জাপলা, খেলারি এবং চাইবাসায়, মধ্যপ্রদেশের কাটনি, কাইমুর ও গোয়ালিয়রে, গুজরাটের পোরবন্দর, দ্বারকা ও জামনগরে, তামিলনাড়ু ডালমিয়াপুরমে এবং মহীশূরের ভদ্রাবতী প্রভৃতি জায়গায় ৩২টি সিমেণ্টের কারখানা রহিয়াছে। ১৯৫৯ সালে এইসব কারখানায় মোট উৎপন্ন সিমেণ্টের পরিমাণ প্রায় ৬.৮২ মিলিয়ন টন।

সিমেণ্ট শিল্প

কুটির শিল্প

আগেই বলা হইয়াছে, যে শিল্পে বেশী দামী যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না, যার জন্য বেশী শ্রমিকেরও প্রয়োজন হয় না, আর যার উপাদান অল্প মূলধনেই সংগ্রহ করা চলে, তাহাকেই বলা হয় কুটির শিল্প। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রামপ্রধান দেশে কুটির শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কুটির শিল্প গ্রাম-জীবনের দ্বিতীয় আয়ের পথ, এবং কৃষিজীবী গ্রামবাসীদের জীবিকাসংস্থানের অন্যতম প্রধান আশ্রয়স্থল। ভারতের মতো যে দেশে লোকসংখ্যা অধিক এবং তার মধ্যে অনেকেই বেকার, তেমন দেশের লোকের কর্ম-সংস্থানের জন্য কুটির শিল্পের প্রয়োজন। কারণ, ভারী শিল্পগুলিতে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের ফলে, কাজের তুলনায়, শ্রমিকের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। তারপর নানা কারণেই ভারী শিল্পগুলি শ্রমিকদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের কতকগুলি কুটির শিল্প এশিয়া ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ক্রমে দেশীয় ও বিদেশীয় বৃহৎ শিল্পের প্রবল প্রতি-যোগিতায় ও বিদেশীয় শাসকের অনুদার নীতির ফলে ইহাদের মধ্যে

অনেক শিল্পেরই বিশেষ অসুবিধা ঘটে এবং কালক্রমে কতক লোপও পাইয়া যায়। যাহারা টিকিয়া থাকে তাহাদের অবস্থাও বিশেষ ভালো ছিল না।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বৃহৎ শিল্পের ন্যায় কুটির শিল্পের দিকেও জাতীয় সরকারের দৃষ্টি পড়ে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ই কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য ঐ সংক্রান্ত সর্বভারতীয় সংস্থাগুলিকে সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ কোটি টাকা আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঐ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া হয় ২০০ কোটি টাকা; আর তৃতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে বরাদ্দ হইয়াছে ২৫০ কোটি টাকা। উপরিউক্ত হিসাব হইতেই কুটির শিল্পের গুরুত্বের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৫ সালে কুটির শিল্পের উন্নতিকল্পে অধ্যাপক জি. ডি. কার্ভের নেতৃত্বে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কমিটি নামে একটি কমিটিও নিয়োগ করিয়াছিলেন। কার্ভে কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, এইসব শিল্পে কর্মসংস্থান এবং এই শিল্পক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থার প্রসারের সুপারিশ ছিল। তাহারা মোট ২৫৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার এক উন্নয়ন কর্মসূচীও সুপারিশ করেন এবং মত প্রকাশ করেন যে এই কর্মসূচী কার্যকরী হইলে এইসব শিল্পে ৪৫ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান হইবার সম্ভাবনা আছে। অতঃপর ১৯৫৬ সালে পণ্ডিত নেহেরু যে নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন, তাহাতেও নীতিগতভাবে বলা হয়, কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনবোধে সরকার বহুল উৎপাদনকারী শিল্পেও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। কুটির শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য ভারত সরকার ছয়টি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করিয়াছেন; এইগুলি হইতেছে—অল ইণ্ডিয়া খাদি এ্যাণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিশন, অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস বোর্ড, অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ বোর্ড, কয়ার (coir) বোর্ড এবং সেণ্ট্রাল সিল্ক বোর্ড।

কুটির শিল্প সংক্রান্ত সরকারী নীতি

ভারতবর্ষে বিভিন্ন কুটির শিল্পের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) তাঁত শিল্প—তাঁত শিল্প ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কুটির শিল্প। এদেশে প্রায়

২৮ লক্ষ তাঁত রহিয়াছে এবং এই সব তাঁতে প্রতি বৎসর প্রায় দেড়শ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন হয়; অর্থাৎ দেশের কাপড়ের চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই তাঁতের কাপড় মেটায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কুটির শিল্প

ভারতবর্ষের বিভিন্ন তাঁতবস্ত্রের মধ্যে তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর ও পশ্চিমবঙ্গে সূতীর ধুতি ও শাড়ী; বেনারসী ও হায়দ্রাবাদের জমকালো সিল্কের কাপড়; মুর্শিদাবাদ, ফরক্কাবাদ, জয়পুর ও বোম্বাইর ছাপা শাড়ী ও কাপড়; শান্তিনিকেতনের বাটিকের কাজ করা কাপড়; মোসলী-পত্তনের কলমাকরী; জয়পুর, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ ও কাশ্মীরের সিল্ক শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্র; কাশ্মীরের পশম বস্ত্র; এবং কাশ্মীর, মির্জাপুর, ভাদ্রোহি, ইলোর, বাঙ্গালোর ও জয়পুরের কার্পেট ও রাগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(২) "বিদরী" কাজ—প্রাচীন বিদর নামক জায়গায় এই কাজের উৎপত্তি বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। তামা ও দস্তার মিশ্রণের বুকে সোনা বা রূপার পাত বা তার নানারূপ নক্সা অনুযায়ী পিটাইয়া বসানো হয়। তামা ও দস্তার মিশ্রণটি পরে কালো হইয়া যায় এবং তাহার বুকে সোনা বা রূপার নক্সা সুন্দরভাবে ফুটিয়া ওঠে। বিদরী কাজযুক্ত সিগারেটের বাক্স, ছাইদানী, ফুলদানী, পাউডার কেস, ফলের পাত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়।

(৩) ফুলকরি—পাঞ্জাবের বিখ্যাত রাগ ও ফুলকরি শালের সাধারণ নাম ফুলকরি। সিল্কের বা খদ্দরের কাপড়ের উপর বহুবর্ণের সুতা দিয়া এম্ব্রয়ডারী করিয়া নানারূপ সুন্দর সুন্দর নক্সা তুলিয়া এই সব শাল তৈরী করা হইয়া থাকে।

(৪) শিং-এর কাজ—শিং-এর কাজ প্রধানত উড়িষ্যারই একচেটিয়া কুটির শিল্প। প্রধানত মহিষের শিং এই কাজে ব্যবহৃত হইলেও, বাইসন এবং হরিণের শিং-ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমানে অবশ্য কেরালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু শিং-এর কাজ হইয়া থাকে।

(৫) হাতীর দাঁতের কাজ—কেরালা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং রাজস্থানে হাতীর দাঁত হইতে সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরী করা হইয়া থাকে।

(৬) "নির্মল" কাজ—অন্ধ্র প্রদেশের আদিলাবাদ জেলার অন্তর্গত নির্মল নামক জায়গায় যে হালকা কাঠের পুতুল তৈরী হইয়া থাকে

তাহা নির্মল কাজ নামে বিখ্যাত। শুধু পুতুলই নহে, এই জায়গায় কাঠের ট্রে, বালা, বাতিদানী, সিগার ও সিগারেট কেস প্রভৃতিও তৈরী হয়।

(৭) সিল্কের কাজ—পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদের নরম সিল্কের কাপড়, মহীশূরের সোনালী বা রূপালী পাড়যুক্ত নানাবর্ণের সিল্ক শাড়ী, কাশ্মীরী পুরু সিল্কের শাড়ী, সম্বলপুরের তসর, আহমেদাবাদের মোগিয়া, আসামের মুগা ও এণ্ডি, বরোদার "পাটোলা" সিল্ক, কাথিয়াবাড়ের সিল্ক, সাটিন প্রভৃতি শুধু এদেশে নহে বিদেশেও বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে।

(৮) ধাতু শিল্প—জয়পুর, কাশ্মীর, মোরাদাবাদ ও বারানসীর খোদাই করা অথবা এনামেল করা কাঁসার পাত্র, মাদুরা ও তাঞ্জোরের তামা, কাঁসা বা ব্রোঞ্জের তৈরী বিভিন্ন মূর্তি প্রভৃতি এই দেশের উন্নত ধাতু শিল্পের নিদর্শন। এছাড়াও এদেশের বিভিন্ন জায়গায় ধাতুনির্মিত ফুলদানী, ধূপদানী, মোমবাতি-দানী, ফলদানী, পাউডার কেস প্রভৃতি তৈরী হইয়া থাকে।

এছাড়া এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁশের দ্রব্যাদি, বেতের দ্রব্যাদি, কাঠের আসবাবপত্র, ছাতা, সাবান, বিড়ি ও চুরুট, নারিকেলের দড়ির তৈরী দ্রব্যাদি, হাতে তৈরী কাগজ প্রভৃতিও কুটির শিল্পজাত পণ্য হিসাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে বহুপ্রকার কুটির শিল্প আছে। বোধ হয় ভারতবর্ষের সব শিল্পেরই কিছু না কিছু পশ্চিমবঙ্গে আছে। নিম্নে তাহাদের বিভিন্ন কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

তাঁত শিল্প পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কুটির শিল্প। হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর প্রভৃতি জায়গা এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

মৃৎশিল্পের দ্রব্যাদির জন্য বিখ্যাত হইতেছে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর, কলিকাতার কুমারটুলী এবং বাঁকুড়া।

রেশম দ্রব্যাদির চাহিদা বর্তমানে কিছুটা কমিয়া গেলেও মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং জেলায় এখনও বছরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড রেশমী সুতা ও আড়াই লক্ষ গজ রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর

জেলার গ্রামগুলি পিতল-কাঁসার দ্রব্যাদির জন্য বিখ্যাত। বহরমপুরের কাঁসার বাসন বিখ্যাত।

হাতে প্রস্তুত কাগজ হয় হাওড়া জেলার মইনান, হুগলী জেলার দশঘরা, মুর্শিদাবাদ জেলার মহাদেবনগর ও বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতনে।

শ্রীনিকেতনে ও কলিকাতায় সুন্দর সুন্দর চামড়ার কাজ করা জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি তৈরী হয়।

বাঁশের ও বেতের চেয়ার প্রভৃতি জিনিস তৈরীর জন্য উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা বিখ্যাত।

চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় প্রচুর পরিমাণে তাল ও খেজুরের গুড় তৈরী হইয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদে হাতীর দাঁতের কাজ বিখ্যাত।

কলিকাতার উপকণ্ঠে, হাওড়ায় এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রামে ঢালাই পিতলের অনেক রকম জিনিস তৈরী হয়।

কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচির সুনাম আছে।

চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের মাদুর শিল্পও বিখ্যাত।

অনুশীলনী

(আমাদের শিল্প)

১। ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ। গত কয়েক বৎসরে এদেশের কোন কোন কেন্দ্রে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প স্থাপিত হইয়াছে? এই সকল কেন্দ্রে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন কোন বিষয় অধিক সহায়তা করিয়াছে? (S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ১৯০—৯৪)

২। কি কারণে পশ্চিমবঙ্গে পাট শিল্প কেন্দ্র মূলতঃ স্থাপিত হইয়াছে? বর্তমানে ভারতবর্ষে পাট শিল্পের অবস্থা বর্ণনা কর। (S. F. 1968)

(উঃ—পৃঃ ১৯৬—৯৮)

৩। কার্পাস বয়ন শিল্পের অনুকূল অবস্থা কি? ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কার্পাস বয়ন শিল্পের বিবরণ দাও। (S. F. 1970) (উঃ—পৃঃ ১৯৪—৯৬)

৪। ভারতে লৌহ-ইস্পাত শিল্প বিকাশের বর্ণনা প্রসঙ্গে দুর্গাপুরে ও ভিলাই সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ কর। (S.F. 1969) (উঃ—পৃঃ ১৯০—৯৪)

৫। ভারতের কুটির শিল্প সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ। (S. F. 1966)

(উঃ—পৃঃ ২০৬—১০)

আমাদের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

যে কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কি বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে, কি শিল্পের উন্নয়নে, কি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বজনিত বিভেদ দূরীকরণে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। তোমরা জান, স্থানান্তরের সহিত বাণিজ্যের প্রধান বাধা দূরত্ব। আর এই দূরত্বের বাধা দূর করার প্রধান উপায়ই হইতেছে সুষ্ঠু পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার। আবার, আমাদের দেশের কোনো অঞ্চলই আমাদের সর্ববিধ চাহিদার ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল নহে। অন্যান্য অঞ্চলে যে সব জিনিস তৈরী হইতেছে তাহা হয়তো আমাদের অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না। ফলে, ঐসব জিনিস পাইতে হইলেও আমাদের একান্তভাবেই পরিবহণের উপর নির্ভর করিতে হয়। শিল্পোন্নয়নের জন্য যেসব কাঁচা মাল প্রয়োজন তাহাও সব সময় শিল্পকেন্দ্রেই উৎপন্ন হয় না, বাহির হইতেই আমদানী করিতে হয়; সেই জন্যও পরিবহণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার একান্তই প্রয়োজন। বস্তুত, শিল্পোন্নয়ন ও সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। আবার, আমাদের মতো বিরাট দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সমতা আনিয়া জাতীয় সংহতি গড়িয়া তোলার কাজেও পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দান অনস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সম্প্রীতি ততই গড়িয়া ওঠে যত এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসে। পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে ইহা সম্ভব নহে। শুধু তাহাই নহে। বেতার, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে বিভিন্ন অঞ্চলের দান সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হই। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য যে সকলের দানেই সমৃদ্ধ 'সেই বোধ জাতীয় সংহতির কাজকে সহজতর করিয়া তোলে।

পরিবহণ ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপায়ে পরিবহন কার্য সম্পাদিত হয়। যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারেও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন

পরিবহণ ও যোগাযোগের বিভিন্ন ব্যবস্থা

করা হয়। নিম্নে মোটামুটিভাবে যোগাযোগ ও পরিবহণের কয়েকটি প্রধান প্রধান উপায় উল্লেখ করা গেল :—

১। ডাক
২। তার
৩। টেলিফোন
৪। বেতার ও রেডিও
৫। পত্র-পত্রিকা
৬। রাস্তা
৭। রেলপথ
৮। জলপথ
৯। আকাশপথ

যোগাযোগ ব্যবস্থা

এদেশে আধুনিককালে ডাক বিভাগের প্রবর্তন হয় ১৭৬৬ সালে লর্ড ক্লাইভের আমলে।

ভারতবর্ষে প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, তদানীন্তন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়ম বি. ও. সাংগ্‌হ্‌নেসীর দ্বারা। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত ২১ মাইল ব্যাপী টেলিগ্রাফের তার ছিল সেই সময় পৃথিবীতে সবচাইতে লম্বা টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাও টেলিগ্রাফ লাইন দ্বারা যুক্ত হয়। বর্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ মাইল টেলিগ্রাফের তার এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

টেলিফোন

বেল সাহেব (Bell) কর্তৃক ১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কারের মাত্র পাঁচ বছর পরেই (১৮৮১ সালে) ভারতবর্ষে কলিকাতায় ৫০টি লাইনযুক্ত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। অথচ আজ এদেশে হাজার মাথাপিছু টেলিফোনের সংখ্যা মাত্র ৭টি (সেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ঐ সংখ্যা হইতেছে ৩১০টি)। ডাক-তার বিভাগের মতো স্বাধীনতা পরবর্তীকালে টেলিফোন বিভাগের উন্নতির জন্যও আমাদের জাতীয় সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে সরকার টেলিফোন শিল্প নিজের হাতে গ্রহণ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয় এবং পরে ঐ পরিমাণ বাড়াইয়া ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একই উদ্দেশ্যে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সংযোগ ছাড়াও ভারতবর্ষে বেতার মারফত খবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সাধারণত টেলিগ্রাফের পাশাপাশি বেতারেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে, যাহাতে প্রথমটি কোনো কারণে বিকল হইলেও খবর আদান-প্রদানের ব্যাঘাত না ঘটে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি সমুদ্র সন্নিকটবর্তী বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ বা সমুদ্রগামী উড়ো-জাহাজের সহিত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার কাজেও বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাছাড়া বড়ো বড়ো শহরে পুলিশও বেতার মারফতই খবর আদান-প্রদান করিয়া থাকে।

বেতার

ভারতবর্ষে রেডিও ব্রডকাষ্টিংএর কাজ প্রথম শুরু করে ১৯২৭ সালে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। তাহারা কলিকাতা ও বোম্বাইতে রেডিও ষ্টেশন বসায়। কিন্তু ১৯৩০ সালে ঐ কোম্পানী বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, ইহার কিছুদিন পরে ১৯৩২ সালে তৎকালীন ভারত সরকার অনিচ্ছাকৃত ভাবেই ঐ দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলিয়া লন। ১৯৩৬ সালে রেডিও সংক্রান্ত সরকারী দপ্তরটির নামকরণ হয় অল ইণ্ডিয়া রেডিও। বর্তমানে এই দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে কেন্দ্রীয় ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং মিনিষ্ট্রির তত্ত্বাবধানে অল ইণ্ডিয়া রেডিওই পালন করিয়া থাকে। ইহার অপর নাম-করণ হইয়াছে আকাশবাণী।

রেডিও

ভারতীয় বেতারের উন্নতিকল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ হয় ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ হয় ৯ কোটি টাকা। বর্তমানে এদেশে ২৯টি বেতার কেন্দ্র রহিয়াছে। ঐ সব কেন্দ্রে প্রেরণযন্ত্রের (transmitters) সংখ্যা প্রায় ৫৭টি। ১৯৫৮ সালের হিসাবে প্রকাশ, সেই সময়ই এদেশে রেডিও সেটের সংখ্যা ছিল ১২,৯১,৮১২টি ; তাছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন কেন্দ্র, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে রেডিওর সংখ্যা ছিল ১,০৯,৬২৫টি।

আকাশবাণীর অধীনেই ১৯৫৯ সাল হইতে দিল্লীতে টেলিভিশন কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ ১২ মাইল ব্যাপী এলাকায় এই টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখা যায়। দিল্লীতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে টেলিভিশনের মারফত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

টেলিভিশন

এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে, আর শুধু এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলই বা বলি কেন, এদেশের সহিত বিদেশেরও সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক খবরা-খবর আদান-প্রদানেরও যোগাযোগ রক্ষার আরেকটি অন্যতম বাহন পত্র-পত্রিকা। এইসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে কোনোটি দৈনিক, কোনোটি সাপ্তাহিক, কোনোটি পাক্ষিক, কোনোটি মাসিক ইত্যাদি ভিত্তিতে বাহির হয়। ইহারা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতালাভের পরে এদেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৭ সালে এদেশের পত্র-পত্রিকার সংখ্যা সেখানে ছিল ৫৯৩২, ১৯৫৮ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৯১৮; আর ১৯৫৯ সালে সেই সংখ্যা আরও বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৭,৬৫১টি। ইহার মধ্যে ৫টির দৈনিক প্রচারসংখ্যা লক্ষাধিক। এ ছাড়া ৯টি ইংরেজি, ২টি হিন্দী, ২টি তামিল, ২টি বাংলা, ২টি মালয়ালম এবং ১টি মারাঠী দৈনিক পত্রিকার দৈনিক প্রচারসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশী। তোমরা সকলে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো দৈনিক এবং মাসিক পত্রিকা নিয়মিত পড়িয়া থাক।

পত্র-পত্রিকা

পরিবহণ ব্যবস্থা

আমাদের দেশের মতো বিরাট ভূখণ্ডে রাস্তাঘাটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রেলপথাদির অন্য বিকল্প ব্যবস্থা না থাকিলেও রাস্তাঘাট থাকিলে মোটর ও লরী তাহার উপর দিয়া যাত্রী ও মাল বহন করিতে পারে। বস্তুত আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায়ই রেলপথ নাই; সেখানে রাস্তাযোগেই পরিবহণ কার্য চলিয়া থাকে। রাস্তার উপর দিয়া পশুপৃষ্ঠে বা পশুচালিত গাড়ীতে অথবা মোটরযোগে পরিবহণ কার্য সম্পাদিত হয়। রাস্তা না থাকিলে এইসব গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্য দ্রব্যের আদান-প্রদান অসম্ভব হইয়া পড়িত, মানুষের জীবনযাত্রা কষ্টকর হইত। শুধু তাই নহে। দেশের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্যও বিস্তৃত রাস্তাঘাটের প্রয়োজন। আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে রাস্তাঘাট না থাকিলে ফসল গৃহে বা বাজারে লইয়া যাওয়া সহজসাধ্য নহে। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে যে শিল্পোন্নয়ন হইতেছে, সেই জন্যও রাস্তাঘাট দরকার। কারণ তাহা না হইলে শিল্পের উৎপাদনস্থান ও বিক্রয়স্থানের মধ্যে যোগাযোগ

রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তা

রক্ষা সম্ভবপর নহে। সর্বোপরি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যও রাস্তাঘাট দরকার ; কারণ তাহা না হইলে দ্রুত সৈন্য চলাচল সম্ভবপর নহে।

বর্তমান ভারতের রাস্তাঘাট প্রকৃতপক্ষে পাঠান ও মোগল সম্রাটদের তৈরী রাস্তাঘাটের পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলেই এদেশের রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার রাস্তাঘাটের দায়িত্ব প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের হাতেই ছাড়িয়া দেয়। আর প্রাদেশিক সরকারও জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের হাতে উহার ভার ছাড়িয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ফলে, এদেশের রাস্তাঘাটের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। আমাদের কি বাণিজ্যিক, কি অর্থনৈতিক, কি কৃষিসংক্রান্ত অনগ্রসরতার জন্য এই রাস্তাঘাটের অব্যবস্থা বহুসাংশে দায়ী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাটের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইলে তৎকালীন ভারত সরকার রাস্তাঘাট উন্নয়নে নজর দেন। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে মোটর চলাচল বহুগুণ বাড়িয়া যায়, কিন্তু নূতন রাস্তাঘাট তেমন বেশী নির্মাণ হয় না। ফলে, সেই সময় এদেশে যেসব রাস্তাঘাট বর্তমান ছিল তাহাও খারাপ হওয়া শুরু করে। অবশেষে ১৯২৭ সালে ডাঃ এম. আর. জয়াকরের নেতৃত্বে এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯২৮ সালে জয়াকর কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন সেই অনুযায়ী প্রতি গ্যালন পেট্রোলের উপর দুই আনা ট্যাক্স বসাইয়া সেই টাকায় একটি কেন্দ্রীয় রাস্তা তহবিল খোলা হয়, এবং সেই তহবিল হইতে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে রাস্তার জন্য অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে নাগপুরে ১৯৪৩ সালে এক পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় স্থির হয় কৃষি অঞ্চলে ৫ মাইলের মধ্যে এবং অন্যান্য অঞ্চলে ২০ মাইলের মধ্যে সদর বড়ো রাস্তা তৈরী করিতে হইবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই।

এদেশের রাস্তাঘাটের ইতিবৃত্ত

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবশ্য এদেশের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জোর প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে এদেশে প্রায় ৯৭,০০০ মাইল বাঁধানো ও প্রায় ১,৪৭,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে প্রায় ১০,০০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ২০,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এদেশের রাস্তাঘাট

বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং প্রায় ১০,০০০ মাইল পুরানো রাস্তার সংস্কার সাধন করা হয়। এর জন্য কেন্দ্রীয় রাজপথ তহবিলের সাহায্য সহ প্রায় ১৫৫ কোটি টাকার মতো খরচ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রাস্তাখাতে ২৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, এবং কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে আরও ২৫ কোটি টাকা খরচের ব্যবস্থা হয়। এইভাবেই নাগপুর পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নাগপুর সম্মেলনে এদেশের রাস্তাঘাটকে মোটামুটি চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) জাতীয় রাজপথ, (২) প্রাদেশিক রাজপথ, (৩) জেলার রাস্তা, এবং (৪) গ্রাম্য রাস্তা। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সরকার জাতায় রাজপথগুলির দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। বর্তমানে ১৪টি জাতীয় রাজপথ রহিয়াছে—(১) কলিকাতা হইতে অমৃতসর পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, (২) আগ্রা হইতে বোম্বাই, (৩) বোম্বাই হইতে তামিলনাড়ু (৪) তামিলনাড়ু হইতে কলিকাতা, (৫) কলিকাতা হইতে বোম্বাই (নাগপুর হইয়া), (৬) কাশী হইতে কেপ কমোরিন, (৭) দিল্লী হইতে বোম্বাই (আহমেদাবাদ হইয়া), (৮) আহমেদাবাদ হইতে কান্দলা বন্দর, (৯) আম্বালা হইতে তিব্বত সীমানা (সিমলা হইয়া), (১০) দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ, (১১) লক্ষ্ণৌ হইতে বিহারস্থ বারৌনী, (১২) আসাম এ্যাকসেস (access) রোড, (১৩) আসাম ট্রাঙ্ক রোড, এবং (১৪) জম্মু-শ্রীনগর-উরি জাতীয় রাজপথ। এই কয়টি রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩,৯২৪ মাইল।

জাতীয় রাজপথ

এদেশে বর্তমানে যে সকল রাস্তা রহিয়াছে তাহার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৫৭,৫৭৬ মাইল (উল্লেখযোগ্য যে, নাগপুর পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৩,৩১,০০০ মাইল রাস্তা)। ইহার মধ্যে অবশ্য ২,২৩,৯৬৬ মাইল রাস্তা এখনও কাঁচা। এদেশের প্রায় সর্বত্রই গ্রামাঞ্চলে কাঁচা ও পাকা, উভয় রাস্তায়ই গোরুর বা মহিষের গাড়ী চলে। কোনো কোনো গ্রাম অঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলেও ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন রহিয়াছে; আবার কোথাও কোথাও উটের গাড়ীরও প্রচলন আছে। পাকা রাস্তার উপর দিয়া পরিবহণের কাজ চালায় মোটর গাড়ী, বাস ও মোটর লরী। গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে আর একটি অন্যতম

রাস্তায় পরিবহণ ব্যবস্থা

উল্লেখযোগ্য পরিবহণের উপায় হইতেছে সাইকেল। শহরাঞ্চলে কোথাও কোথাও মনুষ্যচালিত বা সাইকেলচালিত বা মোটরসংযুক্ত রিক্সাও পরিবহণের কাজ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শহরাঞ্চলে স্কুটার এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতায় ট্রামগাড়ী পরিবহণের অন্যতম উপায় হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রধান প্রধান শহরগুলিকে সংযুক্ত করিয়া প্রায়

৩৫,০৮১ মাইল দীর্ঘ রেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাতে ভারত এশিয়াতে প্রথম এবং পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। শুধু তাহাই নহে ; রেল ভারতবর্ষের সব চাইতে বৃহৎ জাতীয় ব্যবসা। কেন্দ্রীয় সরকার রেলপথের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বেসরকারী হস্তে যে ৪৫৩ মাইল রেলপথ রহিয়াছে, তাহাও সরকারী নিয়ম-কানুন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এদেশে দৈনিক গড়ে প্রায় ৭৫০০টি যাত্রীবাহী এবং মালবাহী গাড়ী বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করে। যাত্রীবাহী গাড়ীগুলি গড়ে প্রায় ৪০ লক্ষ যাত্রী বা মালবাহী গাড়ীগুলি গড়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন মাল দৈনিক বহন করে।

রেলপথ

ভারতে বর্তমানে তিন প্রকার বিস্তারের রেলপথ রহিয়াছে—(১) বড় মাপের (Broad Gauge—সাড়ে পাঁচ ফুট), (২) মধ্যম মাপের (Metre Gauge—তিন ফুট ৩⅜ ইঞ্চি) এবং (৩) ছোটা মাপের (Narrow Gauge—আড়াই ফুট বা দুই ফুট)। ছোটো মাপের রেল লাইন দিয়া অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপের ইঞ্জিন এবং গাড়ী চলাচল করিতে পারে। এই সব রেল লাইনের ইঞ্জিন খুব দ্রুত চলিতে পারে না। যেসব স্থানে রেল লাইন উঁচু পাহাড়ের উপর উঠিয়াছে (যেমন শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং) সে সব স্থানের লাইনও ছোটো মাপের। বেসরকারী সমস্ত রেলপথই ছোটো মাপের এবং তাহারা আঞ্চলিক যোগাযোগ (Local Communication) সাধন করে মাত্র।

রেলপথের বিভিন্ন মাপ

ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার প্রথমদিকে কোনো পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় নাই। ফলে, স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে বিভিন্ন আঞ্চলিক রেলপথসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। ১৯৪৭ সালের পর এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার যে কমিটি বসান তাহাদের মতামত অনুসারে ১৯৫১ সালে এদেশের রেলপথগুলিকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়—(১) উত্তর রেলপথ, (২) পশ্চিম রেলপথ, (৩) মধ্য রেলপথ, (৪) দক্ষিণ রেলপথ, (৫) পূর্ব রেলপথ, এবং (৬) উত্তর-পূর্ব রেলপথ। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে পূর্ব রেলপথকে ভাঙ্গিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, এবং ১৯৫৮ সালে উত্তর-পূর্ব রেলপথকে ভাঙ্গিয়া উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ করা হইয়াছে। বর্তমানে তাই এদেশের রেলপথগুলি ৮টি স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চলে বিভক্ত।

রেলপথ অঞ্চল (Railway Zones)

ইহাদের মধ্যে (১) **উত্তর রেলপথ** অঞ্চল পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে বিস্তৃত। পূর্ব রেলপথের সহিত ইহার সংযোগস্থল মোগলসরাই। ইহা প্রায় ৬৩৩৮·৬৩ মাইল বিস্তৃত এবং ইহার সদর দপ্তর দিল্লী। (২) **পশ্চিম রেলপথ** অঞ্চল উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাট রাজ্যে বিস্তৃত। ইহা আগ্রাতে ও এলাহাবাদে উত্তর রেলপথের সহিত এবং ভূপালে মধ্য রেলপথের সহিত যুক্ত। আমেদাবাদের উৎপন্ন বস্ত্রাদি এবং রাজস্থানের খনিজ দ্রব্যাদি এই পথেই চালান করা হয়। ইহা প্রায় ৬০১২·৯৩ মাইল বিস্তৃত, এবং ইহার সদর দপ্তর বোম্বাই। (৩) **মধ্য রেলপথ** অঞ্চলের সদর অফিসও বোম্বাই। ইহা উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও অন্ধ্র প্রদেশের উপর দিয়া প্রায় ৫২৯৫·৯২ মাইল বিস্তৃত। এই অঞ্চলের চামড়া, তৈলবীজ, কার্পাস শিল্পজাত দ্রব্য ও চুন প্রভৃতি এইপথেই রপ্তানী হয়। (৪) **দক্ষিণ রেলপথ** অঞ্চল মহারাষ্ট্র, মহীশূর, কেরালা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর উপর দিয়া প্রায় ৬১০০·০৪ মাইল বিস্তৃত। ইহার সদর দপ্তর মাদ্রাজে অবস্থিত। মহীশূরের লৌহ-শিল্প, বিমান-শিল্প, তাঁত-শিল্প এবং তামিলনাড়ুর তাঁত-শিল্প ও অভ্র অঞ্চল এই রেলপথের উপরই নির্ভরশীল। (৫) **পূর্ব রেলপথ** অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রায় ২৩২৪·৬৮ মাইল বিস্তৃত। ইহার সদর দপ্তর কলিকাতা। চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন-শিল্প, আসানসোলের লৌহ, এলুমিনিয়ম, সাইকেল-শিল্প, বার্ণপুরের লৌহ-শিল্প, সিন্ত্রির সার-শিল্প প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে পাট, ধান, চাল, জুতা, চর্মদ্রব্য, কাঁচ, কাগজ, চিনি, বস্ত্রাদি এই রেলপথের সাহায্যেই রপ্তানী হয়। (৬) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের উত্তর দিয়া বিস্তৃত। উড়িষ্যার নূতন তাপসহ ইট প্রস্তুত কারখানা, রৌড়কেল্লার লৌহ কারখানা, ভিলাইর লৌহ কারখানা প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। তাছাড়া, এই অঞ্চলের লোহা, অভ্র, কয়লা, সিমেণ্ট প্রভৃতিও এই পথেই রপ্তানী হয়। ইহা প্রায় ৩৪২৩·৫৬ মাইল বিস্তৃত। ইহারও সদর দপ্তর কলিকাতা। (৭) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ** অঞ্চলের সদর দপ্তর গোরক্ষপুর এবং ইহা বিহার ও উত্তর প্রদেশের প্রায় ৩০৬৩০ মাইল জায়গা জুড়িয়া বিস্তৃত। এই অঞ্চলের চিনি, পাট ও চাল প্রধান ব্যবসায় দ্রব্য। (৮) **উত্তর-পূর্ব**
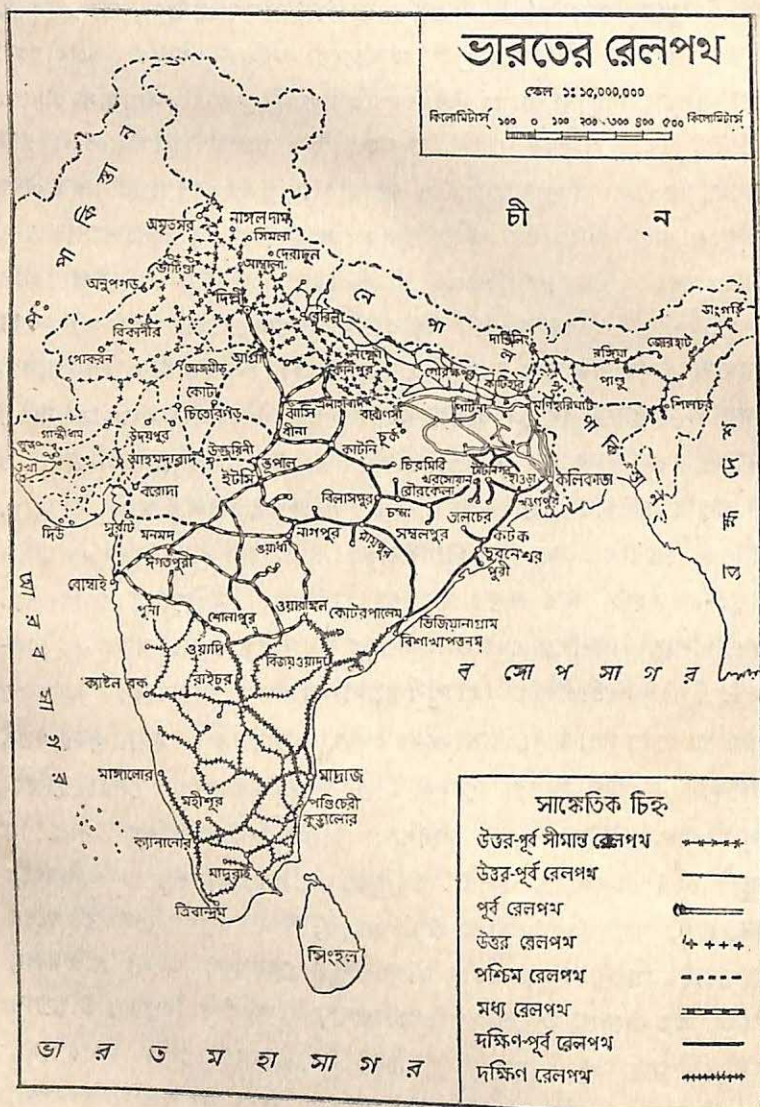
সামান্ত অঞ্চল বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের প্রায় ১৭৩৮ মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চা এই পথে রপ্তানী হয়। তাছাড়া উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্ত প্রতিরক্ষার কাজে ইহার গুরুত্ব অনেকখানি। ইহার সদর দপ্তর পাণ্ডু।

রেলপথের পাশাপাশি জলপথেও পরিবহণের কাজ চলিয়া থাকে। বস্তুত, আমাদের ন্যায় নদীমাতৃক দেশে পরিবহণ কার্যে জলপথ যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাছাড়া জলপথে পরিবহণ অল্প ব্যয়-সাধ্য এবং সুবিধাজনকও বটে; কারণ পণ্যদ্রব্য জলযানে ভালোভাবে বহন করা যায়, বিশেষ নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন হয় না। সেইজন্যই রেলগাড়ী দ্রুতগামী হইলেও অনেক সময়ই ব্যবসায়ীরা জলপথই বেশী পছন্দ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানাকারণে ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথের তেমন প্রসার হয় নাই।

জলপথ

অবশ্য, বহু নদী থাকিলেও উত্তর ভারতে প্রধানত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ও সিন্ধুতেই সারাবৎসর জল থাকে বলিয়া উহাদের সর্বপ্রধান বাণিজ্য-বাহী নদী বলা যায়। বর্তমানে কলিকাতা হইতে ব্রহ্মপুত্র-পথে ডিব্রুগড় পর্যন্ত, এবং কলিকাতা হইতে গঙ্গা-পথে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত যথাক্রমে ১১৭৫ মাইল ও ৯২০ মাইল জলপথই ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ আভ্যন্তরীণ জলপথ। এদেশের বর্তমান নাব্য জলপথ প্রায় ৫০০০ মাইল দীর্ঘ। ইহার মধ্যে প্রায় ১৭৬০ মাইল পথে ষ্টীমার বা জাহাজ চলে, অন্যত্র পরিবহণের কাজ চলে

ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথ
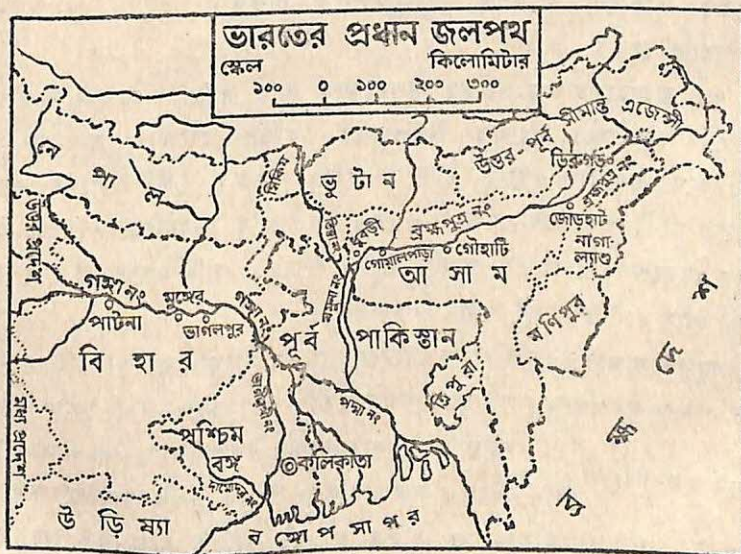
প্রধানত দেশীয় নৌকায় বা ষ্টীম লঞ্চে। দক্ষিণ ভারতে খালপথই জলপথ। এ অঞ্চলে নদীগুলিতে শুধুমাত্র বর্ষায় জল থাকে বলিয়া নৌচালনার বিশেষ উপযোগী নহে। ফলে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের গোদাবরী খাল, ভাম্মাগুডান খাল, কৃষ্ণা খাল, বাকিংহাম খাল, কুর্নুল খাল, মহানদী খাল প্রভৃতিই প্রধান জলপথ। উত্তর ভারতেও অবশ্য প্রচুর খালপথ রহিয়াছে। দেশীয় নৌকাই এই পথের প্রধান বাহন।

গাঙ্গেয় উপত্যকার যান-বাহন

সাধারণভাবে গঙ্গানদীর অববাহিকাকে গাঙ্গেয় উপত্যকা বলে। রাজ্যহিসাবে উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যে পড়ে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গানদীর মাধ্যমে বিশেষ করিয়া মালের যাতায়াত হইয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কলিকাতা হইতে পাটনা পর্যন্ত ৯২০ মাইল দীর্ঘ একটি জলপথ রহিয়াছে। এই জলপথে ষ্টীমার, লঞ্চ ও নৌকা নিয়মিত যাতায়াত করে।

জলপথ ছাড়া রেলপথের দ্বারাও গাঙ্গেয় উপত্যকা সংযুক্ত। পূর্ব রেলওয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রধান প্রধান স্থানকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কলিকাতা-দিল্লী রাজপথ ও গাঙ্গেয় উপত্যকাকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। ট্রাকের সাহায্যে মালপত্র নিয়মিতভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে।

অল্পসল্প দূরত্বের জন্য গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রায় সর্বত্র সাইকেল রিক্সার প্রচলন হইয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিবহণের জন্য বাস ও ট্রাক ব্যবহার হইয়া থাকে। দুর্গম স্থানের জন্য গোরুর গাড়ী ও পাল্কির প্রচলনও গাঙ্গেয় উপত্যকায় রহিয়াছে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে টাঙ্গা বা এক্কা গাড়ীর প্রচলন আছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের গাড়ী প্রায় নাই বলিলেই চলে।

সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সহিত বিদেশের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেই বহিঃস্থ জলপথকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা চলে—(১) উপকূলপথ (২) সমুদ্রপথ। ভারতবর্ষের উপকূল প্রায় ৩৫০০ মাইল দীর্ঘ হইলেও অভগ্ন বলিয়া তথায় বন্দর অত্যন্ত কম। বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ ও কলিকাতা এই চারিটি মাত্র বড় বন্দর

বহিঃস্থ জলপথ

সম্প্রতি কলিকাতার সন্নিকটে হল্‌দিয়ায় আরেকটি বন্দর গড়িয়া উঠিতেছে। এই উপকূলে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে বা এই উপকূল বন্দর হইতে ব্রহ্মদেশ, সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি, সিংহল, আফ্রিকা, পাকিস্থান বা মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে যেপথে বাণিজ্য চলে, তাহাই উপকূলপথ বলিয়া স্বীকৃত। এই পথে উপকূল-বাণিজ্য চলে, হয় বড়ো বড়ো দেশী নৌকায় নয়তো বাষ্পীয় পোতে। পূর্বে উপকূলপথের বাণিজ্যে বিদেশী বাষ্পীয় পোতের একচেটিয়া কারবার থাকিলেও ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে সরকারী নির্দেশে ভারতীয় কোম্পানীর জাহাজ ছাড়া অন্য কোনো জাহাজ এই উপকূলপথে বাণিজ্য করিতে পারিতেছে না।

বর্তমানে এই কাজে নিযুক্ত ভারতীয় জাহাজের মালবহন ক্ষমতা প্রায় ২'৭৪ লক্ষ টন (gross ton)। সমুদ্রপথে বাণিজ্যে ভারত প্রথম অংশ গ্রহণ
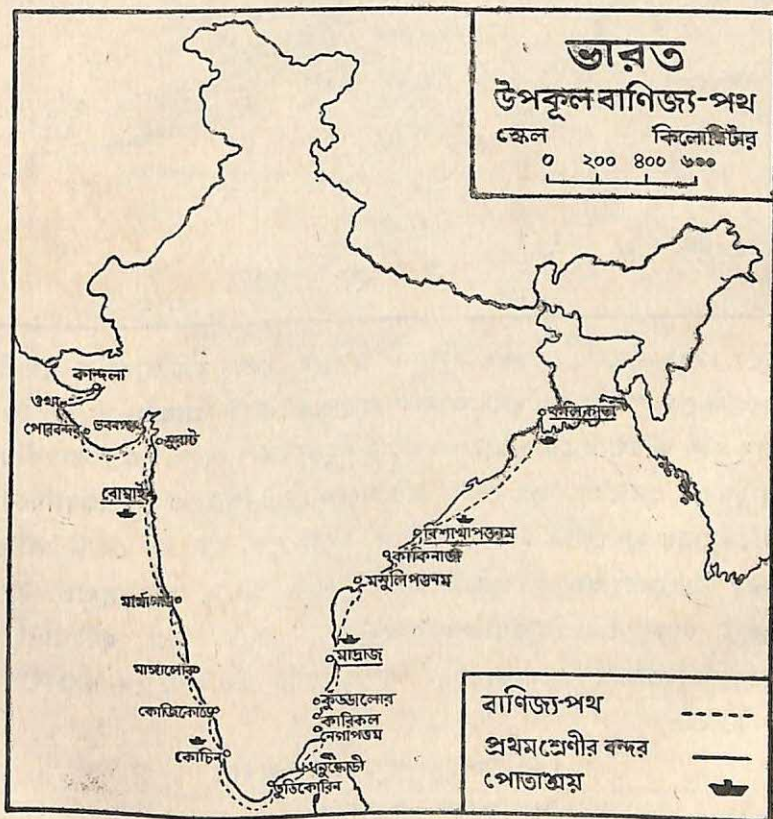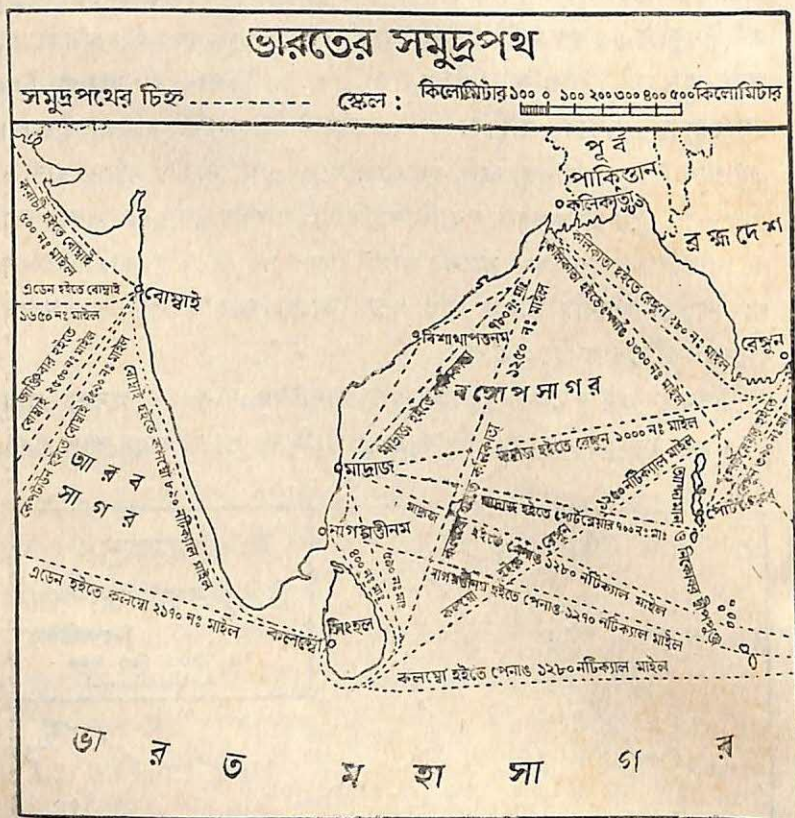
করে ১৯৪৭ সালে। ১৯৫৭ সালের হিসাবে দেখা যায়, ভারতীয় পাঁচটি জাহাজ কোম্পানীর ৪৩ খানি জাহাজ সমুদ্রপথে মোট প্রায় ২৮৯,২৭৩ টন মাল বহন করিয়া থাকে। ভারত সরকার সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য ভারতীয় জাহাজের প্রসারের প্রচুর চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬০ কোটি টাকা (জাহাজ চলাচলের জন্য ২৬ কোটি আর বন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৪ কোটি টাকা), এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯৩ কোটি টাকা (৪৮ কোটি + ৪৫ কোটি) বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বর্তমানে নিম্নলিখিত পথে ভারতের বাণিজ্যপোত নিয়মিতভাবে যাতায়াত করিতেছে—

(ক) ভারত—যুক্তরাজ্য—য়ুরোপ

(খ) ভারত—জাপান

(গ) ভারত—সিঙ্গাপুর

(ঘ) ভারত—পূর্ব আফ্রিকা

(ঙ) ভারত—কৃষ্ণ-সমুদ্র।

স্থলপথ ও জলপথের ন্যায় সাম্প্রতিককালে আকাশপথেও পরিবহণের ব্যাপারে ভারতবর্ষ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়
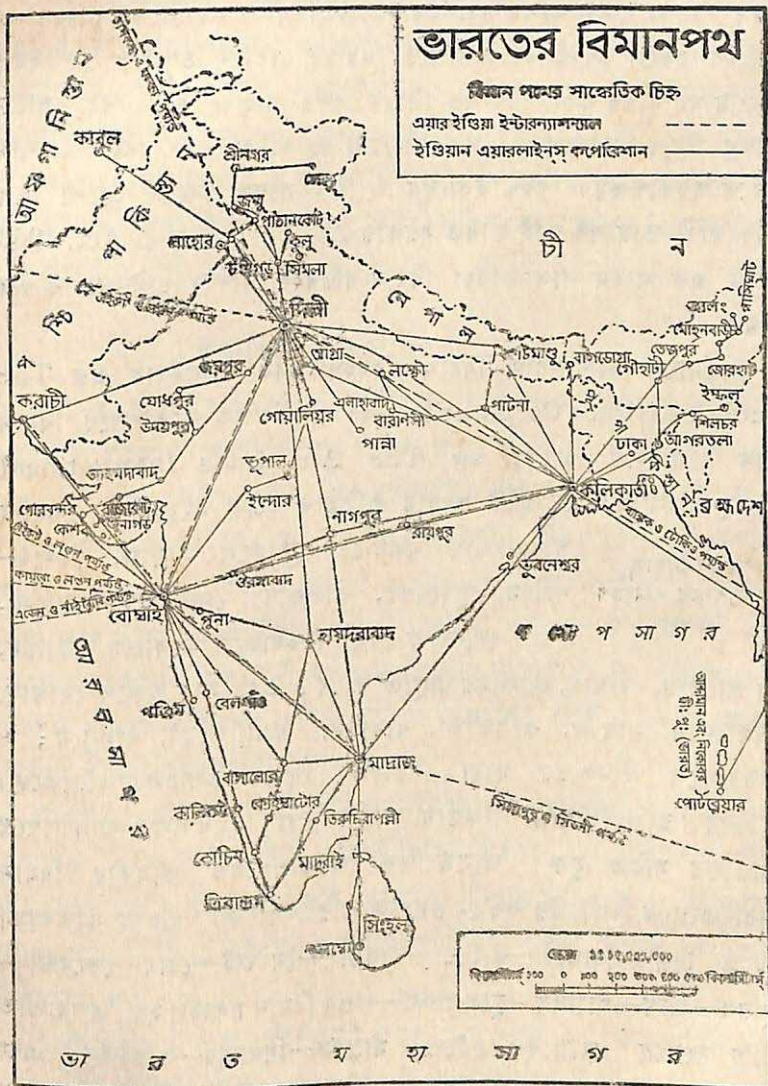
এদেশে মাত্র দুইটি বেসরকারী কোম্পানী কয়েকটি ছোটো ছোটো এরোপ্লেন চালাইত। তখন কোনো বিমান বন্দরও (airport) ছিল না। ১৯২৭ সালে এদেশে প্রথম বেসরকারী বিমান দপ্তর (Civil Aviation Department) স্থাপিত হয় এবং ১৯২৯ সাল হইতে ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে সাপ্তাহিক বিমান চলাচল শুরু হয়। ১৯৩১ সালে কলিকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লী ও করাচীতে বিমান বন্দর স্থাপিত হইলে এদেশের অভ্যন্তরে নিয়মিত বিমান চলাচল শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবশ্য বহু বিমান বন্দর গড়িয়া ওঠে এবং যুদ্ধান্তে যুদ্ধের উদ্বৃত্ত বিমানপোতসমূহ ক্রয় করিয়া বহু প্রতিষ্ঠান পারবহণ ব্যবসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ইহাদের আর্থিক ব্যবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। স্বাধীনতার পর তাই ভারত সরকার Air Corporation Act, 1953 নামে এক আইন পাশ করিয়া বিমান-পরিবহণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লন।

আকাশপথ

বর্তমানে আভ্যন্তরীণ বিমান-পরিবহণ কার্য চালাইবার জন্য The Indian Airlines Corporation এবং আন্তর্জাতিক আকাশপথে বিমান যান চালানোর কার্যের জন্য The Air India International Corporation নামে দুইটি সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রথমটির পরিচালনায় বর্তমানে পূর্বাঞ্চলে মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম, ভুবনেশ্বর, কলিকাতা, গৌহাটি, আগরতলা, ইম্ফল প্রভৃতি স্থানে ; পশ্চিমাঞ্চলে ত্রিবান্দ্রম, কোচিন, ম্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, জামনগর প্রভৃতি স্থানে ; এবং মধ্য অঞ্চলে বোম্বাই, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, কলিকাতা, বানারসী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুরে ; ও উত্তরাঞ্চলে শ্রীনগরের মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচল করিতেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহল, পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও নেপালও আকাশপথে ভারতের সহিত যুক্ত। আন্তর্জাতিক আকাশপথেও ভারতীয় বিমান নিয়মিতভাবে দ্বিতীয়টির অধীনে চলাচল করিয়া থাকে। প্রত্যহ কলিকাতা হইতে দিল্লী—বোম্বাই—কায়রো—দামস্কাস—বেইরুট—রোম—জেনেভা—জুরিখ—প্রাগ—প্যারিস—ডুসেলডর্ফ—লণ্ডন বিমান চলাচল হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ—সিঙ্গাপুর—ডারউইন এবং কলিকাতা হইতে ব্যাঙ্কক—হংকং—টোকিও বিমান চলাচলের ব্যবস্থা

স্বাধীন ভারতে আকাশপথে পরিবহণ ব্যবস্থা

রহিয়াছে। আফ্রিকাগামী বিমান বোম্বাই হইতে এডেন হইয়া সপ্তাহে দুইবার নাইরোবি যায়।

উপরিউক্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান দুইটি ছাড়াও আটটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (Non-Scheduled Airline Operators) আভ্যন্তরীণ পরিবহণের কাজ চালাইবার অনুমতি লাভ করিয়াছে। ভারতের উপর দিয়া যেসব বৈদেশিক কোম্পানীর বিমান পথ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে প্যান এ্যামেরিকান এয়ারওয়েজ, বৃটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন, ট্রান্স-ওয়ার্লড এয়ারলাইনস, রয়েল ডাচ এয়ারলাইনস, কোয়াণ্টাস এম্পায়ার এয়ারওয়েজ এবং এয়ার ফ্রান্স।

১৯৫৬ সালের হিসাবে এদেশে মোট ৮৩টি বিমানবন্দর আছে ; তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসাবে গণ্য তিনটি—কলিকাতা (দমদম), বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), এবং দিল্লী (পালাম)।

দেশ-বিদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা

উপরের আলোচনা হইতে দেখিয়াছ ভারতবর্ষে প্রধানত স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে পরিবহণের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আবার স্থলপথে শহরাঞ্চলে যেমন মোটর, স্কুটার, ট্রাম, রেলগাড়ী, সাইকেল প্রভৃতির প্রাধান্য, গ্রামাঞ্চলে তেমনি সাইকেল বা পশু-বাহিত গাড়ীই বেশী প্রচলিত। অবশ্য সেখানে অন্যান্য ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা যে একেবারেই নাই তাহা নহে ; তবে তাহা একেবারেই নগণ্য। তেমনি, জলপথে উপকূলপথে বা সমুদ্রপথে বা সমুদ্র সন্নিকটবর্তী নদীপথে, বাষ্পীয় পোতই প্রধান পরিবহণের কার্যাদি চালাইয়া থাকে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে দেশী নৌকা, ভেলা প্রভৃতিই পরিবহণের প্রধান উপায়।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উপরিউক্ত পরিবহণ ব্যবস্থাগুলির কোনো-না-কোনোটির যদিও সাক্ষাৎ মেলে, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, যথা, পার্বত্য অঞ্চলে বা মরুভূমি অঞ্চলে বা তুন্দ্রা অঞ্চলে স্থলপথে বা জলপথে এই সব পরিবহণ ব্যবস্থা অচল। নিচে এই সব অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

পার্বত্য অঞ্চলে ভাল পরিবহণের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। খাড়া পাহাড়ের গায়ে রাস্তা নির্মাণ করা অসম্ভব। তার উপর পাহাড়ের গা বাহিয়া কোথাও

বা নদী নামিয়া আসিতেছে, কোথাও বা ঝরণা পড়িতেছে। কোথাও কোথাও বা বিশাল গহ্বর এবং খাদ। ফলে পার্বত্য অঞ্চলে লোকের যাতায়াত খুবই অল্প। পাহাড়ীরা নানা কৌশলে পায়ে চলার পথের ব্যবস্থা করে—খাড়া পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাঁশের খণ্ড পুঁতিয়া হয়তো উপরে উঠার ব্যবস্থা হইল ; আবার কোথাও স্বভাবগত বেত ও লতাকে এমন ভাবে রাখা হইল যে উহাদের ধরিয়াও পাহাড়ের উপর দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। নিজের চলাচল অপেক্ষা, মালবহন পার্বত্য অঞ্চলে অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি করে। ইহার জন্য প্রধানত পশুশক্তির উপরই একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয়। সেখানে অন্য কোনো পরিবহণ ব্যবস্থাই কার্যকরী নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিব্বতে যাবতীয় পরিবহণ কার্যের জন্য নিযুক্ত হয় ইয়াক নামক ভারবাহী পশু। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও বলিভিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে লামা নামক জীব পরিবহণের কার্য সম্পাদন করে। বোঝা লইয়া পর্বতের উপর দিয়া, বিশেষত পর্বতের ঢালু স্থানের উপর দিয়া, চলিতে তাহার মতো অন্য জন্তু বিরল। অবশ্য কোনো কোনো পার্বত্য অঞ্চলে শক্তিশালী পার্বত্য অধিবাসীরা পরিবহণের কার্য করিয়া থাকে। যেমন কেদার-বদরীর পথে পিঠে ডুলি বাঁধিয়া তাহাতে যাত্রী বসাইয়া বহু লোক জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে।

পার্বত্য অঞ্চল

ইয়াক

মরু অঞ্চলেও রাস্তা নির্মাণ করা অসম্ভব। বালুর উপর রাস্তা দাঁড়াইতে পারে না। তারপর সব সময়ই বালুর ঝড় বহিয়া চলিয়াছে বলিয়া, রাস্তার রেখার উপর বালু পড়িয়া তাহা আবৃত হইয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা মরু অঞ্চলে যাতায়াত করা কঠিন। একমাত্র উটের সাহায্যেই মরু অঞ্চলে যাতায়াত চলে কারণ উট বহুদিন পর্যন্ত জল ছাড়া বাঁচিতে পারে এবং মরুভূমির কাঁটাগাছ প্রভৃতি খাইয়া থাকিতে পারে। ইহার উপরের চোখের পাতা পুরু হওয়ায় সূর্যের প্রখর আলোতেও ইহার বিশেষ কষ্ট হয় না। তাছাড়া, মরুভূমিতে বালুর ঝড় উঠিবার পূর্বেই উট বুঝিতে পারে এবং ঝড়ের সময় নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া

মরুভূমি অঞ্চলে

উহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। মরুভূমির প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ঘোড়া এবং গাধাও কিছু কিছু পরিবহণের কাজ করিয়া থাকে।
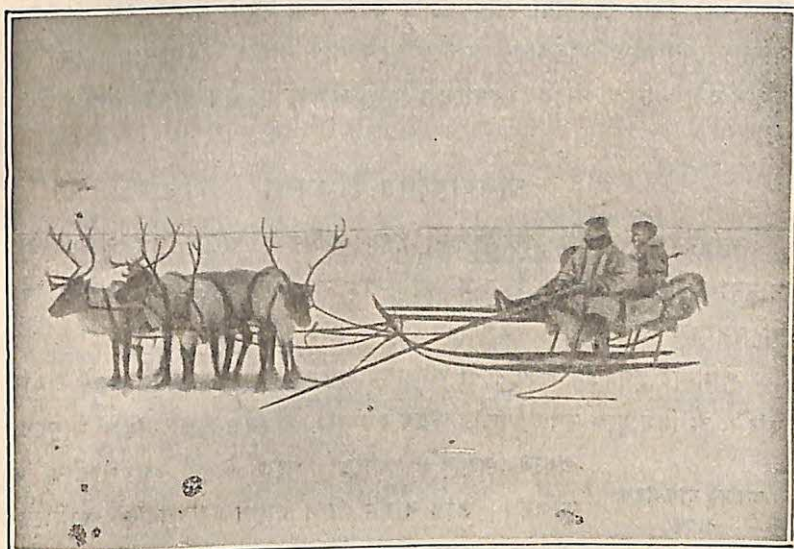
স্লেজ

মেরু অঞ্চলগুলি প্রায় সব সময়ই বরফে ঢাকা থাকে। ওখানে পরিবহণের কাজে বল্গা হরিণ ও কুকুর অপরিহার্য। ঐ সব পশু ছাড়া আর কোন পশু ওখানে পাওয়া যায় না। রাস্তাঘাট নির্মাণও ওখানে অসম্ভব। এখানকার পরিবহণ ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন স্লেজগাড়ী উহাই টানিয়া লইয়া যায়। বরফের উপর দিয়া চাকার গাড়ী চলা সম্ভব নহে, কারণ বরফের বুকে চাকা বসিয়া যায়। তাই এই সব স্লেজগাড়ীতে কোনো চাকা থাকে না। ইহারা দেখিতে অনেকটা তলা-চ্যাপ্টা নৌকার মতো। প্রধানত কাঠের ফ্রেমের উপর সীল মাছের চামড়া লাগাইয়া ইহাদের তৈরী করা হয়। পুরুষেরা যে স্লেজগাড়ী ব্যবহার করে তাহাকে বলা হয় কায়াক (Kayaks), আর মেয়েরা যে স্লেজগাড়ী ব্যবহার করে তাহার নাম হইতেছে উমিয়াক (Umiaks)।

মেরু অঞ্চলে

ভারতে মরু অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল রহিয়াছে। রাজপুতনায়, পৃথিবীর অন্যান্য মরু অঞ্চলেরই মতো অনেক স্থানে উটের সাহায্যে যাতায়াত করা

হইয়া থাকে। ভারতে পার্বত্য অঞ্চল প্রচুর রহিয়াছে। হিমালয় অঞ্চলের কথা বিশেষভাবে বলিতে পারি। সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতই পশুশক্তির সাহায্যে পরিবহণের কাজ করা হয়। কিন্তু মেরু অঞ্চলের যানবাহনের মতো যানবাহন ভারতের কোথাও নাই। হিমালয়ের যে সব অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে, সেখানেও শ্লেজ জাতীয় গাড়ীর ব্যবস্থা নাই।

যানবাহনের ইতিকথা

পরিবহণ ব্যবস্থার আলোচনা শেষ করিবার আগে যুগ যুগ ধরিয়া যানবাহনাদির উদ্ভবের বিচিত্র কাহিনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পৃথিবীর দুর্গমতম অঞ্চলে বা অনগ্রসর অঞ্চলে আজও যেমন পশুই প্রধান বাহন, আদিম যুগে যখন গাড়ীর উদ্ভব হয় নাই, তখনও পশুই ছিল মানুষের প্রধান সহায়। আরো পরে উদ্ভব হয় পাল্কীর বা ডুলির। তার বাহন ছিল মানুষ। আজও আমাদের দেশের কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে এই মনুষ্যবাহিত পাল্কী দেখিতে পাইবে। সেই যুগে আরও এক প্রকারে মানুষ মাল বহন করিত; সেটা হইতেছে লতা বা দড়ির সাহায্যে বাঁধিয়া মাটির উপর দিয়া টানা যে শ্লেজগাড়ী। আজও তুন্দ্রা অঞ্চলে দেখা যায়, শ্লেজগাড়ী এই ভাবে চলে। তবে সেইগুলি টানে কুকুরে বা বল্গা হরিণে।

আদিম যানবাহন ব্যবস্থা

আরও পরে তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ যখন সভ্যতার বড়ো বড়ো কেন্দ্রগুলি গড়িতে শুরু করিল তখন তাহাদের আরেকটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। মিশরে বড়ো বড়ো মূর্তি, পিরামিডগুলি তৈরী করার জন্য দূর দূরান্ত হইতে পাথর আনিতে হইত। নীলনদের বুকে কাঠ ভাসাইয়া তাহার উপর পাথর বসাইয়া জলপথে আনা গেলেও স্থলপথে তাহা বহন করা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। শেষ পর্যন্ত মানুষ কাঠের গুঁড়ি ফেলিয়া তাহার উপর ঐ পাথর বসাইয়া এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াস পাইল। ঐরূপ অবস্থায় টানিলে কাঠের গুঁড়িগুলি গড়াইয়া যাইত, এবং পাথরগুলি আগাইয়া যাইত। এই ভাবে চাকার আদিমতম রূপের উদ্ভব ঘটিল। পরবর্তীকালে প্রথমে কাঠের গুঁড়িগুলিকে ছোটো ছোটো করিয়া কাটা হইত, এবং আরও পরে উহার মধ্য দিয়া ছিদ্র

চাকার ব্যবহার

করিয়া কাঠের গজাল ঢুকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য আরও পরে উহাকে আরও হাল্কা করার জন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়।

চাকার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ রথের ব্যবহারও শিখিয়া ফেলে। প্রাচীন আসীরিয়ায়, বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে, প্রাচীন মিশরে, গ্রীসে বা রোমে বিভিন্ন জাতীয় রথের প্রচলন যে ছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সব রথের সবগুলিতেই মাত্র দুইটি করিয়া চাকা থাকিত এবং গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশু উহাদের টানিত। আজও আমাদের দেশে যে সব গোরুর গাড়ী দেখা যায়, সেই সব রথ তাহারই আদিম সংস্করণ।

আরও পরবর্তীকালে গাড়ীতে দুইটির পরিবর্তে চারিটি চাকা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ডে বা য়ুরোপে এই জাতীয় চার-চাকার গাড়ী খুবই প্রচলিত ছিল। এই সব গাড়ীও সাধারণত ঘোড়ায় টানিত। আমাদের দেশে এখনও এই জাতীয় চার চাকার ঘোড়ার গাড়ী দেখা যায়।

শে গাড়ী

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল মানুষ ততই জীবজন্তুর সাহায্য ছাড়াই গাড়া চালানোর কথা চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার ফলে আবিষ্কৃত হইল শে (Shay) ; ইহাতে ছিল দুইটি বড়ো বড়ো চাকা এবং একটি বসিবার আসন। বসিবার আসনে বসিয়া পা দিয়া ঠেলিয়া শে চালাইতে হইত। পরবর্তীকালে এই শে গাড়ীই বিবর্তনের পথ ধরিয়া একালের সাইকেল গাড়ীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বাষ্পের ব্যবহার

ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে জেমস ওয়াট বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে ইঞ্জিনের পরিকল্পনা করিলেন। ১৭৮৫ সালে মারডকের ইঞ্জিন প্রথম যেদিন রাস্তায় বাহির হইল সেদিনটি মানুষের পরিবহণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। পরবর্তীকালে ঐ ইঞ্জিন পূর্বেকার ঘোড়ার গাড়ীর সহিত জুড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে ষ্টিফেনসন ইঞ্জিনের অনেক উন্নতি সাধন করেন এবং রেল লাইন আবিষ্কার করেন। ফলে, রেলপথে রেলগাড়ীর চলাচল শুরু হয়। আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই পরিবহণের অন্যতম উপায় রেলগাড়ী। সাম্প্রতিককালে বাষ্পের বদলে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেও যে রেলগাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে সেকথা তো আগেই বলা হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডে যখন বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে উন্নততর রেলগাড়ী চালাইবার নানাবিধ-পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিয়াছে, সেই সময় অটো নামক একজন জার্মান একটি ইঞ্জিন তৈরী করেন, যেটি বাষ্পচালিত নহে; গ্যাসোলিন নামক একপ্রকার খনিজ তৈল দিয়া তাহাকে চালাইতে হইত। অটোর এই আবিষ্কারের ফলে স্থলপথে পরিবহণের ক্ষেত্রে আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়া গেল।

গ্যাসের ব্যবহার

এখন রেললাইন ছাড়াও দ্রুতগামী গাড়ীর চলাচল সম্ভবপর হইল। অটোর সহকারী ডেমলার এই গাড়ীর অনেক উন্নতি সাধন করেন।
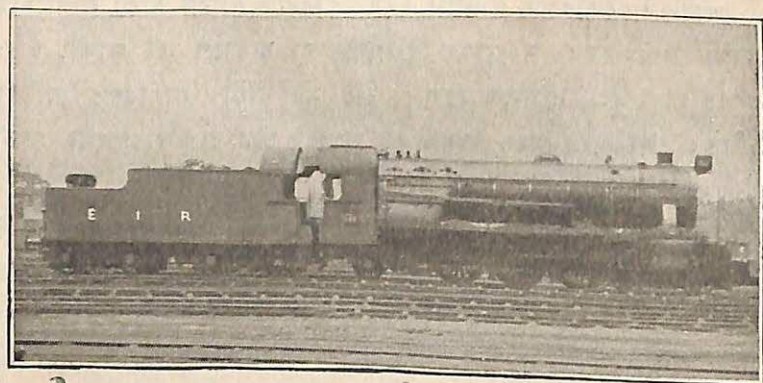
বাষ্পচালিত ইঞ্জিন

মার্ডকের বাষ্পীয় গাড়ী প্রথম চালু হওয়ার প্রায় একশ বছর পরে ১৮৭৫ সালে পেট্রোলচালিত মোটর গাড়ী প্রথম চলা শুরু করিল। আজ মোটর, জীপ, বাস, লরী, স্কুটার প্রভৃতির সর্বত্রই সাক্ষাৎ মেলে। বিদেশে সাম্প্রতিককালে অবশ্য আণবিক শক্তির সাহায্যেও যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে। ইহার পরে গাড়ীর গতি অনেক দ্রুততর করা সম্ভব হইবে।

স্থলপথে যানবাহনের এই বিচিত্র বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলপথেও মানুষ কাঠের যানবাহনের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। আদিম কালে গুঁড়ির সাহায্যে জলপথে পরিবহণের কাজ চালানো হইত তাহা তোমরা জান। এই ভাবে কাঠের গুঁড়ির ভেলা ভাসাইতে ভাসাইতেই মানুষ একদিন নৌকার ব্যবহার শিখিল। আরও পরে বড়ো বড়ো নৌকায় পাল বসাইয়া দাঁড়ের সাহায্যে উহাদের লইয়া মানুষ সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টায় সফল হইল। প্রাচীন

জলপথে যানবাহন ব্যবস্থার বিবর্তন

ফিনিসীয়রা ও মিসরীয়রা সমুদ্রগামী নৌকায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে। প্রাচীন ভারতেও নৌ-শিল্পের প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল।

মানুষের শূন্যপথ বিজয়

শূন্যপথে চলার প্রয়াস শুরু হয় অনেক পরে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মিলার নামে এক ভদ্রলোক এরোষ্ট্যাটের আবিষ্কার করেন। ইহাতে একজন মানুষ দুই হাত দিয়া যাহাতে পাখীর মতো ডানা নাড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর জার্মানীতে অটো লিলিয়েন্থাল গ্লাইডার তৈরী করেন। কিন্তু অল্পক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারিলেও নামিবার সময় যন্ত্রটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি বিশেষ আহত হন এবং মারা যান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শূন্যে চলাচলের ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করেন আমেরিকার অরভিল রাইট। তিনি এরোপ্লেন তৈরী করিয়া তাহাতে পেট্রোল ইঞ্জিন বসাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৯০৮ সালে তিনি যেদিন প্রথম তাহার এরোপ্লেন চালাইয়া শূন্যপথে এক ঘণ্টা বিচরণ করেন সেদিন সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

তাহার পর মাত্র কয়েক দশক কাটিয়াছে, কিন্তু মানুষের শূন্যপথ জয়ের ইতিহাসে এই কয়টি দশক সার্থকতায় সমুজ্জ্বল। শুধু বহুক্ষণ আকাশে স্থায়ী নানাপ্রকারের এরোপ্লেনই সৃষ্ট হয় নাই, আজ মানুষ মহাশূন্য অভিযানেও ব্রতী হইয়াছে।

মহাকাশযান

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ঐ দিনই রাশিয়া মহাশূন্য অভিযানে তাহার প্রথম মহাশূন্য যানটি (spaceship) পাঠাইতে সক্ষম হয়। স্পুটনিক (১) নামক এই মহাকাশযানটি পৃথিবীর কক্ষপথে তাহার উপগ্রহ হিসাবে স্থাপন করা হয়। তাহার পর হইতে অসংখ্য মহাকাশযান রাশিয়া ও আমেরিকা কর্তৃক মহাশূন্যে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কয়েকটি এখনও তাহাদের কক্ষপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের মধ্যে এক্সপ্লোরার, ভ্যানগার্ড, লুনিক, পাইওনিয়র, ডিসকভারার, টাইরস, ট্রানজিট, মিডাস, একো, কোররিয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সাহায্যে মহাশূন্যের বহু অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদ জানা সম্ভবপর হইয়াছে। সাম্প্রতিক সংবাদে জানা যায়, ভারতবর্ষও মহাকাশ সন্ধানী কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল বলা যাইতে পারে।

রেলপথ—এই রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনটি রেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব রেলপথের (Eastern Railway) সাহায্যে পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের সহিত পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ স্থাপিত আছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের (South-Eastern Railway) দ্বারা এই দেশ দক্ষিণ ভারতের সহিত যুক্ত। আবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (North-Eastern Frontier Railways) পশ্চিমবঙ্গকে আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি উত্তর-পূর্বের রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে যাতায়াতের জন্য বর্তমানে ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রচলন হইয়াছে। এই ইলেকট্রিক ট্রেনের লাইন শিয়ালদহ ও হাওড়ার তিনটি রেল লাইনের সহিত যুক্ত।

স্থলপথ—এই রাজ্যের স্থলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত। প্রায় ৫০০০ মাইল যানবাহনের উপযোগী রাস্তা আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আবার জাতীয় রাজপথ, যথা—কলিকাতা-দিল্লী, কলিকাতা-বোম্বাই, কলিকাতা-মাদ্রাজ, বিহার-আসাম, কলিকাতা-শিলিগুড়ি, কলিকাতা-বনগাঁ ও শিলিগুড়ি-গ্যাঙ্গটক জাতীয় রাজপথ। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব রাজপথের পরিমাণও কম নহে।

নৌপথ—ভাগীরথী নদীই এই রাজ্যের প্রধান নৌপথ। এই নদীর মাধ্যমে উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ রহিয়াছে। বর্তমানে ভাগীরথী নদী মজিয়া যাওয়ায় জলপথে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হইতেছে। আশা করা যাইতেছে যে ফারাক্কার বাঁধ তৈরী হইলে ভাগীরথী আবার পূর্বের ন্যায় বেগবতী হইবে। ভাগীরথী ছাড়া, দামোদরের বিভিন্ন খাল, দুর্গাপুর, ত্রিবেণী খাল প্রভৃতির মাধ্যমেও জলপথে যাতায়াত হয়। বঙ্গোপসাগর হইতে ভাগীরথীর মোহনা দিয়া সমুদ্রগামী জাহাজও পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করিয়া থাকে।

বিমান পথ—পশ্চিমবঙ্গে বিমান পথে যাতায়াতের সুবিধাও আছে। দমদম ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিমান বন্দর। ইহার সাহায্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলির সহিত বঙ্গদেশের বিমান পথে যোগাযোগ আছে। দমদম ছাড়া, বাগ্‌ডোগরা (দার্জিলিং), পানাগড় (বর্ধমান) প্রভৃতি আরও

কয়েকটি ছোট ছোট বিমান বন্দর আছে। ঐগুলির মাধ্যমে ভারতের অভ্যন্তরেই শুধু যাতায়াত করা চলে।

গ্রাম ও শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে এখনও অনেক গ্রাম আছে যেখান হইতে রেলপথ বা জলপথে যাতায়াতের সুবিধা নাই। রাজপথের মাধ্যমেই প্রধানত যাতায়াত চলিয়া থাকে। বাস গাড়ীর সাহায্যে যাত্রীরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে বা নিকটস্থ রেল ষ্টেশনে গিয়া থাকেন। মালপত্র পরিবহণের জন্য মটর ট্রাক ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বর্তমানে সাইকেল ও সাইকেল রিক্সাও বেশ চালু হইয়াছে। অল্প দূরত্বের জন্য উহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ষাকলে এমন অনেক যায়গা আছে যেখানে রাস্তা খারাপ হইয়া যায়; আবার অনেক যায়গা আছে যেখানে রাস্তা নাই। তখন গোরুর গাড়ীর সাহায্যেই মালপত্র ও মানুষের পরিবহণ হইয়া থাকে। ঐসব ক্ষেত্রে অসমর্থ ব্যক্তি এবং মেয়েদের জন্য কিছু কিছু পাল্কির ব্যবহার এখনও আছে।

পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি বড় বড় শহর আছে, যথা, কলিকাতা, দুর্গাপুর প্রভৃতি। কলিকাতায় ট্রাম ও বাস প্রধানত যাতায়াতের কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্যত্র বাসের উপরই যাতায়াত নির্ভর করে।

মরু অঞ্চলের যানবাহনের সহিত পশ্চিমবঙ্গের যানবাহনের কোন সাদৃশ্য নাই। পশ্চিমবঙ্গে উট পাওয়াই যায় না; যাতায়াতের জন্য উহার কোন প্রয়োজনও নাই।

অনুশীলন

(আমাদের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা)

১। পশ্চিমবঙ্গে এবং যে কোন মরু অঞ্চলে ব্যবহৃত যানবাহনাদির তুলনা কর। (S. F. 1966) (উঃ—পৃঃ ২২৮, ২৩৪-৩৫)

২। মরু অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল ও মেরু অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থা বর্ণনা কর এবং ইহাদের পার্থক্যের কারণ উল্লেখ কর। (S. F. 1968, 1970) (উঃ—পৃঃ ২২৮-৩০)

৩। গাঙ্গেয় উপত্যকার যানবাহন সম্বন্ধে আলোচনা কর। (S. F. 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ২২২)

৪। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথ ও স্থলপথের পরিবহণ ব্যবস্থার বিবরণ দাও। (S. F. 1969) (উঃ—পৃঃ ২৩৪)

বিশ্বনাগরিক মানুষ

পরিবহণ ব্যবস্থার আলোচনার প্রসঙ্গে তোমরা দেখিয়াছ, গত দুই শতকের মধ্যে মানুষ পরিবহণ ব্যবস্থার কতো উন্নতিই না করিয়াছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যেদিন মারডকের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ইংল্যাণ্ডের রাস্তায় প্রথম চলে সেদিন যে উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল, আজ ইঞ্জিন বা রেলগাড়ী দেখিয়া পৃথিবীর কেহই সেই উত্তেজনা বোধ করে না। সমতলের বুকের উপর দিয়া, নদীর পুলের উপর দিয়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের গায়ে, এমন কি পাহাড়ের মধ্যেও টানেল খুঁড়িয়া তাহার মধ্য দিয়া রেলগাড়ীর চলাচল আজ সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এইসব রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলে; আধুনিক রেল ইঞ্জিনগুলির গতিবেগ অবশ্য আরও বেশী—ঘণ্টায় এমন কি ১০০।১২০ মাইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অটো কর্তৃক খনিজ তৈলদ্বারা চালিত ইঞ্জিন, এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ডেমলার কর্তৃক সেই ইঞ্জিন চালিত মোটর গাড়ী আবিষ্কারের ফলেও স্থলপথে চলাচল অনেক দ্রুততর ও সহজতর হইয়া পড়িয়াছে। তেমনি, প্রায় দেড়শ বছর আগে ফ্লটন সাহেব যেদিন প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ তৈরী করেন, তাহার পর জাহাজ নির্মাণের কলাকৌশলও কতই না উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে সমুদ্র একদিন অজানা রহস্য আর আতঙ্কে ঢাকা ছিল, আজ মানুষ অবলীলাক্রমে তাহা পার হইয়া যাইতেছে। যে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইতে কলম্বাসের দশ সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল, আজ মাত্র চারদিনে জাহাজে সেই সমুদ্র পার হওয়া যায়। সর্বশেষে এই শতকের প্রথম দশকে অর্ভিল রাইট পেট্রোলচালিত মোটর ইঞ্জিনকে উড়োজাহাজ চালাইয়া যে আকাশপথ জয়ের সূচনা করেন, মানুষের শূন্যবিজয়ের সেই অভিযান আজিও অব্যাহত চলিয়াছে। বর্তমানকালে এরোপ্লেনের গতি প্রচণ্ড, ঘণ্টায় ৪০০ হইতে ৭০০ মাইল। কোনো কোনো জেটপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ১১০০ মাইল পর্যন্ত। এমনি ভাবে, জল, স্থল, শূন্য সর্বপথেই মানুষ তাহার গতিপথ অবারিত করিয়াছে, গতিবেগ বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ফলে পৃথিবীর সব দেশই আজ পরস্পরের অতি কাছে

বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান লোপ

আসিয়া পড়িয়াছে। রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথ সুগম করিয়া উহাদের ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। দিন দিনই বিভিন্ন দেশের দূরত্ব কম হইতে আরও কম হইয়া যাইতেছে।

পরিবহণ ব্যবস্থার এই ক্রমোন্নতির ফলে শুধু যে বিভিন্ন দেশের দূরত্ব কম হইয়া আসিতেছে তাহাই নহে, বিভিন্ন অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্যাদির জন্যও বিভিন্ন দেশ ক্রমেই একে অন্যের উপর বেশী নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। কোনো দেশের পক্ষেই তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন করা বা উহার চাহিদা সম্পূর্ণ মেটানো সম্ভবপর নহে। কোনো কোনো দেশের আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ও ভূমির বৈশিষ্ট্যের জন্য সেখানে বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, আবার কোনো কোনো দেশ খনিজ পদার্থের প্রাচুর্যের কারণে নানা শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের বিশেষ সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রভৃতি কারণে ভারতবর্ষে পাট উৎপাদনের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। এই কারণেই অন্যান্য দেশ ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। অন্যদিকে নানাবিধ সুবিধাহেতু ইংল্যাণ্ডে যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া বিভিন্ন দেশ ইংল্যাণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। পূর্বে সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মালপত্রের এই আদান-প্রদান তত বেশী ছিল না। কিন্তু বর্তমানে উহা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন যে দেশ নিজে যাহা উৎপাদন করিতে পারে না তাহা অন্য দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে পারে, তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেক দেশেরই শ্রম ও মূলধনের সর্বাধিক সুব্যবহার হয় এবং তাহার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দুইই বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, ইহারই ফলে কোনো দেশের দুর্ভিক্ষের সময় অন্যদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আনাইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের জনগণের জীবনরক্ষা করাও সম্ভবপর হইতেছে। এমনিভাবে যেমন বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি দ্রব্যের আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও আদান-প্রদানের ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যও বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে আন্তর্জাতিক শান্তি যে প্রত্যেক জাতির পক্ষে অপরিহার্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব নহে, তাহাও মানুষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। আজিকার দিনে বিভিন্ন জাতি তাহার উন্নতির তথা অস্তিত্বের জন্যই অন্যান্য জাতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তাহা সম্ভবপর নহে। একমাত্র শান্তিকালীন আবহাওয়াতেই পরস্পরের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর। প্রত্যেক জাতির স্বীয় অস্তিত্বের জন্যই তাই যুদ্ধ নহে, শান্তি অপরিহার্য। মানুষের এই উপলব্ধি বিশ্বশান্তি কামনায় বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে।

বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা

লীগ অব নেশনস্

প্রথম মহাযুদ্ধের পরই বিশ্বশান্তির প্রয়োজন খুব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের বিশেষ করিয়া য়ুরোপের জনগণের যে চরম দুর্দশা ঘটিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য সকলেই সচেষ্ট হইয়া ওঠে। শান্তির জন্য এই ব্যাপক আকাঙ্খা হইতেই প্রথম বিশ্ব সংঘ বা লীগ অব নেশনস্ (League of Nations) গড়িয়া ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসনই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনের জন্য আহূত ভার্সাই সম্মেলনে, বিশ্বে শান্তি রক্ষার নিমিত্ত, চৌদ্দদফা শর্ত সম্বলিত এক প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়াই লীগ অব নেশনস্ গঠিত হয়।

সংক্ষেপে লীগ অব নেশনসের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষা করা। ন্যায় এবং সততার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবে, আন্তর্জাতিক আইন (International Law) মানিয়া চলিবে, পারস্পরিক চুক্তি ও সন্ধির সর্তগুলি সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি মিটাইতে চেষ্টা করিবে—এই বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্তই লীগ অব নেশনস্-এর সৃষ্টি। কোনো দেশ যদি অন্যায়ভাবে অপর দেশকে আক্রমণ করে তাহা হইলে লীগ অব নেশনসের মাধ্যমে অপরাপর রাষ্ট্রগুলি আক্রমণকারী রাষ্ট্রকে নিরস্ত্র করিবে ও প্রয়োজনবোধে তাহার উপর অর্থনৈতিক চাপ

দিবে—এমন কি সামরিক শক্তির প্রয়োগে উহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবে।

গত যুদ্ধের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া অনেক রাষ্ট্রই লীগ অব নেশনসের সভ্য হয়। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লীগ অব নেশনস্ নানাভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল—লীগ অব নেশনস্ উহা বন্ধ করিতে পারিল না। কিছুদিন হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কমিয়া আসিতেছিল। অনেক ক্ষেত্রে লীগ অব নেশনস্ প্রসংশনীয় কার্য করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে সীমা লইয়া বিবাদের মীমাংসার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীস ও বুলগেরিয়া এবং লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বিবাদও লীগ অব নেশনস্ নিরপেক্ষভাবে মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে লীগ কোনো শক্তিশালী সভ্যের স্বার্থে জড়িত ছিল সেসব ক্ষেত্রে সব সময় উহা নিরপেক্ষ থাকিতে পারে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইঙ্গ-মিশর এবং ইঙ্গ-চীন বিবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলে, পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির চোখে এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা হানি হয়। তারপর শক্তিশালী রাজ্যগুলি লীগের নির্দেশ অমান্য করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে জাপান ও জার্মানী লীগ একেবারেই পরিত্যাগ করে। বস্তুত-পক্ষে মানুষের মনে আন্তর্জাতিক মনোভাব তখনও ভালোভাবে দানা বাঁধে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি সাময়িকভাবে তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিল। কিন্তু লীগ অব নেশনসে সমবেত হইয়াও বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিতে লাগিল। ফলে, লীগ অব নেশনস্ ব্যর্থ হইল। ইহার নিষ্ক্রিয়তার ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের ইতিকথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর, পৃথিবী আবার শান্তিকামী হইয়া ওঠে। লীগ অব নেশনস্ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী বিশ্বসংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন সকল রাষ্ট্রই বিশেষভাবে অনুভব করে।

১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে আটলাণ্টিক মহাসাগরে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল মিলিত হন। আলোচনার পর ইঁহারা বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আটলাণ্টিক চার্টার (Atlantic Charter) নামে এক ঘোষণা

প্রচার করেন। ২৬টি রাষ্ট্র আটলাণ্টিক চার্টারের নীতি গ্রহণ করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করে। ভারতবর্ষ প্রথম স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম ছিল। পরে আরও ১৯টি রাজ্য এই চার্টারে স্বাক্ষর করে।

আটলাণ্টিক চার্টারে এত রাষ্ট্রের স্বাক্ষর দান হইতেই বোঝা যায়, পৃথিবী শান্তির জন্য কতখানি উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল।

জাতিসংঘের ইতিকথা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে যুদ্ধে লিপ্ত অথবা নিরপেক্ষ সকল জাতিকেই আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ তাহাদের মনে স্থিরবিশ্বাসের সৃষ্টি করিল যে আন্তর্জাতিক সংঘ গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে এই সর্বনাশা যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে মানুষের আর পরিত্রাণ নাই। এই উদ্দেশ্য লইয়াই ১৯৪৪ সালের ২৫শে এপ্রিল হইতে ২৬শে জুন পর্যন্ত পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে এমন ৫০টি রাজ্যের সাড়ে আটশত প্রতিনিধি সানফ্রানসিস্কো শহরে সম্মিলিত হন। তাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে
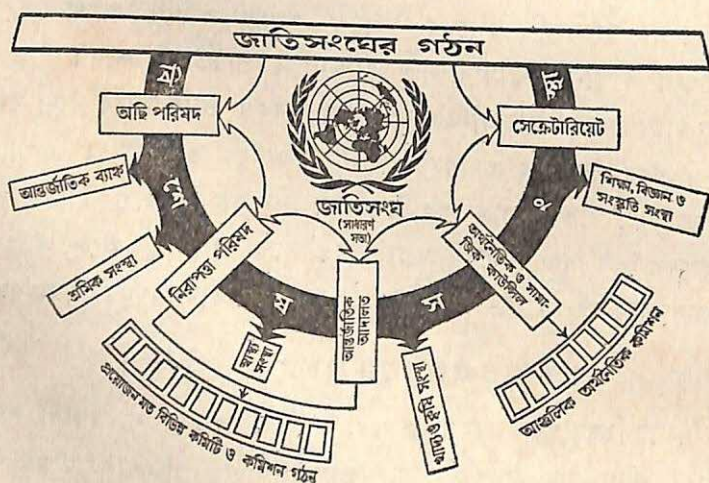
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা ও তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান করা, সমানাধিকারের ভিত্তিতে ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল জাতি যাহাতে পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে

পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া যে সনদ গৃহীত হয়, তাহারই ভিত্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisation সংক্ষেপে U. N. O.) গড়িয়া উঠিয়াছে (২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৫)। বর্তমানে শতাধিক জাতি ইহার সদস্য।

জাতিপুঞ্জের সংগঠন

যে ব্যাপক উদ্দেশ্য লইয়া জাতিপুঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই ইহার সাংগঠনিক দিকও ব্যাপকতর করিয়া তুলিতে হইয়াছে। ইহার প্রধান সাংগঠনিক অংশ হইতেছে সাধারণ সভা (General Assembly), স্বস্তি পরিষদ (Security Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ (Trusteeship Council), এবং দপ্তরখানা (Secretariat)।

প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া সাধারণ সভা গঠিত। সাধারণত ইহার অধিবেশন বৎসরে একবার হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করা সাধারণ সভার প্রধান কাজ। জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সাংগঠনিক অংশগুলির ক্ষমতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকারও সাধারণ সভার রহিয়াছে। এই সভায় পাঁচজন করিয়া সদস্য পাঠাইলেও কোনো রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দিবার অধিকার নাই। সাধারণ বিষয়ে অধিকাংশের ভোটেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রয়োজন।

সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীন এই পাঁচটি রাজ্যের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং প্রতি দুই বৎসরের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ছয়জন সদস্য—এই মোট এগারোজন সদস্য লইয়া স্বস্তি পরিষদ গঠিত। এই পরিষদের প্রধান কাজ হইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের সমাধান করা। শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের বলপ্রয়োগ দ্বারা শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহার পাক্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। যে কোনো ব্যাপারে সাতজন সদস্য একমত হইলেই পরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। তবে স্থায়ী পাঁচজন সদস্যের কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিলে পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত বলবৎ করা যায় না। স্থায়ী সদস্যের এই ক্ষমতাই ভেটো (Veto) নামে পরিচিত।

একজন প্রধান সচিবের অধীনে আটটি বিভাগ লইয়া দপ্তরখানা গঠিত। সংঘের অন্যান্য অংশ যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহাকে কার্যকরী রূপ দেওয়াই দপ্তরখানার কাজ। প্রধান সচিব স্বস্তি পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় হল্যাণ্ডের হেগ নামক শহরে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত পনেরো জন বিচারপতিকে লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করা এই আদালতের প্রধান কার্য। এতদ্ব্যতীত জাতিপুঞ্জের যে কোনো সংগঠন আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে এই আদালতের মতামত আহ্বান করিতে পারে।

লীগ অব নেশনসের সময়ই অছি পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। উহাই কিছু পরিবর্তিতরূপে নূতনভাবে গঠিত হইয়া বর্তমানে কাজ করিয়া চলিয়াছে। ইহার সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নহে। স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছিশাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিগণ এবং অছিশাসনের ভারপ্রাপ্ত ও ভারপ্রাপ্ত নহে অছিপরিষদের এই দুই প্রকার সদস্যদের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া অছি পরিষদ গঠিত হইয়া থাকে। অনগ্রসর জাতিসমূহের তদারক করা অছি পরিষদের প্রধান কাজ।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান : জাতিপুঞ্জের অবদান

যদিও বিগত ২২ বছরে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, কঙ্গো সমস্যা, বার্লিন সমস্যা, আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, আরব-ইস্রায়েল বিরোধ প্রভৃতি গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান জাতিপুঞ্জ করিতে পারে নাই, তবু ঐসব ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা ভুল হইবে। বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলিয়াছে, ইহার প্রচেষ্টাতেই তাহা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আজও পরিণত হয় নাই। জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায়ই বিশেষ রক্তপাত না ঘটাইয়াও মধ্যপ্রাচ্যের ইস্রায়েল রাজ্যের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে; ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হইয়াছে।

জাতিপুঞ্জের সনদে বলা হইয়াছে, অস্ত্রসম্ভারের অধিকারই যুদ্ধের একমাত্র কারণ নয়। তাই এই সনদে বলা হয় যে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের, সর্ববিধ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য ও তাহা হইতে উদ্ভূত অসন্তোষ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ প্রভৃতিও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাহা যুদ্ধ বা বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটাইতে পারে। কল্যাণ সাধনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও যৌথ কার্যকলাপের উপরও প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনে জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

আন্তর্জাতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা সমাধানে জাতিপুঞ্জের অবদান

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তোমরা দেখিয়াছ, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের বহু অবদান সত্ত্বেও কোনো কোনো সমস্যার সমাধানে জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার জন্য সমালোচনার অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্যার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি অবিসংবাদীভাবে প্রমাণ করিয়াছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবকল্যাণ প্রভৃতি ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, সম্ভবপরও বটে।

এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organisation ; সংক্ষেপে I L O) দেশবিদেশের শ্রমিকদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন, তাহাদের কাজের নিয়মকানুনের উন্নতি প্রভৃতির দ্বারা শ্রমিকদের সামাজিক ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ করিয়া দিয়া শ্রমিক-বিক্ষোভ দূর করার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation ; U N E S C O) শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুশীলনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া সর্বদেশের, সর্বধর্মের, সর্বজাতির, সর্বভাষাভাষীর মৌলিক স্বাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার এবং তাহার মধ্য দিয়া ন্যায় ও বিচারের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (Food and Agriculture Organisation ; F A O) মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, বিভিন্ন জাতিকে জীবনধারণের মান উন্নয়নে সহায়তা করা ; সকল দেশের কৃষি, বনজ ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে সাহায্য করা ; গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি করা ; সকল দেশের সকল মানুষ যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা ; এবং এই সব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সকল মানুষের উৎপাদনমূলক কাজে অংশ গ্রহণে সুযোগ বৃদ্ধি করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisa-

tion ; W H O) লক্ষ্য হইতেছে পৃথিবীর সকল দেশে রোগ নিবারণ করা এবং সকল মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা। পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের (International Bank for Reconstruction and Development ; I B R D) উদ্দেশ্য হইতেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল-সমূহের পুনর্গঠনে বা অনগ্রসর দেশগুলির উন্নতির সাহায্য করা। বিশ্বকল্যাণে সহযোগিতা করার জন্য আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আলোচনা বেশী বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কায় তাহাদের উল্লেখ করা হইল না।

বিশ্বমানবিকতা বোধের প্রয়োজনীয়তা

তবু সংশয় থাকিয়া যাইতে পারে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের যে সব ব্যর্থতা দেখা দিয়াছে তাহাতে ইহার ভবিষ্যতও কি লীগ অব নেশনসের মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন? জাতিপুঞ্জ এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহযোগিতার ভিত্তিতে ইহার জন্ম। আজ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষাকল্পে এই প্রতিষ্ঠান যে প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে, মানুষকে সর্ববিধ্বংসী যুদ্ধের হাত হইতে তাহাই রক্ষা করিতেছে। জাতিপুঞ্জের শক্তি তখনই বৃদ্ধি পাইবে, যখন সকল দেশের সকল মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিবে। হয় আমরা ক্ষমতালিপ্সুদের বিশ্বব্যাপী আণবিক যুদ্ধে সমর্থন জানাইয়া সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস সাধনের কারণ হইব নয় আমরা একই পৃথিবীর মানুষ, পরস্পরের সহিত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে বাঁচিয়া থাকিয়া মানব সভ্যতাকে আরও উন্নতির পথে লইয়া যাইব। এই দুইয়ের একটি পথ আজ পৃথিবীর সাধারণ মানুষকে বাছিয়া লইতে হইবে।

অনুশীলন

(বিশ্বনাগরিক মানুষ)

১। জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার পিছনে যে কারণগুলি আছে তাহা আলোচনা কর। জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি কি ভাবে হইয়াছে?

(উঃ—পৃঃ ২৩৮-৪০)

২। জাতিপুঞ্জের প্রধান প্রধান সংস্থাগুলির নাম কর এবং কি ভাবে উহারা বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে, তাহা আলোচনা কর।

(উঃ—পৃঃ ২৪০-৪৪)

৩। সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর—ইউ. এন. ও. (S. F. 1970)
(উঃ—পৃঃ ২৪০-৪১)

৪। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি কি ভাবে পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে এবং কেন তাহারা বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজন বোধ করিতেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ২৩৭-৩৮)

৫। লীগ্ অব নেশনস্ ভাঙ্গিয়া যাইবার কারণগুলি আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ২৩৮-৩৯)

৬। (ক) স্ক্র্যাপ বইএর জন্য—

ইউনাইটেড নেশনসের সনদ-পত্র এবং তোমার পছন্দ মতো কিছু কিছু অংশ নকল করিয়া লও।

(খ) নিম্নলিখিত প্রজেক্ট নেওয়া যাইতে পারে :—ইউ. এন. ও. দিবসের উদ্‌যাপন—পাঠ, বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

দ্বিতীয় ভাগ

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

ঐতিহাসিক পটভূমি

জাতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব

আমাদের দেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক সম্পদাদির কথা তোমরা আগেই পড়িয়াছ। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও ইহাদের অবদান অনেকখানি। উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে সমুদ্র এদেশকে যেমন অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি এই স্বাতন্ত্র্যের ফলেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহার স্বীয় স্বতন্ত্র ঐতিহ্য লইয়া গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। হিমালয় হইতে নির্গত নদনদী আর মৌসুমী জলবায়ু এই দেশকে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে। ইহার এই কৃষি-সম্পদ, তথা অরণ্য-সম্পদ ও খনিজ-সম্পদ ভারতবাসীকে জীবনধারণের জন্য কঠোর সংগ্রাম করার হাত হইতে মুক্তি দিয়াছে। ফলে, ভারতবর্ষ ধর্ম, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সুযোগ পাইয়াছে। সমুদ্রের সান্নিধ্য হেতু ভারতবাসীর, বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীর, সমুদ্র-প্রবণতা তাহাদের সমুদ্রপথে বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিও দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। বৈদেশিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষ সমৃদ্ধতর হইয়াছে।

জনতত্ত্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতি

আবার, এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পর্যালোচনার শুরুতে এদেশের জনতত্ত্বের বিচিত্র প্রভাবের কথাও স্মরণ রাখা দরকার। এদেশের আদিম আদিবাসী নিগ্রিটো, প্রোটো অষ্ট্রলয়েড, মোঙ্গলয়েড প্রভৃতি জাতি ছাড়াও সুপ্রাচীনকালে আর্যদের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপীয়দের অভ্যুদয় পর্যন্ত পারসিক, গ্রীক, শক, হূণ, তুর্কী, আফগান, মোগল প্রভৃতি বিচিত্র জন বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা এদেশে বহন করিয়া আনিয়াছে। একে একে ধীরে ধীরে তাহারা কোথায় কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির মাঝে বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহার সঠিক হিসাব নাই। বস্তুত, এই সব

বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা মনন-কল্পনার সমন্বয়েই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরিয়া সমৃদ্ধতর হইয়াছে। তাই এদেশের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য—সব কিছুতেই বৈচিত্র্যের ছাপ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার

১৯২২ সালে সিন্ধু উপত্যকায় এক উন্নত ধরনের ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। সিমলা পাহাড়ের নীচ হইতে সিন্ধু নদের গতিপথ ধরিয়া, আরব সাগরের তীর পর্যন্ত এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ঐ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মহেঞ্জো-দরো এবং হরপ্পা নামে যে দুইটি শহরের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; ইহা ছাড়া চান্‌হু-দরো নামক স্থানে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষেরও গুরুত্ব রহিয়াছে।

ভারত সংস্কৃতিতে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের গুরুত্ব

কিছুদিন আগেও অনেকে মনে করিতেন, এদেশে আর্যদের আগমনের সঙ্গেই ভারতীয় সংস্কৃতির সূত্রপাত। আর একটি ধারণা ছিল যে আর্যরাই ভারতীয় সভ্যতার জনক এবং অনার্যগণ তেমন সভ্য ছিলেন না। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার এই দুইটি ধারণাকেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। অনার্যরা মোটেই অসভ্য ছিলেন না; সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তাঁহাদেরই অবদান। বৈদিক যুগের পূর্বেও ভারতে উচ্চধরনের সভ্যতা ছিল। আর ভারতীয় সভ্যতা, মিশর, সুমার, আসিরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার সমকালীন।

সিন্ধু সভ্যতায় নগর পরিকল্পনা

আধুনিক যুগের শিল্প-সভ্যতার মত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতাও সম্ভবত নগরকেন্দ্রিক ছিল। ইহার অর্থ এই যে গ্রাম হইতে শহরের সমৃদ্ধি ছিল বেশী। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা দুইটিই ছিল বেশ বড় শহর। শহর দুইটির যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা তখনকার যুগেও নাগরিক জীবন যে খুব উন্নত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শহরগুলির গঠন সৌষ্ঠব ও রাস্তাঘাটের পরিকল্পনা দেখিয়া, ঐগুলি যে সুকৌশলী স্থপতির পূর্ব-পরিকল্পিত সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রশস্ত রাস্তার দুই

পাশে সারিবদ্ধভাবে দালান-কোঠাওয়ালা বড় বড় বাড়ী নির্মিত ছিল। বাড়ীগুলি যে দ্বিতল বা ত্রিতল ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীতেই আধুনিক কালের মতো জল নিকাশের নালা ছিল এবং তাহা ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি করিয়া কূপ থাকিত। দালানগুলিতে সাধারণত অনেকগুলি কোঠা থাকিত; অবশ্য ছোট এক কোঠাওয়ালা দালানও ধ্বংসস্তূপ হইতে বাহির হইয়াছে। মহেঞ্জোদরো শহরে একটি বিশাল প্রাসাদাকৃতি দালান আবিষ্কৃত হইয়াছে। হয়তো বা উহা শহরে বর্তমান "টাউন হলের" কাজ করিত। ঐ সময়ের বাড়ীগুলি রোদে পোড়া ইঁটের ভিত্তির উপর আগুনে পোড়া ইঁটের দ্বারা নির্মিত হইত।
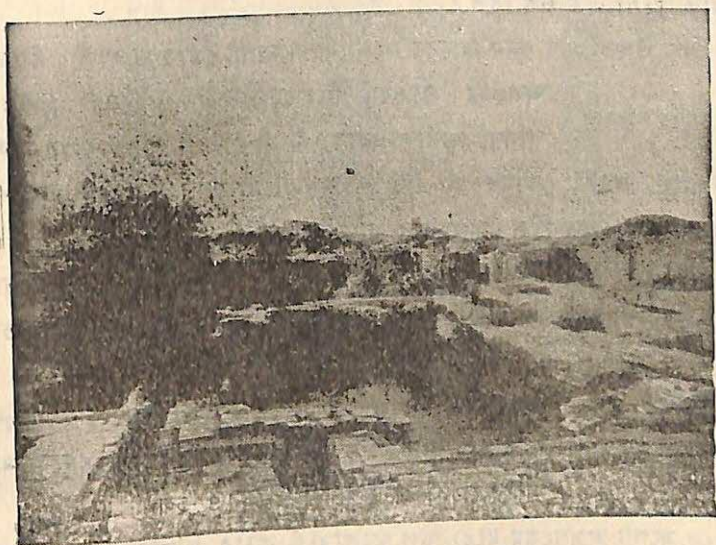
মহেঞ্জোদরোর স্নানাগার

শহরের জল নিকাশের ব্যবস্থা আধুনিক কালের মতো ছিল। শহরের রাস্তাগুলির নীচ দিয়া ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হইত এবং জল উহার ভিতর দিয়া বাহির হইত। আধুনিকতম শহরের মতো, শহরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও প্রশস্ত।

শহরের নাগরিক জীবনে যে গণতান্ত্রিক প্রভাব ছিল তাহার প্রমাণও ধ্বংসাবশেষ হইতে কিছুটা পাওয়া যায়। আধুনিক টাউন হলের মতো যে

একটি বিরাট প্রাসাদাকার অট্টালিকা পাওয়া গিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাছাড়া জনসাধারণের জন্য একটি সন্তরণবাপীসহ একটি স্নানাগারও মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিয়াছে। স্নানাগারে ঠাণ্ডা ও গরম জল উভয়েরই ব্যবস্থা ছিল। আধুনিক কালের ধর্মশালার মতো হরপ্পা শহরে জনসাধারণের একটি শস্য ভাণ্ডারও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এইসব হইতে প্রমাণ হয় যে ঐ সময় শহর নির্মাণের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা ছিল।

বিভিন্ন নিদর্শনাদি হইতে মনে হয়, এই সভ্যতার স্রষ্টাদের কৃষি ও পশুপালনই ছিল প্রধান জীবিকা। গম, বার্লি, যব প্রভৃতি চাষ করা হইত। গোরু, ভেড়া, কুকুর, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু ছিল।

কৃষি ও পশুপালন

সিন্ধু উপত্যকায় খনন কার্যের ফলে সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ ও হাতীর দাঁতের অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। নানারকমের মূল্যবান পাথর বসানো হার, নানা ধরনের হাতে পরার বালা, কানপাশা, আংটি, কোমর বন্ধ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। কাজেই কারুশিল্প ঐ যুগে খুবই উন্নত ছিল ; লোকের রুচিবোধও ছিল।

অলঙ্কারের ব্যবহার

ছোটদের খেলনাও সিন্ধু উপত্যকায় বহু পাওয়া গিয়াছে। ছোট ছোট চেয়ার, ঠেলা গাড়ী, মাথা নাড়াইতে পারে এই ধরনের মাটির তৈরী জন্তু-জানোয়ার পাওয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন ধাতুর প্রস্তুত বহু রকমের বাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে ; ঐগুলি আধুনিক রুচিসম্মত পরিবারেও বেমানান হইবে না। মাটির তৈরী বাসনপত্রের প্রচলনও ছিল।

বাসনপত্র

সে যুগের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল তলোয়ার, কুঠার, ছুরি প্রভৃতি। ক্ষুর ও ছুঁচের ব্যবহারও ছিল।

তখনকার লোকেরা যে বেশ সূক্ষ্ম ধরনের কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিত তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

ধর্মের দিক হইতে সিন্ধু সভ্যতার আমলে শিব ও শক্তি উভয়েরই উপাসনা হইত এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে এই সভ্যতা খুবই উন্নত ধরনের ছিল। কোন জাতীয় লোক এই সভ্যতার স্রষ্টা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

মহেঞ্জোদরোর নটীমূর্তি

তবে ইহা যে আর্য সভ্যতা নহে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত। তবে মৃৎপাত্র-নির্মাণ শিল্প, ভাস্কর্য, বয়ন শিল্প, ধাতুশিল্পাদিতেও যে তাহারা বিশেষ পারদর্শী ছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। মহেঞ্জোদরোতে ধাতুনির্মিত নটীমূর্তি, পাথরের মনুষ্যমূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এইসব শহরে যে অজস্র শিলমোহরজাতীয় জিনিস পাওয়া গিয়াছে তাহাদের উপর খোদাই করা বিভিন্ন পশুপক্ষী বা মনুষ্যমূর্তিও উন্নত ভাস্কর্য-কলারই নিদর্শন।

ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্প

ঐসব শিলমোহরের গায়ে যে সব লিপি খোদাই করা রহিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় লিখিবার পদ্ধতিও সেই যুগের ভারতবাসী আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু এই লিপির পাঠোদ্ধার আজিও সম্ভবপর হয় নাই।

কি করিয়া এই সভ্যতার পতন হয় তাহা আজিও সঠিক জানা যায় নাই। তবে মার্টিমার হুইলার, ষ্টুয়ার্ট পিগট প্রমুখ পুরাতাত্ত্বিকরা সাম্প্রতিক-কালে যে সব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে তাঁহারা মনে করেন, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি নানাকারণে এই সভ্যতা দুর্বল হইয়া পড়িলেও ইহার ধ্বংস ঘটে বহিরাগত আর্যদের সহিত সংঘর্ষে। কবে, কোথা হইতে আর্যরা এদেশে আসেন সে

আর্যগণের আগমন
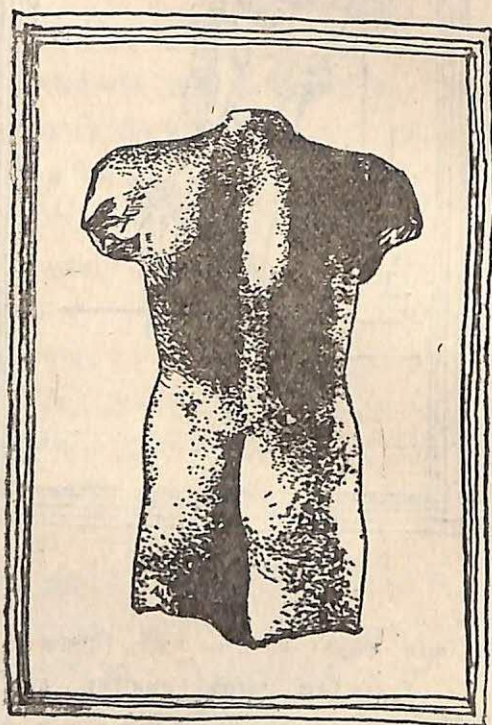
মহেঞ্জোদরোর পাথরের মনুষ্যমূর্তি

সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে ব্র্যাণ্ডেনষ্টিন প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল আরবসাগরের দক্ষিণ তীর। সেখান হইতে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ইঁহাদের এক শাখা পশ্চিমে য়ুরোপের দিকে এবং পূর্বে পারস্য ও ভারতের দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পারস্যের অন্তর্গত বোঘাজকোই নামক জায়গায় এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ভারতীয় আর্যদের আদি দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ ও নাসত্য

ভ্রাতৃদ্বয়ের (অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়) যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা হইয়া থাকে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্যরা এদেশে আসিয়াছিলেন। সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির মতো প্রাচীন আর্যসভ্যতার কোনো বস্তু-নিদর্শন আজিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তবে, সে যুগে ভারতীয় আর্যরা যে সুবিপুল ধর্ম-সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়॥

আর্যদের রচিত সমগ্র সাহিত্য বৈদিক সাহিত্য নামে খ্যাত। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—এই চারিটিকেই বলা হয় বেদ। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরবর্তী-কালে রচিত ছন্দ, শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্পনামীয় ষড়্বেদাঙ্গ এবং সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা নামীয় ষড়্দর্শন-সমন্বিত সূত্রসাহিত্যও এই বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। চতুর্বেদের প্রতিটি আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—এই চারিটি ভাগে বিভক্ত। হিন্দুদের মতে বেদ অভ্রান্ত। উহা কাহারও রচনা নহে, জ্ঞান ও সত্য ঋষিদের ধ্যানের ফলে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্য

বেদের মধ্যে ঋক্ বেদ প্রাচীনতম। ঋক্ বেদের সময় পুরোহিতরা আর্য সমাজে প্রাধান্য পান নাই। যজ্ঞেরও জাঁক-জমক তখন বেশী ছিল না। তবে মোটামুটি ভাবে সমগ্র বৈদিক যুগেই সমাজ এবং ধর্মের অবস্থা একইরূপ ছিল। এইসব গ্রন্থাদি হইতে শুধুই যে প্রাচীন আর্যদের ধর্ম-চিন্তার কথা জানা যায় তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। আর্যদের আচার-আচরণ, সমাজ ও শাসন, সঙ্গীত-নাট্য, চারু ও কারুশিল্পাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রগাঢ় জ্ঞান ও মনীষার সাক্ষ্যও এইসব গ্রন্থাদিতে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

বৈদিক সাহিত্য হইতে জানা যায়, আর্যরা এদেশে আসিয়া প্রথমে শতদ্রু, বিপাশা, ঝিলাম, চিনাব ও রাভী—পাঞ্জাবের এই পঞ্চ নদী এবং সরস্বতী ও সিন্ধুবিধৌত "সপ্তসিন্ধব" নামক ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করেন। পরে ধীরে ধীরে তাঁহারা পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়েন। এই কাজ সহজে সম্ভবপর হয় নাই। বহুদিন ধরিয়া এদেশের আদিম অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়াই আর্যরা নিজেদের বসতি বিস্তারে সক্ষম হন। কিন্তু ইহারই ফলে আবার শেষ

আর্যদের বসতিবিস্তার

পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের কাজও শুরু হইয়া যায়। বস্তুত, আজিকার ভারতীয় সভ্যতা আর্য ও অনার্য এই দুই সংস্কৃতির সমন্বয়েরই ফল।

বৈদিক সাহিত্য হইতে আরও জানা যায়, সেই যুগে বৃত্তির ভিত্তিতে আর্য ও অনার্যরা চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনের কাজ যাঁহারা করিতেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ। দেশরক্ষা ও শাসনাদি কার্য পরিচালনা করিতেন ক্ষত্রিয়রা। বাণিজ্য-কৃষি-পশুপালনাদি অর্থনৈতিক কার্যাদি পরিচালনা করিতেন বৈশ্যরা। আর এই তিন শ্রেণীর সেবাদি করিতেন শূদ্র জাতীয় লোকেরা। বলাবাহুল্য, শূদ্র শ্রেণীতে স্থান হইয়াছিল অনার্যদেরই।

চতুরাশ্রম

আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নিজেদের জীবনকে চারিটি পর্যায়ের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিতেন। আর ঐ ধরনের জীবন পরিচালনের উদ্দেশ্যই ছিল ধর্মলাভ বা আত্মানুভূতি। আট বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে উপবীত ধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। বিদ্যাশিক্ষার্থে তাঁহারা তখন তপোবনে গুরুগৃহে যাইতেন। গুরু পিতার এবং গুরু-পত্নী মাতার স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহারা গুরু পরিবারের একজন হইয়া জীবন যাপন করিতেন। বিদ্যা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময় আহার বিহার প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর সংযম অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে হইত। জ্ঞানলাভ এবং ইন্দ্রিয় সংযম একসঙ্গে চলার ফলে তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের সৃষ্টি হইত এবং তাঁহারা সাংসারিক জীবনের উপযুক্ত হইতেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া অধিকাংশ আর্য সন্তানই বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। কেহ কেহ বা একেবারেই সংসারে প্রবেশ না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। সংসারাশ্রমে যথাসাধ্য নিরাসক্ত ভাবে তাঁহারা পারিবারিক কর্তব্য ও সামাজিক কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া, প্রৌঢ় অবস্থায় (৫০ বৎসরে) বাণপ্রস্থ গ্রহণ করিতেন।

তখন তাঁহারা সাংসারিক কর্তব্য পুত্রদের হাতে অর্পণ করিয়া সংসার হইতে দূরে কোনো নিরিবিলি স্থানে গিয়া ভগবৎ আরাধনায় দিন কাটাইতেন। সংসারের প্রতি আকর্ষণ, স্নেহ-মমতা প্রভৃতি ধীরে ধীরে

কাটাইতে চেষ্টা করিতেন। আর্যদের জীবনে সর্বশেষ আশ্রম ছিল সন্ন্যাস। সকলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু যাহার মনে পূর্ণ বৈরাগ্য আসিত, তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে ভগবানে নির্ভরশীল হইয়া, তাঁহার স্মরণ-মননে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া মুক্তি লাভ করিতেন।

আর্যদের জীবনের উদ্দেশ্য ভোগ-বিলাস ছিল না। সংযম ও ত্যাগের মধ্য দিয়া ভগবানকে লাভ করাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য ছিল। তাই তাঁহারা চতুরাশ্রমের ভিতর দিয়া ঐরূপ জীবন যাপন করিতেন।

ধর্মীয় ব্যাপারে আর্যরা ছিল বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক। আকাশের দেবতা দ্যৌ, জলের দেবতা বরুণ, আলোকের দেবতা সূর্য, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, উষা প্রভৃতি ছিল তাহাদের উপাস্য দেবদেবী। প্রথমে তাহাদের ধর্মীয় আচরণে যজ্ঞই ছিল প্রধান। যজ্ঞের জন্য আগুন জ্বালা হইত এবং উহাতে ঘৃত সংযোগে বিভিন্ন দ্রব্য উপাস্য দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইত। সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ ধ্বনি ও ছন্দের সহিত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত। দেব-দেবীর কোনো মূর্তি গড়া হইত না বা বলিদানেরও কোনো প্রথা ছিল না।

যদিও বহু দেব-দেবীর উদ্দেশে যজ্ঞ বা ত্যাগ করা হইত তথাপি আর্যগণ একেশ্বরবাদেই বিশ্বাস করিতেন। একই ব্রহ্ম (ভগবান) সকল চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; অন্তরে তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারিলেই মুক্তি। আর্যদের ধর্মজীবনের লক্ষ্যাদি মুক্তি অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই সংসারে আসার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া। ইহার জন্য আর্যগণ নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী যথাসাধ্য নিষ্কাম কর্ম করিয়া, চিত্তের শুদ্ধির উপর জোর দিতেন। তারপর, বাণপ্রস্থ কাল হইতে আরম্ভ হইত ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণা। ইহার ফলে ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া অনেকে মোক্ষলাভ করিতেন। যাগযজ্ঞ আর্যধর্মের বহিরঙ্গ মাত্র।

গ্রামকেন্দ্রিক ও পরিবারকেন্দ্রিক সভ্যতা—আর্য সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক এবং পরিবারকেন্দ্রিক। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে কিছু সংখ্যক শহর গড়িয়া উঠিলেও, প্রায় সকল লোকই গ্রামে বাস করিতেন। স্বভাবত কৃষি ও পশুপালনই ছিল আর্যদের প্রধান জীবিকা। গ্রাম পরিবারের ভিত্তিতে সংঘটিত হইত—অনেকগুলি পরিবার একটি গ্রামের সৃষ্টি করিত। গ্রামে প্রত্যেক পরিবারের জন্য জমি থাকিত। প্রত্যেক গ্রামের জন্য একটি

করিয়া বিরাট পশুচারণ ক্ষেত্র থাকিত। উহা ছিল গ্রামের সকলেরই সম্পত্তি।

আর্যদের শিল্পকর্ম—কৃষি ও পশুপালন অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি হইলেও, বস্ত্রাদি, মাটির পাত্র, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্মাণ সংক্রান্ত শিল্পকার্যও আর্যদের অজ্ঞাত ছিল না। তবে সকল শিল্পকার্যই পরিবারের ভিত্তিতে পরিচালিত হইত। আর্যগণ কখনও কোনো বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন নাই।

সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন—পরিবারই ছিল আর্যদের সব রকম জীবনের ভিত্তি। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই ছিলেন কর্তা। তাঁহার আদেশ সকলেই মানিয়া চলিত। স্নেহ, ভালোবাসা, ত্যাগ, কর্তব্যবোধ প্রভৃতির বন্ধনে পরিবারের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে আবদ্ধ থাকিতেন। ফলে পারিবারিক জীবন ছিল মধুর। পরিবারে মেয়েদের স্থানও ছিল উচ্চে। গৃহস্থালীর কাজের পর সামাজিক ও ধর্মীয় সকল ব্যাপারেই তাহারা অংশ গ্রহণ করিতেন। তাহারাও যে প্রচুর পরিমাণ লেখাপড়া শিখিতেন ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রধান কাজ ছিল গৃহে।

আর্য সমাজে সাধারণত পারিবারিক অনুষ্ঠানই সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ নিত। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে সমাজ আমন্ত্রিত হইয়া যোগ দিত।

আর্যদের রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিও ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়া একটি গ্রাম গঠিত হইত। গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনের ভার থাকিত গ্রামীনদের উপর। কয়েকটি গ্রাম নিয়া একটি রাজ্যের সৃষ্টি হইত। রাজ্যকে "বিশ" বা "জন" বলা হইত। তাই রাজ্যের প্রধানকে "রাজন্" বা "বিশপতি" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণেরও হাত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যে সভা ও সমিতি নামে দুইটি পরিষদ গঠিত হইত। রাজাকে সব সময় ইহাদের পরামর্শ নিয়া রাজ্য শাসন করিতে হইত।

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসিত হইত, এরূপ রাজ্যও বৈদিক যুগে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐসব গণরাজ্যের প্রধানকে "গণপতি" বলা হইত। রাজ্যের পরিচালনার জন্য প্রজাদের "বলি", "শুল্ক" ও "ভাগ" নামে তিন প্রকারের রাজস্ব দিতে হইত।

রাজ্যের শাসনকার্যাদি পরিচালনার জন্য রাজা, সেনানী, পুরোহিত প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের নিযুক্ত করিতেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে আর্যদের দান

ভারতীয় সভ্যতা আজও প্রধানত বৈদিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত। আজও আমাদের সভ্যতা প্রধানত গ্রামভিত্তিক—কৃষিই এখনও আমাদের দেশের প্রায় ৭০% লোকের জীবিকা। এখনও আমরা পরিবার-ভিত্তিক জীবনই যাপন করিয়া থাকি। পরিবারের প্রধানেরাই পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া গ্রাম-জীবন পরিচালিত করেন। আজও আমাদের দেশের জনসাধারণ ধর্মপ্রভাবিত জীবনযাত্রা যাপন করে—ভগবৎ লাভ বা মুক্তির নামে জনসাধারণ আজও আগ্রহশীল। তবে, জাতিভেদ আজ ভারত হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর না হইলেও, উহার কঠোরতা বহুলাংশে খর্ব হইয়াছে।

আর্য সমাজে বর্ণভেদ—অন্তর্নিহিত কর্মক্ষমতা এবং বৃত্তি অনুসারে আর্যসমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিতেন। ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি ছিল যুদ্ধ করা এবং রাজ্য শাসন। বৈশ্যেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি এবং পশুপালনে রত থাকিতেন। তিন উচ্চবর্ণের বিভিন্নরূপ সেবা করিয়া শূদ্রেরা নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতেন।

ঋক্ বেদের আমলে অবশ্য বর্ণভেদ প্রথা তেমন কঠোর ছিল না। বর্ণ-প্রথা জন্মগত ছিল না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলেকে ব্রাহ্মণই হইতে হইবে বা ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে ক্ষত্রিয় হইতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বর্ণপ্রথা ছিল বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। এমন কি বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহও চালু ছিল। ঋক্ বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণনা রহিয়াছে যে আদিপুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, জানু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বর্ণভেদ প্রথা কঠোর হইয়া পড়ে। অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ হইয়া যায়; এমন কি অনেক স্থলে বৈশ্যরাও অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য হইয়া পড়েন। বর্ণভেদ প্রথা জন্মগত হইয়া দাঁড়ায়।

বৈদিক যুগের শেষ দিকে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সাধারণের অবোধ্য কতগুলি জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের সমষ্টিতে পরিণত হয়। একদিকে যেমন বাহ্যিক

করিয়া বিরাট পশুচারণ ক্ষেত্র থাকিত। উহা ছিল গ্রামের সকলেরই সম্পত্তি।

আর্যদের শিল্পকর্ম—কৃষি ও পশুপালন অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি হইলেও, বস্ত্রাদি, মাটির পাত্র, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্মাণ সংক্রান্ত শিল্পকার্যও আর্যদের অজ্ঞাত ছিল না। তবে সকল শিল্পকার্যই পরিবারের ভিত্তিতে পরিচালিত হইত। আর্যগণ কখনও কোনো বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন নাই।

সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন—পরিবারই ছিল আর্যদের সব রকম জীবনের ভিত্তি। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই ছিলেন কর্তা। তাঁহার আদেশ সকলেই মানিয়া চলিত। স্নেহ, ভালোবাসা, ত্যাগ, কর্তব্যবোধ প্রভৃতির বন্ধনে পরিবারের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে আবদ্ধ থাকিতেন। ফলে পারিবারিক জীবন ছিল মধুর। পরিবারে মেয়েদের স্থানও ছিল উচ্চে। গৃহস্থালীর কাজের পর সামাজিক ও ধর্মীয় সকল ব্যাপারেই তাহারা অংশ গ্রহণ করিতেন। তাহারাও যে প্রচুর পরিমাণ লেখাপড়া শিখিতেন ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রধান কাজ ছিল গৃহে।

আর্য সমাজে সাধারণত পারিবারিক অনুষ্ঠানই সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ নিত। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে সমাজ আমন্ত্রিত হইয়া যোগ দিত।

আর্যদের রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিও ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়া একটি গ্রাম গঠিত হইত। গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনের ভার থাকিত গ্রামীনদের উপর। কয়েকটি গ্রাম নিয়া একটি রাজ্যের সৃষ্টি হইত। রাজ্যকে "বিশ" বা "জন" বলা হইত। তাই রাজ্যের প্রধানকে "রাজন্" বা "বিশপতি" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণেরও হাত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যে সভা ও সমিতি নামে দুইটি পরিষদ গঠিত হইত। রাজাকে সব সময় ইহাদের পরামর্শ নিয়া রাজ্য শাসন করিতে হইত।

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসিত হইত, এরূপ রাজ্যও বৈদিক যুগে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐসব গণরাজ্যের প্রধানকে "গণপতি" বলা হইত। রাজ্যের পরিচালনার জন্য প্রজাদের "বলি", "শুল্ক" ও "ভাগ" নামে তিন প্রকারের রাজস্ব দিতে হইত।

রাজ্যের শাসনকার্যাদি পরিচালনার জন্য রাজা, সেনানী, পুরোহিত প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের নিযুক্ত করিতেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে আর্যদের দান

ভারতীয় সভ্যতা আজও প্রধানত বৈদিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত। আজও আমাদের সভ্যতা প্রধানত গ্রামভিত্তিক—কৃষিই এখনও আমাদের দেশের প্রায় ৭০% লোকের জীবিকা। এখনও আমরা পরিবার-ভিত্তিক জীবনই যাপন করিয়া থাকি। পরিবারের প্রধানেরাই পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া গ্রাম-জীবন পরিচালিত করেন। আজও আমাদের দেশের জনসাধারণ ধর্মপ্রভাবিত জীবনযাত্রা যাপন করে—ভগবৎ লাভ বা মুক্তির নামে জনসাধারণ আজও আগ্রহশীল। তবে, জাতিভেদ আজ ভারত হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর না হইলেও, উহার কঠোরতা বহুলাংশে খর্ব হইয়াছে।

আর্য সমাজে বর্ণভেদ—অন্তর্নিহিত কর্মক্ষমতা এবং বৃত্তি অনুসারে আর্যসমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিতেন। ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি ছিল যুদ্ধ করা এবং রাজ্য শাসন। বৈশ্যেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি এবং পশুপালনে রত থাকিতেন। তিন উচ্চবর্ণের বিভিন্নরূপ সেবা করিয়া শূদ্রেরা নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতেন।

ঋক্ বেদের আমলে অবশ্য বর্ণভেদ প্রথা তেমন কঠোর ছিল না। বর্ণ-প্রথা জন্মগত ছিল না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলেকে ব্রাহ্মণই হইতে হইবে বা ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে ক্ষত্রিয় হইতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বর্ণপ্রথা ছিল বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। এমন কি বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহও চালু ছিল। ঋক্ বেদের পুরুষসূত্রে বর্ণনা রহিয়াছে যে আদিপুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, জানু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের স্বষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বর্ণভেদ প্রথা কঠোর হইয়া পড়ে। অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ হইয়া যায়; এমন কি অনেক স্থলে বৈশ্যরাও অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য হইয়া পড়েন। বর্ণভেদ প্রথা জন্মগত হইয়া দাঁড়ায়।

বৈদিক যুগের শেষ দিকে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সাধারণের অবোধ্য কতগুলি জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের সমষ্টিতে পরিণত হয়। একদিকে যেমন বাহ্যিক

আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়, তেমনি অন্যদিকে জাতিভেদ প্রথাও কঠোরতর হইয়া দাঁড়ায়। এই অন্তঃসারহীন সঙ্কীর্ণ আদর্শভ্রষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডবহুল ধর্মের অনুশাসন স্বভাবতই চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। আর ইহারই ফলে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে বহু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নূতন ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাব

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থাদি হইতে এবং বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে গ্রথিত রামায়ণ ও মহাভারত নামক মহাকাব্যদ্বয় হইতে জানা যায়, সমসাময়িক ভারতবর্ষে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে এদেশে কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদী, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ নামে ষোলটি বড়ো বড়ো রাজ্য বা মহাজনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের বেশীর ভাগ রাজ্যেই যদিও ছিল রাজতন্ত্র, তবে কোথাও কোথাও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রেরও অস্তিত্ব ছিল। ষোড়শ মহাজনপদ ছাড়াও কপিলাবস্তুর শাক্যজাতি, পিপ্পলীবনের মৌর্যজাতি, ভগ্‌গ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। (গৌতম বুদ্ধ ছিলেন শাক্যজাতির নায়ক শুদ্ধোদনের পুত্র।) এই ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ক্ষমতালাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যে মগধ রাজ্য সবচাইতে শক্তিশালী হইয়া উঠে। মগধের রাজা বিম্বিসার বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু পূর্বভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলিকে জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের সীমানা আরও দুইশত যোজন বিস্তৃত করেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরদের দুর্বলতার ফলে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া মগধে শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁহার বংশধররাও ছিলেন দুর্বল। আর তাহারই ফলে মগধের সিংহাসন শেষ পর্যন্ত চলিয়া যায় নন্দবংশের অধিকারে। নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ মগধ সাম্রাজ্যকে যেমন বিশালতর করিয়া তোলেন,

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ষোড়শ মহাজনপদ

মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান

তেমনি তাহাকে অধিকতর সুগঠিত ও শক্তিশালীও করিয়া তোলেন। তাহার পর আরও আটজন নন্দবংশীয় নরপতি মগধ সাম্রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের শেষ নরপতি ধননন্দ যখন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

ভারতবর্ষে পারসিক ও গ্রীক অভিযান

ইতিপূর্বে পারস্য সম্রাট সাইরাস গন্ধার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র দারায়ুস গন্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা জয় করিয়া ঐ অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের হস্তে পারস্য-সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস পরাজিত হইলে এদেশে যদিও পারসিক আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবু ভারতীয় শিল্প ও শাসন-ব্যবস্থায় পারসিক প্রভাব অব্যাহত থাকে। পারস্য বিজয়ের পর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্যের

দারায়ুস আলেকজাণ্ডার

সুযোগে বিপাশা নদী পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। তাঁহার সৈন্যরা আর পূর্বে অগ্রসর হইতে রাজী না থাকায় অলেকজাণ্ডার ঐ স্থান হইতেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং পথে ব্যাবিলনে মারা যান (খৃষ্টপূর্ব ৩২০)।

তাঁহার মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই এদেশ হইতে গ্রীক অধিকার লোপ পাইলেও এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহার এই আক্রমণের

ফলাফল সুদূরপ্রসারী। এই আক্রমণের ফলে স্থলপথে ও জলপথে পাশ্চাত্য দেশগুলির, বিশেষ করিয়া গ্রীস দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলেই এদেশে গ্রীক ও রোমান শিল্প-সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করে। ইহার অপূর্ব নিদর্শন গন্ধার শিল্পশৈলীর ভাস্কর্যসমূহ। এদেশের মুদ্রানীতি, বিজ্ঞান, নাটক প্রভৃতি গ্রীকপ্রভাবে সমৃদ্ধতর হইয়া ওঠে। অপর দিকে ভারতীয়

ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীক প্রভাব

গন্ধার শিল্প (মাতা ও পুত্র)

সভ্যতার প্রভাব পাশ্চাত্য দেশগুলির উপরও পড়ে। খৃষ্ট ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কিছুটা প্রতিফলিত হইয়াছিল। ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

আলেকজাণ্ডার বিপাশার পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হইলেও ধননন্দের

ভাগ্যে আর বেশীদিন রাজত্ব করা সম্ভব হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামক জনৈক যুবক ধননন্দকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন ও মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আলেক-

মৌর্য সাম্রাজ্য

জাণ্ডারের মৃত্যুসংবাদ এদেশে পৌঁছিলে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের গ্রীক শাসনকর্তাদের পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চলও মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিজিত ভারতবর্ষের এই অংশ ও সীরিয়ার অধিকার তাঁহার সেনাপতি সেলুকাসের উপর বর্তাইয়াছিল। এইবার তিনি হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট নামে চারিটি প্রান্তিক রাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থেনিস নামে তিনি যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহার বিবরণ সমসাময়িক ভারত-ইতিহাসের এক অনবদ্য আকরগ্রন্থ। ঐতিহাসিক যুগে চন্দ্রগুপ্তই প্রথম প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে লইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ হইতে ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসারের সময়ও গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত ভারতের সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁহার পুত্র অশোক (খৃঃ পূঃ ২৭৬—২৩৬) রাজা হওয়ার তের বছর পরে কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্য আরও বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এই যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃশ্য তাঁহার মনকে ব্যথিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। ফলে, তিনি চিরকালের জন্য শরশক্য বিজয় অর্থাৎ অস্ত্রের দ্বারা দিগ্বিজয় ত্যাগ করিয়া ধর্মবিজয় অর্থাৎ সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের দ্বারা অন্যের হৃদয় জয় করার নীতি গ্রহণ করেন। রাজধর্মের এক নূতন আদর্শ তিনি

অশোক

অশোকের সাম্রাজ্য
ম্যাসিডন
(অংতিকিনি)
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
এসিয়া মাইনর
রোম
রোমক
কার্থেজ
আলিকসুন্দর
সিরিয়া
আসীরিয়া
ব্যাবিলন
সুসা
সাইরিনি
(মগ)
মিশর
(তুরময়)
আরব
পশ্চিম সাগর
পূর্ব্ব সাগর
তিব্বত
চীন দেশ
কামরূপ
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
যবন
সিন্ধু
দিল্লী
মথুরা
কপিলাবস্তু
পাটলিপুত্র
সাঁচী
সারনাথ
উজ্জয়িনী
বুদ্ধগয়া
বঙ্গ
সৌরাষ্ট্র
সুরাট
কলিঙ্গ
ধৌলি
সিদ্ধপুর
কেরল
তাম্রপর্ণি
সুবর্ণভূমি
অশোকের ধর্ম্মলিপি
ধর্ম্মের দ্বারা বিজিত রাজ্য
স্বকীয় রাজ্য
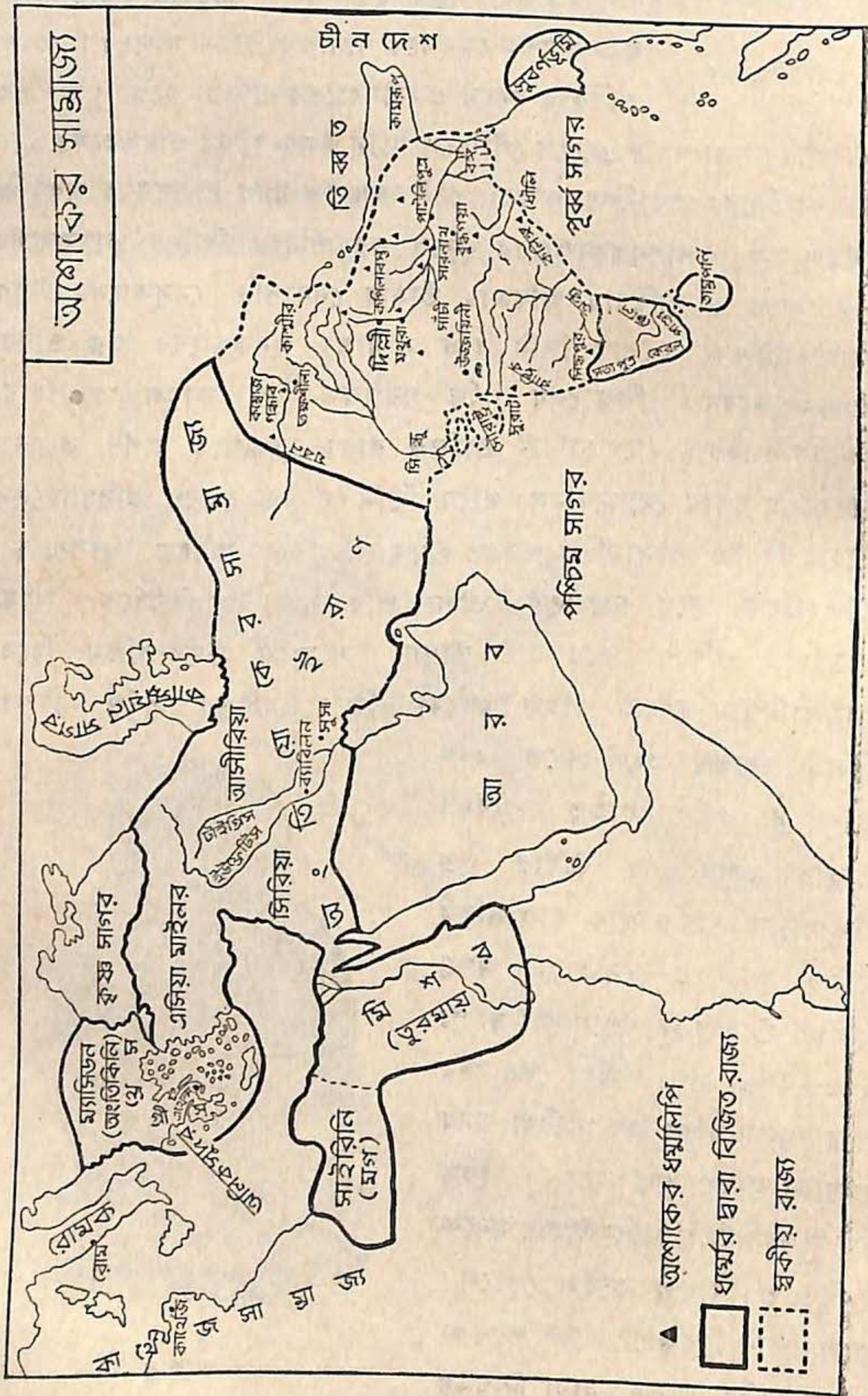
জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। স্বদেশে কি জীব-জন্তু, কি প্রজাসাধারণের ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণসাধনই যেমন তাঁহার রাজ্যশাসন নীতির মূল কথা ছিল, বিদেশের সমস্ত রাজাদের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনও ছিল তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। মানুষ এমন কি পশুর চিকিৎসার জন্যও তিনি চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।
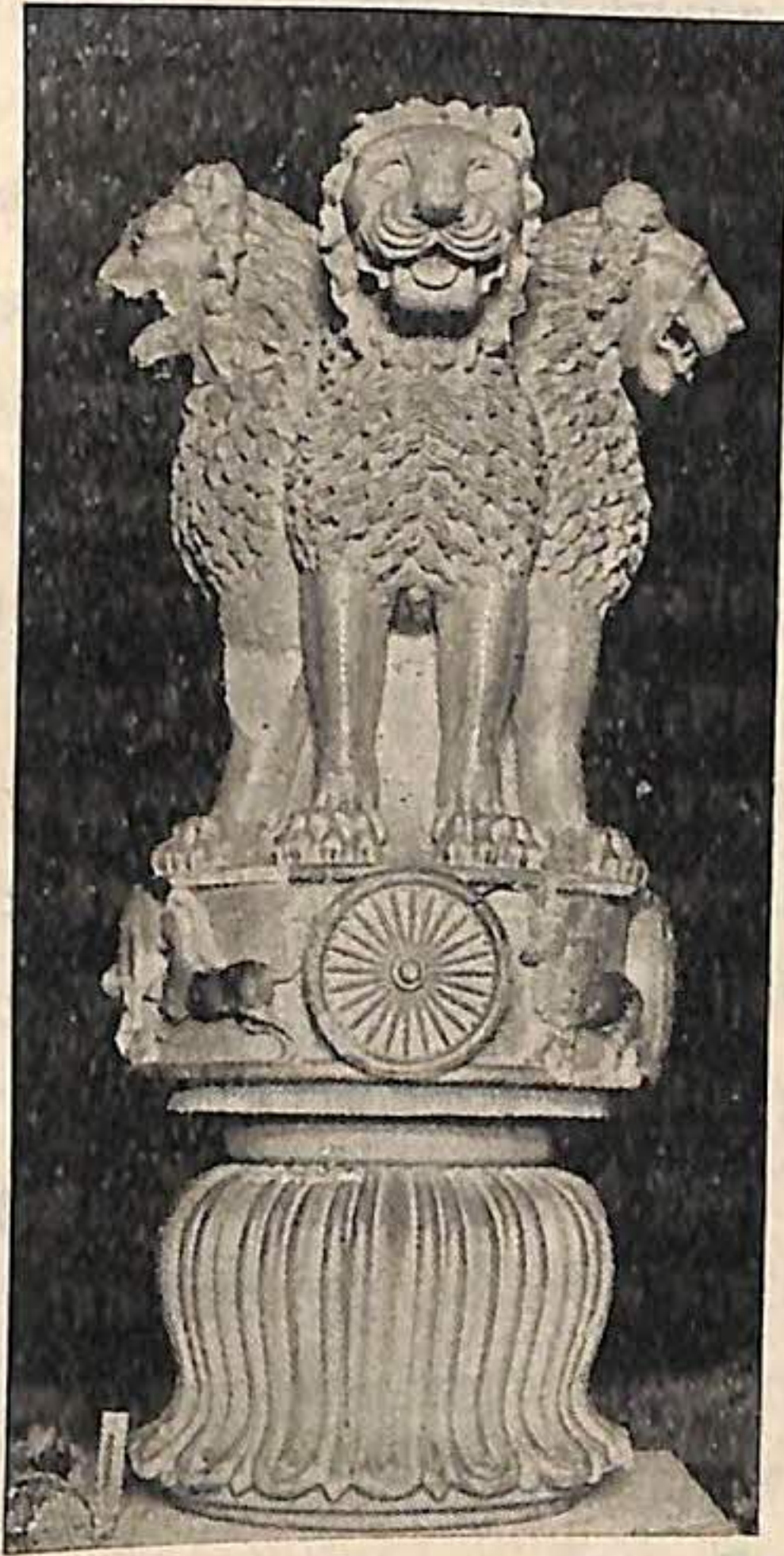
অশোকের ভাব্রুলিপি হইতে জানা যায়, কলিঙ্গযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মবিজয় ক্ষেত্রে প্রজাদের ধর্মাচরণে উৎসাহিত করিলেও অশোক কখনও তাহাদের বৌদ্ধ ধর্ম বা সংঘের অনুগামা হইতে বলেন নাই। তাঁহার দ্বাদশ পর্বতলিপিতে তিনি স্পষ্টই সকলকে আত্মপাষণ্ড পূজা বা স্বধর্মের প্রশংসা ও পরপাষণ্ডগর্হা বা পরধর্মের নিন্দা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যে জনমত প্রচলিত আছে, এই কারণেই তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন না। বস্তুত, সর্বধর্মের যে

সারবস্তু, অশোক তাঁহার লিপিতে তাহাকেই বলিয়াছেন “ধম্ম” বা ধর্ম। এই ধর্মই তিনি প্রজাদের অনুসরণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। এই ধর্মের ভিত্তি ছিল কতকগুলি অবশ্যপালনীয় চিরন্তন ও সার্বজনীন চরিত্রনীতি। যথা, অহিংসা, দয়া, সংযম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা, দান, আলস্য, শুচিতা, দৃঢ়-ভক্তি, সত্যানুরাগ, ধর্মরতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে তাহার সময়ই অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধরাও সমভাবে রাজানুগ্রহ লাভ করে, এবং স্বদেশে ও বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ছড়াইয়া পড়ে। তাছাড়া, বৌদ্ধ ধর্মের কতকগুলি মূলনীতির সহিত অশোকের ধর্মের নিকট সম্পর্ক থাকায়ও বৌদ্ধ ধর্মের এই প্রসার লাভে সহায়তা করে। দেশের মধ্যেও লোকেরা যাহাতে সৎপথে থাকে তাহার জন্য অশোক পর্বতগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে সর্বধর্ম অনুমোদিত উপদেশাবলী খোদাই করিয়া দিতেন। এইসব শিলালিপির অনেকগুলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পরবর্তী মৌর্য সম্রাটের পারিবারিক দ্বন্দ্ব, তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের প্রাধান্য লাভের চেষ্টা প্রভৃতি কারণে তাঁহার মৃত্যুর অল্প পরেই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধের সিংহাসনে শুঙ্গবংশের অধিকার স্থাপন করেন।

মেগাস্থেনিসের বিবরণ ও সমকালীন অপর একখানি গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (কেহ কেহ মনে করেন উহা চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী বা পরামর্শদাতা চাণক্য বা কৌটিল্যের রচনা) হইতে জানা যায়, সেই যুগে শাসন-ব্যবস্থা আজিকার মতোই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রে মন্ত্রীপরিষদ নামে একটি কেন্দ্রীয় সভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজা রাজ্যশাসন করিতেন। দেশের সর্বত্র কি ঘটিতেছে তাহার গোপন তথ্য রাজাকে সর-বরাহের জন্য ছিল অসংখ্য গুপ্তচর। রাজা স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন এবং দণ্ডবিধি ছিল কঠোর। বিচার ব্যাপারে সকলকেই সমান চোখে দেখা হইত এবং শাসন-ব্যবস্থার মূল আদর্শই ছিল প্রজাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থাও যে অনেকটা আধুনিক কালের মতোই পরিচালিত হইত তাহার প্রমাণ আমরা পাই চন্দ্রগুপ্তের সময়ে রাজধানী পাটলীপুত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার বিবরণ হইতে। ত্রিশজন সদস্য লইয়া একটি নগর-পরিষদ ইহার কার্য পরিচালনা করিত। এই নগর-পরিষদ আবার

সময়-পঞ্জী

৫০০০ খৃঃ পূঃ—১ খৃষ্টাব্দ

৪০০০ খৃঃ পূঃ	সিন্ধু সভ্যতার পত্তন
৩০০০ খৃঃ পূঃ	
২০০০ খৃঃ পূঃ	সিন্ধু সভ্যতার পতন ও আর্যদের আগমন (১৫০০ খৃঃ পূঃ)
১০০০ খৃঃ পূঃ	
৫০০ খৃঃ পূঃ	বিম্বিসারের মগধের সিংহাসনে আরোহণ (৫৪৪)। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ (৩২৭)। চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৩২৪)। অশোকের রাজ্যাভিষেক (২৬৯)। শুঙ্গ বংশ, কাণ্ব বংশ, মগধ সাম্রাজ্যের পতন
১ খৃঃ পূঃ	

শিল্পোৎপাদন, বিদেশীদের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্যের জন্য ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক বোর্ডে ছিল পাঁচজন সদস্য। একই নীতিতে সৈন্য-বাহিনীর কার্যও পরিচালিত হইত। প্রত্যেক বোর্ডের পৃথক দায়িত্ব ছিল।

সেই সময় জনসাধারণের জীবন ছিল শান্তিপূর্ণ। কৃষি ছিল তাহাদের প্রধান জীবিকা। চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি ছিল অজ্ঞাত। মিতব্যয়িতা ও শ্রমপরায়ণতা ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

মৌর্যযুগে এদেশে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলারও বিশেষ উন্নতি ঘটে এবং তাহাদের উপর পারসিক ও গ্রীক শিল্পশৈলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে বরাবর পাহাড়ে নির্মিত বিভিন্ন গুহাচৈত্যের বা পাটলীপুত্রের রাজ-প্রাসাদের স্থাপত্য কলা এবং বিভিন্ন স্তম্ভশীর্ষের পশুমূর্তিগুলি উন্নত শিল্প-কলারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

পুষ্যমিত্রের পর আর নয়জন শুঙ্গবংশীয় রাজা মগধের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ছিল দুর্বল। ফলে শেষ শুঙ্গ রাজা দেবভূতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহারই মন্ত্রী বসুদেব মগধের সিংহাসনে কাণ্ববংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজাদের হস্তে কাণ্ববংশের পতন ও মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

অশোকের পরবর্তী মৌর্যসম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে সেই সময়ই বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণ, পহ্লব দেশের পহ্লবগণ, শকস্তানের শকগণ এবং উত্তরাঞ্চল হইতে আগত কুষাণগণ একে একে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। এইসব বৈদেশিক নরপতিদের মধ্যে ব্যাকট্রিয় নৃপতি মিনাণ্ডার, শক নৃপতি নহপান ও রুদ্রদামন, পহ্লব নৃপতি গণ্ডোফার্নিস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে কুষাণ নরপতিগণই এদেশে সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী হইয়া ওঠে।

বৈদেশিক রাজবংশ

কুষাণ সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতি

কুষাণ-রাজ কণিষ্ক তাঁহার রাজ্যের পরিধি পশ্চিমে মধ্য এশিয়ার খোটান ও খোরসান হইতে শুরু করিয়া পূর্বে বিহার ও কোঙ্কন উপকূল পর্যন্ত বিস্তার করেন। তিনি শুধু দিগ্বিজয়ী নৃপতি হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন নাই। অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায়, অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচারে, ধর্মমতের উদারতায়, শিল্প ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার আমলেই বৌদ্ধ মহাযান মতের

বিকাশ ঘটে। পূর্বে বুদ্ধকে দেবতারূপে পূজা করা হইত না। মহাযান মতের বিকাশের ফলে তিনি দেবতারূপে পূজা পাইতে লাগিলেন। নানারূপ বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হইতে লাগিল এবং দেবমন্দিরে সেগুলি পূজা পাইতে লাগিল। ফলে, সাধারণ লোকের কাছে বৌদ্ধ ধর্মের আবেদন বৃদ্ধি পাইল এবং ভারতে ও বাহিরে ইহার প্রচার সহজ হইল। মহাযান মতের প্রসারের ফলে বৌদ্ধ ভাস্কর্যশিল্পও উৎসাহ পায়। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরুষপুরের চৈত্য নির্মিত হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ চরক প্রভৃতির অবদান আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান শিল্পের অপূর্ব সমন্বয়ে গান্ধার-শিল্পশৈলীর উদ্ভব ঘটে। কিন্তু কণিষ্কের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে কুষাণ রাজারা দুর্বল হইয়া পড়েন এবং কুষাণ রাজ্যের পরিধি সংকীর্ণতর হইয়া শেষ পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সীমিত হইয়া পড়ে।

কণিষ্ক

মৌর্যোত্তর যুগে, বিশেষ করিয়া কুষাণদের রাজত্বকালে, বহির্বিশ্বের সহিত নানাভাবে ভারতের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। মধ্য এশিয়ার কাশগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানের সহিত অশোক যে ধর্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে দৃঢ়তর হইল। ফলে, পরবর্তীকালে ঐসব অঞ্চলেও ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পারস্য, সিরিয়া হইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার ভিতর দিয়া গ্রীস ও রোমের সহিত পূর্ব হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা এই সময়ে আরও বৃদ্ধি পাইল। কুষাণদের রাজত্বকালে চীনদেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে দুইজন বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক চীনে

গিয়াছিলেন। ঐসব আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ফলেই কুষাণ সভ্যতা এত উন্নত হইয়াছিল।

কুষাণদের পর ভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে গুপ্ত বংশের। গুপ্তবংশের সর্বপ্রথম শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

গুপ্ত রাজবংশ

বস্তুত তিনিই ছিলেন এই রাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা (৩২০ খৃষ্টাব্দ)। তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র উত্তর ভারত ও মধ্য ভারত জয় করিয়া নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দক্ষিণ ভারতও তিনি জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অঞ্চলের রাজাদের পরাজিত করিয়া তাহাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াই তিনি তাহাদের নিজ নিজ রাজ্য ফিরাইয়া দেন। এইভাবে আসমুদ্র হিমাচল সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু তিনি শুধুই দিগ্বিজয়ী রাজা মাত্র ছিলেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তিনি বিখ্যাত হইয়া আছেন। নিজে হিন্দুধর্মের অনুরাগী হইলেও পরধর্মের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও সংস্কৃতির অনুশীলনের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত হইয়া আছেন। তাঁহার আমলে ফা-হিয়ান নামে যে চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসেন, তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, গুপ্ত আমলের উদার শাসন-ব্যবস্থার ফলে সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

জনসাধারণ উন্নত, সচ্ছল ও সন্তোষপূর্ণ জীবন যাপন করিত। পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ছিল সেই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পরবর্তী গুপ্তসম্রাটদের দুর্বলতা ও আত্মকলহের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িতে শুরু করে। প্রাদেশিক শাসকরা স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন শুরু করে। ফলে, হুণরা যখন এদেশ আক্রমণ করে তখন তাহাদের বাধা দিবার শক্তি গুপ্ত রাজাদের আর ছিল না। এইভাবেই বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্য
গন্ধার
কাবুল
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
কুষাণ রাজ্য
কর্তৃপুর
মদ্রক
হি মা ল য় প র্ব ত
যৌধেয়
দিল্লী
মিরাট
শ্রাবস্তী
নেপাল
ললিতাপুর
কপিলবস্তু
কামরূপ
সিন্ধু
আশ্রিত রাজ্য
মথুরা
বৈরাট
গঙ্গা
অযোধ্যা
কোশল
বৈশালী
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র
যমুনা
চম্বল
প্রয়াগ
কাশী
শোণ
বুদ্ধগয়া
সাঁচী
শকরাজ্য
মালব
বঙ্গ
সমতট
উজ্জয়িনী
নর্মদা
মহাকোশল
তাম্রলিপ্তি
সৌরাষ্ট্র
গিরনার
তাপ্তী
মহানদী
ওড্র
কলিঙ্গ
ধৌলি
সুরাট
নাসিক
গোদাবরী
অন্ধ্র
অমরাবতী
বেঙ্গী
কৃষ্ণা
সিদ্ধপুর
পেনার
সত্যপুত্র
কাঞ্চী
পল্লব
কাবেরী
চোল
কেরলপুত্র
পাণ্ড্য
সিংহল
অশোকের শিলালিপি
মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা
গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা
সমুদ্রগুপ্তের অভিযানপথ

সময়-পঞ্জী

১—৫০০ খৃষ্টাব্দ
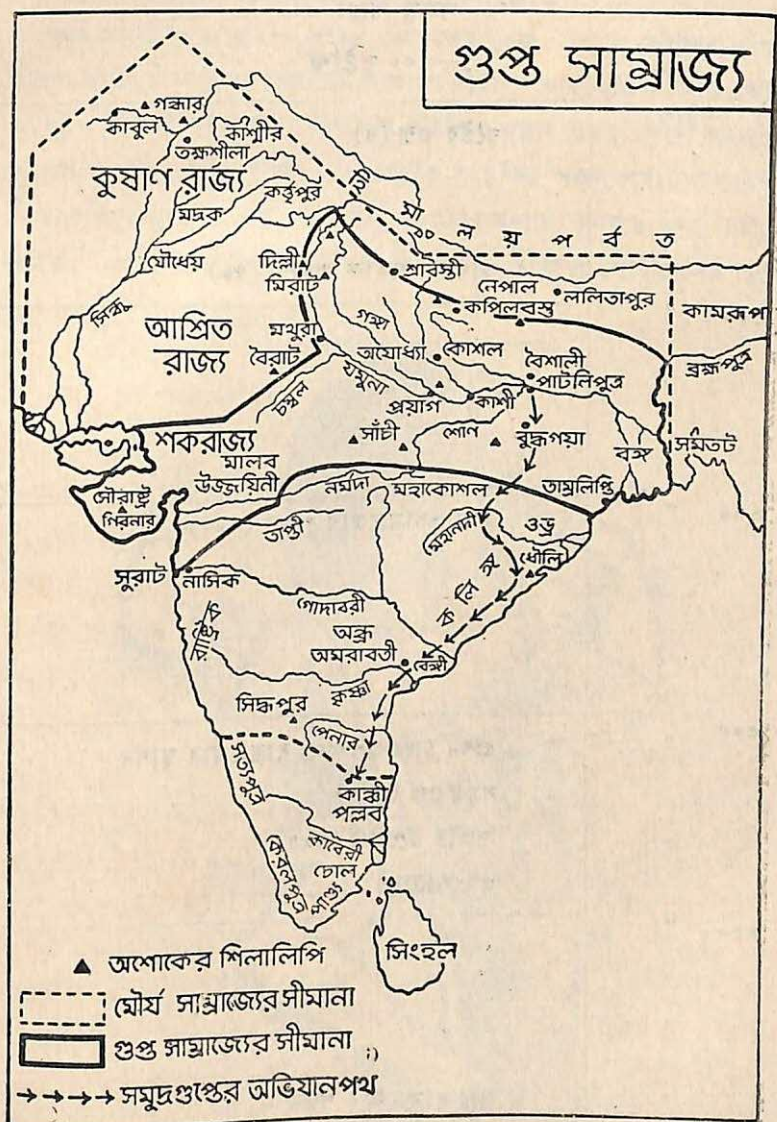
১ খৃষ্টাব্দ	খৃষ্টের জন্ম (৪) কণিষ্ক—শকাব্দ প্রচলন (৭৮)
১০০ "	
২০০ "	কুষাণ-সাম্রাজ্যের পতন (২০০)
৩০০ "	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত—গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থাপন সমুদ্রগুপ্ত (৩২০) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০) হূণ-আক্রমণ
৪০০ "	গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন
৫০০ "	

গুপ্তযুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি

গুপ্ত সম্রাটগণ প্রায় ২০০ বৎসর ভারতের এক বিশাল অংশের উপর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের অধীনে সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন রাজনৈতিক শান্তি ভোগ করে। ঐ সময় ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিও প্রচুর হয়। ফলে গুপ্তযুগে ভারত সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি সংস্কৃতির সকল পর্যায়েই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। গুপ্তযুগকে হিন্দু সভ্যতার মধ্যাহ্ন কালও বলা যাইতে পারে। ভারতে গুপ্তযুগে সংস্কৃতির বিকাশকে এথেন্সে পেরিক্লিসের যুগে
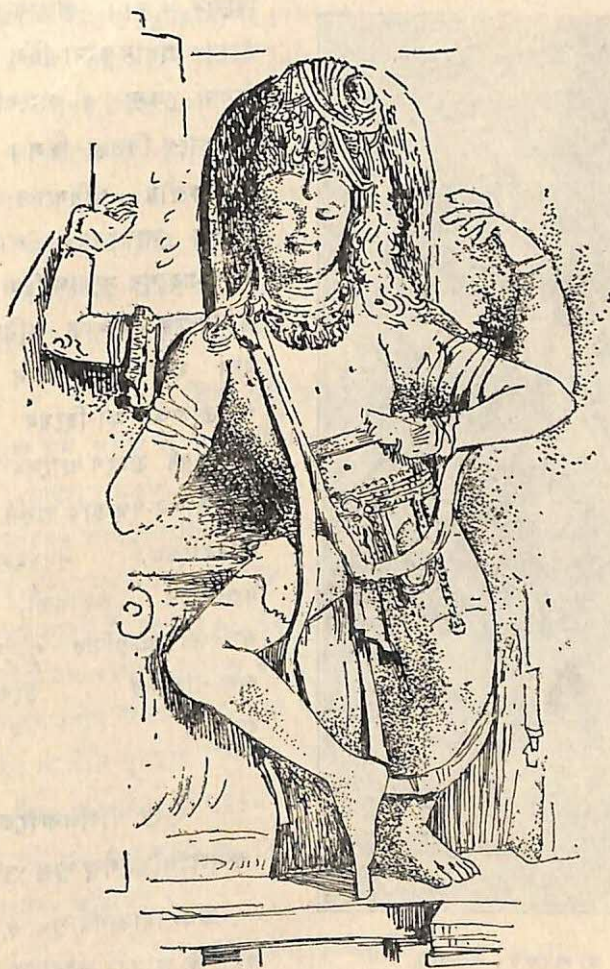
নটরাজ (ইলোরা)

গ্রীক সংস্কৃতির বিকাশের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে—এই যুগকে **ভারতীয় সংস্কৃতির স্থবর্ণ যুগ** বলা হইয়া থাকে। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্ত সম্রাটেরা বিশেষ ভাবে সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন।

গুপ্তশাসন যন্ত্রের উৎকর্ষ

গুপ্তশাসন ব্যবস্থায় রাজাই প্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন না। প্রজার মঙ্গলই তাঁহার প্রধান কাম্য ছিল। শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্র ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। হয়তো বা কেন্দ্রীয় পরিষদের মাধ্যমে দেশের লোকদেরও শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। তিনি গুপ্ত শাসন-দক্ষতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। পরধর্মসহিষ্ণুতা, দণ্ডবিধির উদারতা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা গুপ্ত-শাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

মা ও মেয়ে (অজন্তা)

গুপ্ত শাসনকালে জনসাধারণের স্থখ ও শান্তি

জনসাধারণের সুখ ও সাচ্ছন্দ্য হইলেই আমরা তাহাকে সুশাসন বলিয়া থাকি। ফা-হিয়েনের ভারত **ভ্রমণের বর্ণনা** পড়িলে জনসাধারণ

যে গুপ্তযুগে সুখ-সাচ্ছন্দ্যে ছিল সে সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। ফা-হিয়েন লিখিয়া গিয়াছেন যে জনসাধারণ ধন ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। গুপ্ত সম্রাটেরা সর্বদা জনসাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখিতেন। দেশের সর্বত্র যাতায়াতের জন্য তাঁহারা রাজপথ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ও তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন। ধনবান লোকেরাও জনহিতকর কার্যে প্রচুর দান করিতেন। এই দান প্রদানে তাঁহাদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলিত। ধনবান ব্যক্তিদের দানে পাটলিপুত্র নগরে একটি বিশাল দাতব্য চিকিৎসালয় চলিত।

যে কোন উন্নতিরই ভিত্তি নৈতিক চরিত্র। গুপ্তযুগে জনসাধারণের নৈতিক মান খুবই উন্নত ছিল। চুরি-ডাকাতি তখন প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে গুপ্তযুগে যদি রাজপথে সোনার মতো মূল্যবান জিনিসও পড়িয়া থাকিত তবু কেহ তাহা গ্রহণ করিত না। এত কম অন্যায় অনুষ্ঠিত হইত যে, জনসাধারণের বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার প্রয়োজনই হইত না। এক কথায় বলিতে গেলে, গুপ্তযুগে সমাজে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত।

হিন্দু ধর্মের নূতন রূপ

সমাজে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করার অপরিহার্য ফল সাংস্কৃতিক উন্নতি। গুপ্তযুগে সকল দিকেই তাহা ঘটিয়াছিল। বর্তমানে হিন্দু ধর্মের যে আচার-আচরণ আমরা করিয়া থাকি, গুপ্তযুগেই তাহার প্রচলন হইয়াছিল। আমাদের বর্তমানের প্রধান উপাস্য দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পূজার প্রচলন গুপ্ত যুগেই আরম্ভ হয়। আমাদের ১৮টি পুরাণের অধিকাংশই গুপ্ত যুগেই রচিত হয়—বর্তমানে হিন্দু ধর্ম পুরাণকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

মৌর্যযুগে বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রাধান্য হইয়াছিল গুপ্তযুগে তাহা নষ্ট হয় এবং হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য পুনরায় ফিরিয়া আসে। গুপ্তযুগে ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পরধর্মগ্রহণশীলতা। ঐ যুগে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও গুপ্ত সম্রাটগণ, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের অনুগামীদের প্রতিও সমান ব্যবহার করিতেন।

শিল্পকলার উন্নতি

গুপ্তযুগে ভারতীয় শিল্পকলার চরম উন্নতি হইয়াছিল। গুপ্তযুগের অসংখ্য

দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাস্কর্য রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ফলে গুপ্ত ভাস্কর্য এক অপূর্ব স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য পৃথিবীর যে কোন দেশের ভাস্কর্যের গৌরবের বস্তু। স্থপতিবিদ্যায়ও ভারত উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। গুপ্ত মন্দির, বিশেষ করিয়া তাহাদের স্তম্ভের কারু-কার্য দেখিবার বস্তু। গুপ্ত ভাস্কর্য ও স্থপতি রীতি বৃহত্তর ভারতে অর্থাৎ সিংহল, শ্যাম, জাভা ও ব্রহ্মদেশে পরবর্তী কালে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ধাতু বিদ্যায়ও গুপ্তযুগ খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দিল্লীর নিকটে কুতুব মিনারের পাশে যে লৌহ স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে ১৫০০ বৎসরেও তাহার গায়ে একটুও মরিচা পড়ে নাই।

চিত্রকলা—হায়দ্রাবাদে অজন্তা গুহায় খোদিত চিত্রাবলী গুপ্তযুগে চিত্র-কলার উন্নতির প্রমাণ দিতেছে। চিত্রের অনেকগুলি বৌদ্ধ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহাদের মধ্যে তখনকার সমাজ জীবনের ছবিও আছে অনেকগুলি, যেমন, বাণিজ্য-যাত্রা, গৃহস্থজীবন ইত্যাদি। কলানৈপুণ্যের দিক হইতে চিত্রগুলি খুবই উন্নত ধরনের। ইলোরায় ও অজন্তার গুহা গাত্রে একই শিল্পমানের দেওয়াল চিত্র পাওয়া গিয়াছে।

সঙ্গীত চর্চা—গুপ্তযুগে সঙ্গীত চর্চা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রগুপ্ত নিজে বীণা বাজাইতেছেন, এইরূপ ছবি তাঁহার মুদ্রায় খোদিত পাওয়া গিয়াছে।

সাহিত্যের বিকাশ—সংস্কৃত সাহিত্য গুপ্তযুগে তাহার পরিপূর্ণতম বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের কবি-খ্যাতি ছিল। তাঁহার সভা-কবি ছিলেন হরিসেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নব-রত্নের কথা আমরা সকলেই জানি। কালিদাস ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। ভারবিও ঐ যুগের একজন বিখ্যাত কবি। গুপ্তযুগে অনেকগুলি ভাল ভাল নাটকও রচিত হইয়াছিল। ধর্ম সাহিত্যের দিক হইতে আমাদের ১৮টি পুরাণের মধ্যে অধিকাংশই গুপ্তযুগে রচিত—রামায়ণও মহাভারত রচনাও গুপ্তযুগের কীর্তি।

বিজ্ঞান চর্চা—বিজ্ঞান চর্চায়ও গুপ্তযুগ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আর্যভট্ট ছিলেন গুপ্তযুগের বিখ্যাত জ্যোতিষ-বিজ্ঞানী। পৃথিবী যে নিজ অক্ষরেখায় চারিদিকে ঘুরিতেছে ইহা তিনি প্রথম প্রমাণ করেন। আর্যভট্ট

ছাড়া বরাহ মিহির ছিলেন ঐ যুগের আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী—তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগেরই ভারতীয় গণিতবিদ্ "শূন্য তত্ত্ব" (Concept of zero) সম্বন্ধে ধারণা করেন।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিকাশও গুপ্তযুগে ঘটে। বিখ্যাত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ 'চরক সংহিতা' গুপ্তযুগে রচিত হয়।

হর্ষবর্ধন

গুপ্তরাজবংশের পতনের পর যে সব প্রাদেশিক রাজ্য মাথা চাড়া দিয়া উঠে তাহাদের মধ্যে কনৌজ, বল্লভী, গৌড়, কামরূপ, থানেশ্বর প্রভৃতি প্রধান। অবশেষে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধন পুনরায় প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়িয়া এক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন। তাঁহার আমলে হিউয়েন সাঙ নামে যে চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসেন, তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে শৈব এবং পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও অপরাপর ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রজাদের সুখসুবিধার দিকে তিনি সব সময়ই নজর রাখিতেন এবং স্বয়ং ছিলেন শাসন ও বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চে। তিনি নিজে যে শুধু সুসাহিত্যিক ছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার আমলে রাজস্বের এক বড়ো অংশ সাহিত্য ও শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। এই সময়ই বাণভট্ট প্রমুখ কবি এবং শীলভদ্র প্রমুখ শিক্ষাবিদ্দের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর আবার উত্তর ভারতের এই বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহার স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।

হর্ষবর্ধন

এই সময় ধীরে ধীরে পূর্ব প্রান্তের গৌড় রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠে। হর্ষবর্ধনের আমলেই গৌড়রাজ শশাঙ্ক বিশেষ শক্তিশালী হইয়া

উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর গৌড়ে মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়। তখন বাংলার নেতৃবর্গ গোপাল নামে জনৈক ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন। দেশের দুর্দিনে এই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অতুলনীয় ঘটনা। গোপাল প্রতিষ্ঠিত পাল রাজবংশের ধর্মপাল, দেবপাল প্রমুখ নরপতিদের আমলে পুনরায় আসাম হইতে কাশ্মীরের সীমা, হিমালয়

বাংলাদেশের পাল-রাজবংশ

সেনযুগের ভাস্কর্য—সূর্য

পালযুগের ভাস্কর্য—পদ্মপাণি

হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত এলাকা জুড়িয়া আর এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগে বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, সোমপুরী মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়; নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ই অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমশীলা বিহার হইতে তিব্বতে গমন করেন।

এই যুগেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ চক্রপানি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রমুখের আবির্ভাব ঘটে। আদি বাংলা রচনা চর্যাপদের রচনাকালও এই যুগেই। এই সময়কার ভাস্কর্যকলার যে সকল নিদর্শন পাহাড়পুর প্রভৃতি জায়গা হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহা অনবদ্য। বিখ্যাত ভাস্কর বীতপাল ও ধীমান এই যুগেরই লোক।

সেন রাজবংশ

কিন্তু কালক্রমে পাল রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে বিজয় সেন বাংলার সিংহাসনে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজা বিজয় সেন ও বল্লাল সেন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন।

সময়-পঞ্জী

খৃঃ ৬০০	হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ (৬০৬) ; হর্ষবর্ধনের মৃত্যু (৬২৫)
৭০০	গোপাল কর্তৃক পালবংশের প্রতিষ্ঠা (৭৫০) গোপালের মৃত্যু ও দেবপালের সিংহাসন লাভ (৭৭০)
৮০০	ধর্মপালের মৃত্যু ও দেবপালের সিংহাসন লাভ (৮১০) দেবপালের মৃত্যু (৮৫০)
৯০০	
১০০০	বিজয় সেন কর্তৃক সেন বংশের প্রতিষ্ঠা (১০২৫)
১১০০	বল্লাল সেনের সিংহাসন লাভ (১১৫৮) বল্লালের মৃত্যু ও লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসন লাভ (১১৭৯)
১২০০	সেন বংশের পতন ও মুসলমান রাজ্য স্থাপন (১২০৫)

এই বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন বিদেশী মুসলমানদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারেন নাই।

পাল ও সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশের সংস্কৃতি

পাল রাজারা প্রায় ৪০০ বৎসর এবং সেন রাজারা প্রায় ১৫০ বৎসর বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। ঐ সময় বাংলা সংস্কৃতি বিশেষ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এই সময় বাংলাদেশ বিশেষ উন্নতি করে। দুঃখের বিষয় পাল ও সেন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন অধিকাংশই মুসলমান আক্রমণের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাপি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও কম নহে। গোপাল কর্তৃক নির্মিত উদন্তপুরী বৌদ্ধ বিহার পালযুগের স্থাপত্যের উন্নতির সাক্ষ্য দেয়। তিব্বতের সর্বপ্রথম বৌদ্ধ বিহার ইহারই অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। চিত্র-শিল্প ও ভাস্কর্যে পালযুগের দুইজন প্রধান শিল্পী ছিলেন ধীমান ও তাহার পুত্র বীতপাল। সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শূলপাণি। ধাতুর মূর্তি নির্মাণ কৌশলও পাল ও সেন যুগে খুবই উন্নত ছিল। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীর বহু মূর্তি, ঐ যুগের শিল্প নিদর্শন হিসাবে বাংলা, বিহার ও অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।

এই যুগের সাহিত্যের বিখ্যাত নিদর্শন হইল "চর্যাপদ" ও সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিত কাব্য "রাম চরিত"। বাংলা ভাষা এবং বিশেষভাবে পদাবলী সাহিত্য চর্যাপদের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। শ্রীধর ভট্ট ছিলেন ঐ যুগের বিখ্যাত দার্শনিক ; তিনি "ন্যায় কন্দলী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পাল যুগের আরও কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম হইল শীলভদ্র, শান্তি রক্ষিত, শান্তিদেব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে অনেকে তিব্বত, সিংহল, জাভা, শ্যাম প্রভৃতি দেশে গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

সেন রাজাদের মধ্যে বল্লাল সেন সুপণ্ডিত ছিলেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুখানা গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেন কবিদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। জয়দেব মিশ্র, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য প্রভৃতি কবি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। জয়দেব রচিত 'গীত গোবিন্দ' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

দক্ষিণ ভারতের রাজবৃত্ত

উত্তর ভারতে যখন এইসব বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটিতেছিল, দক্ষিণ ভারতেও তখন বিভিন্ন রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন
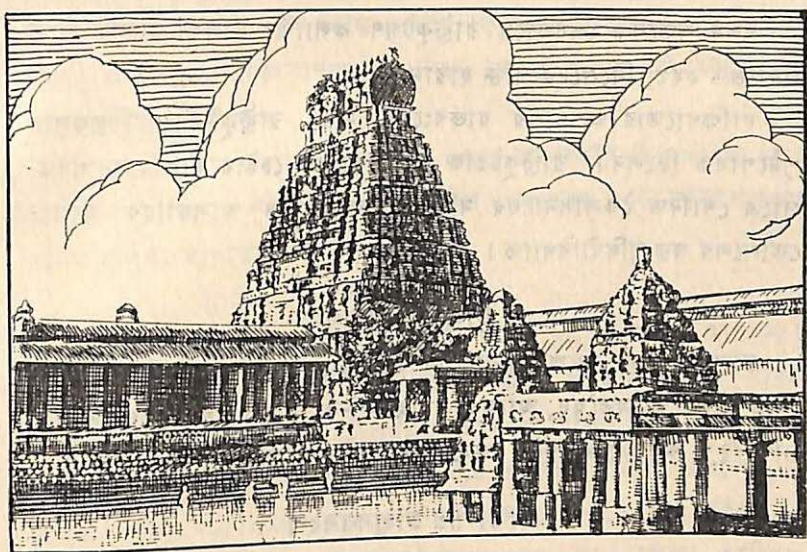
কাঞ্জীভরমের মন্দির

করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে কাণ্ববংশ ধ্বংসকারী সাতবাহনদের কথা তোমরা জান। পরবর্তীকালে সাতবাহন বংশের পতনের পর তাহাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বাকাটক, আভীর, কদম্ব, পল্লব প্রভৃতি বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করিতে থাকে। ইহাদের অনেকেই গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে যেসব রাজবংশ প্রাধান্য অর্জন করে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, পল্লব প্রভৃতি এবং সুদূর দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য, চেয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রকূটরাজগণ

দন্তিবর্মা রাষ্ট্রকূটরাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। রাষ্ট্রকূটরাজ বংশ-পরম্পরায় গুর্জর প্রতিহারদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন। অমোঘবর্ষ এই বংশের রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে জীনসেন নামে একজন জৈন ভিক্ষু একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার

রাজত্বকালে কয়েকখানা দর্শনগ্রন্থ এবং 'সার-সংগ্রহ' নামে একখানা গণিত-শাস্ত্রের পুস্তকও রচিত হয়। আবার পর্যটক সুলেমান অমোঘবর্ষকে খুবই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

দশম শতকের শেষভাগে রাষ্ট্রকূটগণ কল্যাণীর চালুক্য বংশের হাতে পরাজিত হইয়া নিজেদের শক্তি হারান।

দাক্ষিণাত্যের অপরাপর রাজবংশের মতো রাষ্ট্রকূটগণও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের চেষ্টায় ইলোরার পর্বত-গাত্রে খোদিত কৈলাসনাথের মন্দিরটি স্থাপত্য ও আলঙ্কারিক ভাস্কর্য-কৌশলের জন্য পৃথিবীবিখ্যাত।

চালুক্যরাজগণ

চালুক্যরাজগণ নিজেদের রাজপুত জাতির লোক বলিয়া দাবী করিতেন। কিন্তু এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। যাহা হউক, চালুক্যগণ দক্ষিণ ভারতে বাতাপী ও কল্যাণী এই দুইটি অঞ্চলে দুইটি পৃথক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাতাপীর চালুক্যবংশ

বর্তমান বিজাপুর জেলায় বাতাপীতে চালুক্য বংশের রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানকার চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। কীর্তিবর্মা এই বংশের অন্যতম বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্যের সীমা চতুর্দিকে বর্ধিত করেন। উত্তরে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে সমুদ্র, দক্ষিণে তামিল রাজ্যগুলির শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বাতাপীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। হর্ষবর্ধনের নিকট হইতে তাঁহার উত্তরদেশ অভিযান বাধাপ্রাপ্ত না হইলে, তিনি হয়তো উত্তর ভারতের সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইতেন। দ্বিতীয় পুলকেশী সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমি নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তাঁহার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে তিনিই ছিলেন দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালেই দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্য পল্লবদের সহিত চালুক্যদের বিবাদ আরম্ভ হয়। অনেকদিন পর্যন্ত এই বিবাদ চলে। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে রাষ্ট্রকূটদের উপর চালুক্যপ্রাধান্যের অবসান ঘটে।

কল্যাণীর চালুক্য বংশ

বাতাপীর চালুক্য বংশের একজন দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ লইয়া কল্যাণীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি নিজে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং বিচার, রাজনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

চালুক্যদের রাজত্বকালে এলিফ্যাণ্টা গুহার কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত হয়। চালুক্য রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত সঙ্গমেশ্বর এবং বিরূপাক্ষের মন্দির চালুক্য-স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন।

পল্লবরাজগণ

ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে পল্লব ইতিহাস ভালো করিয়া জানা যায় না। শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহবাহু পল্লব রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। তিনি সুদূর দক্ষিণে চোলরাজ্য, এমন কি সিংহল পর্যন্ত জয় করেন। বাতাপীর চালুক্যদের সহিত দাক্ষিণাত্যের প্রাধান্য লইয়া পল্লবদের যে দীর্ঘদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিয়াছিল একথা তোমাদের পূর্বে বলা হইয়াছে। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মার রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ্ পল্লব রাজ্যে আসিয়া-ছিলেন। তিনি পল্লব রাজধানী কাঞ্চীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নরসিংহ বর্মার পর হইতে ধীরে ধীরে পল্লব রাজ্যের পতন ঘটে। পল্লবদের রাজত্বকালে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নতি হয়। পল্লব-রাজগণ সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তখনকার দিনে কাঞ্চী ছিল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ; সংস্কৃত কবি ভারবী এবং সংস্কৃত পণ্ডিত দণ্ডিন্ পল্লব রাজাদের বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন।

পল্লব রাজত্বকাল স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের উন্নতির জন্য বিখ্যাত। কুষাণদের সময় অমরাবতী ও কৃষ্ণানদীর অববাহিকা অঞ্চলে যে উন্নত ধরনের শিল্প এবং স্থাপত্য-কৌশল গড়িয়া উঠিয়াছিল, পল্লবগণ সেই শিল্প-রীতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া পল্লব শিল্প-রীতি গড়িয়া তোলে। কাঞ্চী ও মহাবলীপুরমে পল্লব শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। পল্লব শিল্পীগণ বড়ো বড়ো পাথর কাটিয়া, অপূর্ব দক্ষতার সহিত মন্দিরের কারুকার্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কাঞ্চীর ত্রিপুরান্তকেশ্বর মন্দির, ঐরাবতেশ্বর মন্দির এবং মহাবলীপুরমের মুক্তেশ্বর ও কৈলাস মন্দির বিশেষ বিখ্যাত।

চোলরাজগণ

চোলরাজ্য সুদূর দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হয়তো এই রাজবংশ রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। এক সময় চোলরাজ্য পল্লবগণ জয় করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতকের প্রথমভাগে চোলরাজারা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করেন।

চোলরাজগণের মধ্যে রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র চোলদেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজরাজ, চের ও পাণ্ড্যরাজ্য এবং দক্ষিণ ভারতের আরও
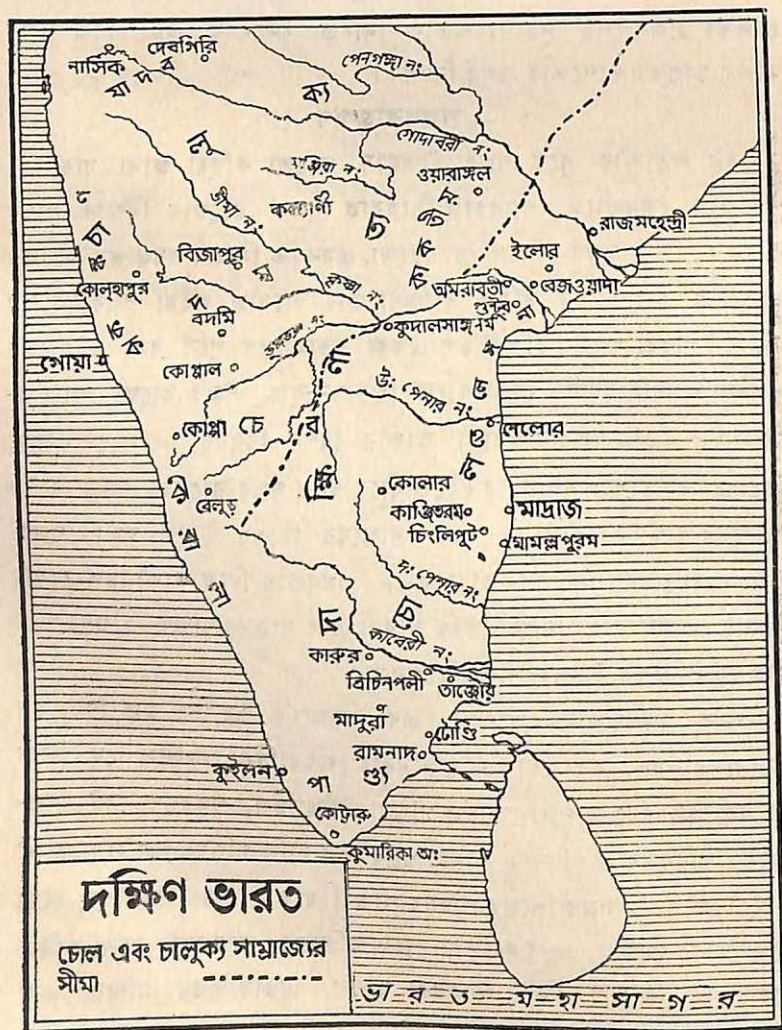
কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া চোলরাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোলদেব উত্তর ভারতেও অভিযান প্রেরণ করেন। বাংলার পাল বংশীয় রাজা মহীপাল তাঁহার নিকট পরাজিত হন। চোলদের বিরাট নৌ-বাহিনী ছিল। ইহার সাহায্যে রাজেন্দ্র চোলদেব পেগু এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর চোলরাজ্য জয় করেন।

শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষের জন্য চোলদের নাম ভারত-ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চোলদের সমগ্র রাজ্য কয়েকটি "কট্টুম" বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কট্টুমের পর জেলা ("নাড়ু") এবং জেলার পর গ্রাম ("কুররম"), শাসনকার্যের জন্য রাজ্যের এইরূপ বিভাগ ছিল। চোলদের গ্রামের স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া গ্রাম-পঞ্চায়েৎ থাকিত। গ্রামের শাসন এই পঞ্চায়েৎ সভাই পরিচালনা করিত। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিতে বিভক্ত ছিল। তোমরা জান যে বর্তমান ভারতেও গ্রাম-পঞ্চায়েৎ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিল্পকার্যেও চোলগণ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। চোল-শিল্পের রীতি পল্লব-শিল্পের রীতি হইতে পৃথক ছিল। তাঞ্জোরের রাজ-রাজেশ্বর শিবমন্দির চোল-শিল্পকলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদ্দটি স্তর আছে এবং সকলের উপরে এক বিরাট পাথর বৃত্তাকারে কাটিয়া বসানো হইয়াছে। চোল-শিল্পীগণ ধাতুমূর্তি-নির্মাণেও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

পাণ্ড্যরাজগণ

পাণ্ড্যরাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমরা জানি না। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে পাণ্ড্যরাজ্য পল্লবদের অধীনে ছিল। চোলরাজগণ শক্তিশালী হইয়া পড়িলে এই রাজ্য চোলদের অধীনে আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজ্য স্বাধীন এবং প্রতিপত্তিশীল হইয়া ওঠে। পাণ্ড্যরাজ্যের ফায়েল সেইযুগে নাম করা বন্দর ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ পাণ্ড্যরাজ্য জয় করে।

দক্ষিণ ভারতের এইসব রাজ্যের ভারতীয় শিল্পে বিশেষ অবদান আছে।

উত্তর ভারত বা বৈদেশিক শিল্প-শৈলীর প্রভাবমুক্ত হইয়া এইসব রাজ্য নিজস্ব শিল্প-শৈলা গড়িয়া তোলে।

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের সম্মুখীন হয় প্রথম সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে সেই অঞ্চলের হিন্দুরাজা দাহির আরব সম্রাট

মাদুরার বৃহৎ মন্দিরের গোপুরম্

হজ্জাজের সেনাপতি কাশিমের নিকট পরাজিত হইলে ঐ অঞ্চল আরবদের অধিকারভুক্ত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতকে গজনীর মুসলমান রাজাদের সহিত

উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহী রাজাদের বিরোধ শুরু হয়। গজনীর রাজা সবুক্তগীন ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়া কাবুল ও তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চল দখল করেন। তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ যদিও ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন নাই, কিন্তু মোট সতের বার ভারত আক্রমণ করিয়া তিনি শাহীরাজ্য, মূলতান, কাংড়া, থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ, সোমনাথ প্রভৃতি জায়গা লুণ্ঠন করিয়া অজস্র ধনরত্ন স্বদেশে লইয়া যান। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদের মৃত্যুর প্রায় দেড়শ' বছর পরে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন গজনীর পার্শ্ববর্তী ঘুর রাজ্যের শাসক মহম্মদ ঘুরী। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দুরাজাদের পরাজিত করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ জয় করেন এবং নববিজিত রাজ্যগুলির শাসনভার কুতুবউদ্দীন নামক জনৈক ক্রীতদাসের হস্তে অর্পণ করেন (১২০৬ খৃষ্টাব্দে)।

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ

ভারতে সুলতানী শাসন

১২০৬ খ্রীঃ হইতে ১৫২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত, প্রায় ৩০০ বৎসর দিল্লীতে মুসলমান শাসন দিল্লীর সুলতানী শাসন নামে পরিচিত। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত সুলতানী বংশগুলি দিল্লীতে শাসন করেন—দাসবংশ, খিলজীবংশ, তুঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশ। খিলজী বংশের আলাউদ্দীন খিলজির রাজত্বকালে, দক্ষিণ-ভারত সহ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলই সুলতানী শাসনের অধীনে আসে। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর, শেষ লোদী সম্রাটকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন—ভারতে সুলতানী আমলের অবসান হয়।

আলাউদ্দীন খিলজি

আলাউদ্দীন খিলজির
সাম্রাজ্য
কাবুল
গজনী
কাশ্মীর
পাঞ্জাব
লাহোর
মুলতান
দিল্লী
রাজপুতানা
জৌনপুর
আগ্রা
কনৌজ
সিন্ধু
চিতোর
অনহিলওয়ারা
প্রয়াগ
কাশী
পাটনা
বিহার
গৌড়
মালব
কারা
গুজরাট
বঙ্গদেশ
গণ্ডোয়ানা
সোমনাথ
দেবগিরি
উড়িষ্যা
যাদব
বরঙ্গল
ও
তেলেঙ্গানা
হোয়সল
দোরসমুদ্র
মাদুরা
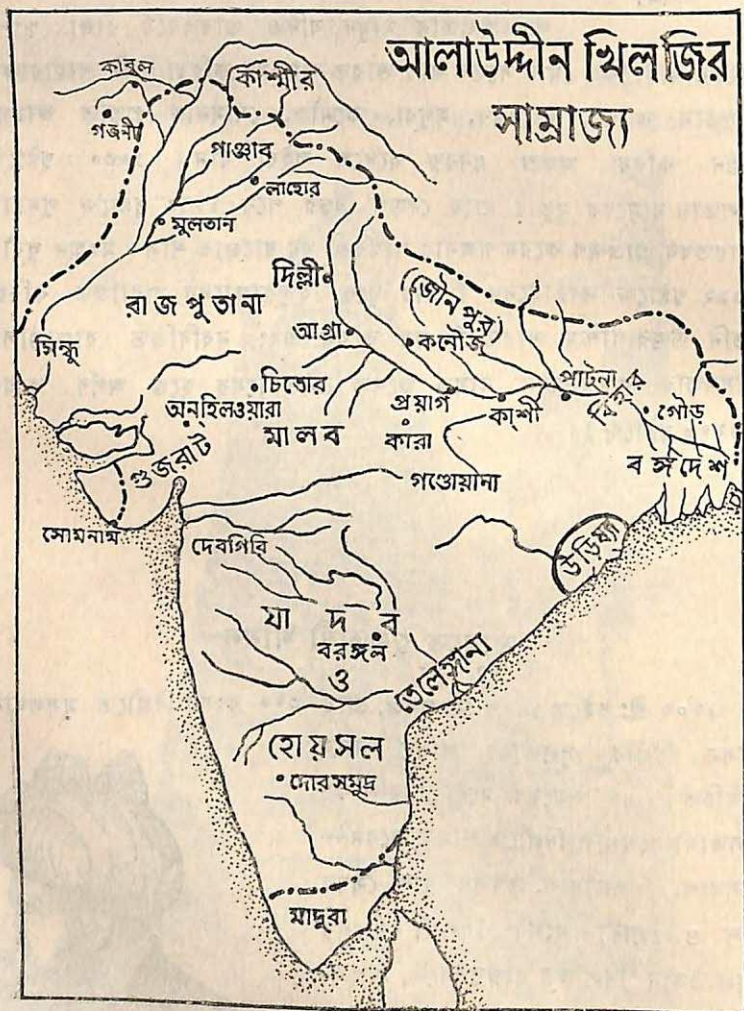
সময়-পঞ্জী

ভারতে সুলতানী রাজত্ব

১২০০ খৃঃ	দাশ বংশের প্রতিষ্ঠা (১২০৬)
	দাশ বংশের অবসান ও খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা (১২৯০)
১৩০০ "	খিলজী বংশের অবসান ও তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা (১৩২০)
১৪০০ "	তুঘলক বংশের অবসান ও সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা (১৪১৩)
	সৈয়দ বংশের অবসান ও লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা (১৪৫১)
১৫০০ "	লোদী বংশের অবসান (১৫২৬)
১৬০০ "	

ইতিপূর্বে যে সব বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল ভারতীয় সংস্কৃতি তাহাদের সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। সুলতানী আমলে মুসলমান সংস্কৃতি একদিকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে অটল রহিল তেমনি অন্যদিকে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি নানাবিধ রক্ষণশীলতার আড়ালে নিজেকে আলাদা করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই এই পরস্পরবিরোধী মনোভাব হ্রাস পাইতে থাকিল এবং ক্রমেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইল।

সুলতানী আমলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

ধর্মক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার সমন্বয়

এই সম্প্রীতি বৃদ্ধির ফল প্রথম দেখা দেয় ধর্মের ক্ষেত্রে। সুলতানী আমলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানক, কবীর, চৈতন্য, রামানন্দ, নামদেব প্রভৃতি মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের ধর্মমত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধ্যান-ধারণা হইতে গৃহীত এবং ইহাদের অনুগামীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই থাকিতেন। শুধু তাহাই নহে। এই সময়ে

হিন্দু ধর্মে ভক্তিবাদের উদ্ভব হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে সুফীবাদ নামে এক নূতন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেয়। ইহারা উভয়েই হিন্দু ও মুসলমান দানের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে সৃষ্ট। সুলতানী আমলেই বাংলাদেশে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ পূজার প্রচলন হয়। এখানে হিন্দুর দেবতা মুসলমানের পীররূপে কল্পিত হন। হিন্দু মুসলমান উভয়ে আজও তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছে।

শিল্পক্ষেত্রে সমন্বয়

সুলতানী যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পরীতির উপর মুসলমান স্থাপত্য ও শিল্পরীতির প্রভাবে এক নূতন শিল্পরীতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

শিল্পের ক্ষেত্রে সুলতানীযুগের দান উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর কুতুব মিনার, আলাই দরওয়াজা, ফিরোজ শাহের সমাধি প্রভৃতি, জৌনপুরের অতাল মসজিদ, গুজরাটের মাফিজ মসজিদ, বাংলাদেশের গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল প্রভৃতি সেই যুগের হিন্দু ও মুসলিম শিল্প-শৈলীর সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন।

এইসব শিল্প-কীর্তি ব্যতীত সম্পূর্ণ হিন্দু পদ্ধতিতে নির্মিত শিল্পকলার বিকাশও ঐ সময় ঘটিয়াছিল; যে সব রাজ্যে মুসলমান প্রভাব অনুপ্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই সব রাজ্যেই হিন্দুরীতির শিল্পকলা গড়িয়া উঠিয়াছিল। পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কোণার্কের সূর্য মন্দির, বিজয়নগরের হাজার মন্দির এবং মেবারের বিঠল স্বামার মন্দির ঐ সময়েরই শিল্প-কীর্তি।

প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি

প্রাদেশিক ভাষাসমূহের সৃষ্টি সুলতানী আমলের আর একটি অবদান। মুসলমান অধিকারের পর হইতেই ভারতে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব কমিতে থাকে; ফলে, বাংলা, মারাঠী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। এইযুগে বাংলার স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ হয়। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি বাঙ্গালী কবি সুলতানী আমলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুলতানী আমলে শিল্প

কৃষিই সুলতানী আমলে জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা হইলেও বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলে ঐ সময় নানাপ্রকার শিল্পজাত জিনিস প্রস্তুত হইত। সুলতানেরা শিল্প স্থাপনের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। সুলতান ও

অভিজাত শ্রেণীর মিহি বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার জন্য দিল্লীতে কাপড় প্রস্তুত করার একটি সরকারী কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল—৪০০ হাজার তাঁতী এই কারখানায় কাজ করিত। কাপড় ছাড়া, চিনি ও কাগজ প্রস্তুতের কারখানাও যে সুলতানী আমলে স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। সোনা-রূপা ও মণি-রত্নের অলঙ্কার নির্মাণ শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

সুলতানী আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য

সুলতানী আমলে আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, পারস্য, তিব্বত, চীন, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, মালয়-দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

সুলতানী আমলেও যে ভারতে প্রচুর ধনরত্ন ছিল, তাহা নানা বিদেশী পর্যটকের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। তারপর নানা বিদেশী আক্রমণকারী ভারত আক্রমণ করিয়া প্রচুর সোনা, মণিরত্ন ইত্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে।

সুলতানী আমলে কৃষি

তবু, ঐ সময় ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, তাহার কারণ কৃষি এবং গ্রামই ছিল ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি। মুসলমান সুলতানেরা কৃষির পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং অনেকে সেচ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ; প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি গ্রামবাসীরা নিজেরাই উৎপন্ন করিত। ফলে, যুদ্ধবিগ্রহ, বৈদেশিক আক্রমণ প্রভৃতি গ্রামবাসীর জীবনের তেমন ক্ষতি করিত না।

সুলতানী আমলে সমাজ-জীবন

কিন্তু ঐ সময় ধনকেন্দ্রিক এবং আমলাকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে পূর্বে কিন্তু ঐ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা ছিল না। সুলতান এবং তাহার উচ্চপদস্থ হিন্দু-মুসলমান কর্মচারীরা টাকা-পয়সায় গড়াগড়ি দিতেন। এই অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র কৃষকের উপর নানারূপ পীড়নের দ্বারা সংগৃহীত হইত। অভিজাত সম্প্রদায় মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী এবং অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজে ক্রীত দাস-দাসী পোষণের রীতিও প্রবর্তিত করেন। মুসলমানদের অনুকরণে ঐ সময় হিন্দু নারীরাও পর্দানসীন হইয়া পড়েন।

সংক্ষেপে, সুলতানী আমলে ভারতীয় সভ্যতা উন্নততর না হইলেও, উহা যে নূতন রূপ ধারণ করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাবর ভারতবর্ষে যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন খুব বেশীদিন তিনি তাহার ভিত্তি দৃঢ় করিবার অবকাশ পান নাই। মাত্র চারিবৎসর রাজত্ব করার পর তাঁহার মৃত্যু হইলে দিল্লীর সিংহাসনে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন যখন আরোহণ করেন তখনই পূর্ব-ভারতের আফগান দলপতিরা মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু করেন।

মোগল সাম্রাজ্য

কুতুব মিনার

বিহারের আফগান নেতা শেরশাহ ক্রমেই শক্তিবৃদ্ধি শুরু করিলে হুমায়ুন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু শেরশাহের চতুরতায় তিনি পর পর চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া পারস্যে চলিয়া

যান। ফলে, সাময়িকভাবে মোগল সাম্রাজ্য শেরশাহের হাতে চলিয়া যায়। শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহ সিন্ধুদেশ, মুলতান, বাংলাদেশ, গোয়ালিয়র, মালব ও মেবার জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে বিস্ফোরণের ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দুর্বল বংশধরদের পক্ষে এত বড়ো সাম্রাজ্যশাসন

হুমায়ুন

শেরশাহ

বেশীদিন সম্ভব হইল না। শূর বংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া হুমায়ুন পুনরায় ভারত আক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

আকবর

ইহার মাত্র এক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হইলে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র আকবর। আকবরই এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁহার আমলেই যেমন মালব, গণ্ডোয়ানা, অম্বর, চিতোর, রণথম্ভোর, কালিঞ্জর, বিকানীর, চিতোর, বাংলা, উড়িষ্যা, কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, আহম্মদ-নগর, বেরার, অসীরগড়, খান্দেশ

মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি তাঁহার উদার ধর্মনীতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই সম্রাটের প্রতি অনুগত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষের সম্রাটকে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতীয়দের জাতীয় সম্রাট হইতে হইবে—এই কথা আকবর যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে এক শের শাহ ভিন্ন অপর কেহ তেমন উপলব্ধি করেন নাই। আকবরের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন জাহাঙ্গীর। তাঁহার আমলেই ইংরেজ বণিকেরা এদেশে প্রথম বাণিজ্য করিতে আসে।

জাহাঙ্গীরের পর তাঁহার পুত্র শাহজাহান দাক্ষিণাত্যের অবিজিত গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য জয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেন।

জাহাঙ্গীর

শাহজাহান

কিন্তু তাঁহার পুত্র ঔরঙ্গজেব তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহাকে বন্দী করিয়া এবং ভ্রাতাদের হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিয়া লন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও সমরকুশল সেনাপতি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও সংযমী। কিন্তু সম্রাট আকবর যে উদার ও ধর্মসহিষ্ণু মতবাদের দ্বারা ভারতবাসীকে একসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন তাহা অনুসরণ করা ঔরঙ্গজেবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার এই অদূরদর্শী ধর্মান্ধনীতির ফলে শীঘ্রই জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী সম্প্রদায়, শিখ, মারাঠা ও রাজপুতরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি ইহাদের দমনে প্রয়াস পাইলেও শেষ পর্যন্ত

মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের সাম্রাজ্য
আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য
কাবুল
কাবুল নদী
কা শ্মী র
পঞ্জাব
লাহোর
মুলতান
সিন্ধু নদ
হি মা ল য়
পাণিপথ
দিল্লী
রাজপুতানা
সি ন্ধু
আজমীঢ়
সিক্রি
আগ্রা
অ যো ধ্যা
লক্ষ্ণৌ
বক্সার
পাটনা
ব্রহ্মপুত্র
বি হা র
এলাহাবাদ
বারাণসী
চুনার
গৌড়
পদ্মা
চিতোর
মালব
শোন
বঙ্গদেশ
বিন্ধ্য পর্বত
আমেদাবাদ
গুজরাট
নর্মদা
তাপ্তী
মহানদী
খান্দেশ
বেরার
গণ্ডোয়ানা
উড়িষ্যা
গোদাবরী
আহম্মদনগর
গোলকোণ্ডা
মারাঠারাজ্য
কৃষ্ণা
বিজাপুর
কাবেরী
তাঞ্জোর
মাদুরা
রামেশ্বর
ভা র ত ম হা সা গ র

পূর্ণ সার্থককাম হন নাই। ফলে, ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরই মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে শুরু করে। বাংলাদেশ, অযোধ্যা, এমন কি আগ্রার নিকটবর্তী জাঠরা, রোহিলখণ্ডের আফগানরা, দাক্ষিণাত্যের মারাঠারাও রাজপুতরা স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তোলে। মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের আমলে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে)। অবশ্য ইহার পরেও কয়েকজন মোগল সম্রাট নামেমাত্র দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সর্বশেষ বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ কর্তৃক রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই মারা যান।

ঔরঙ্গজেব

মোগল যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

মোগল যুগকে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের সুবর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ঐতিহ্য মিলিত হইয়া এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক জীবনের সৃষ্টি লাভ ঘটিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনে এক বিরাট জাতি এবং সংস্কৃতি গঠনের কল্পনা আকবরের রাজত্বকালে বিশেষভাবে রূপ গ্রহণ করে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সেতু হিসাবে তিনি দীন ইলাহি নামে সর্বধর্ম ও জাতি লইয়া এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন।

শিল্পকালের বিকাশে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলনের ফল বিশেষ-

বুলন্দ দরওয়াজা
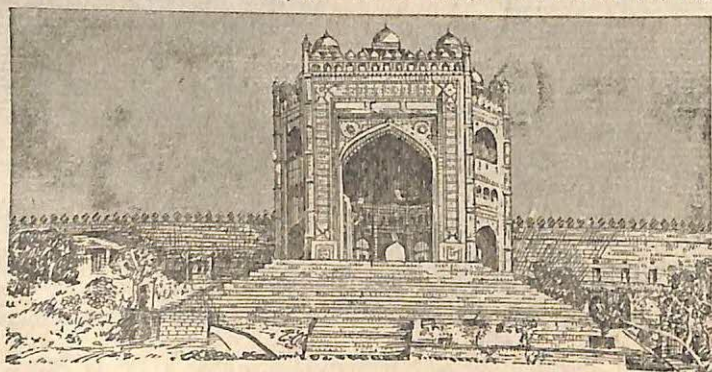
ভাবে উপলব্ধি করা যায়। মোগল সম্রাটদের মধ্যে এক ঔরঙ্গজেব ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। এইযুগে নির্মিত ফতেপুর সিক্রীর বুলন্দ দরওয়াজা, সেলিম চিস্তির কবর, পাঁচমহল, সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধ, আগ্রার ইতমদউদ্দৌলার সমাধিসৌধ, দিল্লীর দুর্গস্থ দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, আগ্রার তাজমহল মোগল স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন।

এই যুগে গ্রীক, ইরানী, চীনদেশীয় ও প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পশৈলীর সমন্বয়ে এক নূতন চিত্রশিল্পরীতি গড়িয়া ওঠে। এই রীতির অনুসরণে আঁকা বহু চিত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ই রাজপুতানায় ও পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলে রাজপুত-শিল্পশৈলী ও কাংড়া-শিল্পশৈলী হিসাবে পরিচিত দুইটি বিশিষ্ট শিল্পধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল।
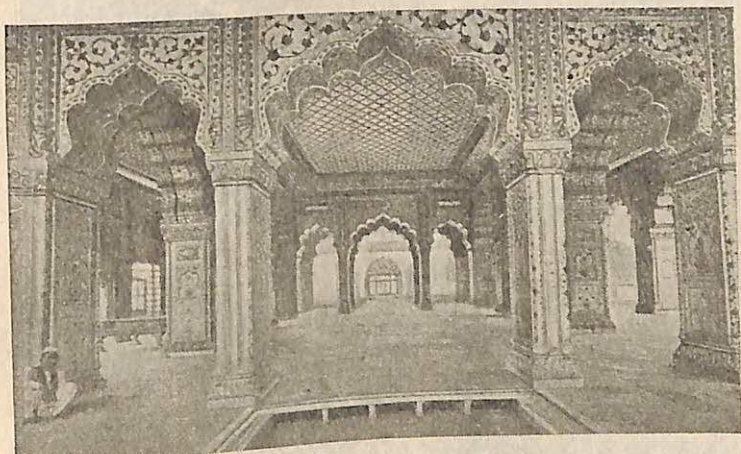
দেওয়ান-ই-আম

সঙ্গীতানুশীলনেও মোগল সম্রাটদের (ঔরঙ্গজেব ছাড়া) পৃষ্ঠপোষকতা ছিল যথেষ্ট। এই সময়ই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি হয়। আকবরের অন্যতম সভাসদ তানসেনের নাম ভারতীয় সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছে। খেয়াল প্রভৃতি দরবারী সঙ্গীতের বিকাশ এই সময়ই হয়।

শুধু শিল্প-সঙ্গীতেই নহে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মোগল যুগ অপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মোগল সম্রাটদের অনেকেই অনবদ্য ভাষায় নিজেদের

আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া, আবুল ফজল, ফৈজী, বদাউনা, আবদুল হামিদ লাহোরী, কাফি খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের

উদ্যানে মহিলা (রাজপুত)

রচনায়ও এই যুগের সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ। এই যুগেই হিন্দী, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে।

মোগল আমলে নানাধরনের শিল্পেরও উন্নতি হয় প্রচুর। যদিও কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা তথাপি সুতীবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা প্রভৃতি বয়নশিল্পের প্রসারও ছিল প্রচুর। মোগল

ব্যথাতুরা (কাংড়া)

সম্রাটেরা ছিলেন বিলাসী। কাজেই জিনিসপত্র যাহা প্রস্তুত হইত তাহা কারুশিল্পের দিক হইতে খুব উন্নতস্তরের ছিল। আজও মোগল যুগের কারুশিল্পরীতির (রেশম-ব্রকেড ইত্যাদি) প্রচলন ভারতবর্ষে রহিয়াছে। শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কারখানারীতির প্রচলনও ছিল। সরকারের অধীনেই কতকগুলি কারখানা পরিচালিত হইত।

আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া, আবুল ফজল, ফৈজী, বদাউনী, আবদুল হামিদ লাহোরী, কাফি খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের

উদ্যানে মহিলা (রাজপুত)

রচনায়ও এই যুগের সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ। এই যুগেই হিন্দী, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে।

মোগল আমলে নানাধরনের শিল্পেরও উন্নতি হয় প্রচুর। যদিও কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা তথাপি সুতীবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা প্রভৃতি বয়নশিল্পের প্রসারও ছিল প্রচুর। মোগল

ব্যথাতুরা (কাংড়া)

সম্রাটেরা ছিলেন বিলাসী। কাজেই জিনিসপত্র যাহা প্রস্তুত হইত তাহা কারুশিল্পের দিক হইতে খুব উন্নতস্তরের ছিল। আজও মোগল যুগের কারুশিল্পরীতির (রেশম-ব্রকেড ইত্যাদি) প্রচলন ভারতবর্ষে রহিয়াছে। শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কারখানারীতির প্রচলনও ছিল। সরকারের অধীনেই কতকগুলি কারখানা পরিচালিত হইত।

সময়-পঞ্জী

মোগল সাম্রাজ্য

১৫০০ খৃঃ	বাবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৫২৬) বাবরের মৃত্যু ও হুমায়ুনের সিংহাসনারোহণ (১৫৩০) হুমায়ুনের পলায়ন ও শের শাহের সিংহাসনারোহণ (১৫৪০)
১৫৫০ খৃঃ	হুমায়ুন কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (১৫৫৫) হুমায়ুনের মৃত্যু; আকবরের সিংহাসনারোহণ; পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬)
১৬০০ খৃঃ	আকবরের মৃত্যু ; জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ (১৬০৫)
১৬৫০ খৃঃ	জাহাঙ্গীরের মৃত্যু; শাহজাহানের সিংহাসনারোহণ(১৬২৭) ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ (১৬৫৮)
১৭০০ খৃঃ	ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৫) নাদির শাহের ভারত আক্রমণ (১৭৩৯)
১৭৫০ খৃঃ	পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭)
১৮০০ খৃঃ	
১৮৫০ খৃঃ	শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের নির্বাসন (১৮৫৭)
১৯০০ খৃঃ	

সুলতানী আমলে দক্ষিণ ভারত

খিলজী সুলতানদের আমলে দক্ষিণ ভারত দিল্লীর অধীনে আসিলেও তুঘলক আমলে মুহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের শাসনকালে যখন দেশের সর্বত্র
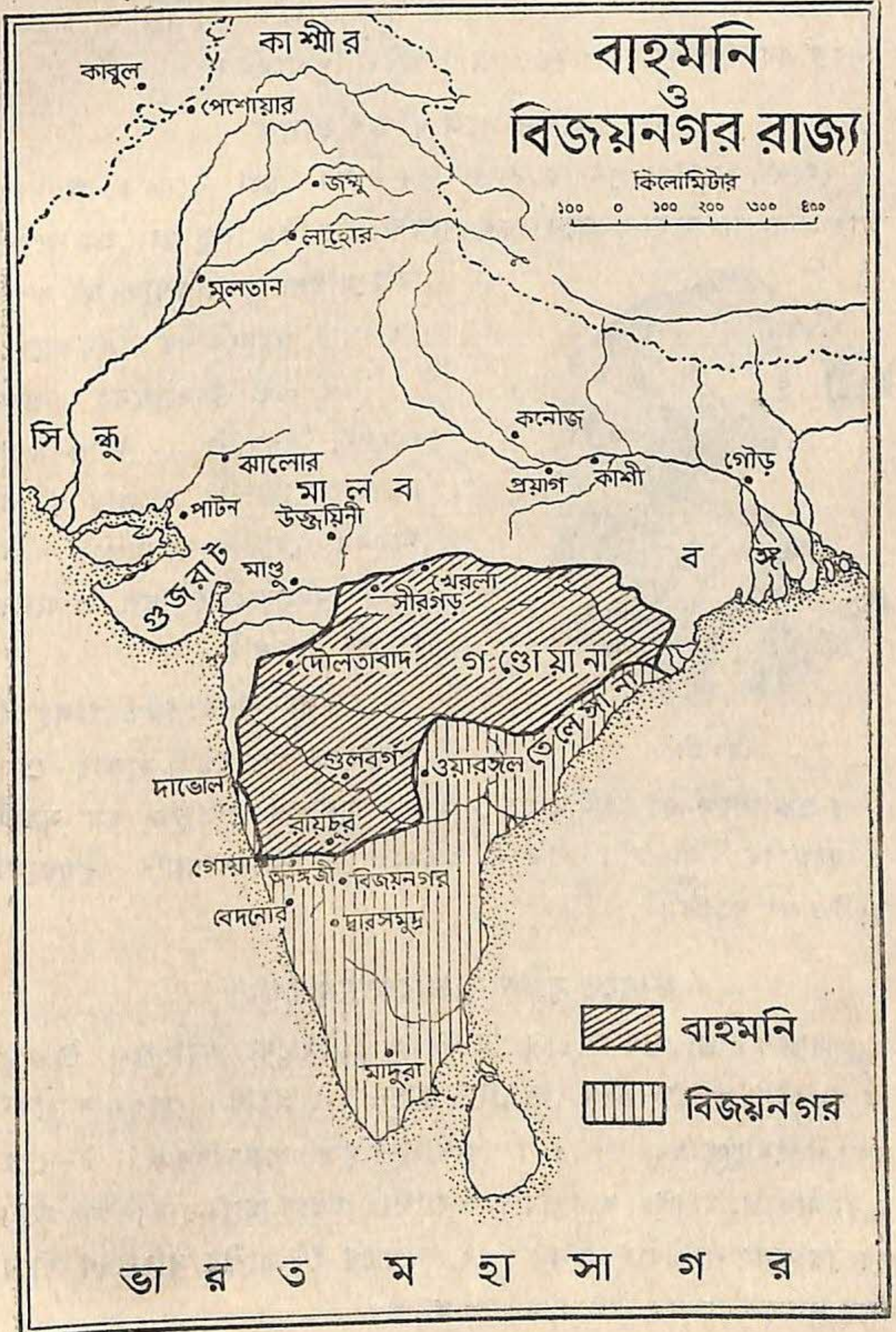
বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সেই সময় দাক্ষিণাত্যে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ইহাদের মধ্যে বহমনী রাজ্য মুসলমান শাসনাধীন এবং বিজয়নগর রাজ্য হিন্দু শাসনাধীন ছিল। দুই রাজ্যই যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। খ্রিশ্চিয়ান ও মুসলমান অনেক ভ্রমণকারী বিজয়নগর ভ্রমণ করিতে আসিয়া ঐ রাজ্যের ধনরত্ন এবং শিল্পকার্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

মোগল যুগে দক্ষিণ ভারত

মোগল সম্রাটগণ পুনরায় দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করেন। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, প্রত্যেকেই দাক্ষিণাত্যের কিছু কিছু অংশ জয় করেন, কিন্তু মোগলদের দাক্ষিণাত্য জয় সম্পূর্ণ হয় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে।

শিবাজী

কিন্তু এই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই, শিবাজী দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতন কালে মারাঠাগণই ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তি।

তাঁহার সময়ই বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে। তিনি তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লীর হিন্দুরাজ্য দুইটিও জয় করেন।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপন এবং প্রসার। মোগল সাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ তখন ভারতবর্ষ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে মারাঠা, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও বাংলাই প্রধান ছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর কলহ লাগিয়াই ছিল। এই সুযোগে ইউরোপীয় বণিকগণ ধীরে ধীরে ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে।
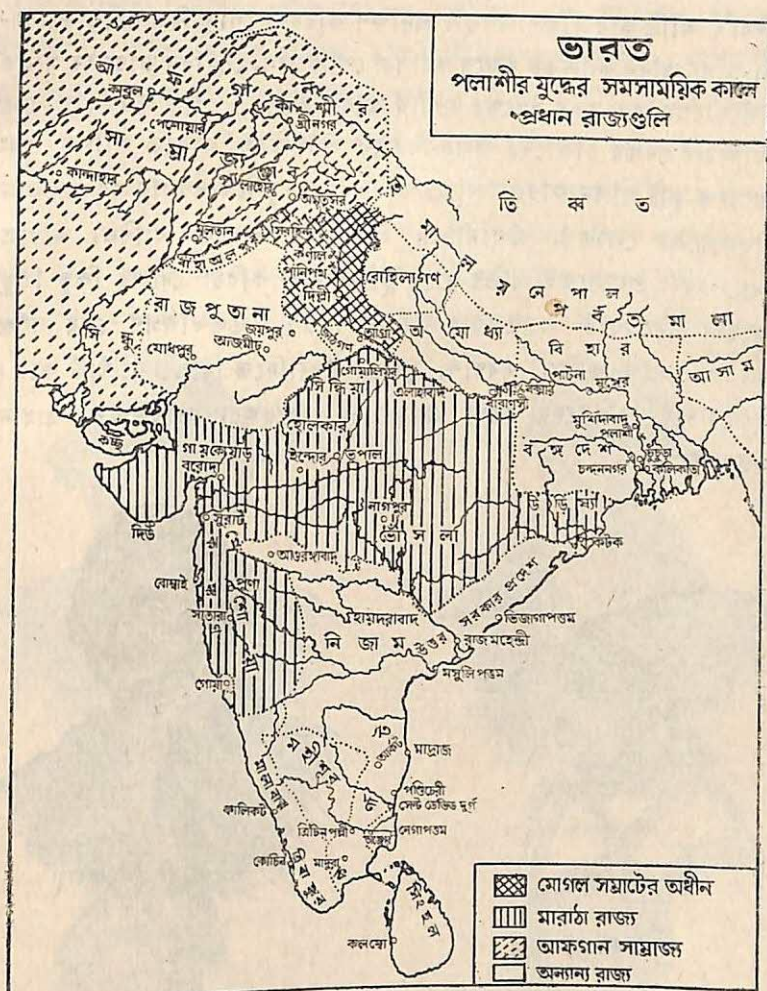
তোমরা জান যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের সহিত পাশ্চাত্য দেশগুলির বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। সেইসময় পাশ্চাত্য দেশের বণিকগণ আরব দেশের মধ্য দিয়া, লোহিত সাগর ও আরব সাগর হইয়া ভারতবর্ষে পৌঁছাইতেন। মধ্যযুগে আরবগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে, ঐ পথে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে, তাঁহারা সমুদ্রপথে ভারতে আসিতে চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জলপথ

পোতুর্গীজগণ

দিয়া (আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল প্রদক্ষিণ করিয়া) পোর্তুগীজ বণিক ভাস্কো-ডা-গামা যেদিন কালিকট বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেইদিন ভারতের সহিত ইউরোপের এক নূতন সম্বন্ধের অধ্যায় আরম্ভ হইল। পোর্তুগীজগণ ভারতে আসিয়াই দেশীয় রাজাদের কলহ-বিবাদে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং ভারতে কুঠি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। পোর্তুগীজদের পর পর ওলন্দাজ (হল্যাণ্ডের লোক), ফরাসী ও ইংরেজগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন স্থানে কুঠি নির্মাণ করিয়া দেশের কিছু কিছু জায়গা নিজেদের করতলগত করিয়া নেয়। ওলন্দাজগণ শেষ পর্যন্ত ভারত ত্যাগ করিয়া, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদিতে নিজেদের ঘাঁটি করে। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে ক্রমে এই ইংরেজরা ভারতবর্ষে প্রধান হইয়া উঠে।

সিরাজউদ্দৌল্লা

ক্লাইভ

বাংলাদেশের স্বাধীন নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা বাংলার মসনদে বসেন তখন ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্যের ফলে তাঁহার সহিত ইংরেজদের বিরোধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। প্রথম দিকে সিরাজ তাঁহার কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইলেও শেষ পর্যন্ত স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের কাছে পরাজিত হন (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ)। তখন হইতে বাংলার নবাবের শক্তি ও প্রভুত্ব ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে অবশ্য নবাব মিরকাশিম ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু

তিনি কাটোয়া, ঘেরিয়া, উদয়নালা ও বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হইলে ইংরেজদের ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্লাইভকে বাংলা দেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ (এই দুইটি স্থান তিনি অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য করার বিনিময়ে লাভ করিয়াছিলেন) দান করেন। বিনিময়ে তিনি বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানের প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। তারপর ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ওয়েলেসলি,

ভারতে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠা

ওয়ারেণ হেষ্টিংস

লর্ড ওয়েলেসলী

লর্ড কর্ণওয়ালিস

লর্ড বেণ্টিঙ্ক

ব্রিটিশ ভারত

কর্ণওয়ালিস, স্যার জন সোর, লর্ড ওয়েলেসলী, বেন্টিঙ্ক, কর্ণওয়ালিস, অকল্যাণ্ড ও ডালহৌসী ভারতে ইংরাজ গভর্ণররূপে আসেন। ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেকের আমলেই ইংরেজ রাজত্ব বিস্তার লাভ করিতে করিতে ডালহৌসীর সময় পর্যন্ত প্রায় সারা ভারতই ইংরেজদের অধীনে চলিয়া আসে।

লর্ড ডালহৌসী

কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে ভারতবাসীদের মনে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়া ওঠে তাহারই ফলে

পরবর্তী গভর্ণর লর্ড ক্যানিংএর আমলে শুরু হয় সিপাহী সংগ্রাম। ইংরেজরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামে জয়ী হয়। কিন্তু এই সংগ্রামের সবচাইতে বড়ো ফল হয় ভারতবর্ষের শাসনাধিকার চলিয়া যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে সরাসরি বৃটিশ সরকারের হাতে। ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনারেল ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর প্রতিভূ বা ভাইসরয় হিসাবে এদেশে শাসন করা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে পর্যন্ত এই ভাবেই ভারতবর্ষ ইংরেজ ভাইসরয়দের দ্বারা শাসিত হইয়াছে।

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি

ইংরেজদের শোষণ ও শাসনের ফলে ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশে পরিণত হইয়াছে। বিদেশী বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহার কুটির-শিল্পের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, কৃষির উপর ইহার নির্ভরশীলতা বাড়িয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের সমাজ-জীবনের বহু কুসংস্কার প্রভৃতি দূরীভূত হইয়াছে। ইহাছাড়া এদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছে, স্ত্রীশিক্ষার পুনঃপ্রচলন হইয়াছে, ভারতের আধুনিক আঞ্চলিক ভাষাসমূহ সমৃদ্ধ হইয়াছে, সাহিত্যকলায় পাশ্চাত্যের প্রভাবে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হইয়াছে। চিত্রশিল্প, বিজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভার বিকাশলাভ ঘটিয়াছে। গত প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা আন্দোলন আজিকার স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছে, তাহাও ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শেরই পরোক্ষ ফল। সেই কাহিনী পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে।

অনুশীলন

১। ভারতের তাম্রযুগের সভ্যতা যাহা সাধারণভাবে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা নামে পরিচিত, সেই সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ। (S. F. 1964, 1966) (উঃ—পৃঃ ২৫০-৫২)

২। সিন্ধু উপত্যকার নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে কি জান? (S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ২৫১-৫২)

৩। বেদ কি? বৈদিক যুগের আর্যদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (S. F. 1965, Comp.) (উঃ—পৃঃ ২৫৫-৫৬)

৪। ধর্মগ্রন্থ বেদ হইতে ভারতের ধর্মজীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (S. F. 1967) (উত্তর পূর্ব প্রশ্নের মতো)

৫। ঋক্ বেদে উল্লিখিত ভারতের জনগণের জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (S. F. 1961)

(উত্তর পূর্ব প্রশ্নের মতো, শুধু জাতিভেদের কথা থাকিবে না।)

৬। আর্যদের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ এবং ভারত সংস্কৃতিতে তাহাদের দান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (S. F. 1966)

(উত্তর ৩নং প্রশ্নের মতো)

৭। মগধে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ২৭৩-৭৭)

৮। দিল্লী সুলতানী আমলে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (S. F. 1967, 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ২৮৯-৯৯)

৯। দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ক্ষেত্রে পল্লব ও চোল রাজাদের অবদান বর্ণনা কর। (S. F. 1967)

(উঃ—পৃঃ ২৮৩-৮৫)

১০। কুষাণগণ ভারতের শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে কি অবদান রাখিয়া যান? (S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ২৬৮-৭০)

১১। অশোক কে ছিলেন? অশোক প্রজাবর্গের পার্থিব, নৈতিক ও ধর্মীয় মঙ্গল সাধনের জন্য কি করিয়াছিলেন? (S. F. 1969)

(উঃ—পৃঃ ২৬৩-৬৬)

১২। বাংলাদেশের সাহিত্য, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে পাল ও সেন রাজাদের অবদান বর্ণনা কর। (S. F. 1970)

(উঃ—পৃঃ ২৭৭-৮০)

১৩। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সাংস্কৃতিক জাগরণ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ। (S. F. 1965) (উঃ—পৃঃ ৩০৭)

১৪। (ক) স্ক্র্যাপ বইএ নিম্নলিখিত কাজ কর—

(১) নিম্নলিখিত সময়-রেখাগুলি অঙ্কিত কর—

(ক) ১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাবলী।

(খ) সুলতানী আমল।

(গ) মুঘল সাম্রাজ্য।

(ঘ) সিপাহী যুদ্ধ হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত।

(২) প্রাচীন ভারতের যতগুলি সম্ভব ভাস্কর্যের ছবি সংগ্রহ কর—
ক্লাসের জন্য নিম্নলিখিত প্রজেক্ট নেওয়া যাইতে পারে—

(ক) ভারতীয় ইতিহাসকে ছবি-সংযুক্ত সময়-রেখার মাধ্যমে প্রকাশ কর।

আমাদের ধর্ম

আমাদের দেশের সকল জিনিসের মূলেই রহিয়াছে ধর্ম। যুগ যুগ ধরিয়া ধর্মই এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাহাদের ধ্যান-ধারণা সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় বিশ্বাসেরই দ্বারা হইয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের ধারা বহন করিয়া এদেশে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাহাদের সমন্বয় সাধনের কাজ চলিয়াছে, কখনো বা পাশাপাশি সমান গতিতে তাহাদের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। এই উদারতাই ভারতীয় ধর্মীয় ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ধর্মসমন্বয়ই ভারত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য

ধর্মই মানুষের জীবনের প্রধান অবলম্বন। বাঁচিয়া থাকিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষ ধর্মের ভিতর দিয়া অনুসন্ধানের ফলেই বুঝিতে পারে। এখনও পৃথিবীর প্রায় সকল লোকই কোনো-না-কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে ধর্ম যে উচ্চ আদর্শ লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষের স্বকীয় দুর্বলতার জন্য উহা অনেক সময় ঐ উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে—অনেক বিকৃত আচার এবং কুসংস্কার ধর্মের মধ্যে আসিয়া জড় হইতে থাকে। ধর্মের আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া মানুষ অনেকটা যন্ত্রের মতো আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া নিজেকে ধার্মিক বলিয়া মনে করে। ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, মানুষ মানুষের সহিত যুদ্ধ করে। পৃথিবীর অনেক দেশেই ধর্ম লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল বড়ো বড়ো ধর্মের অনুসরণকারী লোকই ভারতবর্ষে আছে। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু—সকল সম্প্রদায়ের লোকই ভারতের তীর্থক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে ধর্ম লইয়া বিরোধ হয় নাই। ভারতবাসী চিরদিনই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যে, যত মত তত পথ। ভগবানের কাছে মস্তক নত করিলেই হইল, সে তুমি যে ভাবেই কর। তারপর ভারতে যেটি প্রধান ধর্ম, অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম, উহা অপর ধর্ম হইতে নিজ ধর্মে লোককে ধর্মান্তরিত করায় বিশ্বাস করে না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের কোন বাধা নাই। উদার মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে

ধর্মের অবনতি ও ধর্ম-দ্বন্দ্ব

সকল ধর্মের মধ্যেই মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। হিন্দু, ইসলাম এবং খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে ভারতে চিরদিনই ভাবের আদান-প্রদান হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা ধর্ম ভুলিয়া, সব কিছুর সঙ্গে রাজনীতি মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের পূর্বের ধারণা ছিল যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জিনিস। কিন্তু অধুনা ইহার দলগত রূপ প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে এবং ইহাকে মানুষের সাংসারিক দলগত স্বার্থলাভের জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। ফলে, ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে, যাহার বীভৎস রূপ আমরা দেখিয়াছি স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বের দাঙ্গায়। ধর্মের পার্থক্যের অজুহাতে আমাদের মাতৃভূমিকে বিভক্ত করার দুঃখ আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই। তাই আমাদের রাষ্ট্রকে ধর্মপ্রভাবহীন (secular) রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে আমরা যে শিল্প-সভ্যতার যুগের ভিতর দিয়া যাইতেছি তাহাও মানুষের ধর্মবিশ্বাসের অনুকূল নহে। শিল্প-সভ্যতা আমাদিগকে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পূজারী করিতে শিক্ষা দিতেছে। আমরা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধিকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। জীবনের মান (standard of living) বৃদ্ধি করার চেষ্টাই নাকি মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' সে যেপ্রকারেই হউক,—আমাদের জীবনের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার সময় আমাদের নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় অনেকেই আমরা ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। অনেকে হয়তো গৌরব করিয়া বলে যে তাহারা ধর্মে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বর্তমান ধর্মহীন সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবন হইতে প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি যেন দিন দিনই দূরে চলিয়া যাইতেছে। ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করার অর্থ জীবনের বৃহৎ আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করা। শুধু খাওয়া-পরা লইয়া আজীবন ব্যস্ত থাকা মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অল্প-বিস্তর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে, ধর্ম নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি। উহা মনুষ্য জীবনের সর্বাপেক্ষা বড়ো আদর্শ। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ভারতবর্ষ সভ্যতা এবং কৃষ্টির মহান শীর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল সে যেন আজ ধর্মহীন না হইয়া পড়ে। আমাদের রাষ্ট্র ধর্মপ্রভাবমুক্ত হউক, তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু আমাদের জীবন যেন ধর্মপ্রভাবমুক্ত না হয়।

তোমরা জান, এদেশের প্রধান ধর্ম হিন্দু ধর্ম। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই এই হিন্দু ধর্মের ধারা এক অখণ্ড অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মনীষীরা বৈদিক ধর্মের শাশ্বত ভিত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সময়োপযোগী পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হিন্দু ধর্মকে সজীব ও সবলই করিয়াছে। বৈদিক যুগের আদি পর্বে হিন্দু ধর্মের ভিত্তি ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির আরাধনা। প্রকৃতির যাহা কিছুই আর্যদের মুগ্ধ বা ভীত বা বিস্মিত করিত তাহাকেই তাঁহারা দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে আকাশের দেবতা দ্যৌ, জলের দেবতা বরুণ, পৃথিবীর দেবতা পৃথ্বী, সূর্যের দেবতা মিত্র, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, বাতাসের দেবতা বাত, বিদ্যুতের দেবতা রুদ্র, বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য প্রভৃতি প্রধান। তাঁহারা স্তবস্তুতির দ্বারাই ইঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে তাঁহারা স্তবস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের প্রীতির জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও শুরু করেন। অগ্নি জীবনের প্রতীক। তাই তাহার মাধ্যমেই দেবতাকে প্রদত্ত উপঢৌকন দেবতার নিকট পৌঁছান সম্ভব, এই বিশ্বাসে তাঁহারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্তবস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্নিতে ঘৃত প্রভৃতি নানা উপকরণ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া শুরু করেন। ইহারই নাম যজ্ঞ। ক্রমে ক্রমে যজ্ঞে পশুবলির প্রথাও প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই যজ্ঞ ছিল অন্তরের ক্রিয়ার প্রতীকমাত্র। এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে নিজের অন্তরে দেবতাকে উপলব্ধি করাই ছিল আর্যদের সকলপ্রকার ধর্মাচরণের মূলকথা। এই ধর্মকে ঘিরিয়া আর্যগণ খুব উচ্চস্তরের দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া তুলিলেন। উপনিষদে আমরা তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই। প্রত্যেক ধর্মকার্যের ভিত্তি ছিল গূঢ় অনুভূতি এবং গভীর তত্ত্ব। আজিও হিন্দু ধর্মে যাগযজ্ঞ একটি বিরাট অংশ জুড়িয়া আছে। বৈদিক হিন্দু ধর্মের এই প্রথম পর্যায়ে, বলাবাহুল্য, মূর্তিপূজার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রাক্-আর্য বা অনার্য ধর্মকর্মসাধনার সহিত আর্য ধর্মকর্মসাধনার সংঘর্ষ ও পরে সমন্বয়ের ফলে এই মূর্তিপূজার বিধান হিন্দু ধর্মের অঙ্গীভূত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় দেবদেবীর উপাসনার প্রমাণ রহিয়াছে। খুব সম্ভবত পশুবলি প্রথাও প্রাক্-আর্য ধর্মকর্মসাধনা হইতেই হিন্দু ধর্মে আসিয়াছে।

হিন্দু ধর্ম

বেদই আজও হিন্দুদের সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ। বেদে উপাস্য বিভিন্ন দেবদেবীরা যে একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশমাত্র সেই ধারণার উপর জোর দেওয়া হয়। ফলে, ব্রহ্ম ও আত্মোপলব্ধি হিন্দুধর্মাচরণের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু স্বভাবতই এই জাতীয় তত্ত্বচিন্তা সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ ছিল না। তাছাড়া, প্রাক্-আর্য সভ্যতার সহিত ক্রমাগত ভাবের আদানপ্রদানের ফলে তাহাদের ধর্মচিন্তাও সাধারণ মানুষের উপর ধীরে ধীরে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। তাই দেখা যায়, পরবর্তীকালে নূতন নূতন দেবদেবীর চিন্তাকল্পনার উদ্ভব ঘটিয়াছে। দ্যৌ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবদেবীর বদলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ দেবতা হিসাবে প্রধান হইয়া ওঠেন। গুপ্তযুগ হইতেই এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সব নূতন দেবদেবীর পূজা সমর্থন করিয়া এবং তাঁহাদের পূজার পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া নূতন ধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। উহাদিগকে পুরাণ বলা হয়। পুরাণের সঙ্গে বেদের তত্ত্বগত কোনো বিরোধ নাই। জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া বেদের তত্ত্বকথা এবং অনুষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। কালক্রমে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকেরা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিলেন। বিষ্ণু এবং শিবকে উপাস্য দেবতা করিয়া হিন্দুদের মধ্যেই এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শৈব নামে দুইটি আলাদা সম্প্রদায় গড়িয়া ওঠে। কোনো বৈদিক ধর্মগ্রন্থে একাধিপত্যসম্পন্ন কোনো মহিলা দেবতার নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সময় ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে ভগবানকে শক্তি বা জগন্মাতারূপে আরাধনার আয়োজনও দেখা যায়; এবং ইহার ফলেই শক্তি সম্প্রদায়েরও উদ্ভব ঘটে। কালী, দুর্গা বা জগন্মাতার অন্য কোনো রূপকে ইহারা উপাস্য দেবী বলিয়া গ্রহণ করেন। একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বৈদিক যুগের প্রথম অবস্থায় ধর্মসাধনা যেমন ছিল যাগ-যজ্ঞাদিরূপ কর্মপ্রধান, উপনিষদের যুগে যেমন ছিল জ্ঞানপ্রধান, এই সময় তেমনি সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মসাধনা হইয়া দাঁড়ায় প্রধানত ভক্তিপ্রধান। ভক্তি-ভরে আরাধ্য দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণই ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠ পথ—এই যুগের হিন্দু ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই ছিল প্রধান বিশ্বাস। কেহ কেহ মনে করেন, এই ভক্তিবাদও অনার্য ধর্মকর্মসাধনারই অবদান। আজিকার হিন্দু ধর্ম উপরিউক্ত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগেরই এক অপূর্ব সমন্বায়িত ফল।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৈদিক যুগের শেষদিকে হিন্দু ধর্ম সাধারণের অবোধ্য কতগুলি জটিল ক্রিয়াকাণ্ড ও আন্তরিকতাহীন যাগযজ্ঞের বাহ্যিক অনুষ্ঠানমাত্রে পরিণত হয়। জাতিভেদপ্রথা কঠোরতর হইয়া সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এই আন্তরিকতাহীন, আচারানুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্মের পরিবর্তে এক সহজ, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মপন্থার প্রয়োজন অনুভব করা শুরু করেন। ইহার ফলেই খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এদেশে বহু ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছেন গৌতম বুদ্ধ। নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরে আনুমানিক ৫৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধধন শাক্যবংশের রাজা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারবিরাগী ছিলেন। জগতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁহার মনকে বিচলিত করিত। বেড়াইতে বাহির হইয়া পথে পর পর পঙ্গু, জরাগ্রস্ত, ব্যাধিতে কাতর এবং মৃতলোক দেখিয়া, তিনি মানুষের দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বাহির করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কোথায় শান্তি! কি করিলে দুঃখের নিবারণ হয়! এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য গৌতম বুদ্ধ পূর্ণ যৌবনে রাজসংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া পড়েন। নানাস্থানে তপস্যা করার পর বুদ্ধদেব গয়ার কাছে বৌদ্ধ গয়ায় এক অশ্বত্থ গাছের নিচে, মরণপণ করিয়া তপস্যায় বসেন। দীর্ঘদিন ধ্যানস্থ থাকার পর সত্য তাঁহার অন্তরে পরিস্ফুট হয়। মানুষের দুঃখের কারণ কি এবং কি করিলে তাহার নিবৃত্তি হয়, গৌতম বুদ্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম নামে খ্যাত। আজিও বৌদ্ধ ধর্ম এদেশের একটি ধর্মমত।

গৌতম বুদ্ধ সারনাথে তাঁহার প্রথম ধর্মমত ব্যক্ত করেন। তাঁহার সারনাথ উপদেশের মূল কথা হইতেছে (১) জন্ম দুঃখের ; রোগ, জরা, মৃত্যু দুঃখের। (২) আসক্তি বা তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ। (৩) তাই তৃষ্ণার বা দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করিতে হইবে। (৪) দুঃখের নিবৃত্তির আটটি পথ আছে—(ক) সম্যক বিশ্বাস, (খ) সম্যক সংকল্প, (গ) সম্যক বাক্য, (ঘ) সম্যক কর্ম, (ঙ) সম্যক জীবনযাত্রা, (চ) সম্যক চেষ্টা, (ছ) সম্যক স্মৃতি, ও (জ) সম্যক সমাধি বা ধ্যান। বুদ্ধদেব পাঁচ প্রকারের ধ্যান বা ভাবনার

নির্দেশ দিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবনার অর্থ সর্বজীবে মৈত্রী বা প্রেম, জীবের দুঃখে করুণা বা দয়া, অন্যের আনন্দে আনন্দ, দেহ অপবিত্র এরূপ চিন্তা, এবং লোকের ভালোবাসা বা ঘৃণা উভয় সম্বন্ধেই ঔদাসীন্য। উপরি-উক্ত অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি পন্থা বৌদ্ধ ধর্মের সার কথা।

বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মমত মুখে মুখে শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যরা রাজগৃহে এক বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করিয়া তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া ত্রিপিটক নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। পিটক তিনটি হইতেছে বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম। প্রথমটিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মসমূহ, দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধদেবের ধর্মমত ও তৃতীয়টিতে ধর্মমতের দার্শনিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সুত্ত পিটকের পাঁচটি ভাগ আছে। তাহাদের অন্যতম ক্ষুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত ধম্মপদ বুদ্ধদেবের অতি মহান উপদেশাবলীতে পূর্ণ।

ত্রিপিটক পাঠে জানা যায়, বুদ্ধদেব ছিলেন ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারেই নির্বাক। তিনি সৎকর্মের উপরেই জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ যদি অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুযায়ী কর্ম করিয়া যায়, তাহা হইলে নিজ কর্মবলেই দুঃখ হইতে নিবৃত্তি, অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করিতে পারে। আত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিলেও বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের মতোই কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তর হইতে মুক্তিই হইতেছে নির্বাণ, এবং ইহা জীবমাত্রেরই কাম্য। আগেই বলা হইয়াছে, বৈদিক প্রাণহীন যাগযজ্ঞাদির প্রতিবাদেই এই সময়কার ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলি শুরু হয়। বৌদ্ধ ধর্মও ছিল যাগযজ্ঞাদির বিরোধী। বুদ্ধদেব একদিকে যেমন ভোগবিলাসের বিরোধী ছিলেন, তেমনি অপরদিকে অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনকে পছন্দ করিতেন না। বৌদ্ধ ধর্ম হইতেছে মধ্যপথাবলম্বী। তাই দেখা যায় অহিংসাকে ধর্মের মূল হিসাবে স্থান দিলেও বুদ্ধের শিষ্যরা অনেকে তাঁহার সম্মতিক্রমে মাংসও খাইতেন।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে হীনযান ও মহাযান এই দুইটিই প্রধান। হীনযান মতে শুধু সন্ন্যাসজীবন যাপন করিয়াই নির্বাণলাভ সম্ভব, কিন্তু মহাযান মতে সর্বজীবে প্রেম ও করুণা এবং পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া বুদ্ধের পূজার মধ্য দিয়া এমন কি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিয়াও নির্বাণলাভ সম্ভব। হীনযানীরা ছিলেন বুদ্ধের মূর্তিপূজার বিরোধী, কিন্তু মহাযানীরা বুদ্ধের মূর্তিপূজা শুরু করেন। বৈশালীতে বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে যে বৌদ্ধসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেই বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে এই মতভেদ শুরু হয়। আরও অনেক পরে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে, কণিষ্কের আমলে যে বৌদ্ধসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়ই মহাযান ও হীনযান এই দুইভাগে বৌদ্ধ ধর্ম সুস্পষ্টরূপে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। মহাযান মতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ সদ্ধর্মপুণ্ডরীক।

হীনযান মত প্রতিষ্ঠার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম জনসাধারণের নিকট আদরণীয় হইয়া ওঠে। মৌর্য ও কুষাণ সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এইধর্ম শুধু এই দেশের অভ্যন্তরেই নহে, ভারতের বাহিরেও ব্রহ্মদেশ, সিংহল, সুবর্ণভূমি, সীরিয়া, মিশর, ম্যাসিডনিয়া, কাইরিনি, ইপিরাস, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশগুলিতেও বিস্তারলাভ করে।

কিন্তু পরবর্তীকালে একদিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িল, তেমনি অন্যদিকে শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রমুখ হিন্দু সংস্কারকেরা তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভাবলে বুদ্ধ-প্রবর্তিত বহু সংস্কার এমনভাবে হিন্দু ধর্মের মধ্যে স্থান করিয়া দিলেন, যাহার ফলে বৌদ্ধ ধর্মের আলাদা অস্তিত্বের প্রয়োজন আর রহিল না। ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্ম এদেশে পুনরায় হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। বুদ্ধের স্থান হইল বিষ্ণুর অন্যতম অবতার হিসাবে। কিন্তু ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলিতে এখনও বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান। স্বাধীনতালাভের পরবর্তী যুগে ভারতেও বৌদ্ধ ধর্মের পুনঃপ্রচার হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

জৈন ধর্ম

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ভারতবর্ষে যে আরো একজন চিন্তাশীল নায়ক হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন মহাবীর। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম জৈন ধর্ম নামে খ্যাত। অবশ্য, জৈন প্রবাদমতে মহাবীরই এই ধর্মের প্রবর্তক নহেন।

তাঁহার পূর্বে আরও তেইশ জন মহাপুরুষ বা তীর্থঙ্কর এই ধর্মমত প্রচার করিয়াছেন—মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর। এইমত কতটা সত্য বলা না গেলেও প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ এবং মহাবীরের পূর্ববর্তী পার্শ্বনাথ খুব সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সে যাহাই হউক, মহাবীরই যে এই ধর্মের উন্নতি সাধন ও সাধারণে বহুল প্রচার করেন, সে কথা অনস্বীকার্য। উত্তর বিহারে বৈশালীনগরে এক বিত্তবান ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীরের জন্ম হয়। সংসার ধর্মে তাঁহার নাম ছিল বর্ধমান। তিনি যৌবনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যার পর তিনিও দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। মহাবীর দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জিন্ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয়ী বলিয়া পরিচিত। তাই তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতকে জৈন ধর্ম বলে। জৈনদের 'নির্গ্রন্থ' ধর্মসম্প্রদায়ও বলা হইয়া থাকে। নির্গ্রন্থ শব্দ সংসারে আকর্ষণহীনতা সূচিত করে।

জৈন মতেও আত্মার চরম শান্তি বা নির্বাণলাভই মূল লক্ষ্য। ইহাকে তাঁহারা বলেন কৈবল্য। যোগ কৈবল্যলাভের উপায়স্বরূপ। যোগের তিনটি অঙ্গ—(১) জ্ঞান বা বাস্তবের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করা, (২) বিশ্বাস রাখা বা জিনদের উপদেশে আস্থা, এবং (৩) চরিত্র বা সমস্ত অসৎ আচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকা। চরিত্র বলিতে জৈনরা অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য বোঝেন। ইহাদের মধ্যে সত্যবাদিতা, চুরি না করা, হিংসা না করা এবং লোভ সংবরণ করা—এই চারিটি খুব সম্ভবত পার্শ্বনাথই প্রচার করেন। মহাবীর ইহার সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করার সূত্রটি যোগ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের মতো জৈনমতেও ভগবানের অস্তিত্ব বা জাতিভেদ প্রথা

মহাবীর

স্বীকৃত নহে, কিন্তু কর্মফল বা জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধদেব ধর্মের অঙ্গ হিসাবে কৃচ্ছ্রসাধনকে স্বীকার না করিলেও জৈনমতে কৃচ্ছ্রসাধন কৈবল্য-লাভের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তাঁহারা শুধু পশুবলির বিরোধিতাই করেন না, তাঁহারা অজৈব পদার্থেও প্রাণ আছে বলিয়া মনে করেন, এবং সেই কারণেই কৃষিকার্যে প্রাণের বেদনা সঞ্চার হইবে ধারণায় কৃষিকার্য পর্যন্ত করেন না।

জৈন ধর্মমত যেসব গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে বলা হয় সিদ্ধান্ত বা আগম। মূল জৈন ধর্মমত চৌদ্দটি পর্বে বা খণ্ডে সংকলিত ছিল। কথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় বিহারে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বহু জৈন জৈনসংঘের নেতা ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। এই সময় জৈনসংঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্থূলভদ্র। তিনি পাটলীপুত্রে এক জৈন সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে চৌদ্দটি পর্ব বারোটি অঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে গুজরাটে আহূত অপর এক জৈন ধর্মসভায় জৈন ধর্ম-সাহিত্য অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র—এই চারিটি ভাগে সঙ্কলিত হয়।

ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে যেসব জৈনরা দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান তাঁহারা যখন পুনরায় মগধে ফিরিয়া আসেন, তখন দেখিতে পান স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে মগধের জৈনরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে শুরু করিয়াছেন। মহাবীর পার্থিব কোনো কিছুর প্রতিই আসক্তি থাকা কৈবল্যলাভের অন্তরায় মনে করিতেন। তাই এমন কি পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও যাহাতে কোনো আসক্তি না জন্মায় সেইজন্য তিনি দিগম্বরই থাকিতেন। তাঁহার শিষ্যরাও ছিল দিগম্বর। ভদ্রবাহুর ভক্তরা স্থূলভদ্রের শিষ্যদের এই শ্বেতবস্ত্র পরিধান অনুমোদন করিতে পারিলেন না। ফলে, জৈনরা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর—এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যান। পরবর্তীকালে, যদিও মুসলমান আমলে দিগম্বর জৈনদের সামান্য বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য করা হয়, তবুও আজ পর্যন্ত জৈনদের মধ্যে ঐ দুইটি সম্প্রদায় বিদ্যমান।

জৈন ধর্ম কোনোদিনই বৌদ্ধ ধর্মের মতো রাজানুগ্রহপুষ্ট হয় নাই বলিয়া কি ভারতবর্ষে কি ভারতের বাহিরে প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু সেইকারণেই হিন্দু ধর্মের সহিত প্রত্যক্ষ বিরোধও তাহার তেমন হয় নাই। তাছাড়া হিন্দু ধর্মের সহিত জৈন ধর্ম নানাবিধ সামঞ্জস্যও বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। ফলে, আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধ ধর্ম যেমন পরবর্তীকালে এদেশ হইতে

প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, জৈন ধর্ম তেমন হয় নাই। এখনও গুজরাট প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলে বহু ভারতবাসী জৈন ধর্মাবলম্বী।

ইসলাম ধর্ম

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে আরবের শাসনকর্তা হজ্জাজের সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাসিমের সিন্ধুদেশ বিজয়ের মধ্যদিয়া এদেশে প্রথম ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমান রাজাদের তৎপরতায় তাহাদের হিন্দুধর্মবিদ্বেষী অভিযানের ফলে বা সাধারণ মানুষের রাজানুকূল্য লাভের আশায় বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তৎকালীন হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথার কঠোরতাও নিম্নশ্রেণীর লোকদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে ভারতবর্ষের এক বিরাট জনসংখ্যা মুসলমান।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ)। এই ধর্মমত যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সেই কোরাণ সম্পূর্ণ তাঁহারই রচনা। ঐশ্লামিক মতে কোরাণের বাণী স্বয়ং ভগবানের। দেবদূত গেব্রিয়েলের নিকট হইতে মহম্মদ তাহা লাভ করেন। কোরাণ ব্যতীত ইসলাম ধর্মের অপর দুইটি ধর্মগ্রন্থ হইতেছে সুন্না ও হাদিথ। প্রথমটিতে মহম্মদের জীবনী ও দ্বিতীয়টিতে তাঁহার বাণী সংকলিত রহিয়াছে।

ইসলাম ধর্মমতে ভগবান বা আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন, সবকিছু ইচ্ছা করেন—তিনি সর্বশক্তিমান। এই কারণেই মূর্তিপূজা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ ; আল্লাহ্ কখনই কোনো মূর্তিরূপ বা অবতাররূপ গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ্-তে বিশ্বাস রাখিতে হইবে—বিশ্বাস রাখিতে হইবে তাঁহার প্রচারক মহম্মদে এবং ঐশ্লামিক ধর্মগ্রন্থ কোরাণে। এই মত অনুযায়ী পৃথিবীর শেষ ধ্বংসের দিনে সমস্ত মানুষের বিচার করিবেন আল্লাহ্ এবং আমাদের কর্ম অনুযায়ী সপ্তনরকে বা স্বর্গে আমাদের স্থান হইবে। এই ধর্মমতানুযায়ী এই পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ঘটে না, ঘটে আল্লাহ্-এর ইচ্ছা অনুসারে। যাহাতে নরকে যাইতে না হয় তাহার জন্য কোরাণে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পাঁচটি অবশ্যপালনীয় কর্মের বিধান রহিয়াছে—(১) আল্লাহ্-তে বিশ্বাস, (২) প্রতিদিন পাঁচবার ভগবানের আরাধনা, (৩) দরিদ্রের প্রতি দয়া ও ভিক্ষাদান, (৪) রমজান মাসে (যে মাসে কোরাণ মহম্মদের নিকট দেবদূত কর্তৃক বিবৃত হয়) উপবাস

পালন, এবং (৫) জীবনে অন্তত একবার মক্কায় তীর্থযাত্রা (যদি কোনো কারণে কাহারও পক্ষে যাওয়া একান্তই অসম্ভব হয়, সেইক্ষেত্রে সে অন্যকে তাহার প্রতিনিধি হিসাবেও পাঠাইতে পারে)।

অন্যান্য ধর্মমতের মতো ইসলাম মতাবলম্বীরাও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে শিয়া ও সুন্নী প্রধান। সুন্নীরা আদি ইসলামমতে বিশ্বাসী এবং মহম্মদের পরে অন্য কোনো প্রচারকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু শিয়ারা করিয়া থাকেন।

খৃষ্টান ধর্ম

বর্তমান ভারতবর্ষের আরেকটি প্রধান ধর্মমত খৃষ্টান ধর্ম। যীশুখৃষ্ট কর্তৃক খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের অব্যবহিত পরেই যদিও এদেশে দুই একজন খৃষ্টান ধর্মযাজক উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্যত এইদেশে এই ধর্মমত প্রচারিত হয় অনেক পরে য়ুরোপীয় বণিকদের এদেশে আগমনের পরোক্ষ ফল হিসাবে। য়ুরোপীয় বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে যে সব ধর্মযাজক এদেশে আসেন প্রধানত তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় এদেশে বহুলোক খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়।

যীশুখৃষ্টের বাণী বাইবেল নামক ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বাইবেল পাঠে জানা যায় যীশুখৃষ্ট যে ধর্মমত প্রচার করেন তাহার মূল কথাও ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। এ জগতে তাঁহারাই ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেন যাঁহারা ন্যায়পথে থাকে, যাঁহাদের অন্তর পবিত্র, যাঁহারা অহিংস ও শান্তিকামী। ভগবানের প্রীতিলাভের একমাত্র উপায় মানুষকে ভালোবাসা। শত্রুতার দ্বারা শত্রুতাকে জয় করা যায় না, জয় করা যায় ভালোবাসার দ্বারা। তাই যীশুখৃষ্ট শত্রুকেও ভালোবাসার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। আদি
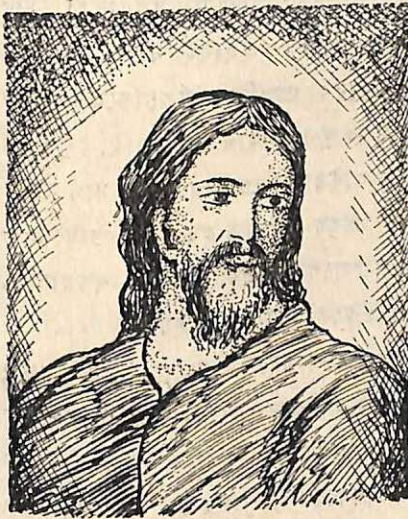
যীশুখৃষ্ট

খৃষ্ট ধর্মেও পৌত্তলিকতার স্থান নাই। মৃত্যুর পর, পাপ-পুণ্যের বিচার

এবং মুক্তিলাভের কথাও খ্রীষ্টান ধর্মে বলা হইয়াছে। যীশুকে খৃষ্টানরা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন; তিনি মানুষকে মুক্তিদানের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাও তাহাদের বিশ্বাস।

যীশুখৃষ্ট প্রবর্তিত খৃষ্ট ধর্ম ছিল অত্যন্ত সহজ সরল জীবনাচরণের কতকগুলি নীতি। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য ধর্মমতের মতো খৃষ্টধর্মযাজকরাও রাজানুকূল্যে পুষ্ট হইয়া মূল ন্যায়নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। যীশুখৃষ্টের মূর্তিপূজাও ধর্মাচরণের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতকে ইহার প্রতিবাদে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী চিন্তাশীল নায়কেরা এক আন্দোলন শুরু করেন। ফলে, খৃষ্টানরাও রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যাহারা উপরিউক্ত প্রতিবাদী আন্দোলনের সমর্থক তাহারাই প্রোটেষ্টাণ্ট নামে খ্যাত।

মধ্য ও আধুনিক যুগের ধর্ম-সংস্কারকগণ

তোমাদের ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, সুলতানী আমলে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বহুদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান-দের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, ক্রমে তাহা হ্রাস পায় এবং ক্রমেই হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীরদের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহারই ফলে সুলতানী আমলের শেষ দিকে নানক, কবীর, চৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকের উদ্ভব ঘটিল। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই মূল বাণী হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরকে পাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ বা মার্গ মাত্র।

ইসলাম ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের প্রথম সংঘাত হয় দক্ষিণ ভারতে—অষ্টম-নবম শতকে আরব ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে আসিয়া। ফলে, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব প্রভৃতি ধর্মসংস্কারকদের আবির্ভাব হয়।

শঙ্করাচার্য

শঙ্করাচার্য ছিলেন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ। মালাবার উপকূলের এক গ্রামে অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিতান্ত অল্পবয়সেই তাঁহার ধারণা জন্মায় যে সংসার মিথ্যা। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি আত্মান্বেষণে ব্যাপৃত হন। গুরু গোবিন্দ যোগীর নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন এবং কঠোর তপশ্চর্যার ফলে পরম-হংসত্ব বা সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর সারা ভারত ঘুরিয়া তিনি তাঁহার

ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি পণ্ডিতদের সভায় বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতাদের পরাস্ত করেন। ইহাকে শঙ্করাচার্যের দিগ্বিজয় বলে। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি সত্য সত্য দিগ্বিজয়ই করিয়াছিলেন। আজিও শঙ্করাচার্যের নাম আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে একবাক্যে পরিচিত। শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। সংসারে এক ছাড়া তিনি দুই মানিতেন না। শঙ্করের মতে সংসারে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব তিনি একেবারেই স্বীকার করিতেন না। কাজেই পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের দিক দিয়া যাঁহারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাকে ধর্ম-সাধনায় একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে শঙ্কর বিদ্রোহী। কিন্তু তিনি শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যেই তাঁহার মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। ভারতের নানাস্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শঙ্করাচার্য তাঁহার শিষ্যদের মাধ্যমে তাঁহার মত প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতের প্রায় প্রতি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রেই (কাশী, পুরী ইত্যাদি) শঙ্করাচার্যের আশ্রম আজও বিদ্যমান। শঙ্করাচার্যকে হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করা হয়।

রামানুজ

১০১৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের নিকট তিরুপটিগ্রামে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত। শঙ্করের ধর্মমতে জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একতা উপলব্ধি করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাহাদের নিকট শঙ্করের ধর্মমত নীরস ও অবোধ্য ছিল। রামানুজও শঙ্করের মতো অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্মমতের সহিত পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া উহাকে জন-সাধারণের অধিকতর নিকটে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের লোক এখনও ভারতে অনেক আছেন।

নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য রামানুজেরই সমসাময়িক। নিম্বার্ক ভক্তিভাবের উপর আরও জোর দেন। রামানুজ ও নিম্বার্ক উভয়েরই ধর্মমত সংস্কার করিয়া মাধ্ব (১১৯৯-১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) উহা আরও সাধারণগ্রাহ্য করিয়া তোলেন।

রামানন্দ ও কবীর

রামানন্দ দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ। রাম-সীতার উপাসনার ভিতর দিয়া তিনি ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করেন। তিনি ও তাঁহার প্রধান শিষ্য মুসলমান ধর্মাবলম্বী কবীর (চতুর্দশ

শতকে) প্রচার করেন হিন্দুদের রাম আর মুসলমানদের আল্লাহ্, এক ও অভিন্ন। ভগবানকে পাইতে হইলে তাহাকে ভক্তি করিতে হয়, ভজন করিতে হয়। জাতিভেদপ্রথা তাঁহারা মানিতেন না। মুচি, মেথর, হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকল জাতির ও শ্রেণীর লোকদেরই রামানন্দ ও কবীর শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ অপেক্ষা কবীরই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি দোঁহা নামে ছোটো ছোটো দুই লাইনের কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার উপদেশগুলি প্রচার করেন। তাঁহার একটি দোঁহা নিচে দেওয়া গেল—

"আল্লা-রাম ভ্রম মুচ গিয়া মেরী।
সবই দেখৌ দর্শন তেরী॥"

এই সময় পাঞ্জাবে গুরু নানকও (জন্ম ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত শিখ ধর্ম নামে খ্যাত। শিখ অর্থ শিষ্য। নানকও জাতিধর্মনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকলকেই শিষ্য হিসাবেই গ্রহণ করিতেন। সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। শিখ ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকও নিতান্ত কম নহে। শিখেরা গুরুদ্বার (আমাদের মন্দিরের মতো) স্থাপন করিয়া, তাহার মাধ্যমে ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির শিখদের প্রধান গুরুদ্বার। বর্তমানে পাঞ্জাবে শিখ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অনেক। শিখ ধর্মের অনুসরণকারীরা ধর্মীয় দল হিসাবে খুবই সংঘবদ্ধ। মুসলমান যুগে, সুলতান এবং সম্রাটদের অত্যাচারের ফলে, শিখরা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেও বাধ্য হন।

নানক

নানক

চৈতন্য

নানকের প্রায় সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে অপর এক মহাপুরুষ তাঁহার প্রেমধর্ম প্রচার করেন। তিনি হইতেছেন চৈতন্যদেব। ভগবানকে ভক্তি করা এবং প্রিয়জন হিসাবে

ভালোবাসা, সর্বজীবে দয়া ও ভালোবাসা, সকল মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা এই ছিল চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত ধর্মমতের মূল বাণী। কীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের ভজনা করা চৈতন্যদেব বিশেষভাবে প্রচার করেন। তিনিও জাতিভেদ মানিতেন না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিতেন। চৈতন্যদেব যে ভাবধারা প্রচার করেন তাহার অনুসরণকারী ভারতের সর্বত্র এখনও অনেক আছেন।

নামদেব

এই সময়ই মারাঠা দেশে ভক্তিবাদের আরেক অন্যতম সাধক নামদেব তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। মূর্তিপূজা, আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ বা হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য তিনিও মানিতেন না। ব্যক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়াই ছিল তাঁহার ধর্মমতের মূল নির্দেশ।

কিন্তু এই সব ধর্মগুরুদের প্রচার সত্ত্বেও পরবর্তী মুসলমান নরপতিদের অনেকের সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধ নীতির ফলে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সম্পূর্ণ মিশিবার সুযোগ পায় নাই। ফলে, পরবর্তীকালে যখন এদেশে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হইল, তখন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন ধর্মমতই নিজ নিজ স্থান করিয়া লইবার জন্য প্রয়াস পাইল। দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি। নবজাগরণের পটভূমিকায় দেখা দিল এই তিন ধর্মমতের সমন্বয়সাধনের ঐতিহাসিক প্রয়োজন। ইহারই প্রকাশ রামমোহন, রাণাডে, দয়ানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দেশে যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার পথপ্রদর্শক ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ)। ইস্‌লাম ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের সংঘাতকালে দক্ষিণ ভারতে শঙ্করাচার্য ও রামানুজ এবং উত্তর ভারতে রামানন্দ, কবীর, নানক, ও শ্রীচৈতন্য যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, খৃষ্ট ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের সংঘাতকালে রামমোহন প্রায় অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধর্ম-সমন্বয়ই ছিল তাঁহার ধর্মসংস্কারের অন্তর্নিহিত কথা। পাদ্রীরা তখন রাজানুকূল্য লাভ করিয়া সোৎসাহে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। অপর-দিকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে নানাপ্রকার কুসংস্কার স্থান পাইয়াছিল। ধর্মাচরণের ভিতর যে গূঢ় সত্য বা জীবনদর্শন নিহিত আছে তাহা না বুঝিয়া হিন্দুরা যন্ত্রের মতো ধর্মাচরণ করিয়া চলিয়াছিল। ঐসব আচরণ দেখিয়া স্বভাবতই

অপরে তাহাকে অর্থহীন কুসংস্কার বলিয়া মনে করিত। পাদ্রীরা ঐসব ধর্মাচরণের প্রকাশ্য নিন্দা ও সমালোচনা করিয়া হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত অনেক হিন্দু যুবকও তাহাদের প্রচারে আকৃষ্ট হইতেছিল। এই ধর্মসংকটের সময় রামমোহনের আবির্ভাব হয়। আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় রামমোহনের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। নিজের চেষ্টায় পরে তিনি ইংরেজীও শিখিয়াছিলেন। ইস্‌লাম এবং খৃষ্টান ধর্মের সারগ্রন্থগুলি তিনি গভীরভাবে পড়িয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের বেদ-উপনিষদ রামমোহনই ভাষ্যসহ প্রথম অনুবাদ করেন। যাহাতে সংস্কৃত না জানা লোকও বেদান্ত-উপনিষদের কথা পড়িয়া বুঝিতে পারে এবং হিন্দু আচারের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই

রাজা রামমোহন রায়

রামমোহন ঐ গ্রন্থগুলিকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদগুলি রামমোহন বিনামূল্যে পর্যন্ত বিতরণ করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আত্মীয়-সভা' নামে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য এক সভা স্থাপন করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ব্রহ্মকে একমাত্র সত্যরূপে মনে করিয়া তাঁহার উপাসনার জন্য এক সভা স্থাপন করেন। এই সভাই 'ব্রাহ্মসভা' বা 'ব্রাহ্ম-সমাজ'রূপে খ্যাতি অর্জন করে।

রামমোহন প্রচারিত ব্রাহ্ম ধর্মের মূল কথা, সকল ধর্ম মূলত একই ভগবানে বিশ্বাস করিয়া থাকে। উপনিষদে প্রচারিত একেশ্বরবাদই ইহার

মূল কথা। ব্রাহ্মরা মূর্তিপূজার সম্পূর্ণ বিরোধী। অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় গোঁড়ামি বা বাধানিষেধের কোনো প্রকৃত মূল্য নাই। জাতিভেদ অর্থহীন। সকল জাতির লোকের সহিত একত্রে বসিয়া আহারাদি করা বা ভগবানের উপাসনা করায় কোনো দোষ নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজ সেই বোধই জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার উপরই রামমোহন জোর দিয়াছিলেন।

রাণাডে

নামদেব, তুকারাম প্রমুখ মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রচারকদের মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই রাণাডে তাঁহার 'প্রার্থনা-সমাজ' গড়িয়া তোলেন। বাংলার ব্রাহ্ম-সমাজদ্বারা মহারাষ্ট্রও প্রভাবান্বিত হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাবে মহারাষ্ট্রে প্রথম 'পরমহংস সভা' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ)। এই সভা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। তারপর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাই গেলে তাঁহার উৎসাহে এবং রাণাডের প্রচেষ্টায় 'প্রার্থনা-সমাজ' স্থাপিত হয়। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন প্রভৃতিই ছিল রাণাডের মূল আদর্শ। ধর্মসংস্কার অপেক্ষা সমাজসংস্কারের কার্যে প্রার্থনা-সমাজ অধিকতর অগ্রণী হয়।

দয়ানন্দ

হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে সমস্ত কুসংস্কার হইতে মুক্ত করা এবং বৈদিক হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রবর্তনই ছিল দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের মূল লক্ষ্য। দয়ানন্দ ধর্মবিষয়ে উদারনীতির অনুসরণকারী ছিলেন, এবং শুদ্ধির মাধ্যমে অহিন্দুকেও হিন্দুসমাজে গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) নিজে গুজরাটী ছিলেন। বিশুদ্ধ আর্য ধর্মের (বৈদিক ধর্ম) উপর তিনি হিন্দু ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ পৌরাণিক আমলে যেসব দেবদেবীর পূজা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি

দয়ানন্দ সরস্বতী

জাতিভেদ এবং বহু দেব-দেবীর পূজার বিরোধী ছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতীর কর্মকেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব। পাঞ্জাবেই এখনও তাঁহার অনুগামী লোকের সংখ্যা অনেক।

একান্তভাবে হিন্দু ধর্মের অনুসরণকারী ও পৌত্তলিকতার পূজারী হইয়াও উদার মানবতার অধিকারী কি করিয়া হওয়া যায় ও সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রয়াস পাওয়া যায় তাহার মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৫-১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) বিশেষ লেখাপড়া জানিতেন না। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে কঠোর তপস্যার দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ধর্মের সহিত ধর্মের, ঈশ্বরের সহিত ঈশ্বরের বা মানুষের সহিত মানুষের বিভিন্নতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাস করিতেন না। সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য আছে, একথা তিনি সাধনাদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও ইস্‌লাম এবং খৃষ্ট ধর্মের সাধনা পর্যন্ত অভ্যাস করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও, ব্রাহ্ম-সমাজের কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নীরস বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুদ্ধি এবং হৃদয়-আবেগের সমন্বয় ঘটান। 'মায়ের' প্রতি ভক্তিরসে তাঁহার ধর্ম জনসাধারণের নিকট সরস হইয়া ওঠে। তিনি ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ অনাবিল ভক্তি দ্বারা একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মের মূল অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশিত ও প্রচারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তেমনি হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকল ধর্মের প্রতি সম-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু ধর্মমতকে সংকীর্ণতার আবিলতা হইতেও মুক্তি দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ

দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড়ে ইহার প্রধান কেন্দ্র হয়। মানবকল্যাণ এবং জনসেবায় এই মিশন বিশেষভাবে উৎসর্গীকৃত। ভারতের সর্বত্র, এমন কি ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক স্থানেও, আজ রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অনুশীলন

(আমাদের ধর্ম)

১। গৌতম বুদ্ধের জীবনী লেখ ও তাঁহার ধর্মমতের বিবরণ দাও।
(S. F. 1965, 1968) (উঃ—পৃঃ ৩১৩—১৫)

২। মহাবীর কে ছিলেন? তাঁহার ধর্মমতের বিবরণ দাও।
(S. F. 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ৩১৫—১৭)

৩। খৃষ্টের জীবন ও ধর্মমত সম্পর্কে যাহা জান লেখ।
(S. F. 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ৩১৯—২০)

৪। ইস্‌লাম ধর্মের প্রধান উপদেশগুলি কি কি? (S. F. 1967)
(উঃ—পৃঃ ৩১৮—১৯)

৫। মধ্যযুগের ধর্মসংস্কারকদের সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।
(S. F. 1965, Comp.) (উঃ—পৃঃ ৩২০—২৩)

৬। জৈন ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(S. F. 1966) (উঃ—পৃঃ ৩১৬)

৭। (ক) নিচে কতকগুলি ধর্মগ্রন্থের নাম এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান এবং খৃষ্টান ধর্মের বাণী দেওয়া আছে। যে ধর্মের যে গ্রন্থ বা বাণী তাহা বুঝাইবার জন্য বাণীগুলির নিচে প্রয়োজনমতো, "হ", "ব", "জ" এবং "গ" অক্ষর বসাও।

ধর্মগ্রন্থ এবং নীতি

ত্রিপিটক, দেবদেবীর মাধ্যমে ব্রহ্মের উপাসনা, উপনিষৎ, জ্ঞানীদের (জিন) উপর বিশ্বাস, জাতিভেদে অবিশ্বাস, মানুষ কেবলমাত্র নিজের কর্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ করিতে পারে, প্রতিদিন পাঁচবার ঈশ্বরের উপাসনা, একেশ্বরবাদে বিশ্বাস, অপরকে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, দরিদ্রকে ভিক্ষাদান, বাইবেল, যজ্ঞ দ্বারা ভগবৎ উপাসনা, জড়ের মধ্যেও প্রাণ রহিয়াছে।

(খ) নিম্নলিখিত প্রজেক্ট গ্রহণ করা যাইতে পারে—

ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের দুইটি করিয়া প্রধান উপদেশ লিখিবে। ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি প্রাচীর পত্রিকা প্রস্তুত করা হইবে।

আমাদের ভাষা

সুবিশাল আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ। যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন প্রকার জাতির লোক তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের ভাষা লইয়া মিলিত হইয়াছে।

আমাদের ভাষাসমস্যা

কিন্তু প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে এই বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করিয়া কোনো সমস্যা দেখা দেয় নাই। কারণ, বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরা যদিও দৈনন্দিন কাজকর্ম স্থানীয় কথ্যভাষাতেই চালাইয়াছে, রাজকার্য বা সমাজের উচ্চকোটির লোকদের ভাব ও প্রয়োজনের আদান-প্রদান হিন্দু আমলে সংস্কৃত ও মুসলমান যুগে ফারসী ভাষার মাধ্যমেই চলিয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের ধর্মগুরু ও চিন্তানায়কেরা যখন ভারতের বিভিন্নাংশে স্থানীয় প্রান্তিক ভাষার মাধ্যমে তাঁহাদের ধর্মমত প্রচার শুরু করেন, তখন হইতেই এই স্থানীয় ভাষাগুলি পুষ্টিলাভ শুরু করে। স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি রচনার ফলে, ভারতের বিভিন্নস্থানে ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। বিবাহাদিও এক ভাষাভাষীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতে থাকে। যেদিন এই ভাষাগুলির সৃষ্টি হয় সেদিন হয়তো এইসব স্থানীয় ভাষার বিকাশ ও পুষ্টি এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজিকার ভারতবর্ষে এই ভাষার বিভিন্নতা এক সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথক জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছে। ফলে ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরোধ তাহা জাতীয় ঐক্যমূলে ফাটল ধরাইবার প্রয়াস পাইতেছে। আমরা নিজেদের ভারতীয় বলিয়া না ভাবিয়া বাঙ্গালী, অসমীয়া, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাবিতে শিখিতেছি। ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হইয়াছে। তথাপি প্রত্যেক রাজ্যেই অপর ভাষাভাষী লোক রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নাই। সংখ্যাগুরু ভাষাভাষীদের খানিকটা গোঁড়ামি এখনো রহিয়া গিয়াছে। তাই সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের মনে একটা অনিশ্চয়তাবোধ বর্তমান। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটা সর্বভারতীয় মনোভাব গড়িয়া তোলার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। অথচ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে এই সমস্যা আপাত দৃষ্টিতে যতটা জটিল মনে হইতেছে কার্যত ততটা নহে। গ্রিয়ারসন সাহেব ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাসমূহের

পর্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, এদেশে মোট ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষা রহিয়াছে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্ট হইতেও জানা যায়, এদেশে মোট ৮৪৫টি ভাষা রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সংখ্যা ভীতিপ্রদ মনে হইলেও ঐ রিপোর্ট হইতেই জানা যায় যে ইহার মধ্যে ৭২০টি ভাষার প্রত্যেকটিতে মাত্র ১ লক্ষেরও কম লোক কথা বলিয়া থাকে। তাছাড়া, আরও ৬৩টি হইতেছে আধুনিক কোনো বিদেশী ভাষা। এদেশে সেসব ভাষাভাষী লোকসংখ্যা অতি নগণ্য। আমাদের শাসনতন্ত্রে যে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার স্বীকৃতি রহিয়াছে,সেই ভাষাগুলির কোনো-না-কোনোটাতে প্রায় ১০ কোটি লোক, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোকই কথা বলিয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে, ইংরাজীসহ মাত্র ১৫টি শ্রেষ্ঠ ভাষাকেই আধুনিক ভারতবর্ষে স্বীকার করিয়া লওয়াতে কোনো ভুল হয় নাই।

আঞ্চলিক ভাষা

আমাদের শাসনতন্ত্রে যে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহারা হইতেছে অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, উর্দু, কানাড়ী, কাশ্মীরী, মারাঠী, মালয়ালম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু। একটু পর্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, উপরিউক্ত ভাষাগুলির মধ্যেও উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে যেমন একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র বর্তমান আছে, তেমনি দাক্ষণ ভারতীয় ভাষাগুলিও, অর্থাৎ কানাড়ী, মালয়ালম, তামিল, তেলেগুও পরস্পরের সহিত খুবই নিকটভাবে সম্পর্কিত। এই ভাষাগুলির প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো ভারতীয় রাষ্ট্রে প্রধান ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে গণ্য। যেমন বাংলা দেশে বাংলা, মহারাষ্ট্রে মারাঠী, গুজরাটে গুজরাটী, আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে গণ্য। ভারতীয় অধিকাংশ রাষ্ট্রই নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন, অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় সরকারী কাজ-কর্ম চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমাদের শাসনতন্ত্রের ৩৪৩ ধারায় দেবনাগরী হরফে লিখিত হিন্দী ভাষাকে সরকারী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। হিন্দী ছাড়া ইংরেজীকেও শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পর ১৫ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অবশ্য শাসনতন্ত্রের অপর এক ধারায় (৩৪৪ নং) হিন্দীভাষার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য রাষ্ট্র-

প্রধান রাষ্ট্রভাষা এবং হিন্দী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা থাকিবে, কিন্তু ১৯৬৫ সালের পরে হিন্দীই প্রধান রাষ্ট্রভাষা হইবে এবং ইংরেজী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে চালু হইবে। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রপতি যে নির্দেশ জারী করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের পরেও ইংরেজী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা-রূপেই চালু থাকিবে।

আগেই বলা হইয়াছে আমাদের আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্যে উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র বর্তমান। বস্তুত, শুধু এই ১৪টি ভাষাই বা বলি কেন, ভারতবর্ষের মোট ৮৪৫টি ভাষার কথাই যদি ধরা যায়, ঐতিহাসিক ভাষা-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাহাদের মাত্র চারিটি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা চলে। এই চারিটি ভাষাগোষ্ঠী হইতেছে—১। অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী, ২। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, ৩। ভোট-চীন (Tibeto-Chinese) ভাষাগোষ্ঠী এবং ৪। আর্য ভাষাগোষ্ঠী।

ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদের মধ্যে নিগ্রো বা নিগ্রোবটু জাতির (Negro অথবা Negrito) প্রোটো-অষ্ট্রেলয়েড বা প্রাথমিক অস্ত্রালাকার (Proto-Australoid) লোকেদের বংশধররা আজও এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু ইহাদের ভাষা আর জীবিত নাই। পরবর্তী জাতিসমূহের আগমনে ইহাদের ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই আদিম যুগেই ইহাদের পরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে যাত্রা করিয়া মেসোপোটেমিয়া হইয়া অষ্ট্রিক জাতির (Austric) মানুষ এদেশে আগমন করে এবং ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারত ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, পরবর্তীকালে আর্যদের আগমনে তাহাদের অনেকে নদী-উপত্যকা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া মধ্য ও পূর্বভারতের পাহাড় ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। নদী-উপত্যকা অঞ্চলে ইহারা বিজেতা আর্যদের ভাষা গ্রহণ করে, এবং আর্য ভাষাতেও ইহাদের বহু শব্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়। কিন্তু পূর্ব বা মধ্য ভারতের অরণ্য-অঞ্চলে যে সমস্ত অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরা পলাইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা আজও টিকিয়া আছে। বর্তমান ভারতীয় অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলি প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে পড়ে: (১) কোল বা মুণ্ডা শ্রেণী—বিহারের সাঁওতাল

অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী

পতিকে কমিশন নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই কমিশনের মতামত প্রকাশিত হইলে তাহা পার্লামেন্টের ৩০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইবে। তাঁহাদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্কে নির্দেশ জারী করিবেন। এই ধারা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালে নিযুক্ত ভাষা কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯৬৫ সালের

পরেও ইংরেজীর রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। পার্লামেন্টের সদস্যদের লইয়া গঠিত কমিটিও ভাষা কমিশনের এই অভিমত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত যদিও ইংরেজীই আমাদের

পতিকে কমিশন নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই কমিশনের মতামত প্রকাশিত হইলে তাহা পার্লামেন্টের ৩০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইবে। তাঁহাদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্কে নির্দেশ জারী করিবেন। এই ধারা অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে নিযুক্ত ভাষা কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯৬৫ সালের
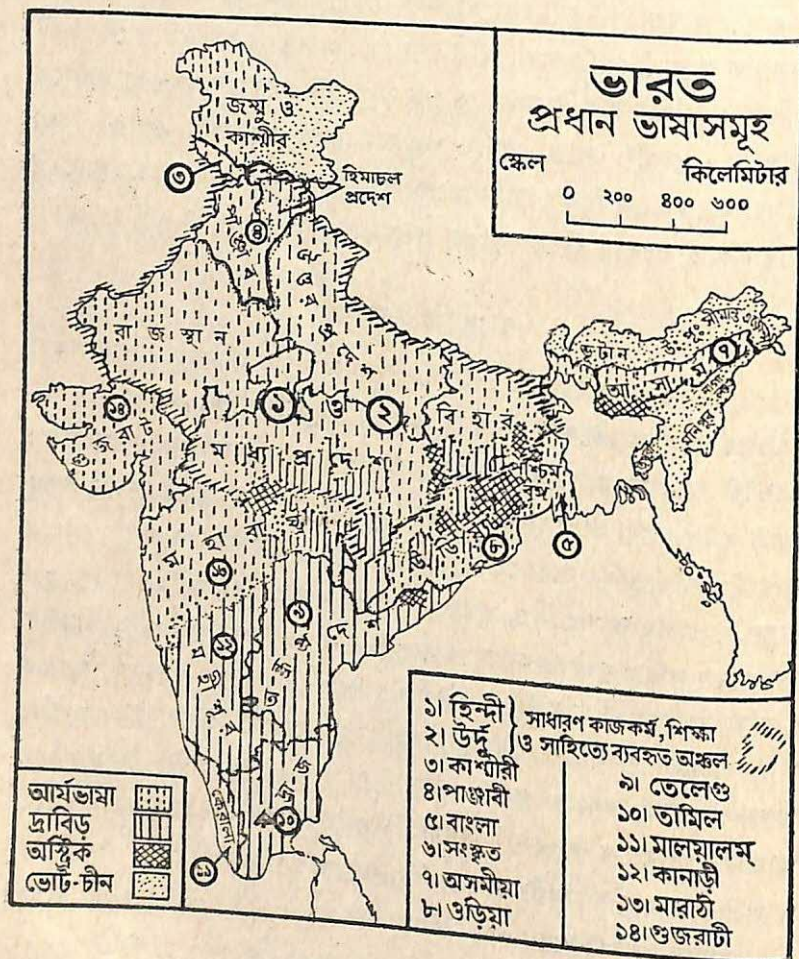
পরেও ইংরেজীর রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। পার্লামেন্টের সদস্যদের লইয়া গঠিত কমিটিও ভাষা কমিশনের এই অভিমত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত যদিও ইংরেজীই আমাদের

পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলের সাঁওতালীদের ভাষা সাঁওতালী, রাঁচী অঞ্চলের মুণ্ডারী ভাষা, হো ভাষা ও গদব ভাষা, উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলের শবর ভাষা, দক্ষিণ রাজস্থান অঞ্চলের কোরকু ভাষা প্রভৃতি এই ভাষাশ্রেণীর অন্তর্গত। (২) খাসি বা খাসিয়া শ্রেণী—আসামের খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলের লোকদের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত। এবং (৩) নিকোবরী শ্রেণী—নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই শ্রেণীর ভাষা প্রচলিত। সাম্প্রতিককালে সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া প্রভৃতি অষ্ট্রিক গোষ্ঠীয় লোকদের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন ইহারা নিজেদের ভাষা ও তন্নিবদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অন্যদিকে ইহাদের বাস্তব প্রয়োজনেই বাংলা, বিহারী, ওড়িয়া বা অসমীয়া—এই প্রতিবেশী ভাষাগুলিরও একটি-না-একটিকে জানিতে ও শিখিতেই হইতেছে। ফলে, তাহাদের নিজস্ব ভাষাও আর বিশুদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না। এমনি করিয়া আজ হইতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে অষ্ট্রিক ভাষার যে আর্যীকরণের পালা শুরু হইয়াছিল তাহা আজিও অব্যাহত চলিয়াছে।

অষ্ট্রিক জাতির পর যাহারা এদেশে আগমন করে এবং যাহাদের ভাষা আজও ভারতে টিকিয়া আছে, তাহারা হইতেছে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের ভূমধ্যসাগরীয় জাতি (Mediterranean) এবং পশ্চিমে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের আর্মেনয়েড জাতি (Armenoid)। ইহারাই সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা গ'ড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহারা ছিল সমভাষিক এবং ইহাদের ভাষাই দ্রাবিড় ভাষা নামে খ্যাত। পরবর্তী আর্যদের সহিত সংঘর্ষে উত্তরাপথে যদিও অষ্ট্রিক ভাষার মতই এই ভাষাও প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু দক্ষিণাপথে আজও এই ভাষা টিকিয়া রহিয়াছে। শুধু টিকিয়া আছেই বা বলি কেন, সেখানে দ্রাবিড় ভাষারই একচ্ছত্র আধিপত্য। বর্তমান দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে তেলেগু বা অন্ধ্র, কানাড়ী বা কর্ণাট, তামিল বা দ্রাবিড় এবং মালয়ালম বা কেরালা প্রধান। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে সুপ্রচলিত এই চারিটি প্রধান দ্রাবিড় ভাষা ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যত্র আরও কয়েকটি দ্রাবিড় ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কেরালার উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত তুলু, কুর্গ অঞ্চলে প্রচলিত কোডগু, নীলগিরি অঞ্চলে প্রচলিত কোতা ও তোদা, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ ও হায়দরাবাদের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত গোঁড় বা গোণ্ড,

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী

উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত কন্ধ বা কুঁই, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের অঞ্চলবিশেষে আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত কুঁড়ুখ বা ওরাওঁ এবং রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে প্রচলিত মাল্‌তো ভাষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সব ভাষায় কোনো সাহিত্য আজিও গড়িয়া ওঠে নাই বলিয়া এই সব ভাষাভাষীদেরও অষ্ট্রিকভাষীদের মতোই হয় উপরোক্ত চারিটি প্রধান দ্রাবিড় ভাষার অথবা হিন্দী বা মারাঠীর মতো কোনো ভাষার একটি না হয় অপরটিকে শিখিতে হইয়া থাকে। বস্তুত, এই কারণেই উপরিউক্ত চারিটি ভাষাই আমাদের শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা পাইয়াছে।

দ্রাবিড়দের পরে ভারতে আসে আর্যভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভাষী ইন্দো-য়ুরোপীয় জাতির (Indo-European) লোকেরা। এদেশে ইহাদের ভাষার আদিমতম রূপ ঋক্ বেদের ভাষা। এই ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan) নামেও খ্যাত। পরবর্তীকালে এই আদি ঋক্‌বেদিক ভাষাই অর্বাচীনতার রূপ লাভ করে। তাহাই লৌকিক এবং আরও পরবর্তীকালে সংস্কৃত নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধদেবের কিছু আগে মৌখিক আর্যভাষা পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পালি ও বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতে ইহার বিভিন্ন স্থানীয় রূপভেদের সূত্রপাত ঘটে। আরও পরে সুলতানী আমলে মধ্যযুগীয় ধর্মগুরুদের জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় ধর্মপ্রচারের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় যদিও এইসব রূপভেদকে ভিত্তি করিয়াই আর্যভাষার আধুনিক রূপগুলির উদ্ভব ঘটে, তবু ইহা মনে রাখিতে হইবে, ইহাদের প্রায় সব ভাষার পক্ষেই সংস্কৃত স্বাভাবিক পরিপোষকের কাজ করিয়া গিয়াছে। আধুনিক আর্যভাষাগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে—(১) দক্ষিণী—মহারাষ্ট্রে প্রচলিত মারাঠী, পশ্চিম উপকূলে প্রচলিত কোঙ্কণী ও বোম্বাই-এর পূর্বাঞ্চলে কিয়দংশে প্রচলিত হল্‌বী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (২) পূর্বী—উড়িষ্যায় প্রচলিত ওড়িয়া, বাংলা দেশে প্রচলিত বাংলা, আসামে প্রচলিত অসমীয়া এবং বিহারের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত মৈথিলী (উত্তরে), মগহী (মধ্য ও দক্ষিণে), ভোজপুরী (পশ্চিমে) প্রভৃতি বিহারী ভাষাসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৩) পূর্ব-মধ্য—উত্তর প্রদেশের ও মধ্য-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রচলিত যথাক্রমে অবধী,

আর্যভাষাগোষ্ঠী

প্রধান রাষ্ট্রভাষা এবং হিন্দী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা থাকিবে, কিন্তু ১৯৬৫ সালের পরে হিন্দীই প্রধান রাষ্ট্রভাষা হইবে এবং ইংরেজী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে চালু হইবে। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রপতি যে নির্দেশ জারী করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের পরেও ইংরেজী দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা-রূপেই চালু থাকিবে।

আগেই বলা হইয়াছে আমাদের আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্যে উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র বর্তমান। বস্তুত, শুধু এই ১৪টি ভাষাই বা বলি কেন, ভারতবর্ষের মোট ৮৪৫টি ভাষার কথাই যদি ধরা যায়, ঐতিহাসিক ভাষা-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাহাদের মাত্র চারিটি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা চলে। এই চারিটি ভাষাগোষ্ঠী হইতেছে—১। অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী, ২। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, ৩। ভোট-চীন (Tibeto-Chinese) ভাষাগোষ্ঠী এবং ৪। আর্য ভাষাগোষ্ঠী।

ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদের মধ্যে নিগ্রো বা নিগ্রোবটু জাতির (Negro অথবা Negrito) প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড বা প্রাথমিক অস্ত্রালাকার (Proto-Australoid) লোকেদের বংশধররা আজও এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু ইহাদের ভাষা আর জীবিত নাই। পরবর্তী জাতিসমূহের আগমনে ইহাদের ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই আদিম যুগেই ইহাদের পরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে যাত্রা করিয়া মেসোপোটেমিয়া হইয়া অষ্ট্রিক জাতির (Austric) মানুষ এদেশে আগমন করে এবং ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারত ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, পরবর্তীকালে আর্যদের আগমনে তাহাদের অনেকে নদী-উপত্যকা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া মধ্য ও পূর্বভারতের পাহাড় ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। নদী-উপত্যকা অঞ্চলে ইহারা বিজেতা আর্যদের ভাষা গ্রহণ করে, এবং আর্য ভাষাতেও ইহাদের বহু শব্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়। কিন্তু পূর্ব বা মধ্য ভারতের অরণ্য-অঞ্চলে যে সমস্ত অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরা পলাইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা আজও টিকিয়া আছে। বর্তমান ভারতীয় অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলি প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে পড়েঃ (১) কোল বা মুণ্ডা শ্রেণী—বিহারের সাঁওতাল

অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী

বাঘেলী ও ছত্রিশগড়ী এই তিনটি উপভাষা সমেত কোসলী বা পূর্বী হিন্দী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৪) মধ্য-দেশীয়—উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত জানপদ হিন্দুস্থানী খড়ীবোলী (সাধু হিন্দী ও উর্দু ইহার দুইটি রূপমাত্র; বস্তুত ইহারা দুইটি বিভিন্ন লিপির দ্বারাও হয়; সংস্কৃত নয়, বিদেশী শব্দ দ্বারা সমৃদ্ধ এই ভাষার দুইটি বিভিন্ন আকার), বাংগ্রূ, ব্রজভাষা, কনৌজী ও বুন্দেলী প্রভৃতি উপভাষা সমেত পশ্চিমা হিন্দী ভাষা; পূর্ব পাঞ্জাবের ডোগরী সমেত পূর্ব পাঞ্জাবী ভাষা; এবং গুজরাট ও রাজস্থানের মারবাড়ী, জয়পুরী, হাড়ৌতি, মেবাতী, অহীরবাটী, মালবী, তামিল দেশের সৌরাষ্ট্রী, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের গুজরী প্রভৃতি উপভাষা সমেত রাজস্থানী-গুজরাটী ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৫) উত্তরী বা পাহাড়ী—হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল ও সংলগ্ন অঞ্চলের পূর্বী পাহাড়ী, তাহার পশ্চিমে কুমায়ুন অঞ্চলে কুমাউনী, গঢ়বালী প্রভৃতি মধ্য পাহাড়ী ও আরও পশ্চিমে ভদ্রবাহী, পাডরী, চমেআলী, কুলুঈ, কিউঠালী, সিরমৌড়ী প্রভৃতি পশ্চিমী পাহাড়ী উপভাষা-সমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৬) দরদ—কাশ্মীরী ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এত ভাষা ও উপভাষার মধ্যে প্রধানত অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, উর্দু, কাশ্মীরী, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী ও সংস্কৃত—এই কয়টি ভাষাই মুখ্য। এগুলির সামনে অন্য ভাষা বা ভাষাগুলির বিশেষ কোনো মূল্য নাই, কারণ কেবল এই ভাষাগুলিতেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ বিকাশ সাধিত হইয়াছে। প্রধানত এই কারণেই পূর্বোক্ত চারিটি দ্রাবিড় ভাষা ছাড়া উপরোক্ত ভাষা কয়টিও আমাদের শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আবার উত্তর ভারতের এইসব আর্যগোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের মধ্যে হিন্দী একটি সহজ সূত্র হিসাবে বিদ্যমান থাকাতেই এই সব ভাষাভাষী লোকেদের পরস্পরের মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান ততটা অনুভূত হয় না। প্রায় বিনা আয়াসলব্ধ স্বল্প হিন্দীর জ্ঞান লইয়াই সমগ্র আর্যভাষাভাষী অঞ্চলে সাধারণভাবে ভাবের আদানপ্রদান সম্ভবপর। এই কারণেই রাষ্ট্রভাষা স্থিরীকরণের সময় হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

আর্যদের পরবর্তীকালে এদেশে আসে চীনদেশ হইতে আগত মোঙ্গল জাতীয় লোকেরা। ইহাদের ভোট নামক উপজাতীয় শাখা হিমালয়ের

পাদদেশে, তিব্বতে ও পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের ভাষা ভোট-চীন ভাষা (Sino-Tibetan বা Tibeto-Chinese) নামে খ্যাত। এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের বেশীর ভাগই পরবর্তী-কালে ক্রমশই কোনো-না-কোনো পূর্ব অঞ্চলীয় ভাষা গ্রহণ করিয়াছে, যদিও গারো পাহাড় অঞ্চলের গারো, মণিপুর অঞ্চলের মণিপুরী বা মেইতেই, লুসাই পাহাড় অঞ্চলের লুশেই এবং নাগা অঞ্চলের নাগা ভাষাভাষী আজিও তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠী

আমাদের দেশের এত বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা, এবং শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা ও দুইটি রাষ্ট্রভাষা। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আমাদের 'শিক্ষার বাহন' বা মাধ্যম হইবে কোন ভাষা? প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ হইতেই রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বারংবার বলিয়া আসিয়াছেন। বস্তুত, ইহাই স্বাভাবিক। কারণ, আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে কোনো কিছু আমরা যত সহজে বুঝিতে পারিব, অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে তাহা সম্ভবপর নহে। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশে এই নীতিই গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃ-ভাষাকেই বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাদানের মাধ্যম করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও মাতৃভাষার বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের আয়োজন চলিয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ণ রূপায়নে একটি বড়ো বাধা হইতেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিদেশী ভাষায় যত গ্রন্থ রহিয়াছে আমাদের বিভিন্ন ভাষায় সেগুলির সামগ্রিক অনুবাদ এখনও সম্ভবপর হয় নাই। তাছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আঞ্চলিক ভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হয় তাহা হইলে এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক বা ছাত্রদের স্বাভাবিক গতায়াত বন্ধ হইয়া যাইবে। আঞ্চলিক শিক্ষক বা ছাত্রদের ঐ বিশেষ অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়েই পঠন-পাঠন করিতে হইবে। অথচ জাতীয় সংহতির স্বার্থে, জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজনে শিক্ষক ও ছাত্রদের নিজেদের অঞ্চলের বাহিরে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গতায়াত অত্যাবশ্যক। এইসব

শিক্ষার মাধ্যম

কারণেই কুঞ্জরু কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ত্বরান্বিত না করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। জাতীয় সংহতির পন্থা নির্ণয়ের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য দান কমিশন (University Grants Commission) কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২।৩ বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করাকে ত্বরান্বিত করার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য দান কমিশন, আঞ্চলিক ভাষায় বিদেশী বইগুলিকে অনুবাদ করার জন্য প্রত্যেক রাজ্যকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

অনুশীলন

(আমাদের ভাষা)

১। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর ও অঞ্চলের বিবরণ দাও। (S. F. 1967, 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ৩৩১-৩৫)

২। কোন কোন অঞ্চলে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি প্রচলিত আছে ?
হিন্দী, কানাড়ী, মারাঠী, তেলেগু। (S. F. 1965, Comp.)
(উঃ—পৃঃ ৩৩২—৩৪)

৩। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির যে কোন ৬টির নাম কর এবং কোন কোন রাজ্যে ঐগুলি প্রচলিত আছে তাহা বল।
(S. F. 1965) (পৃঃ—উঃ ৩৩২-৩৪)

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন দুইটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :
(ক) রাষ্ট্র ভাষা (খ) শিক্ষার মাধ্যম (গ) আঞ্চলিক ভাষা।
(S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ৩২৯-৩১, ৩৩৫-৩৬)

৫। ভারতের রাষ্ট্রভাষা নিয়া যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ। (উঃ—পৃঃ ৩২৮-২৯)

৬। ভারতে শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে একটি রচনা লিখ।

(ক) বাম দিকে কতকগুলি স্থানের নাম এবং ডান দিকে কতকগুলি ভাষার নাম দেওয়া আছে। ভাষাগুলির মধ্যে যেগুলিকে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিচে দাগ দাও। তারপর যে স্থানে যে ভাষা প্রচলিত তাহার ইঙ্গিত স্বরূপ, স্থানের বাম দিকে যে সংখ্যা আছে তাহা ভাষার ডান দিকের ব্র্যাকেটের মধ্যে বসাও। অবশেষে যে ভাষা যে জাতিগোষ্ঠী হইতে প্রচলিত তাহা ইঙ্গিত স্বরূপ ভাষাগুলির নিচে, প্রয়োজনানুসারে, আর্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক ও ভোট-চীন শব্দ বসাও।

স্থানের নাম	ভাষার নাম
১। সাঁওতাল পরগণা। ২। অন্ধ্র	মুন্ড্রি ( ) তেলেগু ( )
৩। খাসিয়া পাহাড় ৪। কুর্গ	সাঁওতালী ( ) তামিল ( )
৫। রাঁচি ৬। উড়িষ্যার দক্ষিণাংশ	নিকোবরী ( ) কোডগু ( )
৭। মাদ্রাজ। ৮। নিকোবর	কানাড়ী ( ) কোঙ্কণী ( )
দ্বীপপুঞ্জ। ৯। মহীশূর ১০। পশ্চিম	মৈথিলী ( ) খাসি ( )
উপকূল। ১১। বিহারের বিভিন্ন অংশ	শবর ( )

(খ) স্ক্র্যাপ বই এর জন্য

১। দেবনাগরী অক্ষরে যে সব ভাষা লেখা হয় তাহাদের নাম সংগ্রহ কর।

২। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ছবি সংগ্রহ কর এবং সেগুলির নিচে যে যে ভাষায় তাহারা কথা বলে তাহাদের নাম লেখ।
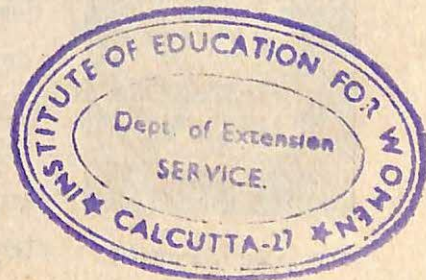
আমাদের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

শিল্পকলায় ও ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে জাতির সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত যে এইসব ক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতেই উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের চারুশিল্পের (ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা) ইতিহাস পর্যালোচনায় দুইটি ধারা আদিম কাল হইতে দেখিতে পাই। একটি কালধর্মী শিল্পধারা। সম্রাট এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের প্রসাদে উহা পুষ্ট হইয়াছিল। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন রাজবংশের আমলে, এই ধারা বার বার রূপ বদলাইয়াছে। ফলে, বিভিন্ন শিল্পশৈলীর উদ্ভব হইয়াছে। অপরটি হইতেছে, লোকায়ত শিল্পধারা। লোকমানসের সার্থক প্রতিফলন হিসাবে ইহা যুগ যুগ ধরিয়া টিকিয়া রহিয়াছে। আমাদের বিভিন্ন আল্পনায়, বাঁশ ও বেতের কাজে, কাঁথার উপরের বিচিত্র নক্সায়, পটচিত্রে, কাঁচা বা পোড়ামাটির অথবা শোলা বা কাঠের মূর্তিতে, পুতুলে ও খেলনায় ইহার প্রকাশ। ইহাতে শিল্পশৈলীর বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু আছে প্রাণের স্পর্শ। ইহাকে আমরা লোকশিল্প (Folk Art) বলিয়া থাকি।

কালধর্মী শিল্প ও শিল্পকলা

আমাদের দেশের আদিম শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার ধ্বংসাবশেষসমূহে। সেখানে পোড়ামাটির অসংখ্য মাতৃমূর্তি, খেলনা, খোদিত চিত্রসহ অসংখ্য শিলমোহরাদি, সুদৃশ্য অলঙ্করণযুক্ত মৃৎপাত্র এবং পশু, পাখী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদির চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহারাই আমাদের দেশের লোকশিল্পের আদিমতম নিদর্শন। মাতৃকামূর্তিগুলি হাতে টিপিয়া তৈরী। ইহাদের চক্ষু ও বক্ষঃস্থল আলাদা মৃত্তিকাপিণ্ড জুড়িয়া গঠিত। এইরূপ মূর্তি-নির্মাণ প্রথা আজও ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। উন্নততর কালধর্মী শিল্পের পরিচয়ও সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় পাওয়া যায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত পাথরের মস্তকহীন স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তি দুইটি, অষ্টধাতুর নৃত্যরতা

সিন্ধুসভ্যতার শিল্পকলা

মৃৎশিল্প (মহেঞ্জোদরো)

নগ্নমূর্তি এবং মহেঞ্জোদরোয় প্রাপ্ত শ্মশ্রুযুক্ত পাথরের মূর্তি কালধর্মী শিল্পের নিদর্শন। ইহাদের গঠনকুশলতা উন্নত শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দেয়। এইগুলি বহু পরবর্তীকালের গ্রীকভাস্কর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কাদামাটির তৈরী মূর্তি

সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার ধ্বংসের পর প্রায় দীর্ঘ দেড় হাজার বৎসরের ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। ইহার কারণ

মৃৎশিল্প (মহেঞ্জোদরো)

বোধ হয়, ঐ সময়কার ভাস্কর্যের নিদর্শনাদি কাঠ বা মাটি প্রভৃতি অস্থায়ী উপকরণে নির্মিত হওয়ায় সহজেই কালের কবলে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তেমনি এই সময়কার চিত্রশিল্পেরও কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি অঙ্কন ও দর্শনের নিষেধাজ্ঞা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িককালে এদেশে চিত্র-শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল।

মহেঞ্জোদরোয় প্রাপ্ত শীলমোহর
(ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ)

মৌর্যযুগে ভাস্কর্যশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এই সময়কার বা কিঞ্চিৎ পূর্বেকার যে এগারোটি যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বা অশোক-স্থাপিত বিভিন্ন স্তম্ভশীর্ষে যেসব পশুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের আকার ও আয়তন হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই যুগে বৃহদাকার মূর্তিনির্মাণের এক বিশেষ ঝোঁক ছিল। ইহাদের রূপায়ণে যে শিল্পশৈলীর প্রকাশ, তাহার মধ্যে দুইটি ধারা সহজেই চোখে পড়ে। সারনাথ সিংহ বা দিদারগঞ্জ যক্ষিণী প্রভৃতি তাহাদের গঠননৈপুণ্যে, বাস্তবানুগ সজীবতায় সরস ও সুকুমার সত্তায় সমৃদ্ধ। কিন্তু বেশনগরের নারী-মূর্তি বা পাটনার যক্ষমূর্তিদ্বয় প্রভৃতি আকারে যদিও বিরাটকায়, সজীবতা ও গতিচাঞ্চল্যের অভাবে তাহারা নিছকই স্থূল ও নিষ্প্রাণ। এইসব মূর্তির প্রায় সবগুলিতেই যে সুচিক্কণ পালিশ ও মসৃণতা দেখা যায় তাহা মৌর্যশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেহ কেহ মৌর্য-শিল্পকলায় পারসীক বা গ্রীক প্রভাবের কথা বলিয়া থাকিলেও একথা অনস্বীকার্য যে, মূলত মৌর্যশিল্পকলা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতারই উত্তর-সাধক। মৌর্যযুগের এইসব মূর্তির সহিত হরপ্পার মূর্তিগুলির তুলনা করিলে এই সত্য স্পষ্টই প্রকট হইয়া ওঠে।

মৌর্যযুগের শিল্পকলা

চমর ব্যজনকারিণী (দিদারগঞ্জ)

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর মৃৎপাত্রগুলির গায়ে অঙ্কিত চিত্রাদির কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষের চিত্রকলার প্রথম সার্থক নিদর্শনও মেলে এই যুগে। মধ্য প্রদেশের রামগড় পর্বতে যোগীমারা নামে যে গুহাটি রহিয়াছে, তাহার ছাদের

নিচে একই বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে ভাগে ভাগে কতকগুলি ছবি আঁকা রহিয়াছে। এই সব ভাগের বা প্যানেলের মধ্যে মাত্র চারিটির ছবি স্পষ্ট বোঝা যায়, অন্যগুলি অস্পষ্ট। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সব ছবিই শাদা জমির উপর লাল অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালো রং দিয়া অঙ্কিত। সীমারেখায় কোনো কোনো সময় হলুদও ব্যবহৃত হইয়াছে। এইসব ছবি, কি মানুষের, কি জীবজন্তুর, বা কি লতা-পাতা-ফুল প্রভৃতির, রেখার বলিষ্ঠতার জন্য বিখ্যাত।

মৌর্য চিত্রশিল্প

মৌর্যোত্তর যুগে ভরহুত, সাঁচী, বোধগয়া, অমরাবতী প্রভৃতি জায়গায় এই আদি মৌর্যচিত্রশিল্পের এক বিবর্তন চলে। পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম ভারতে গন্ধার অঞ্চলে চলে শিল্পশৈলীর আরেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বর্তমান আফগানিস্থানের অনেকখানি নিয়া প্রাচীন গন্ধার প্রদেশ গঠিত ছিল। উহার রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। গ্রীক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী রাজারা বেশ কিছুদিন এই অঞ্চল শাসন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যপথের উপর পড়ে বলিয়া বহু বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব এই অঞ্চলের উপরে পড়িয়াছিল। ফলে গন্ধার অঞ্চলের শিল্পিগণ ভারতীয় বিষয়বস্তু বা ভাবধারাকে বৈদেশিক রীতিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছেন। এই মিশ্র শিল্পশৈলী গন্ধার শিল্প নামে খ্যাত। গ্রীক ও পারসীক শিল্পশৈলীর প্রভাবই ইহার উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে। গন্ধার-

শিল্পকলা
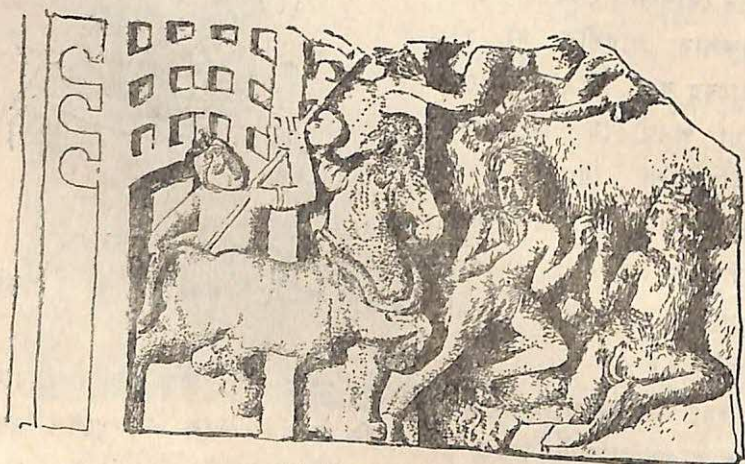
মহাপ্রস্থান (অমরাবতী)

শিল্প পূর্ণ পরিণতি লাভ করে প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে; কুষাণ সম্রাটগণ, বিশেষ করিয়া কণিষ্ক গন্ধার শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মে মহাযান মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গন্ধার শিল্প-রীতি প্রকাশের এক বিশেষ সুযোগ আসে। গন্ধার শিল্প-রীতিতে
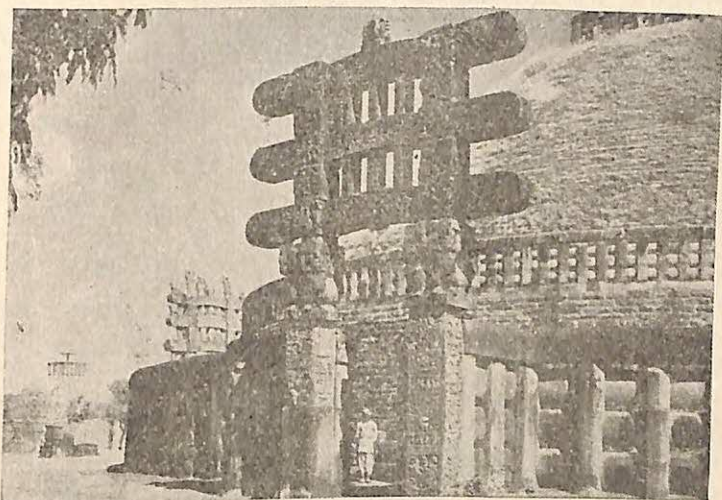
স্তূপ (সাঁচী)

পাথরের বুকে শিল্পীরা যে অজস্র জাতক-কাহিনীকেই শুধু রূপায়িত করেন তাহাই নহে, তাঁহারা অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিও নির্মাণ করেন। এই সব মূর্তির বসনভূষণ, উত্তরীয়ের পরিপাটি ও নিখুঁত ভাঁজ, মাথার কুঞ্চিত কেশ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহগঠন, অলঙ্কৃত মস্তকাভরণ ও উষ্ণীষ বা পায়ে গ্রীসীয় চপ্পল এই যুগের শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ বা হিন্দু দেবদেবীদের মাথার পিছনে যে প্রভামণ্ডল দেখা যায়, এই জায়গায় বৌদ্ধমূর্তিগুলিতেই তাহার প্রথম প্রকাশ।

ষাঁড় (রামপুর)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, পূর্বে সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে স্তূপ গাত্রে জাতকের যে সব কাহিনী উৎকীর্ণ পাওয়া

গন্ধার বুদ্ধ

গিয়াছে তাহাতে বুদ্ধমূর্তি নাই। কিন্তু গন্ধারের শিল্পীরা বুদ্ধমূর্তিকে কেন্দ্র-স্থলে স্থাপন করিয়া জাতকের কাহিনীকে রূপদান করিয়াছেন। অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি তাঁহারা উৎকীর্ণ করিয়াছেন, ছোট ছোট মূর্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৫০ উঁচু বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সবগুলি যে পাথরের তৈরী তাহাও নহে; যেখানে পাথর পাওয়া যায় নাই সেখানে চুনের উপাদান ব্যবহার করা হইয়াছে এবং মাথা মুখ ছাঁচে ঢালাই করিয়া, দেহের অংশ প্লাষ্টার করা হইয়াছে।

তক্ষশিলা, পেশওয়ার, কমিয়ান, জালালাবাদ, হাদ্দা প্রভৃতি স্থানে গন্ধার শিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

গুপ্ত শিল্পকলা

ভারতীয় শিল্পকলা চরম পরিণতি লাভ করে গুপ্তযুগে। গুপ্ত শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল সারনাথ। ইহা ছাড়া, মথুরা, সুলতানগঞ্জ, অজন্তা প্রভৃতি বহু স্থানে গুপ্ত শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত শিল্পকলার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। কিন্তু গুপ্তযুগের শিল্পীরা তাঁহাদের রচনায় বুদ্ধমূর্তিকেও অবহেলা করেন নাই। গুপ্তযুগের মূর্তিগুলিতে মানবিক দৈহিক শক্তির দ্যোতনা তত না থাকিলেও, ইহাদের মানবিক রূপ ও দেহভঙ্গি ধ্যানযোগ ও স্বচ্ছ মনন কল্পনার সংযোগে এক অতি সূক্ষ্ম সংবেদনময় অপরূপ অধ্যাত্মভাব ও কল্পনার দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছিল। মসৃণ, মার্জিত, রমণীয় ডৌল, সুকুমার অঙ্গবিন্যাস ও সৌষ্ঠব রেখাপ্রবাহের ধীরসংযত গতি ছাড়াও এক গভীর ধ্যানলব্ধ আনন্দের, চরম জ্ঞান ও উপলব্ধির, পরম পরিতৃপ্তির সহজ, সংযত, মার্জিত প্রকাশে সমৃদ্ধ সারনাথ বুদ্ধ ভারতীয় ভাস্কর্যের এক অমূল্য সম্পদ।

অজন্তার চিত্রকলা

অজন্তার গুহাগাত্রের চিত্রাবলী পৃথিবীর শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অজন্তার গুহাগুলি অন্ধ্ররাজ্যের হায়দ্রাবাদের নিকটে অবস্থিত। এই গুহাগুলির ভাস্কর্য অপেক্ষা দেয়াল চিত্র বা ফ্রেস্কো পেন্টিং (Fresco-painting) ই বেশী উল্লেখযোগ্য। ফ্রেস্কো পেন্টিং তুলি দিয়া কাগজের উপর আঁকা ছবি নহে। উহা দেওয়ালের উপর আঁকা ছবি। অজন্তার ক্ষেত্রে, মাটি, গোবর ও পাথর গুঁড়া মিশাইয়া এক ধরনের আঠালো বস্তু (পেষ্ট) তৈরী করা হইত। উহার দ্বারা দেওয়াল মসৃণ করিয়া তাহার উপরে ছবি আঁকা হইত।

প্রায় ৫০০-৬০০ বৎসর ধরিয়া এই গুহাগুলিতে ফ্রেস্কো ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে উহাদের অঙ্কন আরম্ভ হয়, কিন্তু এই চিত্রকলার পূর্ণ বিকাশ ঘটে গুপ্ত আমলে। প্রায় ২৯টি গুহায় অজন্তার ফ্রেস্কো ছবিগুলি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সব চিত্রের বিষয়বস্তু সাধারণত জাতক কাহিনী ও বুদ্ধজীবনী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত। কিন্তু সমসাময়িক জীবনের রূপায়ণ, পশুপাখী-লতাপাতা বা আলঙ্কারিক আলপনা এবং নক্সাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলিষ্ঠ ও সুললিত রেখাবিন্যাসে, চিত্রের বিষয়বস্তুর পারস্পরিক ভারসাম্যে (ইংরাজীতে যাকে বলে com-

মথুরা বুদ্ধ

position) সম্বন্ধে ও গভীরতায়, বলিষ্ঠ গতিভঙ্গিতে, বর্ণনৈপুণ্যে ও সুললিত ছন্দে এই সকল চিত্র সমৃদ্ধ। অজন্তার মুমূর্ষু রাজকুমারী, বোধিসত্ত্ব, পদ্মপাণি, যশোধরা ও রাহুল প্রভৃতি চিত্র ভাবদ্যোতনায় শুধু ভারতীয় শিল্পকলারই নহে, পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক অনবদ্য সৃষ্টি। অজন্তার চিত্রকরগণ সাদা, লাল, মেটে, সবুজ প্রভৃতি রং ব্যবহার করিতেন। যে কারণেই হউক, হলুদ রংএর ব্যবহার অজন্তার চিত্রাবলীতে বেশী দেখা যায় না। অধিকাংশ রংই স্থানীয় প্রাকৃতিক উপাদান হইতে প্রস্তুত হইত; যেমন লোহার নানা রকম মিশ্রণ হইতে তৈরী হইত লাল রং।

অজন্তার গুহাগুলিতে নানা রং-এর ভাস্কর্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভাস্কর্য অপেক্ষা অজন্তার চিত্রকলার খ্যাতিই বেশী।

ইলোরার শিল্পকলা

ইলোরার গুহাগুলিও হায়দরাবাদের নিকট অবস্থিত। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ হইতে অষ্টম-নবম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলোরার গুহাগাত্রে নানা ভাস্কর্যের সৃষ্টি চলিয়াছিল। ইলোরার গুহা গাত্রের মূর্তিগুলি বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দু ভাবাদর্শ অবলম্বনে সৃষ্ট। বৌদ্ধ ও জৈন গুহাগুলিতে বুদ্ধ এবং জৈন মূর্তি খোদাই করা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি গুহাতে হিন্দু দেবদেবীর চমৎকার মূর্তি খোদাই করা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মহাদেবের ভৈরব মূর্তি, তাণ্ডব মূর্তি, কালী মূর্তি, বিষ্ণু মূর্তি ইত্যাদি প্রধান। রাষ্ট্রকূট সম্রাট প্রথম কৃষ্ণের রাজত্বকালে (অষ্টম খৃষ্টাব্দে) হিন্দু গুহাগুলির মূর্তি খোদিত হইয়াছিল।

মহাবলীপুরম্

দক্ষিণ ভারতের শিল্পকীর্তির প্রমাণ আমরা মহাবলীপুরমে দেখিতে পাই। এই নগর পল্লব রাজাদের শিল্প-কীর্তির প্রমাণ বহন করিতেছে। মহাবলীপুরমের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য উভয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ হইতে ৩৫ মাইল দূরে এই শহর অবস্থিত।

পল্লব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাবলীপুরমে নূতন ধরনের মন্দির নির্মাণের রীতি প্রবর্তিত হয়। মহাবলীপুরমে যে ধরনের মন্দির নির্মাণ

করা হয়, তাহাকে বলে "রথ"। একখণ্ড সমগ্র পাথর কাটিয়া রথ নির্মিত হয়। সাতটি "রথ" ধরনের মন্দির আজিও মহাবলীপুরমে দেখা যায়। দ্রৌপদী, গণেশ, অর্জুন, ধর্মরাজ, ভীম ও বাসুদেব নামে মহাবলীপুরমে যে চারিটি রথ নির্মিত হইয়াছিল ভারতবর্ষের স্থাপত্য ইতিহাসে তাহা

বানর-পরিবার (মহাবলীপুরম্)

অমূল্য সম্পদ। এই মন্দিরগুলির শিখর বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট। যেমন, দ্রৌপদী মন্দিরের চূড়া বাংলাদেশের কুঁড়েঘরের মতো; ভীম ও গণেশ মন্দিরের চূড়া বেশকৃতি আর ধর্মরাজ মন্দিরের চূড়া, ত্রিতল বৌদ্ধ বিহারের মত। মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলির গায়ের ভাস্কর্যও অনবদ্য। এই প্রসঙ্গে বানর-পরিবার, যমুনাদেবী, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি ভাস্কর্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

দাক্ষিণাত্যে যখন শিল্পশৈলীর এই বিবর্তন চলিয়াছে পূর্বাঞ্চলেও তখন শিল্পশৈলীর আঞ্চলিক রূপান্তর শুরু হইয়া গিয়াছিল। গুপ্তযুগ হইতে

ভারতের মূর্তিসমূহে যে আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশের প্রয়াস লক্ষণীয়, পাল ও সেনযুগের বিহার ও বাংলাদেশের শিল্পকলায় তাহারই এক অভিনব বিবর্তন চোখে পড়ে। এই যুগের মূর্তিগুলিতে আধ্যাত্মিক নৈর্ব্যক্তিকতা, দৈহিক সৌকুমার্য ও সৌন্দর্য একই সঙ্গে সমভাবে স্থান পাইয়াছে। মানবদেহের যে বিশেষ ধর্ম,

বাংলাদেশে পাল ও সেন-শিল্প

যমুনা দেবী (ইলোরা)

তাহার অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার যাহা ব্যঞ্জনা, তাহার সুষ্ঠু ও সুমিত প্রকাশই দেখা যায় এই যুগের বিষ্ণু, শিব, সূর্য, বুদ্ধ বা শক্তি মূর্তিগুলির স্মিতহাস্যে বিকশিত মুখমণ্ডলে,. বিশিষ্ট অঙ্গভঙ্গিতে। এই সকল মূর্তির বেশীর ভাগই কালো কষ্টিপাথরের। তবে, পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে পোড়ামাটির মূর্তিও প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। তাছাড়া, বিহারের নালন্দার ধাতুনির্মিত মূর্তিগুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধাতুনির্মিত মূর্তি নটরাজ

এইসময়কার বিভিন্ন বৌদ্ধ পুঁথির বুকে যে সমস্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাই এই যুগের চিত্রশিল্পের একমাত্র নিদর্শন। ইহাদের উপর অজন্তার প্রভাবও সুস্পষ্ট।

উড়িষ্যা

সমসাময়িক উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোণার্কের মন্দিরগুলির গায়ে যেসব নাগনাগিনী, দেবদেবী, পশুপাখী, লতাপাতা ও ফলফুলের মূর্তি ও চিত্র খোদিত হইয়াছিল, তাহাদের সরস সাবলীল ছন্দগতি ও নিখুঁত কারুকার্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করিয়া এই সব মন্দিরগাত্রে রূপায়িত স্ত্রীমূর্তিগুলি তাহাদের লাস্যময়

পেলব দেহভঙ্গিমার লাবণ্যে চিরভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। উড়িষ্যা ছাড়া মধ্য প্রদেশের খাজুরাহের হিন্দু ও জৈন মন্দিরগুলিতে যে অসংখ্য ফুল লতাপাতা, দেবদেবী ও মনুষ্যমূর্তি খোদিত পাওয়া গিয়াছে, বা গুজরাটে আবুপাহাড়ের জৈন মন্দিরে যে অপূর্ব কারুকার্যময় অলঙ্করণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাও ভারতীয় শিল্পের চরম সূক্ষ্মকার্যের নিদর্শন।

খাজুরাহ

বাংলাদেশের অনুরূপ গুজরাটের জৈন ধর্ম পুঁথিগুলিতেও প্রচুর চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশেই জৈন কল্পলতা ও মহাবীরের জীবনচিত্র রূপায়িত। এইসব চিত্রের রেখাপ্রাধান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুজরাট
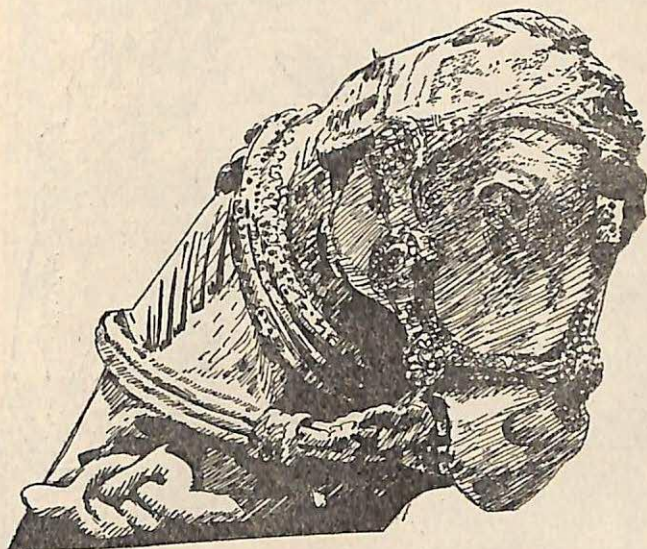
অশ্বমূর্তি (কোণার্ক)

ত্রয়োদশ হইতে শুরু করিয়া পঞ্চদশ শতকের মধ্যে খোদিত বা চিত্রিত উল্লেখযোগ্য কোনো ভারতীয় ভাস্কর্য বা চিত্রকলার নমুনা প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীকালে মোগলযুগে যদিও ভাস্কর্যের নমুনা খুব কম পাওয়া গেলেও, এই যুগে কিন্তু চিত্রকলার আরেকটি বিশেষ ধারা গড়িয়া ওঠে। তবে, ফতেপুর সিক্রী বা লাহোরের দেওয়ালে আঁকা কতিপয় বৃহদাকার ছবি ছাড়া (ইহারাও ক্ষুদ্রাকার ছবিরই বৃহদাকার সংস্করণ) এই যুগের আর সব চিত্র-নিদর্শনই ছোটো

মোগলযুগের চিত্রকলা

আকারের (ইংরেজাতে যাহাকে বলা হয় miniature painting)। এই সব ক্ষুদ্রাকার ছবির প্রায় সবই তুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজে ভরা। মোগল যুগের চিত্রকলার প্রথম দিকে যদিও তাহার উপর পারসীক প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু শীঘ্রই এই বিদেশী শিল্পশৈলী ভারতীয় ধারার সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। এই সব ছবিতে নীল, সোণালী প্রভৃতি বর্ণের বিন্যাসে অপূর্ব ঐক্য ও ঐশ্বর্য রহিয়াছে। মুখ্য ছবির আশেপাশে ছবির জমি ছোটো ছোটো গৌণ ছবি দ্বারা ভরাট করা হইয়াছে। স্তর হইতে স্তরে ছবি

লিপিলিখনরতা (খাজুরাহ)

বিস্তার পাইয়াছে, এবং ইহার ফলে ছবিতে পশ্চাদ্‌পট প্রায় নাই বলিলেই চলে। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের সবগুলিই ভারতীয় রীতি। একটি বিদেশী রীতি যে এত সহজে ভারতীয় রীতির সহিত মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল

তাহার মূলে ছিল আকবর, জাহাঙ্গীর প্রমুখ সম্রাটদের শিল্পপ্রীতি, হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতের শিল্পীদের প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতা। মোগল যুগের চিত্রকলার যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কতকগুলি হইতেছে বিভিন্ন সম্রাটদের আত্মজীবনী বা অন্যান্য লেখকদের রচনার অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে অঙ্কিত পুঁথিচিত্র। কিন্তু ইহা ছাড়াও বিভিন্ন রাজরাজড়া বা ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীদের অঙ্কিত অজস্র সংখ্যক আলাদা আলাদা নানা বিষয়বস্তুর ছবিও পাওয়া গিয়াছে। এইসব চিত্র আখ্যানধর্মী
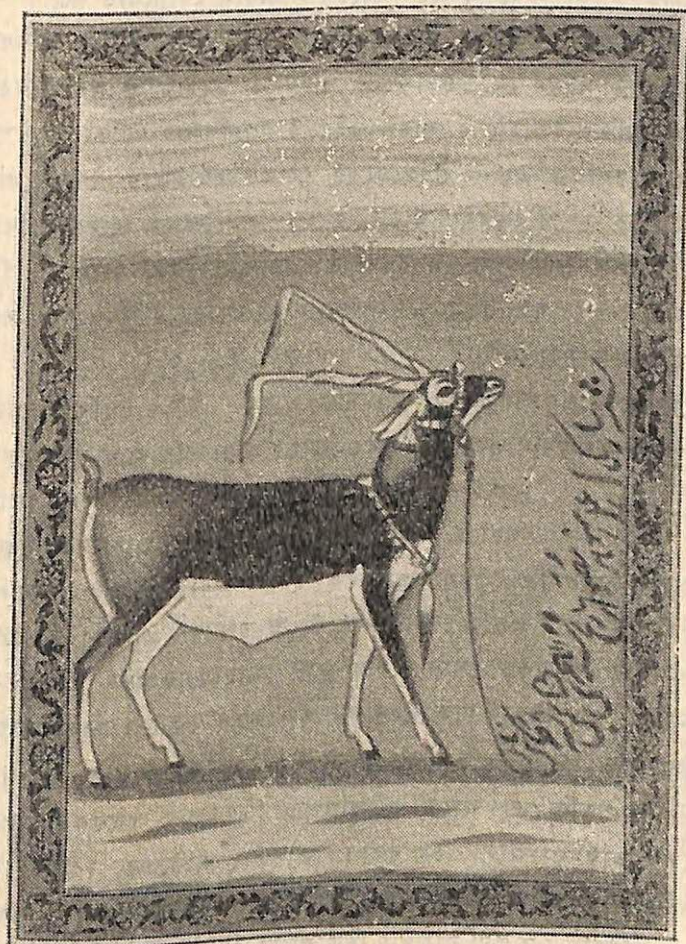
মৃগ (এ্যাণ্টিলোপ) [মোগল চিত্রকলা, ষোড়শ শতাব্দী]

না হওয়ার ফলে তাহাদের বিশুদ্ধ চিত্রধর্মী হওয়ার কোনো বাধা ছিল না। ইহাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জন্তুজানোয়ারের প্রতিকৃতি, অপূর্ব রঙীন পাখীর ছবি, জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের ছবি, সাধুসন্তদের ছবি, শিকারের ছবি, দৈনন্দিন জীবনের নানা চিত্র প্রভৃতি রহিয়াছে। কিন্তু মোগল চিত্রকলার প্রধান বিষয়বস্তু বোধ হয় মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে, জীবন্ত মানুষটির সমস্ত অবয়বের সার্থক প্রতিপ্রকাশে। ব্যক্তি চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট প্রতিফলনে মোগল শিল্পীরা যে অনবদ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। মোগল চিত্রকলার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সব চিত্রের প্রায় সবগুলিতেই মূল ছবির চারিধারে ফুললতাপাতা মণ্ডিত যে চওড়া পাড় রহিয়াছে তাহার ঔৎকর্ষ অনবদ্য। মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমল হইতেই চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ঔরঙ্গজেবের উৎকট ধর্মান্ধতার ফলে মোগল দরবারে উহা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, পরবর্তীকালে এদেশের বিভিন্ন অংশে মোগল চিত্রকলার যেসব অপভ্রংশ গড়িয়া উঠে, তাহাতে শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন যত না মেলে, রীতিপদ্ধতি বা কারিগরি নৈপুণ্যের সন্ধান পাওয়া যায় অনেক বেশী।

রাজপুত চিত্রকলা

মোগল চিত্রকলার প্রায় সমসাময়িককালেই যদিও পশ্চিম ভারতে রাজপুত চিত্রশিল্পও গড়িয়া ওঠে, তবুও দুইয়ের মধ্যে ভাব বা রীতিতে কোনো সম্বন্ধই নাই। রাজপুত চিত্রকলার যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোঝা যায় তাহাদের সুকুমার কোমলতা অতুলনীয়। বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহা একান্তই ভারতীয়। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি লৌকিক ধর্মের বা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের এমন কিছু লোকপ্রসিদ্ধি নাই যাহার রূপায়ণ রাজপুতচিত্রে হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, দৈনন্দিন জীবনেরও কোনো বিষয় রাজপুত শিল্পীরা বাদ দেন নাই। তাছাড়া, মানুষের প্রতিকৃতি, ফুল-ফল, গাছ-পালা, পশু-পাখী প্রভৃতি তো আছেই। রাজপুত চিত্রকলার আরেকটি মূল্যবান সম্পদ তাহার রাগমালা চিত্রাবলী। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রসম্মত রূপায়ণে এই চিত্রগুলির তুলনা মেলে না। ইহাদের অদম্য প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনা রাজপুত শিল্পশৈলীর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে য়ুরোপীয় বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয়

চিত্ররীতিও এদেশে আসে। মোগল শিল্পশৈলীর ভাঙ্গন ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। ফলে দেশী শিল্পীরা কখনো স্বেচ্ছায় বিদেশী রীতির দিকে ঝুঁকিয়া ছবি আঁকা শুরু করেন, কখনো বা বিদেশী প্রভুর হুকুমে তাহাদের ইচ্ছামতো বিদেশী রীতিতে ছবি আঁকিতে থাকেন। পরবর্তীকালে এইসব শিল্পীদের মধ্যে উনবিংশ শতকের শেষ দিককার ত্রিবাঙ্কুরের শিল্পী রাজা রবিবর্মার য়ুরোপীয় রীতিতে জলরঙ্গে বা তেলরঙ্গে আঁকা ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বলাই বাহুল্য, ইঁহারা বিদেশী শিল্পশৈলী ভালোভাবে আয়ত্ত করিলেও তাঁহাদের ছবিতে মননকল্পনার কোনো সাক্ষ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার যে প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, তাহার ঢেউ অনিবার্যভাবেই চিত্রকলার জগতেও আসিয়া লাগে।

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা

সেই যুগে বর্তমান ভারতীয় চিত্রনীতির পথ যিনি সর্বপ্রথম খুলিয়া দেন তিনি হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিল্পরীতিতেই তাঁহার অপরিসীম দক্ষতা থাকায় তাঁহার হাতেই সর্বপ্রথম এই দুই রীতির সমন্বয়সাধনের কাজ শুরু হয়। শুধু তাহাই নহে, এদেশের লোকচিত্রের বিভিন্ন ধারাও তাঁহার শিল্পকর্মে স্থান খুঁজিয়া পায়। তাই তাঁহার রাধাকৃষ্ণ পর্যায়ের ছবিগুলিতে যেমন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মণ্ডনরূপের মিশ্রণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তেমনি তাঁহার ভারতমাতা বা ওমর খৈয়াম পর্যায়ের ছবিগুলিতে দেখা যায় মোগল ও রাজপুত শিল্পকলায় ভাবাশ্রিত সূক্ষ্ম কারুকার্য। ছায়া ও রংয়ের মনোমুগ্ধকর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় জলরংয়ের সাথে জাপানী 'ওয়াশ' প্রথার ব্যবহার অথবা 'কুটুম-কাটাম' লোকরীতির সার্থক প্রয়োগ তিনিই করিতে পারিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাঁহারা আধুনিক ভারতীয় শিল্পকে মর্যাদালাভে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, অসিত হালদার, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে নন্দলাল বসুর ছবিতে যেমন ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যের রেখা বা রূপই প্রধান, তেমনি আবার যামিনী রায়ের ছবিতে প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে লোকশিল্পের বলিষ্ঠ রেখা ও জোরালো, তীব্র গভীর রং; এইযুগের অপর দুইজন শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল

শিল্পকর্মকে অন্যদের সহিত তুলনা করা অসম্ভব। কিউবিষ্ট ধরনে আঁকা গগনেন্দ্রনাথের রহস্যময় রোমাণ্টিকবিষয়ক ছবিগুলি আধুনিক ভারতীয় শিল্পের এক বিরাট সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রং, রেখা আর ভাব মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সব ছবিতে য়ুরোপীয় ধারা যেমন আসিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনি সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার রোমাণ্টিক ভাবালুতা বা লোকশিল্পের ধারারও সমস্ত চিহ্ন উপস্থিত।

সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্পী

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন য়ুরোপীয় রীতি লইয়া এদেশে বহু শিল্পী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে সুধীর রঞ্জন খাস্তগীর, গোবর্ধন আঁশ, অমৃতা শেরগিল, রথীন মৈত্র, কে. কে. হেব্বর, নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, আমিনা আহ্‌মেদ, মকবুল ফেইদা হুসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বস্তুর স্বাভাবিক বাহ্যিক রূপকে অস্বীকার করিয়া ভাঙ্গাচোরা বাহ্যরূপের মধ্য দিয়া বস্তুসত্তার অন্তর্নিহিত রূপকে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টাই ইহাদের শিল্পকর্মের প্রধান লক্ষণ।

সাম্প্রতিক ভারতীয় ভাস্কর্যকলাও বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। আধুনিককালে ভাস্করদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রামকিংকর বেইজ, ধনরাজ ভকৎ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের শিল্পকর্মের সহিত আধুনিক য়ুরোপীয় ভাস্কর্যকলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

অনুশীলন

(আমাদের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা)

১। অজন্তা ও ইলোরার চিত্রকলা সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।
(S. F. 1966) (উঃ—পৃঃ ৩৪৫, ৩৪৭)

২। মোগল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। রাজপুত চিত্রকলার সহিত ইহার কি কোন সম্পর্ক আছে? মোগল ও রাজপুত শিল্পকলার মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলির নির্দেশ কর। (S. F. 1965, 1969)
(উঃ—পৃঃ ৩৫১—৫৪)

৩। ফ্রেস্কো কাহাকে বলে? কুড়ি লাইনএ অজন্তা গুহার বিবরণ লেখ। (S. F. 1965) (উঃ—পৃঃ ৩৪৫, ৩৪৭)

৪। (১) নিম্নলিখিত যে কোন দুইটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বিবরণ লেখ :

(ক) মহাবলীপুরম্, (খ) ইলোরার শিল্পকলা, (গ) গন্ধার শিল্প, (ঘ) অজন্তা চিত্রকলা, (ঙ) রাজপুত চিত্রকলা। (S. F. 1968)

(উঃ—পৃঃ (ক) ও (খ) ৩৪৭, (গ) ৩৪২, (ঘ) ৩৪৫, (ঙ) ৩৫৪

(২) নিচে কতকগুলি ভাস্কর্য রীতির এবং ভাস্কর্য প্রাপ্তিস্থানের নাম দেওয়া হইল। সিন্ধুসভ্যতা, মৌর্যযুগ, সুঙ্গ ও কণ্ব রাজত্বকাল, কুষাণ যুগ এবং গুপ্তযুগের মধ্যে ইহাদের যাহার সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার ইঙ্গিত হিসাবে স্থানগুলির নিচে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ লিখ।

গন্ধার রীতি, ভরহুত, কণিষ্ক মূর্তি, সুলতানগঞ্জ, অমরাবতী, ধাতু-নির্মিত নৃত্যরতা নারীমূর্তি, সুলতানগঞ্জ সিংহ, দিদারগঞ্জের যক্ষিণী, সারনাথ বুদ্ধ, যোগীমারা, অজন্তা গুহা, মথুরা।

(৩) স্ক্র্যাপ্ বই এর জন্য—

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রীতির স্থাপত্য কলাচিত্র সংগ্রহ কর।

(৪) নিম্নলিখিত প্রজেক্ট নেওয়া যাইতে পারে—

(ক) কাছাকাছি কোন যাদুঘরে শিক্ষামূলক গমন।

আমাদের স্থাপত্যকলা

ঘরবাড়ী তৈরী মানুষের আদি শিল্পের অন্যতম। বিভিন্ন দেশে মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ী তৈরী করিয়া থাকে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। একদেশেও মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বাড়ী নির্মাণ করিয়া থাকে। ঘরবাড়ী নির্মাণের রীতিকে স্থাপত্য বলে।

ঘরবাড়ীকেও দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। নিজেদের থাকিবার জন্য ঘরবাড়ী এবং দেবালয়, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ী নির্মাণের রীতি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। সম্ভবত তাহা ভঙ্গুর পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইত বলিয়া তাহাদের ধ্বংসাবশেষও আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছায় নাই। কিন্তু ঐ সময়ে নির্মিত অনেক দেবালয় এবং স্মৃতিসৌধ অটুট অবস্থায় এখনও বর্তমান আছে।

উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প

আলোচনার সুবিধার জন্য ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পকে, উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

উত্তর ভারতের স্থাপত্য কলা-কৌশলের প্রমাণ পাই আমরা খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বে মহেঞ্জোদরোতে। অনেকটা আধুনিক পদ্ধতিতে ইট দিয়া দোতলা তিনতলা বাড়ী বাস করিবার জন্য নির্মিত হইত। তারপর মৌর্যযুগে নির্মিত চৈত্য, বিহার ও স্তূপগুলিতে উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যকলার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

স্তূপ

মৌর্যযুগে বুদ্ধদেবের পুণ্যাস্থি প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যই এইসকল স্তূপ নির্মিত হয়। গঠনপ্রণালীর দিক হইতে স্তূপকে চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়—বেদিকা, অণ্ড, হর্মিকা ও ছত্র। ইটের তৈরী চতুষ্কোণ বেদিকার উপর গোলাকৃতি যে স্তূপ তৈরী করা হইত তাহাকেই বলা হইত অণ্ড। অণ্ডর কিঞ্চিৎ সমতল উপরিভাগে যে চতুষ্কোণ হর্মিকা বসানো হইত তাহারই অভ্যন্তরে পুণ্যাস্থি প্রভৃতি সংরক্ষিত হইত। হর্মিকার মধ্যভাগে প্রোথিত একটি কাষ্ঠ বা ধাতুদণ্ডের উপর শোভা পাইত ছত্র। মৌর্যযুগের স্তূপাদির মধ্যে পিপরয়া, সাঁচী, ভরহুত প্রভৃতি স্থানের স্তূপাদি উল্লেখযোগ্য।

চৈত্যগৃহগুলি নির্মিত হইত পাহাড়ের গায়ে, গুহার মধ্যে। প্রধানত সন্ন্যাসীদের বর্ষাকালের আবাস হিসাবেই এইগুলি ব্যবহৃত হইত। এই যুগের বরাবর পাহাড়ে আজীবীক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জন্য তৈরী চৈত্যগুলি বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে লোমশ ঋষি গুহার উপরিভাগে যে অপূর্ব কারুকার্য খোদিত রহিয়াছে তাহা

চৈত্য
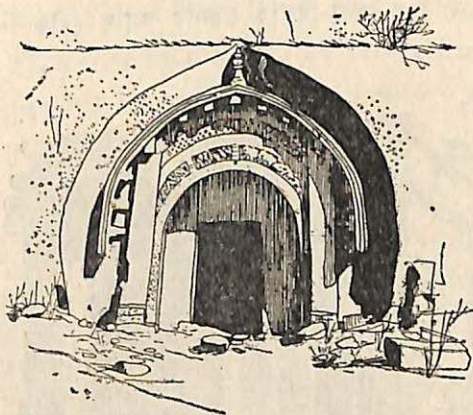
লোমশ ঋষি গুহা

হইতে জানা যায়, কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্যরীতির অনুকরণেই উহা নির্মিত। পরবর্তীকালে অনুরূপ গুহা চৈত্য-স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায় কলিঙ্গরাজ খরবেলের পৃষ্ঠপোষকতায় উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি নামক পর্বত-গাত্রে খোদিত হাতী, অনন্ত, রাণী ও গণেশগুম্ফা প্রভৃতি জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য নির্মিত গুহায়।

এই চৈত্যগৃহগুলিই পরে বিহারে রূপান্তরিত হয়। এইসব বিহার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল, শিক্ষাকেন্দ্র বা বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ডাজা, কার্লে, বেদশা, নালিক প্রভৃতি স্থানে চৈত্য ও বিহার পাশাপাশি পাওয়া গিয়াছে। লোমশ ঋষি গুহার মতো ইহারাও সম্ভবত কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। উহাদের প্রবেশপথে কাষ্ঠনির্মিত ঘরবাড়ীর কড়িবরগা প্রভৃতি অলঙ্করণ হিসাবেই খোদাই করিয়া দেখানো হইয়াছে। এইসব চৈত্যগৃহগুলি আকারে লম্বাধরনের ও একদিকে অর্ধগোলাকৃতি। অর্ধগোলাকৃতির দিকে অবস্থিত রহিয়াছে একটি স্তূপ। চৈত্যগৃহের

বিহার ও চৈত্য

অভ্যন্তরে দেওয়ালে সমান্তরালভাবে স্থাপিত সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ ও দেওয়ালের মধ্যবর্তী পথটি স্তূপের প্রদক্ষিণপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। চৈত্যের প্রবেশদ্বারের ঠিক উপরে অবস্থিত অশ্বত্থ-পত্রাকৃতি গবাক্ষটি চৈত্যের অভ্যন্তরে আলো-হাওয়া যাতায়াতের পথ হিসাবে তৈরী হইত। পরবর্তীকালে গুপ্তযুগে সারনাথের ধামেক স্তূপে বা অজন্তা-ইলোরার চৈত্যগুলিতে এই স্তূপ-চৈত্য-বিহার রচনার আদি বৌদ্ধ শিল্পরীতিই চরম পরিপূর্ণতা লাভ করে।
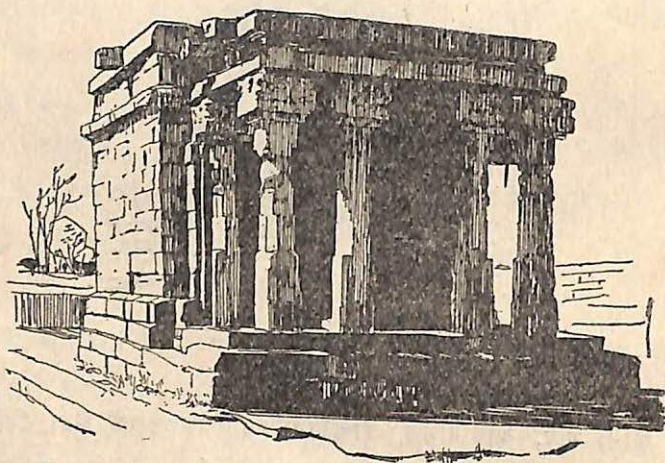
সাঁচীর হিন্দুমন্দির

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মন্দির স্থাপত্যেরও বিকাশ শুরু হয়। ইতিপূর্বে মন্দিরাদিও কাঠ প্রভৃতি ভঙ্গুর জিনিস দ্বারা নির্মিত হইত বলিয়াই খুব সম্ভবত তাহার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। গুপ্তযুগে নির্মিত প্রাচীনতম হিন্দু মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সাঁচীতে। ঐ মন্দিরটি সমচতুষ্কোণী এবং উহার ছাদটি সমতলাকৃতি। গর্ভগৃহ (অর্থাৎ যে ঘরে বিগ্রহ থাকিত) ছাড়াও উহার সম্মুখে চারিটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান একটি মণ্ডপ রহিয়াছে। কিছু পরে নির্মিত তিগুয়া, ভূমারা ও নাচনাকুঠায়ও অনুরূপ সমতল ছাদের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু শীঘ্রই উত্তর ভারতীয় স্থপতিরা মন্দিরে শিখর সন্নিবেশের রীতি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

গুপ্তযুগের স্থাপত্যকলা

ইহার পরে নির্মিত, মন্দিরগুলিতে আমরা চারিটি প্রধান অংশ দেখিতে

পাই—মূল মন্দির বা চারকোণা কেন্দ্রস্থ গৃহ (নাম—বিমান); এই গৃহের ঊর্ধ্বমুখী অংশ (নাম—শিখর); গৃহের ভিতরে দেবতার স্থান (নাম—গর্ভগৃহ); মন্দিরের সামনে ভক্তদের বসিবার স্থান (নাম—মণ্ডপ)। শিখর সন্নিবেশই ভারতীয় মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। মন্দিরে তিন ধরনের শিখর নির্মাণের প্রথা আছে : নাগর, দ্রাবিড় ও বেশর।

উত্তর ভারতে নাগর প্রথায় শিখর নির্মিত হয়। নাগর প্রথায় শিখর গর্ভগৃহের উপর হইতে বঙ্কিম বৃত্তাকারে চারিদিক হইতে উঠিয়া ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া চূড়ায় মিলিত হয় এবং সেখানে ঘট বা আমলক বসানো থাকে। নাগর প্রথায় নির্মিত এই ধরনের শিখরযুক্ত মন্দিরকে রেখ দেউলও বলা হয়।
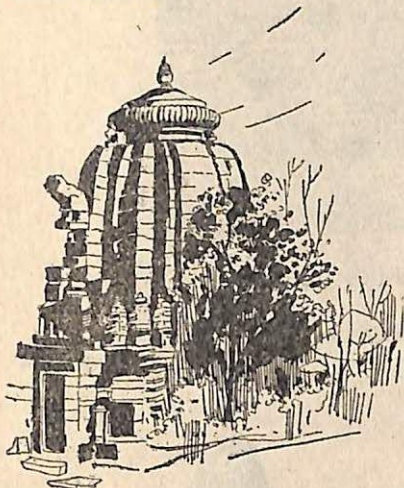
লিঙ্গরাজ মন্দির—ভুবনেশ্বর
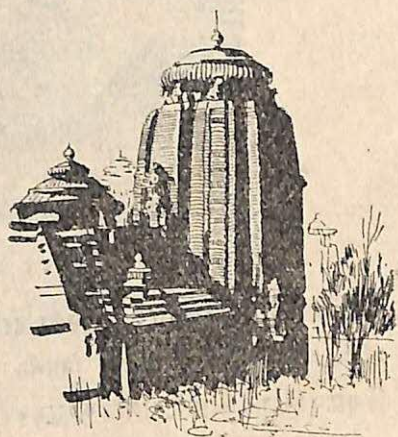
ভুবনেশ্বরের আরেকটি মন্দির

নাগর প্রথায় নির্মিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হইল, যোধপুর রাজ্যে ওসিয়ার সূর্যমন্দির (নবম শতাব্দী), মধ্যপ্রদেশে খাজুরাহোয় নির্মিত কয়েকটি মন্দির (দশম শতাব্দী ; এখানে ৮৫টি মন্দির ছিল, বর্তমানে ২০টি আছে)। নাগরিক স্থাপত্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুটা পার্থক্যও দেখা যায়।

উড়িষ্যার স্থাপত্যশৈলী

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর, লিঙ্গরাজ, রাজারাণী, পুরীর জগন্নাথ, এবং কোণার্কের সূর্য মন্দির—এইগুলি নাগর শিল্পরীতির ক্রমবিকাশের সুন্দর উদাহরণ। উড়িষ্যার মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে, এখানে মূল মন্দিরের (ইহাকে বলা হয় দেউল) সঙ্গে সংলগ্ন মণ্ডপ (জগমোহন), নাটমন্দির ও ভোগমন্দির

রহিয়াছে। দেউলের শিখর নাগরাকৃতি, কিন্তু অন্যগুলির ছাদ পিরামিডের আকারে, স্তরে স্তরে সাজানো। ইহাদের বলা হয় পীড় দেউল।
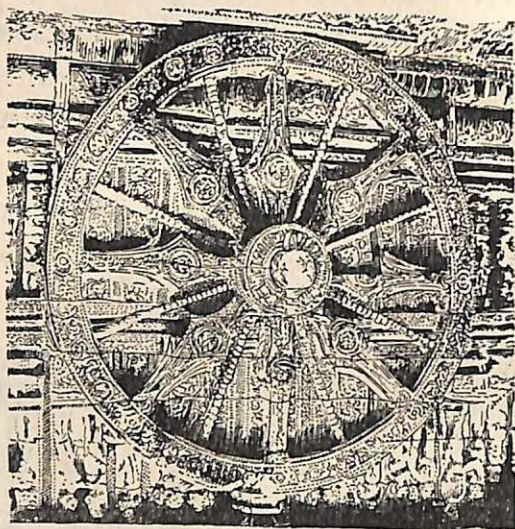
সূর্যদেবের রথচক্র (কোণার্ক)

সমকালীন খাজুরাহে চান্দেল্য রাজাদের আনুকূল্যে তৈরী হিন্দু ও জৈন মন্দিরগুলিও নাগর শিল্পের নিদর্শন হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কনদারেও মহাদেবের মন্দিরটি। উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত বলিয়া এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য শিখর সংস্থাপিত রহিয়াছে বলিয়া উহা প্রকৃত উচ্চতা অপেক্ষাও অনেক বৃহদাকার বলিয়া মনে হয়। এই সময়ই গুজরাটের শোলাঙ্কী রাজারা যেসব মন্দির তৈরী করেন তাহাও নাগরাকৃতি। তবে উহাদের অধিকাংশ

মধ্য ও পশ্চিম ভারতের স্থাপত্যশৈলী

খাজুরাহের মন্দির

মুসলমানদের আক্রমণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এইসব মন্দিরের মধ্যে সোমনাথের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা খ্যাত।

কোণার্কের সূর্য মন্দির

বাংলাদেশের স্থাপত্যশৈলী

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলাদেশে যেসব মন্দির তৈরী হয় তাহাদের বেশীর ভাগই ইটের তৈরী। আকৃতির দিক হইতে ইহারা বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠননৈপুণ্যের কোনো সাক্ষ্য বহন করে না। শিখরের আকৃতি অনুযায়ী ইহাদের পীড় দেউল, রেখ দেউল, স্তূপযুক্ত পীড় দেউল বা শিখরযুক্ত পীড় দেউল—এই কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। পরবর্তীকালে বাসগৃহের অনুকরণে, চতুষ্কোণ নক্সার ভিত্তিতে ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা চালাঘরের আকারে যেসব ইটের তৈরী মন্দির নির্মিত হয়, তাহাদের আকৃতিই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে বাংলা রীতি নামে খ্যাত।

দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যশিল্পের প্রকাশও আমারা দেখিতে পাই মন্দির নির্মাণের ভিতর দিয়া। দক্ষিণ ভারতের মন্দির শিখর চারিদিক হইতে থাক-কাটা, অনেকটা সিঁড়ির মতো উপরের দিকে উঠিয়াছে এবং উহার চূড়ায় বৃত্তাকার গম্বুজের মতো কিরিট আছে। এই ধরনের মন্দিরের শিখরকে "দ্রাবিড় শিখর" বলা হয়।

মন্দিরে দ্রাবিড় শিখর ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বিজাপুর জেলার অন্তর্গত আইহোলে। এখানকার দুর্গা মন্দিরটি দ্রাবিড় রীতির প্রথম নিদর্শন। পল্লব যুগে পাহাড় কাটিয়া রথের অনুরূপ মন্দির নির্মাণ করিবার যে নূতন রীতি আবিষ্কৃত হয় তাহার আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে।
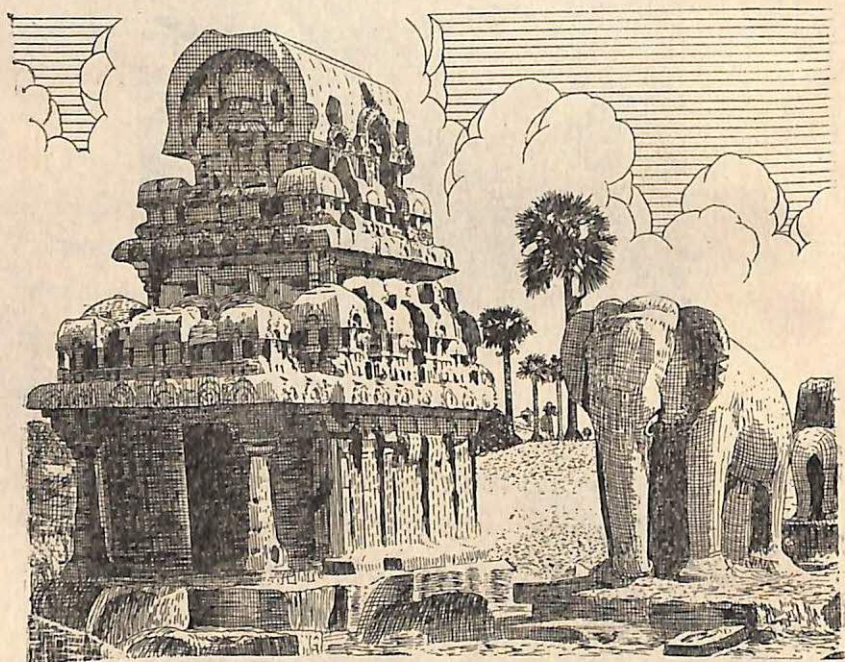
মহাবলীপুরমের রথ

মহাবলীপুরমে পর্বত পৃষ্ঠ খোদাই করিয়া, দ্রৌপদী, গণেশ, অর্জুন, ধর্মরাজ ও সহদেব নামক যে "রথ"গুলি নির্মিত হইয়াছিল ভারতবর্ষের স্থাপত্য

ইতিহাসে তাহা অমূল্য সম্পদ। পাহাড় খোদাই করিয়া মন্দির নির্মাণের এই ধারাটিই চরম পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্রকূট রাজাদের আমলে। এই সময় নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দিরটি অতুলনীয়। ইহার শিখর দ্রাবিড়াকৃতি, ছাদটি সমতল এবং ইহার সম্মুখের মণ্ডপটি ষোলটি স্তম্ভযুক্ত। অবশ্য স্তরে স্তরে পাথর সাজাইয়া তৈরী মন্দিরও পল্লবযুগে নির্মিত হইয়াছে। মহাবলীপুরমের সমুদ্রতটবর্তী মন্দিরটি ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। স্থাপত্যশিল্পের এই ধারাই চোল রাজাদের আমলে, তাঞ্জোরের শিবমন্দির প্রভৃতিতে পূর্ণ বিকাশলাভ করে। এই সময় শিখরগুলি যে শুধুই সাতিশয় উচ্চতা লাভ করে তাহাই নহে, মূল মন্দিরের চারিপাশে বিরাট অঙ্গন এবং উহার চতুর্দিকে বিরাট প্রাচীরও দেখা দেয়। এই প্রাচীরের গায়ে প্রবেশ-পথগুলিতে দেখা দেয় বিরাট তোরণ। এইসব তোরণগুলি গোমুখের অনুকরণে নির্মিত হইত বলিয়া গোপুরম্ নামে খ্যাত। এইসব মন্দিরের সম্মুখভাগে সুন্দর কারুকার্যখচিত স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এই দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের চরম উন্নতি হয় মাদুরার নায়ক রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এইসময় নির্মিত মাদুরার মন্দিরটি এই স্থাপত্যশৈলীর শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ নিদর্শন।

সুলতানী যুগে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সমন্বয়

সুলতানী যুগে সমাজ ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের ধ্যান-ধারণার সমন্বয় স্থাপত্যশিল্পের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। এইযুগে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়ে যে নূতন স্থাপত্য শিল্পশৈলী গড়িয়া ওঠে তাহাই ইতিহাসে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যকলা (Indo-Islamic Architecture) নামে খ্যাত। এই সমন্বয়সাধন খুব সহজ ছিল না। কারণ, হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহ যেখানে ছোটো ও অন্ধকার, মুসলমানদের উপাসনাঘর সেক্ষেত্রে বড়ো ও খোলামেলা। হিন্দু স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য তাহার স্তম্ভ ও বিভিন্ন ধরনের শিখর। কিন্তু মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য তাহার বড়ো বড়ো গম্বুজ ও খিলান। তবু, দিল্লীতে আদি পর্যায়ের সুলতানী স্থাপত্যকলায় হিন্দুরীতির ছাপ সহজেই চোখে পড়ে।

সুলতানী আমলের শেষে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন ভারতীয় স্থাপত্য-কলার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

আদি মোগল স্থাপত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হুমায়ুনের স্ত্রী হাজী বেগম কর্তৃক নির্মিত হুমায়ুনের সমাধি ভবনটি। এই সমাধিভবনের

উপরকার গম্বুজ, ভিতরের বারান্দা ও ঘরসমূহের সংস্থান প্রভৃতি, বা সম্মুখভাগের অলঙ্করণাদি একান্তভাবে পারসীক প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। পরবর্তীকালে, সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত তাঁহার স্ত্রী মমতাজের সমাধিটি এই সমাধি ভবনের অনুকরণেই নির্মিত। আকবরের স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তাঁহার
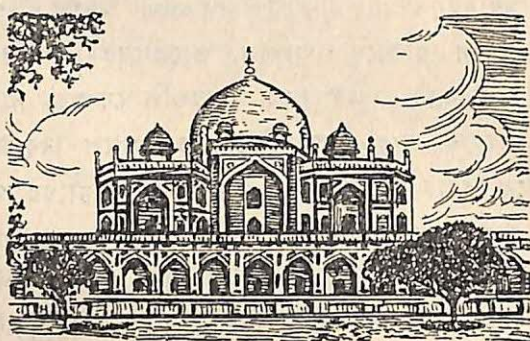
হুমায়ুন

হুমায়ুনের সমাধি

পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী প্রভৃতি জায়গায় অসংখ্য সমাধি-স্মৃতিসৌধ, দুর্গ প্রভৃতি নির্মিত হয়। ইহাদের মধ্যে সিক্রীর জামি মসজিদ, সুবিশাল বুলন্দ দরওয়াজা, সেলিম চিস্তীর সমাধিসৌধ, যোধবাই মহল, দেওয়ান-ই-খাস, তুর্কী সুলতানার ভবন এবং বীরবল ভবন নির্মাণকৌশল ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পশ্চিম ভারতের, বিশেষ করিয়া গুজরাটের, মধ্যযুগীয় স্থাপত্যশিল্পের ধারা এইসব সৌধে সুপরিস্ফুট। তবে, মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সুন্দর নক্সা কাটা জাফরী ও লাল পাথরের গায়ে শাদা মার্বেল বসাইয়া কারুকার্য প্রভৃতির ব্যবহারও এইসব সৌধে দেখা যায়। আকবর কর্তৃক নির্মিত আগ্রা দুর্গটি শুধু যে আদি মোগল সামরিক স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবেই উল্লেখযোগ্য, তাহাই নহে। এই সামরিক স্থাপত্যটির সর্বত্র স্রষ্টার অপরিসীম সৌন্দর্য ও রুচিবোধের সন্ধানও পাওয়া যায়। আকবর পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলেও স্থাপত্যশিল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁহার নির্মিত আগ্রার ইতমাদ্‌উদ্দৌলার সমাধিসৌধ ও সেকেন্দ্রার আকবরের ত্রিতল সমাধিসৌধ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করিতেছে। আকবরের সমাধিসৌধটির বা মিনারের

আকবর

জাহাঙ্গীর

গঠন সেইযুগের প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম। মনে হয়, প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের গঠনপদ্ধতির প্রভাবে এই সমাধিটি নির্মিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আকবর বা জাহাঙ্গীরের নির্মিত প্রায় সব স্থাপত্য-নিদর্শনই লাল পাথরে
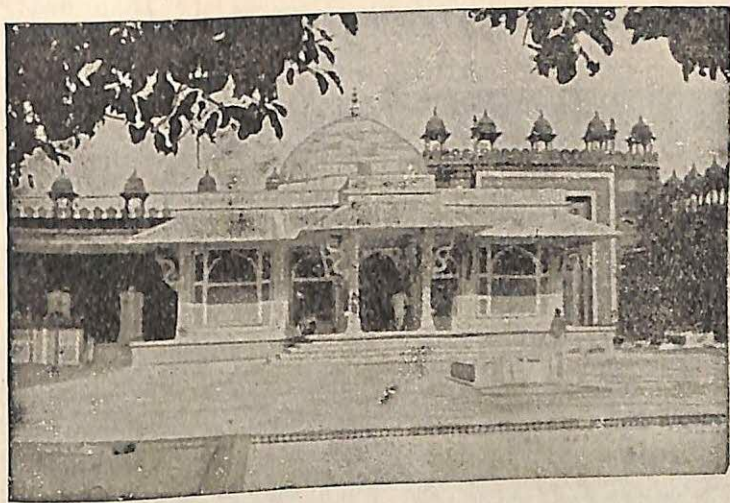
সেলিম চিস্তীর সমাধি, ফতেপুর সিক্রী

তৈরী। তাহাদের গায়ে শাদা মার্বেল পাথর বসাইয়া নক্সার কাজ করা হইত (শুধু সেলিম চিস্তীর কবর ও ইতমাদ্‌উদ্দৌলার কবর ইহার ব্যতিক্রম; এইগুলি সম্পূর্ণই শাদা মার্বেল পাথরে তৈরী)। এই সব সমাধিভবন সাধারণত উচ্চ মঞ্চের উপর স্থাপিত এবং চতুর্দিকে বিরাট বাগান-বেষ্টিত।

মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমলে স্থাপত্যকলার আর এক পর্যায় শুরু হয়। আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে তৈরী সৌধগুলির বলিষ্ঠ ব্যাপ্তির বদলে এই সময়কার সৌধগুলিতে দেখা দেয় পেলব কোমলতা। শাহজাহানের

শাহজাহান

নির্মিত সৌধগুলি প্রায় সবই শাদা মার্বেলে তৈরী বলিয়াই তাহাদের মধ্যে বলিষ্ঠতার পরিবর্তে এই সৌকুমার্য চোখে পড়ে। আগ্রা দুর্গে শাহজাহান নির্মিত খাসমহল, মোতি মসজিদ, দিল্লীর দুর্গ ও তাহার ভিতরকার দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস, জামি মসজিদ প্রভৃতি শাহজাহানের আমলের স্থাপত্যশিল্প-নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পত্নী মমতাজমহলের দেহাবশেষের উপর নির্মিত তাজমহলই তাঁহার

আমলের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন। পৃথিবীর সেরা শিল্পকীর্তিসমূহের মধ্যে উহা অন্যতম। আগাগোড়া মার্বেল পাথরে তৈরী এই সমাধিসৌধের কেন্দ্রীয় গম্বুজটির উপর পারসীক প্রভাব যদিও সুস্পষ্ট, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গম্বুজগুলি একান্তই ভারতীয়। ইহার দেয়ালের অপূর্ব সুন্দর জাফরীগুলি অতুলনীয়। ইহার শাদা মার্বেলের বুকে মূল্যবান মণিরত্ন বসাইয়া যে সকল অপূর্ব
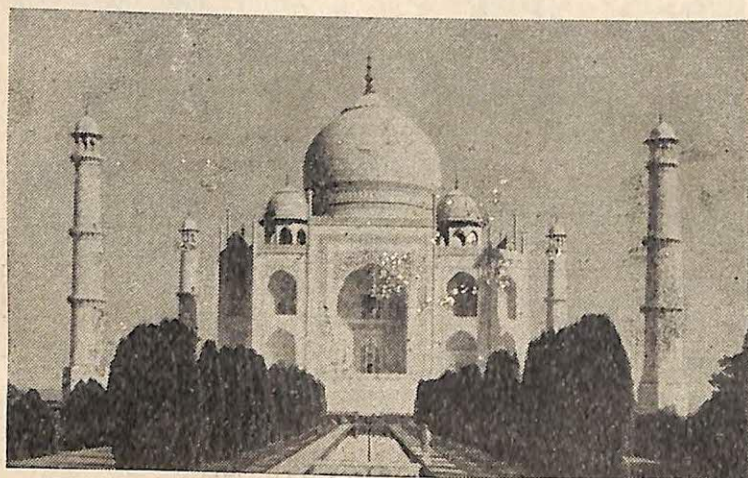
তাজমহল

নক্সা খোদাই করা হইয়াছে, তাহা এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শাহজাহানের আমলে মোগল স্থাপত্যকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও তাঁহার পুত্র ঔরঙ্গজেবের উৎকট ধর্মান্ধতার ফলে ইহার অনুশীলন বন্ধ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে মোগল স্থাপত্যকলা ঐ যুগের অন্য শিল্পকলার মতোই অবনতির পথে আগাইয়া যায়।

ইংরেজ আগমনের ফলে এদেশের স্থাপত্যকলার উপর ভিক্টোরীয়-যুগের ইংরেজ স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব যেমন আসিয়া পড়ে, তেমনি সুপ্রাচীন গ্রীক ও রোমান স্থাপত্যধারার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। এইযুগের বিভিন্ন গীর্জাগুলিতে প্রথম ধারার এবং কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহগুলিতে (ইহাদের মধ্যে কলিকাতা সেনেট ভবনটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে) দ্বিতীয় ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু আধুনিককালে ভারতীয় স্থাপত্য

আদি বৃটিশ যুগে স্থাপত্যকলা

এক পাঁচমিশালী অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। জাতীয় স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভবের তাগিদে স্থপতিরা হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধস্তূপ, মুসলিম মসজিদ, ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজ স্থাপত্যকলার বা আধুনিক পাশ্চাত্য স্থাপত্যকলার সমন্বয়ের এক প্রাণান্তকর প্রয়াস করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা সমন্বয়সাধনের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পরিণত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লীর বিড়লা মন্দির, লক্ষ্ণৌ ও জয়পুরের রেলওয়ে স্টেশন, কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, দিল্লীর সুপ্রীম কোর্ট প্রভৃতি ভবনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে স্থপতিরা আধুনিক যুগে যেসব গৃহাদি নির্মাণ করিতেছেন, তাহা একান্তই প্রয়োজন মিটাইবার কাজে (functional)। তাঁহারা মনে করেন, কোনো গৃহনির্মাণের

আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্যকলা
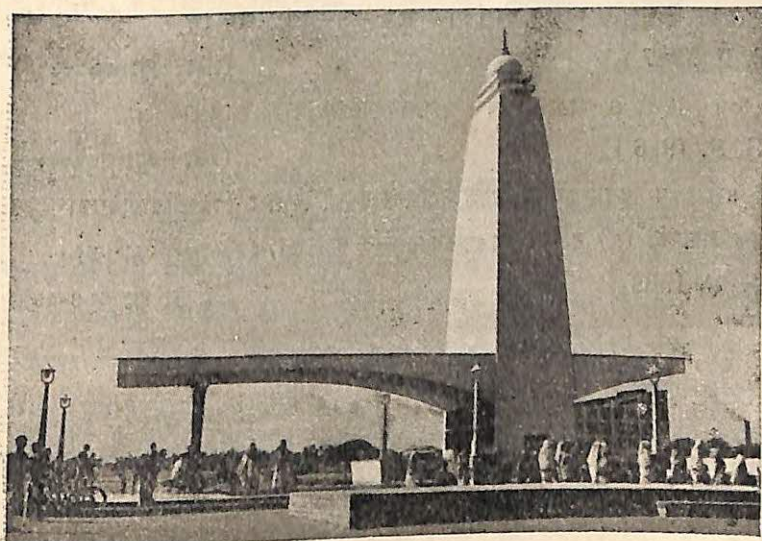
গান্ধীঘাট, ব্যারাকপুর

পরিকল্পনা করার সময় মনে রাখা প্রয়োজন ঐ গৃহ কোন কাজে ব্যবহৃত হইবে। তাঁহারা ঐসব গৃহের গায়ে নক্সা খোদাই করিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে চান না। সৌধের বিভিন্ন অংশের সংস্থাপনের দ্বারা সার্থক সমন্বয়বিধানের মধ্যেই তাঁহারা সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াসী। সাম্প্রতিককালে, ভারতবর্ষে এইজাতীয় পাশ্চাত্য স্থাপত্যশৈলীর সার্থক প্রয়োগে যেসব

গৃহাদি নির্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চণ্ডীগড়ের গৃহগুলি, দিল্লীর চাণক্যপুরী, বোম্বাইর স্যার জাহাঙ্গীর গ্যালারী অব আর্টস, কলিকাতায় ব্যারাকপুরস্থ গান্ধীঘাট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়ো বড়ো শহরগুলিতে পাশ্চাত্য স্থাপত্যকলার অনুকরণে গগনচুম্বী গৃহনির্মাণ আধুনিক ভারতের স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম বিশেষত্ব।

অনুশীলন

(আমাদের স্থাপত্যকলা)

১। উত্তর ভারতীয় মন্দিরের উদাহরণ সহ বিবরণ দাও।
S. F. (1966) (উঃ—পৃঃ ৩৫৮-৬৩)

২। উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।
(S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ৩৬১-৬২)

৩। দিল্লী ও আগ্রার মুঘল স্থাপত্য সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।
(S. F. 1966) (উঃ—পৃঃ ৩৬৫-৬৮)

৪। যে কোন দুইটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লেখ : (১) ভারতীয় স্থাপত্যে গ্রীক প্রভাব, (২) দক্ষিণ ভারতের মন্দির স্থাপত্য, (৩) মুঘল স্থাপত্য।
(S. F. 1968) (উঃ-পৃঃ ৩৬৪-৬৮)

আমাদের সঙ্গীতকলা

চিন্তায়, জ্ঞানে, কর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে গৌরবময় পরিচয় পাওয়া যায়, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাহার পরিচয় কম নহে। আমাদের শাস্ত্রমতে সৃষ্টির মধ্যেই সঙ্গীতের সুর নিহিত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলেছে গান শুনে সেটারই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তে অনুভব করি।" বৈদিক যুগে ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি যে বিভিন্ন সুরে আবৃত্তি করা হইত বা সামবেদের স্তোত্রগুলি যে বিভিন্ন সুরে গীত হইত, সেই উদাত্ত মধুর স্বরভঙ্গিমাই আমাদের সঙ্গীতের আদি প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

ভারতীয় সঙ্গীতের আরম্ভ

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সুর কি ছিল আজ সঠিক বলিবার উপায় নাই। কারণ যদিও সেই যুগের বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে এমন সব উক্তি রহিয়াছে যাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, সেই সময়ে সঙ্গীতের সমধিক প্রচলন তো ছিলই, সঙ্গীতচিন্তা এবং প্রয়োগপদ্ধতিও এক বিশেষ পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তবুও সেই সব সুর ও প্রয়োগ প্রাচীনেরা গোপন করিয়াই রাখিয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয়, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যদিও সঙ্গীতের সাধারণ উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধন, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশেষ পারলৌকিক মঙ্গলসাধন। তাই দেবতার পূজায় বা বিভিন্ন আভিচারিক কাজে সঙ্গীতের প্রয়োগ ছিল। সেইজন্যই অনধিকারী ব্যক্তিরা যাহাতে তাহার অনুশীলন করিতে না পারে সেইজন্য তাঁহারা সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন।

প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের যেটুকু জ্ঞান তার প্রধান ভিত্তি পরবর্তী যুগের সঙ্গীত-গ্রন্থাদি। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে ভরত প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র'। ইহার সঠিক রচনাকাল নির্দিষ্ট করা না গেলেও পণ্ডিতেরা মনে করেন উহা খৃষ্টীয় প্রথম

সঙ্গীত-গ্রন্থাদি

শতাব্দীর মধ্যে রচিত। পরবর্তী কালের রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে নারদের 'সঙ্গীত-মকরন্দ' ও মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে শেষ ও উৎকৃষ্টতম গ্রন্থ শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ

শতকের প্রথমার্ধে রচিত। এইসব গ্রন্থাদি পাঠে প্রাচীন সঙ্গীতের প্রয়োগ-পদ্ধতি জানা না গেলেও, বিভিন্ন সুরলয়ের নাম পাওয়া যায়। জানা যায়, বহু পূর্ব হইতেই আমাদের দেশে বিভিন্ন স্বর ও রাগরাগিণী এবং কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় প্রকার সঙ্গীতেরই প্রচলন ছিল।

স্বর বলিতে ভারতীয় প্রাচীনেরা সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই সপ্তস্বরকে বুঝিতেন (অবশ্য, বৈদিক সাহিত্যের আদি পর্বে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ—এই তিনটি মাত্র স্বরের সন্ধান পাওয়া যায়)। কথিত আছে, চতুর্বেদ হইতেই এই সপ্তস্বর উদ্ভূত—ঋক্ হইতে ষড়জ (সা) ও ঋষভ (রে), সাম হইতে গান্ধার (গা) ও পঞ্চম (পা), যজুঃ হইতে মধ্যম (মা) ও ধৈবত (ধা) এবং অথর্ব হইতে নিষাদ (নি)। অপর এক মত অনুযায়ী মহাদেব পাঁচটি স্বর এবং পার্বতী অপর দুইটি স্বর আবিষ্কার করেন। এই সপ্তস্বর সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সাতটি জীবের কণ্ঠস্বর হইতে নাকি এই সপ্তস্বর গৃহীত হইয়াছিল—যথা, ময়ূর হইতে সা, বৃষ হইতে রে, ছাগল হইতে গা, বক হইতে মা, কোকিল হইতে পা, ঘোড়া হইতে ধা, এবং হাতী হইতে নি। কিন্তু এইসব কাহিনী যাহাই হউক না কেন, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করিয়া আধুনিককালে পণ্ডিতেরা শুধু এইটুকুই বলিয়া থাকেন যে মৌর্যযুগের পূর্বেই এদেশে সপ্তস্বরের প্রকৃতি ও পদ্ধতি স্থির হইয়া গিয়াছিল।

সপ্তস্বর

ভারতীয় গানের সুরমাত্রই এই সপ্তস্বরের সমষ্টি। কিন্তু সেই স্বরগুলির সাজাইবার বিভিন্ন পদ্ধতিকেই বলা হয় রাগ ও রাগিণী। প্রাচীনদের মতে স্বরগুলির সম্বন্ধভেদে সৃষ্ট রাগ হইতেছে ছয়টি ও ছত্রিশ রাগিণী তাহাদের স্ত্রীস্বরূপা। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাগ বা রাগিণী গাহিবার বিধান ছিল—যথা, সকালে ভৈরবী, দুপুরে সারঙ্গ, বিকালে মূলতান, সন্ধ্যায় পূরবী, রাত্রিতে বেহাগ ইত্যাদি। সপ্তস্বরের মতো ইহাদের সৃষ্টি সম্বন্ধেও নানা কাহিনী প্রচলিত; যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মহাদেবের অঘোর নামক মুখ হইতে ভৈরব, সদ্য নামক মুখ হইতে শ্রী, বাম হইতে বসন্তক, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম, ঈশান হইতে মেঘ এবং পার্বতীর মুখ হইতে নটনারায়ণ—এই ছয়টি রাগের সৃষ্টি হয় বলিয়া কথিত আছে। সপ্তস্বরের মতো এই রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনীও যাহাই হউক না কেন, পূর্বোক্ত বিভিন্ন

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী

সঙ্গীত গ্রন্থাদি পড়িলে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে রাগ-রাগিণী সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ চিন্তাও খৃষ্টপূর্ব যুগেই এদেশে হইয়া গিয়াছিল।

ধর্মসাধন ব্যতীত কেবলমাত্র আনন্দলাভের জন্য সঙ্গীতের চর্চা যে আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, ভারতীয় সঙ্গীতকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর সঙ্গীত আছে, যাহাতে দখল পাইতে হইলে—আনন্দ পাইতে হইলে, অন্তত কিছুটা শিক্ষা, সাধনা ও ধর্মের প্রয়োজন। আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতগুলি ঐ ধরনের সঙ্গীত। কিন্তু আরেক শ্রেণীর সঙ্গীত আছে, যাহা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, স্বাভাবিক নিয়মে গড়িয়া উঠিয়াছে—অন্তরের আবেগে যাহা স্বতঃপ্রকাশিত। এই ধরনের সঙ্গীতে দখল পাইতে খুব একটা শাস্ত্রানুগ অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের

লোকসঙ্গীত

সঙ্গীতকেই লোকসঙ্গীত বলে। ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে কোনো দিনই লোকসঙ্গীতকে খুব উচ্চাসন দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, আজ যেটি লোকসঙ্গীত, সেইটিই হয়তো কালক্রমে উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসন দখল করিয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সঙ্গীতের কোনোরূপ শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া, সাধক সম্প্রদায় যে ভজন গানের সৃষ্টি করেন, লোকসঙ্গীত হিসাবেই তাহা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বর্তমানে উহা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কৌলীন্য দাবী করিতেছে। আরও বলা যাইতে পারে যে, একদিন 'টপ্পা' গান ছিল পথেঘাটে গাহিয়া দরিদ্রের অন্নসংস্থানের উপায়, কিন্তু আজ উহাই হইতেছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, একথা বলিলে খুব অত্যুক্তি হইবে না যে লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বর্তমান ভারতীয় সঙ্গীতের গোড়ার কথার সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা গানের গোড়ার কথা জানিতে হইলে, আমাদের আসিয়া পৌঁছিতে হইবে সমাজের তথাকথিত নিচের স্তরে। খুব সহজ সুর আর সোজা কথার ভিতর দিয়া গভীর দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশ বাংলা দেশের লোকসঙ্গীতে অতুলনীয়। প্রাচীনকাল হইতেই নানারূপ ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে এবং শহরের জীবনের কৃত্রিমতার দরুন আমাদের দেশের সঙ্গীত সম্পদ শহর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ভারতের যাহা আদর্শ, যাহা সংস্কার, সঙ্গীতের মধ্যে তাহা ফিরিয়া পাইতে হইলে

পল্লীর দরবারে আমাদের যাইতে হইবে। তাই, নিতান্ত সাধারণ হইলেও লোকসঙ্গীতের মূল্য আমাদের কাছে অপরিসীম। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইবে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে (যে সঙ্গীতের বিধিবদ্ধভাবে চর্চা করিতে হয়) আমাদের দেশে বর্তমানে মার্গ সঙ্গীত বলা হয়। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আলোচনা ভারতে বর্তমানে নাই বলিলেই চলে। এখন যাহাকে মার্গ সঙ্গীত বলা হয়, তাহার উদ্ভব হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে। মুসলমানরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে ইরাণের গজল, কাওয়ালী ইত্যাদি গানের সুর লইয়া আসেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া মুসলমান গায়কেরা এবং তাহাদের মুসলমান পৃষ্ঠপোষকেরাও প্রাচীন যুগ হইতে উপলব্ধ ভারতের রাগ-রাগিণীমূলক সঙ্গীতের রীতির দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন। বস্তুত, আধুনিক কালে মার্গ সঙ্গীত (classical music) বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সৃষ্টি হয় এইভাবেই হিন্দু-মুসলমান সঙ্গীত ধারার সংমিশ্রণে (অবশ্য প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে মার্গ সঙ্গীত বলিতে বুঝাইত পূর্বোক্ত ধর্মীয় ও আভিচারিক সঙ্গীতকেই)।

মার্গ সঙ্গীত

ভারতের কয়েকটি মার্গ সঙ্গীত

১। কর্ণাটী সঙ্গীত

দক্ষিণ ভারতে এই হিন্দু-মুসলিম সঙ্গীত রীতি-সমন্বয়ের ধারাটি গিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়াই বোধ হয় সেখানে আজিও মুসলমান-পূর্ব যুগের শুদ্ধ প্রাচীন সঙ্গীতের রূপটি বেশী করিয়া সংরক্ষিত হইয়া আছে—কর্ণাটী সঙ্গীতে আমরা বিশুদ্ধ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের রূপ দেখিতে পাই।

২। ধ্রুপদ

ধ্রুপদ বর্তমানে ভারতে প্রচলিত সঙ্গীতের আদি রূপ। এদেশে ধ্রুপদ বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। ভারতের নাট্যশাস্ত্রেও ধ্রুপদের গীত রূপের উল্লেখ আছে। তবে বর্তমানে আমরা ধ্রুপদের যে রূপ পাই তাহার সূচনা খিলজী সুলতানদের আমলে। গোপাল নায়ক, আমীর খসরু, বৈজুবাওরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতের রচয়িতা ও গায়কেরা সকলেই সেই যুগের। পরবর্তীকালে মোগল যুগের তানসেন, ছুঁদি খাঁ ও সুরদাস ভালো ধ্রুপদ-রচয়িতা ও গায়ক বলিয়া

প্রসিদ্ধ। ধ্রুপদের সুরে শাস্ত্রকথিত বিধিনিষেধ অলঙ্ঘনীয়; তানবৈচিত্র্য বা তানকর্তব এই গানে নিষিদ্ধ। এই গানে চারিটি কলি (Stanza) বা 'তুক' থাকে—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। ধ্রুপদ গায়ক প্রথমে কতকগুলি অর্থহীন শব্দের (তা, না, নানা প্রভৃতি) সাহায্যে রাগরূপ ফুটাইয়া তোলেন (আলাপ), পরে শুরু হয় গান। আস্থায়ী অর্থাৎ প্রধান তুকটিকে অন্য তুকগুলি গাওয়ার পর বারবার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। সব রাগেই ধ্রুপদ গাওয়া চলে।

৩। খেয়াল

মোগল যুগে ধ্রুপদের চাইতে খেয়ালের প্রচলন হয় বেশী। কথিত আছে, খিলজী বংশের আমলেই আমীর খসরু খেয়াল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে একথা সত্য যে, সেই যুগের ওস্তাদসমাজ খেয়ালকে একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখিতেন। মোগল যুগে, বিশেষ করিয়া আকবরের আমল হইতেই খেয়ালের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। খেয়াল ধ্রুপদ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত এবং দুই কলিতেই—আস্থায়ী ও অন্তরা—সম্পূর্ণ। ইহার চাইতে বেশী কলি খেয়ালে থাকিতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাহাদের সুর অন্তরারই মতো। খেয়ালে সুরবিকাশের স্বাধীনতা অবারিত। গায়ক রাগের সীমা স্বীকার করিয়া লইয়া সুরকে ইচ্ছামতো লীলায়িত করিতে পারেন, ছন্দবৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন। এই বৈচিত্র্যের জন্যই বোধহয় খেয়াল মোগলযুগে বিলাসব্যসনে এত সমাদৃত হইয়াছিল। পরবর্তীকালের মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহ্ রঙ্গীলার সভাগায়ক সদারঙ্গ ও অদারঙ্গের চেষ্টাতেই খেয়াল বর্তমান সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

৪। তেলেনা

খেয়ালের মতো তেলেনার স্রষ্টাও আমীর খসরু। তোম, তা, না, দের দানি, দ্রিম প্রভৃতি অর্থহীন শব্দের দ্বারা একটি রাগিণীর রূপ ফুটাইয়া তোলাই তেলেনার কাজ। ইহার বাণী অত্যন্ত দ্রুত উচ্চারণ করা যায়, কাজেই কোনো রাগের দ্রুত প্রকাশিত রূপ দেখাইতে হইলেও সাধারণত তেলেনা গাওয়া হইয়া থাকে।

৫। ঠুংরী

ঠুংরী খেয়াল গানের চাইতেও অপেক্ষাকৃত হাল্কা, এবং সাধারণত এই গানে সুকৌশলে একাধিক রাগিণী এবং রীতি মিশাইয়া সুরের ও তালের বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হয়। তবে ঠুংরী গানে আবেগই প্রধান বলিয়া এই গানের পক্ষে হাল্কা রাগ-রাগিণীই প্রশস্ত। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্-র প্রচেষ্টায় ঠুংরী

গানের জনসমাদর হয়। বর্তমানে ইহার মিষ্টত্বের জন্যই ঠুংরী বিশেষ জনপ্রিয়।

৬। টপ্পা

লক্ষ্ণৌর নবাব আসাফ-উদ্-দৌল্লার আমলে টপ্পা গানের উদ্ভব ঘটে। টপ্পা খেয়ালের চাইতে আরো সংক্ষিপ্ত, আরো হাল্কা এবং তানপ্রধান। বস্তুত, ইহাতে কথার ভাগ একান্তই কম, তালের অংশই বেশী। ইহাদের বিষয়বস্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রেম-বিষয়ক বলিয়া, ইহারা সাধারণত ঠুংরী গানের মতো হাল্কা রাগ-রাগিণীতেই রচিত হইয়া থাকে।

৭। গজল

টপ্পার মতো গজল গানও প্রেমবিষয়ক। মোগল যুগের সুপ্রচলিত কাওয়ালীর অপভ্রংশ বলা যাইতে পারে গজলকে। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, ইহার অনুপ্রেরণা আসে ইরাণ হইতেই। গজল গানে কথাই প্রধান, সুর কথার বাহনমাত্র। অন্যান্য মার্গ সঙ্গীতের সহিত এইখানেই ইহার প্রধান পার্থক্য।

দেশী সঙ্গীত

শিল্পকলার আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, কালধর্মী শিল্পশৈলী-সমূহের পাশাপাশি একটি কালাতীত লোকশিল্পের ধারা আবহমান কাল হইতেই আমাদের দেশে বহিয়া চলিয়াছে। ঠিক তেমনি মার্গ সঙ্গাতের পাশাপাশি আর একজাতীয় সঙ্গীতও বহুকাল হইতেই আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে, যাহাকে বলা হইয়া থাকে দেশী সঙ্গীত। যেসব প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইসব গ্রন্থেও দেশী সঙ্গীতের উল্লেখ আছে। দেশী সঙ্গীত শাস্ত্র-কঠোর নিয়মে বদ্ধ নহে। দেশগত কালগত রুচির বশে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি।—দেশী সঙ্গীতের রূপ কি ছিল, প্রাচীন মার্গ সঙ্গীতের প্রয়োগপদ্ধতির মতো তাহাও জানিবার আজ কোনো উপায় নাই। শাস্ত্রগ্রন্থ যাহাই বলুক না কেন, পর্যালোচনা করিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করিয়া থাকেন, অন্তত কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী বিভিন্ন দেশী সুরের আধারেই তৈরী হইয়াছিল ; যথা—গুর্জরী, মনহেলরী, বঙ্গালী, গৌড়, মালব-কৌশিক, গন্ধার, কানাড়া প্রভৃতি।

বর্তমানকালে দেশী সঙ্গীতের যেসকল রূপ আমাদের জানা আছে, তাহাদের উৎপত্তিও মধ্যযুগে। সেই সময় আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে

আঞ্চলিক স্বাজাত্যবোধের যে ঢেউ জাগে (আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভবে যাহার অন্যতম প্রকাশ), সেই ঢেউয়ের দোলায়ই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই সব বিভিন্ন দেশী সঙ্গীত বা লোকসঙ্গীত স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় উৎসারিত হয়। সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ এই সব লোকসঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ সুরকে আশ্রয় করিয়াই নিজেকে সবচাইতে বেশী ছড়াইয়া দেয়। এই কারণেই সমস্ত উচ্চকোটির সংস্কৃতির চাপ তুচ্ছ করিয়াও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাটে-ঘাটে-মাঠে-বাটে সহস্র সহস্র কণ্ঠে লোকসঙ্গীতের সুরের নিত্য উৎসার। পাঞ্জাবের ভাঙ্গরা, হীর, মীর্জা, উত্তর প্রদেশের কাওয়ালী, গুজরাটের ঝাঁঢ়, বিহারের দেহাতী গানগুলি, ভারতের বিভিন্ন দেশের লোকসঙ্গীতের সুরের দৃষ্টান্ত। বাংলা দেশের ভাটিয়ালী, কীর্তন, বাউল ইহাদের পদের অন্তর্নিহিত সহজ খাঁটি ভাব এবং সুরের অলঙ্কারহীন সরল মাধুর্যের জন্য ইহাদের আকর্ষণ রসিকচিত্তের উপর দুর্নিবার।

বাংলার লোকসঙ্গীত

বাংলার লোকসঙ্গীতের অসংখ্য বৈচিত্র্য। ভৌগোলিক পটভূমি ও অন্যান্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যভেদে বাংলাদেশের এক এক জায়গায় এক এক ধারার লোকসঙ্গীতের উদ্ভব ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া বীরভূম জেলায় বাউল গানের জন্ম। বাউলরা এক সাধন সম্প্রদায়। সকল বাধা-বিপদ উপেক্ষা করিয়া ভগবানের সহিত মিলনই বাউল সাধনার উদ্দেশ্য। এই সাধনায় গানই প্রধান মাধ্যম। বীরভূমের মন উদাস করা গেরুয়া রংয়ের রিক্ত প্রান্তরে যে বাউল সাধকদের জন্ম, তাহাদের গানেও যেন এই উদাস রিক্ততার ছায়া পড়িয়াছে। বাউলদের সাধনা দরদীয়া মনের মানুষের সাধনা। মনের মানুষ বা পরম পুরুষের সঙ্গে মিলনের পথের সমস্ত বাধা-সংস্কার, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, আচারাদি হইতে তাহারা মুক্ত। গানই ইহাদের

বাউল

প্রাণ ; গানের মধ্য দিয়াই তাহাদের পরম পুরুষের সহিত মিলনের চেষ্টা। বাউল গানের একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হইবে—

আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥

তাই তাহাদের গানে ও সুরে কোনো জটিলতা নাই, তাহা একান্তই আভরণরিক্ত। এই বাউল গানেরই রূপভেদ দেখা যায় দেহতত্ত্ব গানে, মুর্শিদ্যাগানে। বাউলগণ একতারা নিয়া, নাচিয়া নাচিয়া গান করিয়া থাকেন। আবার পূর্ববঙ্গে নদী বেশী। সেই কারণেই বোধহয় সেখানে নদীপথের গান ভাটিয়ালীর এত প্রচলন। ভাটির টানের মতো ভাটিয়ালীর সুরও খুব টানা টানা, তাহার গতি বিলম্বিত। ভাটিয়ালী গানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে, ইহা বাউল গানের মতো কোনো তত্ত্বপ্রধান হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু ইহার ভাবে, ইহার সুরে, এক বিষাদের কারুণ্য মিশিয়া আছে। এই বিষাদের সুর দেশবিদেশের সমস্ত লোকসঙ্গীতের সুরের মধ্যেই বোধহয় কাণ পাতিলে শোনা যায়।

ভাটিয়ালী

নিচে ভাটিয়ালী গানের একটি নমুনা দেওয়া গেল—

বিদেশেতে রইল বন্ধু রে।
বিধি যদি পাখা দিত, পাখী হয়ে উড়ে যাইত।
ও মোর উড়ে যাইয়ে পরতাম বন্ধুর গায়ে রে॥
বন্ধু আমার তিলেক চাঁদ, তিল কাটিয়ে বুনে ধান।
ওরে সেও ধান হয়ে গেল উড়ি রে॥

ভাটিয়ালী গানেরই আর এক রূপভেদ সারি গান। ভাটিয়ালী একের সুর, কিন্তু সারির রূপ যৌথ জীবনের। আর সেই কারণেই বোধহয় সারির লয়ও ভাটিয়ালীর অপেক্ষা দ্রুত।

কীর্তনকে অবশ্য অনেকে লোকসঙ্গীত মনে করেন না, কারণ কীর্তনের সুর-তান-লয় মার্গ সঙ্গীতের মতোই জটিল এবং অনুশীলনসাপেক্ষ। কিন্তু বহিরঙ্গের কথা বাদ দিলে, কীর্তন গানে যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বড়ো হইয়া দেখা দেয় তাহা বাঙ্গালী লোক-মানসেরই অভিব্যক্তি। এই দিক দিয়া ভাটিয়ালী-বাউলের মতো কীর্তনও বাংলার লোকসঙ্গীতের এক অমূল্য সম্পদ।

কীর্তন

কিন্তু কি মার্গ সঙ্গীত, কি লোকসঙ্গীত—উভয়েই রাগ বা সুরের কাঠামোই মোটামুটি সঙ্গীতের বাণীকে নিয়ন্ত্রিত করে। আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সঙ্গীত রচয়িতার পক্ষে ইহা এক বড়ো বাধা হইয়া দেখা দিল। ফলে আধুনিকরা কেউ কেউ পাশ্চাত্য সুরের দিকেও ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কারণ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সঙ্গীতরচয়িতার স্বাধীনতা অনেক

বেশী। এদেশের সঙ্গীতজগতে এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের
আবির্ভাব। প্রথম জীবনে অবশ্য তিনি সচেতন ভাবে
রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রাচীন মার্গ সঙ্গীতেরই অনুসরণ করিলেন। তাঁহার সেই
যুগের ধ্রুপদভঙ্গিম একরাগভিত্তিক ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ইহার প্রমাণ। কিন্তু
মধ্যযুগের শেষদিকে মার্গ সঙ্গীতের গায়কেরা যেখানে স্বর ও স্বরবিস্তারের
প্রাধান্য দিতে গিয়া গানের বাণীকে প্রায় কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন,
সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাণীকে আবার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই
বাণীর মাধুর্য, ধ্বনিলালিত্য ও উচ্চ ভাবসমৃদ্ধিই তাঁহার গানগুলিকে
অতুলনীয় করিয়াছে। অবশ্য এখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভা স্তব্ধ হইল না।
তিনি বুঝিলেন, বাণীকে সুরানুসারী করিতে হইলে অনিবার্যভাবেই বাণীর
স্বাচ্ছন্দ্য খণ্ডিত হয়। বাণী ও সুরের সুসমঞ্জস মিলনে গানের যে
পরিপূর্ণতা তাহা এই একরাগভিত্তিক সঙ্গীতে সম্ভব নহে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের
নূতন পর্যায় শুরু হইল। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় বিধান অস্বীকার করিয়া
তাঁহার গানে সচেতনভাবে সুরমিশ্রণ শুরু করিলেন। এই সুরমিশ্রণের
অব্যাহত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। একবার
যখন এই সুরমিশ্রণ পর্ব শুরু হইল তখন আর বাধা মানিল না।
শুধু শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাইয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হইলেন না।
প্রচলিত রাগ-রাগিণীগুলির মধ্যে তিনি দরাজ হাতে বাংলার তথা ভারতের
অন্যান্য প্রান্তের প্রিয় লৌকিক সুরগুলির খোঁচও মিশাইয়া দিলেন (তবে,
একথা অনস্বীকার্য যে লৌকিক সুরগুলির মধ্যে বাউলের সুরই কবিকে বেশী
প্রভাবান্বিত করিয়াছে)। আমাদের দেশে য়ুরোপের মতো হার্মনি-সঙ্গীত
ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে এই য়ুরোপীয় সঙ্গীতের হার্মনি
(Harmony), অর্থাৎ বিবাদের মধ্যে সংবাদ আনারও চেষ্টা করিয়াছেন।
রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই সুরের অনবদ্য মিশ্রণ এবং বাণীর অনবদ্য ভাবসমৃদ্ধি ও
ধ্বনিলালিত্যই ইহাকে ভারতবর্ষের সঙ্গীতের ইতিহাসে একটি নিজস্ব
স্থান করিয়া দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় ৬১ বৎসর ধরিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সবশুদ্ধ
তাঁহার রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। রবীন্দ্র প্রতিভার
মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতও বহুমুখী। অনুশীলন করিলে ইহার মধ্যে নাকি ১৭টি
ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ১৭টি ধারাকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত

করা চলে—সুরধর্মী ও কাব্যধর্মী সঙ্গীত। সুরধর্মী সঙ্গীত রচনায় সুরই প্রাধান্য পাইয়াছে, গানের কথাগুলিকে সুরের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। কাব্যধর্মী রচনায় ঠিক তার উল্টাটি ঘটিয়াছে। কাব্যের প্রয়োজনে সুরকে ব্যবহার করা হইয়াছে। এখানে গানে কথারই প্রাধান্য। তাই, এই ধরনের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিবার সময় গানের কথাকে বিশুদ্ধ এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করার রীতি। রবীন্দ্রনাথের রচিত রাগসঙ্গীত, ধ্রুপদ, লোক-সঙ্গীত ইত্যাদিকে সুরধর্মী সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা চলে। প্রেম সঙ্গীত, ঋতু সঙ্গীত, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত (বিশেষ অনুষ্ঠানে গাহিবার জন্য রচিত) হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত ইত্যাদি কাব্যধর্মী সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধরনের সঙ্গীত সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা হইতেছে। 'ভানুসিংহ' এই ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে তাঁহার 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন। এই গানগুলি তাঁহার যোল হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রচিত। রবীন্দ্রনাথ রচিত লোকসঙ্গীতও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়। এই গানগুলিতে আমরা পাই বাউল-দরবেশের গূঢ় দার্শনিকতা এবং কবীর-নানক প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধক-দের ভাবধারা। তিনি বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বাংলা দেশে প্রচলিত প্রায় সকল ধরনের লোকসঙ্গীতই রচনা করিয়াছেন। স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী সঙ্গীত প্রচুর উদ্দীপনা যোগাইয়াছে। তোমরা জান যে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতও রবীন্দ্রনাথের রচনা। অনেকগুলি আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত রচনা করিয়া (যেমন জন্মদিনের, নববর্ষের, গৃহপ্রবেশের ইত্যাদি) কবি আমাদের সামাজিক জীবনে গানের বহুল প্রচলনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের কথাও ভোলেন নাই। তাহারা যাহাতে আনন্দ পাইতে পারে সেইজন্য প্রায় একশতের উপর শিশু-সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছেন। তারপর রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ রচিত ধর্ম সঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত, উদ্দীপনা সঙ্গীত ইত্যাদি। সামান্য পরিধিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিপুল ভাণ্ডার। সঙ্গীতরসিক এই বিপুল ভাণ্ডার হইতে নিজের প্রয়োজনমতো যে-কোনো ধরনের সঙ্গীত বাছিয়া লইতে পারেন।

অতুলপ্রসাদ বাংলা দেশে আর একটি সঙ্গীতধারার প্রবর্তক।

নজরুলের রচিত গানকেও একটি বিশিষ্ট রীতির গান মনে করা হয় এবং ইহাকে নজরুল গীতি আখ্যা দেওয়া হয়। অধ্যায় শেষে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় সঙ্গীতের সামান্ত তুলনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাশ্চাত্য কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয় সঙ্গীতেই 'হার্মনি'র বা ঐকতানের প্রাধান্য। অনেকগুলি কণ্ঠ বা যন্ত্রের সংমিশ্রণে ঐকতান সৃষ্টি করাই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। একক কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতে পাশ্চাত্যের উৎকর্ষ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের বিকাশ বিপরীত পথে। আমরা কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয়ক্ষেত্রেই একক সঙ্গীতে অধিকতর অভ্যস্ত। তাল-লয়ের বিস্তারেই আমাদের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য।

অতুলপ্রসাদ নজরুল

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত

অনুশীলন

(আমাদের সঙ্গীতকলা)

১। মার্গ সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।
(S. F. 1965, Comp. 1966) (উঃ—পৃঃ ৩৭৪)

২। লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি লোকসঙ্গীতের নাম কর। (S. F. 1967)
(উঃ—পৃঃ ৩৭৩, ৩৭৭-৭৮)

৩। রবীন্দ্রসঙ্গীত বা বাউল সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ।
(S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ৩৭৭,৩৭৮-৮০)

৪। ধ্রুপদ কাহাকে বলে? খেয়ালের সহিত ইহার পার্থক্য কি?
(S. F. 1965) (উঃ—পৃঃ ৩৭৪-৭৫)

স্ক্র্যাপ বইএর জন্য—

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের ছবি সংগ্রহ করিয়া লাগাও।

আমাদের নৃত্যকলা

সঙ্গীতের মতো নৃত্যেরও আদিমতম শাস্ত্রীয় বিধানের সন্ধান পাওয়া যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। বস্তুত, ভরত ও আমাদের অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সঙ্গীত বলিতে গীত, বাদ্য এবং নৃত্ত—এই তিনটিকেই বুঝিতেন। নৃত্ত শব্দের মূলধাতু নৃতি, যার অর্থ গা-হাত-পা নাড়া। অর্থাৎ ছন্দোময়, সুদৃশ্য, নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ সঞ্চালনকেই তাঁহারা বলিতেন নৃত্ত। এই নৃত্ত যদি অনুকরণাত্মক হয়, যেমন অভিনয়ের ক্ষেত্রে, তাহা হইলে তাহাকে তাঁহারা বলিয়াছেন অভিনয়-নৃত্ত বা নাট্য। আর মনের বিভিন্ন ভাবকে সঙ্গীতের উদ্দেশ্যে উপযোগী করিয়া গীতকে অভিব্যক্ত করার জন্য যদি পরিকল্পিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাঁহারা বলিয়াছেন ভাব-নৃত্ত বা নৃত্য। শাস্ত্রকারদের মতে গীত, বাদ্য ও নৃত্ত—একে অন্যের পরিপূরক।

নৃত্য শব্দের অর্থ

সুতরাং, অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে নৃত্যকলাও আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল এবং বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বস্তুত, মৌর্যযুগ হইতে শুরু করিয়া মধ্যযুগ পর্যন্ত এদেশের সর্বত্র বিভিন্ন দেব-দেউলের প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ নৃত্যপর ও নৃত্যপরা অসংখ্য দেবদেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব-নারী, মন্দির-নর্তকী প্রভৃতির নৃত্যের গতিতে ও ভঙ্গিমায় এইরূপ অনুমানের সমর্থন মেলে। গীতের ন্যায় নৃত্যেরও তখন একান্ত লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতিলাভ। কিন্তু কালক্রমে নৃত্যের সমাদর থাকিলেও নর্তক-নর্তকীদের স্থান সমাজে যে ধীরে ধীরে হেয় হইয়া যায় পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফলে, গীতের মতোই নৃত্যের শাস্ত্রীয়ধারাও অবহেলাভরে প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। মধ্যযুগে শাস্ত্রীয় নৃত্যের এক ক্ষীণ ধারা বিভিন্ন দেবমন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্য বাঁচিয়া রহিল। কিন্তু যেসব নর্তকীরা ইহার অনুশীলন করিতেন তাঁহাদের স্থানও ছিল সমাজে অত্যন্ত নিচে। আধুনিককালে আমরা ভারতীয় নৃত্য বলিতে যাহা বুঝি তাহার পুনর্জন্ম হইয়াছে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে আসার ফলে।

প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা

বর্তমানে ভারতবর্ষে চারি প্রকার শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার অনুশীলন দেখা যায়—ভরতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী। ইহাদের মধ্যে ভরত-নাট্যমেই সর্বাপেক্ষা বেশী শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ স্বীকৃত হইয়াছে। বর্তমানকালে এই নৃত্যকলাধারার পুনঃ-প্রচারের প্রথম উদ্যোক্তা হইতেছেন মাদ্রাজের ই. কৃষ্ণ আয়ার। ১৯২৬ সালে

ভরতনাট্যম্

ভরতনাট্যম্

কোনো মেয়েকে ভরতনাট্যম্ নাচিতে সম্মত করাইতে অপারগ হইয়া (নৃত্যের প্রতি সমকালীন সমাজমানসের অভিব্যক্তির ইহাই বড়ো প্রমাণ) শেষপর্যন্ত তিনি নিজেই স্ত্রীলোকের বেশে ভরতনাট্যম্ নাচিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার ছাত্রী বালাসরস্বতী এবং তাঞ্জোরের গুরু মিনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য রামগোপাল ও রুক্মিণী দেবী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় ভরতনাট্যম্ যথার্থ স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তামিলনাদ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে আজ ভরতনাট্যম্ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভরতনাট্যমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার গতি এবং সুললিত অঙ্গ-ভঙ্গি। এই অঙ্গভঙ্গি যে শুধুই লালিত্যময় ও মনোরঞ্জক তাহাই নহে, ইহা গভীর অর্থদ্যোতকও বটে। ভরতনাট্যমে শির, চক্ষু, গ্রীবা, হস্ত, জঙ্ঘা,

কটী, পদ প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গসঞ্চালনের যে বিপুল বৈচিত্র্যময় বিধান রহিয়াছে, তাহাদের প্রয়োগ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুদ্রার কথা। এক বা দুই হস্তের প্রয়োগ অনুযায়ী মুদ্রা দুই জাতীয়—অসংযুত ও সংযুত। অসংযুত অর্থাৎ এক হাতে আবার অন্তত চব্বিশ রকমের মুদ্রা হইতে পারে, যথা—পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, শিখর, কপিথ প্রভৃতি। পতাক মুদ্রায় হাতের অঙ্গুষ্ঠ হয় কুঞ্চিত, আর অন্য সব অঙ্গুলি থাকে প্রসারিত ও পরস্পর সংলগ্ন। প্রহার, প্রতাপ, প্রেরণাদান প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে এই মুদ্রার ব্যবহার। অথবা, হস্তের অনামিকা বক্র হইলেই তাহাকে বলা হয় ত্রিপতাক। আবাহন, অবতরণ, বারণ, প্রবেশ প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে ইহার ব্যবহার।

ভরতনাট্যম্ প্রদর্শনীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ইহা সাতটি বিভিন্ন নৃত্যাংশের সামগ্রিক রূপ। এই সাতটি নৃত্যাংশ হইতেছে—যথাক্রমে আলারিপ্পু, যতিশ্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্ (অথবা স্বরযাতি), পদম্, তিল্লানা এবং শ্লোক (বা অষ্টপদী)। সাম্প্রতিককালে বিশিষ্ট ভরতনাট্যম্ শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও কুমারী জয়ম্, জাভেরী ভগ্নীদ্বয়, পশ্চিমবঙ্গের তারা চৌধুরী প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঞ্জোরকে কেন্দ্র করিয়া যেমন ভরতনাট্যম্ নৃত্যধারা শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার ধারা বহন করিয়া চলিয়াছিল, তেমনি শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার আরেকটি রূপ দক্ষিণ ভারতে কেরালায় বহুদিন ধরিয়া টিকিয়া ছিল। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে আয়ারের প্রচেষ্টায় যখন ভরতনাট্যমের পুনর্জন্ম হয়, প্রায় সেই সময়ই ভল্লাথোল, গুরু কুঞ্জরু, কুরূপ, গুরু মাধব মেনন, গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রি প্রমুখের প্রচেষ্টায় এই ধারাটিও পুনরুজ্জীবিত হয়। এই ধারাই কথাকলি নৃত্য নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে কথাকলি হইতেছে মূক নৃত্যনাট্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনীকে রূপায়িত করাই ইহার লক্ষ্য। তাই ভরতনাট্যম্ যেমন প্রধানত একক-নৃত্য, কথাকলি সেক্ষেত্রে একান্তই সমবেত নৃত্য। একই কারণে কথাকলি নৃত্যে সাজপোশাক ও অঙ্গসজ্জার বাহুল্যের প্রয়োজনীয়তাও অনেক বেশী। মুদ্রার সংখ্যাও ভরতনাট্যমের চাইতে কথাকলিতে বেশী, যদিও শাস্ত্রীয় মুদ্রাগুলির সহিত তাহাদের অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আরও এক ব্যাপারে ভরতনাট্যমের সহিত

কথাকলি

কথাকলির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেখানে ভরতনাট্যমে কমনীয় লালিত্য-ময় রসের প্রাবল্য, সেক্ষেত্রে কথাকলিতে বীর বা রুদ্র রসের আধিক্যই বেশী। ভরতনাট্যমের মতো ইহাতেও কয়েকটি বিভিন্ন ক্রম রহিয়াছে।

কথাকলি

ইহারা হইতেছে, যথাক্রমে—তোডায়ম্, পুর্রপ্পড়ু, থিরনোট্টম্, কুম্মী প্রভৃতি। সাম্প্রতিককালে কথাকলি শিল্পীদের মধ্যে গুরু গোপীনাথ, শান্তা রাও, কেলু নায়ার, মৃণালিনী সারাভাই, পদ্মিনী প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে মুসলমান সম্রাটদের আমলে নৃত্যের শাস্ত্রীয় বা আভ্যুদয়িক প্রয়োজন প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। একটি ক্ষীণ ধারা শুধু দেবদাসীদের

নৃত্যে বাঁচিয়া থাকে, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সময়ই ঐ মুসলমান সম্রাট সামন্তশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাহাদের মনোরঞ্জনার্থে নাচের বহুল প্রচলনও হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যের কিছুটা আঙ্গিক এইসব নাচের মধ্যে বর্তমান থাকিলেও, এই নাচে পারসীক বা ইরাণী প্রভাবই বেশী। কথক নৃত্যশিল্পীর বেশভূষায়ও এই

কথক

কথক নৃত্য

প্রভাব লক্ষণীয়। এই মিশ্র দরবারী নাচের পদ্ধতিই কথক নামে পরিচিত। কথকে হস্ত-মুদ্রার প্রয়োগ প্রায় নাই-ই; পদের ব্যঞ্জনামূলক ব্যবহারও দেখা যায় না। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখের ও মুখের চটুল অভিব্যক্তি এবং দেহব্যঞ্জনা। ঐ অভিব্যক্তি ও চটুল ব্যঞ্জনার সাহায্যেই কথক নৃত্যশিল্পীরা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের মনোরঞ্জন করিতেন। কথক নৃত্যের আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য চক্র বা দ্রুত ঘূর্ণন এবং আকস্মিক স্তব্ধতা। কথক

শিল্পীকে একাধারে রুদ্ররস ও শৃঙ্গার রস—তাণ্ডব ও লাস্য—উভয়কেই অনুশীলন করিতে হয়। পরবর্তীকালে কথক নৃত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান করিয়া লয়। কথকের বিভিন্ন ক্রম হইতেছে, যথাক্রমে—আমদ, পরাণ ও গথ। সাম্প্রতিক কথক শিল্পীদের মধ্যে লাচ্চ মহারাজ, আচান মহারাজ, সিতারা, কুমুদিনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মণিপুরী নৃত্য

মণিপুরী

মণিপুরী নৃত্য বলিতে বর্তমানে আমরা এক বিশেষ নৃত্যপদ্ধতিকে বুঝিলেও প্রকৃতপক্ষে মণিপুরী নৃত্য এক নহে, বহু। বস্তুত, মণিপুর নৃত্যেরই দেশ। মণিপুরবাসীদের পুরাণ-কাহিনীতে পাওয়া যায়, হর-পার্বতী কৃষ্ণ ও গোপীদের রাসলীলার অনুসরণে নিজেদের রাসনৃত্যের জন্যই মণিপুর দেশটি সৃষ্টি করেন। কিন্তু পুরাণ কাহিনী যাহাই হউক, মণিপুরের বহু বিচিত্র নৃত্যপদ্ধতি দেখিয়া মণিপুরকে নৃত্যের রাজ্য বলিয়াই মনে হয়। এই সব বিভিন্ন নৃত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লাই হরওবা (মণিপুর পুরাণোক্ত হর-পার্বতীর নকল রাস-লীলা)। বর্ষাসমাগমে কৃষির কাজ শুরুর পূর্বে এই নৃত্য হইয়া থাকে। ইহা

একান্তভাবেই ধর্মভিত্তিক। পরবর্তীকালে কৃষ্ণের রাসলীলা এবং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জীবনীকে কেন্দ্র করিয়াও বিশিষ্ট মণিপুরী নৃত্যধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। এইসব নৃত্যের পোশাকের ও অঙ্গসজ্জার বর্ণঔজ্জল্য এবং ঘটা সহজেই চোখে পড়ে। ইহারা একান্তভাবেই যৌথ নৃত্য। নর্তক-নর্তকীদের সংস্থান সর্বত্রই বৃত্তাকারে। এই বৃত্তাকৃতিই মণিপুরী নৃত্যে দেহভঙ্গিমারও প্রধান বৈশিষ্ট্য। মণিপুরী নৃত্যে পায়ের কাজ বা মুখের অভিব্যক্তি প্রায় নাই-ই। সুললিত হস্ত সঞ্চালনই ইহার প্রধান সম্পদ। মণিপুরে নর্তকদের বাদ্যযন্ত্রসহ নৃত্যও এক অপূর্ব সৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢোল নৃত্য, তকর নৃত্য, পাংনৃত্য বা কর্তাল নৃত্য। সাম্প্রতিককালে মণিপুরী নৃত্য-ভঙ্গিতে যেসব শিল্পী নিজেদের বিশেষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গুরু অমুবি সিং, ব্রজবাসী সিং রাঘুবী সিং, থম্বলা দেবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

গানের ক্ষেত্রে তোমরা দেখিয়াছ, মার্গ সঙ্গীতের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকগীতির ধারাও বহুদিন ধরিয়াই এদেশে অব্যাহত রহিয়াছে।

লোকনৃত্য

ঠিক তেমনই উপরিউক্ত চারিটি নৃত্যশৈলী ছাড়াও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিভিন্ন লোকনৃত্যের ধারাও উচ্চকোটির সংস্কৃতির অবহেলা অস্বীকার করিয়াও বাঁচিয়া আছে। আঞ্চলিক নৃত্যরীতিগুলির প্রয়োগ সাধারণত ধর্মীয় আচরণের অঙ্গ হিসাবে অথবা বিভিন্ন সমাজোৎসবে। ইহাদের মধ্যে নৃত্যপদ্ধতির আঙ্গিকের জটিলতা নাই, নাই শাস্ত্রীয় বিধানলঙ্ঘনের প্রতিপদে আশঙ্কা। সহজ সাবলীল গতিভঙ্গিতে লোকমানসের সহজ সরল প্রকাশে ইহারা সমৃদ্ধ। লোক-নৃত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা একক নৃত্য নহে, যৌথ নৃত্য। গ্রাম-বাসীদের একত্রিত হইয়া আনন্দের প্রকাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এইসব হাজারো লোকনৃত্যের মধ্যে পাঞ্জাবের ভাঙ্গরা, রাজস্থানের কাজরী, গুজরাটের গরবা, বাংলাদেশের রায়বেঁশে ও ধামালি, দক্ষিণ ভারতের বাঘ-নৃত্য, মিথিলার জাতা-জাতিন নৃত্য, কাশ্মীরের নাজুন, দাক্ষিণাত্যের কোল্লাট্টম (একজাতীয় কাঠি-নৃত্য) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও কাঠি-নৃত্যের রূপভেদ দেখা যায়। তামিলনাদের কুরু ভঞ্জী, কর্ণাটক অঞ্চলের যক্ষগণ (বা বায়লতা), মালাবারের ওথনথুল্লল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের প্রায় সকল আদিবাসীদের মধ্যেই

নিজস্ব নৃত্যধারা রহিয়াছে। নৃত্যই তাহাদের সমাজ-জীবনের অবলম্বন। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ইহাদের নৃত্য ভারতীয় অন্যান্য লোকনৃত্যের মতোই যৌথ নৃত্য। দক্ষিণ ভারতের টোডা, চেঞ্চু, উত্তর ভারতে গণ্ড, আগারিয়া, মারিয়া এবং পূর্ব ভারতের সাঁওতাল, ওরাঁও, নাগা প্রভৃতি আদিবাসীদের নৃত্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রতিবৎসর গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে (২৬শে জানুয়ারী) আদিবাসীরা দিল্লীতে নানাধরনের নৃত্য দেখাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে নাগা নৃত্যের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। আমাদের বাংলা দেশে সাঁওতালদের নৃত্যও রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ।

আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলা

ভারতীয় নৃত্যকলা, বিশেষত ভরতনাট্যমের পুনরুজ্জীবনের জন্য কৃষ্ণ আয়ারের দানের কথা ইতিপূর্বেই তোমাদের বলা হইয়াছে। কিন্তু আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নৃত্যসম্বন্ধে ভদ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাব তিনি দূর করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই প্রয়াসকে পূর্ণ ও সার্থক রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষে ভদ্রসমাজে তিনিই নৃত্যকলার আধুনিক প্রবর্তক। তিনি যদি শান্তি-নিকেতনে নৃত্যকলাকে প্রথমে উৎসাহিত না করিতেন তাহা হইলে আজ যেসব বড়ো বড়ো নৃত্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের দেখা পাওয়া যাইত না। নৃত্যশিল্পীরা যে সামাজিক সম্মান আজ পাইতেছেন তাহাও বোধহয় তাঁহারা পাইতেন না। সঙ্গীতের মতো নৃত্যেও রবীন্দ্রনাথ খাঁটি ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় নিয়মে, নৃত্যের পদবিক্ষেপ বাঁধা নিয়মে নির্দিষ্ট প্রথায় পরিচালিত হয় বলিয়া অনেক সময় আড়ষ্ট ভাব আসিয়া নৃত্যবিদ্‌কে আড়ষ্ট করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক প্রভাব হইতে নর্তক-নর্তকীকে মুক্তি দেন। শুধু তাহাই নহে। সঙ্গীতের মতো নৃত্যেও যে এক বিরাট সমন্বয়-সাধনের আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন তাহা অভিনব। তাঁহার বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে ভরতনাট্যম্‌, কথাকলি, মণিপুরী বা কথক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যপদ্ধতিকে যেমন তিনি কাজে লাগাইয়াছেন, তেমনি আবার প্রয়োজনবোধে এদেশীয় গরবা প্রভৃতি লোকনৃত্য জাভা, বলী, চীন বা জাপানের নৃত্যপদ্ধতি, কিংবা রুশ, হাঙ্গারীয় প্রভৃতি য়ুরোপীয় নৃত্যধারাকেও প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও নৃত্যকেই তিনি মুখ্য হইয়া উঠিবার অবকাশ দেন নাই। সুর ও ভাবকে প্রকাশের জন্য যেখানে যে পদ্ধতি বৈচিত্র্যদানে সহায়তা করিয়াছে, সেখানেই তাহাকে অনায়াসে

স্থান দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। কবিতা আবৃত্তির সহিত নৃত্যের যে রীতি তিনি পরিকল্পনা ও প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। শুধু গান নয়, তাঁহার অনেক কবিতাকেও তাই নৃত্যরূপ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যেসব নৃত্যশিল্পী জগৎসভায় ভারতীয় নৃত্যকে স্থান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শান্তিদেব ঘোষ ও উদয়শঙ্করের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৃত্যকলায় তাঁহাদের সর্বতোমুখী প্রতিভা তাঁহাদিগকে আধুনিক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃত্যবিদের সম্মান দিয়াছে।

অনুশীলন

(আমাদের নৃত্যকলা)

১। ভরতনাট্যমের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা।
(S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ৩৮৩-৮৪)

২। ভারতীয় লোকনৃত্যের বিবরণ দিয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। (S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ৩৮৮-৮৯)

৩। বাংলার লোকনৃত্য বা কথক নৃত্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(S. F. 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ৩৮৬)

৪। ভরতনাট্যম বা কথাকলি নৃত্য সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।
(S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ৩৮৩-৮৪)

৫। আধুনিক ভারতীয় নৃত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ৩৮৯-৯০)

৬। কথক অথবা কথাকলি নৃত্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(S. F. 1965) (উঃ—পৃঃ ৩৮৪, ৩৮৬)

৭। মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।
(S. F. 1969) (উঃ—পৃঃ ৩৮৭-৮৮)

স্ক্র্যাপ বইয়ের জন্য :

ভারতের প্রসিদ্ধ নৃত্য-শিল্পীদের ছবি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নৃত্যানুশীলনের তথ্য বিবৃত করা যাইতে পারে।

আমাদের জাতীয় সরকার

স্বাধীন ভারত

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের নূতন শাসন ব্যবস্থা বলবৎ হয়। প্রতি বৎসর স্মরণীয় দিন হিসাবে, আমরা ঐ দিন দুইটি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকি। দিল্লীতে প্রতি রাজ্যের রাজধানীতে এবং আমাদের বৈদেশিক দূতাবাসগুলিতে ঐ দুই দিন জাতীয় উৎসবের দিন হিসাবে প্রতিপালিত হয়।

স্বাধীন ভারতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা

স্বাধীনতালাভ আনন্দের বটে। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের সুযোগ-সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে—রাষ্ট্রের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু দাবী করিতে পারি। রাষ্ট্রের পরিচালনা সম্বন্ধে আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিতে পারি। রাষ্ট্র পরিচালনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনে সাবালক হইলেই আমাদের সকলের ভোট দিবার অধিকার রহিয়াছে। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার (এমন কি প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত হইবার) আশাও প্রত্যেকে পোষণ করিতে পারি। দেশবিদেশে, যেখানেই আমরা থাকি না কেন, আমাদের রাষ্ট্র আমাদের স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবে, এ আশা আমরা করিতে পারি। কোনো দেশের নাগরিক অপেক্ষা আমাদের অধিকার হীন নহে। জাতি, ধর্ম, উচ্চ-নীচ, উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে আমাদের সকলেরই নিজ নিজ মাতৃভাষার চর্চা, ধর্মের আচরণ এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের সমান অধিকার আছে। রাষ্ট্রের নিকট হইতে আমরা নিজ প্রবণতা অনুসারে শিক্ষা, ক্ষমতানুযায়ী কর্ম, প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য এবং চিকিৎসা লাভের সুযোগের দাবীও করিতে পারি। এককথায়, স্বাধীনতালাভের পর আমাদের জীবন সমৃদ্ধ এবং সুখ-শান্তিতে পূর্ণ হইবে এই আশা করিতেছি। কেহ আমাদিগকে আর নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য শোষণ করিতে পারিবে না।

কিন্তু রাষ্ট্রের নিকট আমাদের যে এতসব দাবী তাহা পূর্ণ করিবে কে? আমাদের লইয়াই তো রাষ্ট্র। আমরাই তো রাষ্ট্রের পরিচালক। আমাদের

ভোটেই তো রাষ্ট্রের বিধানসভা গঠিত হয়। আমাদের প্রতিনিধিরাই তো মন্ত্রী হন। আমরা যদি রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য করি তবেই রাষ্ট্র আমাদের আশানুরূপ সুযোগ-সুবিধা দিতে সক্ষম হইবে। প্রথমেই রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আনুগত্য থাকিতে হইবে। তাহার আইন-কানুন আমাদিগকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে। রাষ্ট্র তাহার পরিচালনার জন্য যে সব কর ধার্য করিয়াছে, তাহা দিতে হইবে। রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব যখন আমাদের উপর আসিয়া পড়ে, আপ্রাণ সে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। ভোটদানের সময়ই হউক, আর জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরেই হউক, সর্বদা জনসাধারণের কল্যাণের কথা মনে রাখিয়া আমাদের কাজ করিতে হইবে। আমরা ব্যবসাই করি বা চাকুরীই করি, সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে আমরা জনসাধারণের সেবক। কাজে ফাঁকি দেওয়া, অসাধুতা, উৎকোচ গ্রহণ বা প্রদান প্রভৃতির দ্বারা আমরা দেশের লোকের প্রতি, নিজেদের প্রতি, বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছি—একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা সকলে প্রাণপণ করিয়া যদি স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারি তবেই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। না হইলে, শুধু স্বাধীনতা-লাভের ফলে আমাদের সব সুখ-সমৃদ্ধি কিছুই বৃদ্ধি পাইবে না।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক-কর্তব্য

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের সমস্যাগুলি জটিলতররূপে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দীর্ঘদিন দাসত্বের ফলে আমাদের মধ্যে অনেক গলদ ঢুকিয়াছে। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতা পরস্পর দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি আমাদের সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তারপর সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে ধনবৈষম্যও আছে প্রচুর। সমাজের অধিকাংশ লোকই অর্থনৈতিক দাসত্ব করিতেছে বলা যাইতে পারে। আমাদের অধিকাংশ প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই আমরা পরমুখাপেক্ষী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের মান নিম্নতম শ্রেণীর। উপরিউক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করিতে না পারিলে, স্বাধীনতালাভ করিয়াই বা আমাদের কি হইবে? যে স্বাধীনতা লাভ করিলাম, তাহাও দীর্ঘদিন রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

স্বাধীনতালাভের পর আমাদের সমস্যা

অনুশীলন

(স্বাধীন ভারত)

১। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ৩৯১-৯২)

২। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহাদের উল্লেখ কর। (উঃ—পৃঃ ৩৯২)

স্বাধীনতা সংগ্রাম

আমাদের দেশের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় স্বাধীনতালাভের ইতিহাস। কোনো জাতিই বেশী দিন পরাধীনতার শৃঙ্খল সহ্য করিতে পারে না। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে। শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে একদিন-না-একদিন শাসিত বিদ্রোহ করিয়া বসে, সে মরিয়া হইয়া ওঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ব্যতীত তাহার জীবনের প্রায় কোনো প্রয়োজনই মিটিতে পারে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল কথা

পরপদানত জীবন লাঞ্ছিতের জীবন—এ বিষয়ে একদিন-না-একদিন সে নিঃসংশয় হয়। একত্র মিলিত হইয়া শাসককে বিতাড়িত করার জন্য শাসিতেরা বদ্ধপরিকর হয়। তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত হয়। দাসত্বকে জাতীয় অপমান বলিয়া মনে করিয়া তাহাকে তাহারা ঘৃণা করিতে শেখে। জীবন পণ করিয়া এই অপমান হইতে তাহারা মুক্ত হইবার চেষ্টা করে। ইহাই তাহাদের জীবনের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। শাসিতের মনে যখন দৃঢ়সংকল্পের সৃষ্টি হয়, তখন শাসকের আসন টলিয়া ওঠে, তা সে যত শক্তিশালীই হউক। সকল পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকেই মোটামুটি উপরিউক্ত সত্যকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়।

ভারতের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ইংরাজ ভারতে তাহার সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে। প্রথম হইতেই ইংরেজরা তাহাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারত শাসন করে। ফলে, দেশের উৎপাদনশক্তি দিন দিনই হ্রাস পাইতে থাকে। ভারতবাসী দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়ে। অপর দিকে ভারতের অর্থে ইংল্যাণ্ড সমৃদ্ধ হইতে থাকে। এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ রূপ নেয় ভারতের

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজ শাসন আরম্ভের প্রায় ১০০ বৎসর পরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজ লিখিত ইতিহাসে ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিদ্রোহ শব্দটি খুব সম্মানসূচক নহে। সরকারের ক্ষমতা অপহরণের নিমিত্ত যখন দেশবাসীর কোনো অংশ সংঘবদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করে, তাহাকে বলা হয় বিদ্রোহ। কিন্তু কেহ যদি কোনো দেশকে সৈন্যশক্তির সাহায্যে

পদানত করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন করিতে থাকে এবং দেশবাসী যদি প্রত্যক্ষভাবে শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাহা সংগ্রাম আখ্যা পাইবার যোগ্য।

ইংরেজ শাসন প্রায় একশত বৎসর চলার পরে নানা কারণে প্রায় সকল শ্রেণীর দেশবাসীর মনেই এই শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ইংরেজদের সাম্রাজ্যলোলুপতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা ছলে-বলে-কৌশলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলী অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি উদ্ভাবন করেন। অনেক দেশীয় রাজ্যকেই তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। ডালহৌসী দত্তক

কারণ

পুত্রগ্রহণের বিরুদ্ধে যে নীতি প্রবর্তন করেন তাহার ফলেও অনেক দেশীয় রাজ্য ইংরেজ কবলিত হয়। ফলে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তাঁহাদের মনে ধারণা জন্মায় যে, অল্প দিনের মধ্যেই দেশীয় রাজ্যের আর কোনো অস্তিত্বই থাকিবে না। তাই তাঁহারা ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। যেসব দত্তক পুত্রের মুখের গ্রাস ডালহৌসী কাড়িয়া লইয়াছিলেন (যেমন, পেশোয়ার দত্তক পুত্র নানাসাহেব) তাঁহারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন।

দেশীয় রাজারা ব্যতীত জমিদারগণও ইংরেজদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। রাজস্ববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংরেজরা এক বছর, পাঁচ বছর বা দশ বছর পর পর জমি নিলামের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যিনি ইংরেজ সরকারে সর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব জমা দিতে স্বীকৃত হইতেন তিনিই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমির মালিকানা লাভ করিতেন। ফলে, পুরাতন জমিদার বংশের উচ্ছেদ ঘটিতে থাকে এবং নূতন বিত্তবান লোকেরা জমিদার হইতে আরম্ভ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবশ্য অল্পদিন পর পর জমি নিলামের প্রথা রহিত হয়, কিন্তু পুরাতন জমিদার বংশের তাহাতে কোনো লাভ হয় না। তাঁহারা বেকারে পরিণত হইয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বৃদ্ধি করার কার্যে যোগ দেন। এদিকে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দরিদ্র কৃষক-সাধারণের কষ্ট কম ছিল না। বার বার জমিদার পরিবর্তন এবং

তাঁহাদের শোষণ এবং পীড়ন নীতি গ্রহণের ফলে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। নিজেদের স্বার্থে ইংরেজরা দেশের শিল্পসম্পদ খুবই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। বিলাতী পণ্যদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পজাত দ্রব্য টিকিতে পারে নাই। ইংরেজরা এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে সোনারূপাও নিজেদের দেশে চালান দিতেছিল। ফলে, সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আর্থিক অসন্তোষ চরমে পৌঁছিল। সামাজিক এবং ধর্মগত কারণেও দেশবাসীর মনে ইংরেজ সরকারের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হইল। ইংরেজ সাম্রাজ্যস্থাপনের পথপ্রদর্শক ছিলেন খৃষ্টান পাদ্রীরা। ইঁহারা এদেশবাসীকে নানাভাবে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এই কার্যে ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেছিলেন। অপরদিকে কিছুটা উদারনৈতিক মনোভাবের জন্য এবং কিছুটা শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে ইংরেজ সরকার পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারের কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু, দেশের সাধারণ মানুষের সন্দেহ হইল যে এইসব সমাজ সংস্কারের ভিতর দিয়া ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের ধর্মনাশের চেষ্টা করিতেছে। দেশের গোঁড়া পণ্ডিত এবং মৌলবীরা প্রাণপণে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন।

সিপাহীরাই এই সংগ্রামে অগ্রণী হয়। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের অসন্তুষ্ট হইবার নানা কারণ ছিল। ইংরেজ রাজত্ব প্রসারের নিমিত্ত ভারতীয় সিপাহীরা প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু তাহারা দেখিতে পাইল যে তাহারা এদেশীয় বলিয়া, নিতান্ত অনভিজ্ঞ ইংরেজ সৈন্যরা তাহাদের উর্ধ্বতন কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, একই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ইংরেজ এবং ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বেতন, ভাতা ইত্যাদির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তারপর, সাগর পারে গেলে তাহাদের জাতি নষ্ট হয়, হিন্দু সৈন্যদের মধ্যে এই ধারণা থাকা সত্ত্বেও, ইংরেজ সরকার ইহা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাদের সাগর পারে ব্রহ্ম যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করেন। মোট কথা, ভারতীয় সিপাহীদের উপর নানারূপ দুর্ব্যবহার হইতেছিল। ইতিমধ্যে 'এনফিল্ড' রাইফেল নামে এক রকম নূতন বন্দুক সৈন্যবাহিনীতে চালু করা হয়। এই বন্দুকের টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে ভরিতে হইত।

সত্যাসত্য জানা না থাকিলেও, রটিয়া গেল যে ঐ বন্দুকের টোটায় গোরু এবং শুয়ারের চর্বি আছে—হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সিপাহীদের জাতি নষ্ট করার জন্যই না কি এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই 'এন্‌ফিল্ড' বন্দুক হইতেই সিপাহী সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। প্রথমে, ১৮৫৭ সালে, বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে ভারতীয় সিপাহীরা 'এন্‌ফিল্ড' টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। ঐ বৎসরই মে মাসে মীরাটে সিপাহীরা ইংরেজদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিল। তারপর, বিভিন্ন সৈন্য-শিবির হইতে সিপাহীরা আসিয়া দিল্লীতে মিলিত হইল এবং শেষ মোগল বংশধর বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। ভারত হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করাই হইল সিপাহীদের উদ্দেশ্য। ইংরেজদের সহিত সিপাহীদের সশস্ত্র সংগ্রাম কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মধ্য ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। পেশোয়ার দত্তক পুত্র নানাসাহেব সিপাহীদের সহিত যোগ দিলেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈও সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুরুষের পোশাকে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আজিও আমাদের দেশে উদাহরণস্বরূপ হইয়া আছে।

সিপাহীদের সংগ্রাম

এই সংগ্রামে ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের সমর্থন থাকিলেও, ইহাকে ঠিক জাতীয় সংগ্রাম বলা চলে না। প্রথমত, দেশের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ তখনও তেমনভাবে জন্মে নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছিল। সিপাহীরা এবং কয়েকজন সিংহাসনচ্যুত দেশীয় রাজা ভিন্ন আর কেহ এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হয় নাই। সিপাহীদের মধ্যেও এক অংশ মাত্র বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। সংগ্রামে লিপ্ত সিপাহীরা যাহা করিতেছিল তাহা আবেগের বশেই করিতেছিল। তাহাদের কোনো সুপরিকল্পিত নীতি ছিল না; সুযোগ্য সর্বজনমান্য নেতারও তাহাদের মধ্যে বিশেষ অভাব ছিল।

সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ

ফলে, এক বৎসরের মধ্যে সিপাহীরা পরাজিত হইল। ইংরেজরা দিল্লী অধিকার করিল। বাহাদুর শাহের পুত্রদের হত্যা করা হইল এবং তিনি নিজে বর্মায় নির্বাসিত হইলেন। সংগ্রামের নেতাদের মধ্যে কেহ বা প্রাণ দিলেন, কেহ বা পলায়ন করিলেন

সংগ্রামের অবসান

এবং কাহারও বা ফাঁসি হইল। অসংখ্য সিপাহী প্রাণ হারাইল। সিপাহী সংগ্রামের অবসান হইল।

কিন্তু জাতীয় সংগ্রামের দিক হইতে সিপাহীদের এই সংগ্রাম যে ব্যর্থ হইল তাহা বলা চলে না। এই সিপাহীরাই আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রথম শহীদ। হাজার হাজার শহীদ, হাজার হাজার সিপাহীর রক্তে আমাদের মধ্যে জাতীয়ভাবের উন্মেষ ঘটিল। ইংরেজদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সাহস আমাদের বৃদ্ধি পাইল। এদিকে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজীর মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হয়। ইংল্যাণ্ড তথা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তখন জাতীয়ভাবের প্রাবল্য চলিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এই ভাবধারা ভারতীয়দের মনেও বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয়। দেশমাতৃকার প্রতি অনুরক্তি এবং আনুগত্য ভারতীয়দের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দাসত্বের গ্লানি এবং জাতির অপমান সম্পর্কে তাহারা বিশেষ ভাবে সচেতন হইয়া ওঠে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেশীয় ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে দেশ ইংরেজ শাসনের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করে এবং তাহার স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে থাকে।

জাতীয়ভাবের উন্মেষ

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা ভারতে জাতীয়তাবাদ উন্মেষে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিক্ষিত ভারতবাসীরা অতি আগ্রহের সহিত ঐ সব পত্রিকা পড়িতেন। লর্ড লিটন যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল তখন তিনি দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র দমনের আইন (Vernacular Press Act) পাশ করিয়া, ঐ পত্রিকাগুলির সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে সমালোচনার অধিকার কাড়িয়া লন। কিন্তু দেশ রাজনৈতিক চেতনা এবং জাতীয় চেতনা তখন এতখানি জাগরিত হইয়াছিল যে বাংলা 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এই আইন এড়াইবার জন্য রাতারাতি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। আজিও এই পত্রিকা ইংরেজীতেই প্রকাশিত হইতেছে। এই ব্যাপারে দেশবাসীর উত্তেজনার পরিমাণ অনুভব করিয়া

সংবাদপত্র দমন আইন

উদারনৈতিক গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণ দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্র দমনের আইন বাতিল করিয়া দেন।

এই সময় আর একটি ঘটনাও ভারতবাসীদের জাতীয় গৌরববোধকে বিশেষভাবে আঘাত করে। এতদিন পর্যন্ত আইন ছিল, কোনো ভারতীয় বিচারক ইউরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন না। ইহা ভারতীয়দের নিকট অত্যন্ত অপমানকর বলিয়া মনে হইত। রিপণের শাসনকালে সার ইল্‌বার্ট এক আইনের খসড়ায় ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দেরও বিচার করিবার অধিকার দানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইউরোপীয়রা এই আইনের খসড়ার (ইল্‌বার্ট বিল) বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিল। ভারতীয়রাও প্রতিআন্দোলন হইতে নিবৃত্ত রহিল না। অবশেষে দুই পক্ষে একটা মিটমাট হয়। দেশীয় বিচারকেরা ইউরোপীয়দের বিচারের অধিকার পাইলেন বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে ইউরোপীয়েরা অধিকাংশ ইউরোপীয় দ্বারা গঠিত জুরির সাহায্যে বিচারের দাবী করিতে পারে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

ইলবার্ট বিল

সিপাহী সংগ্রাম ব্যারাকপুরে আরম্ভ হইলেও, ইহার ঘটনাবলীর সহিত বাঙ্গালীর বিশেষ সংশ্রব ছিল না। সিপাহীরা বাঙ্গালী ছিল না। এমন কি শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এই সংগ্রামের বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু জাতীয়তাবোধ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে বাংলাদেশেই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়, এবং বাঙ্গালী জাতি এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। বাংলাদেশের নীল আন্দোলনও বাঙ্গালীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইতে বিশেষ সাহায্য করে। ইংরেজ বণিকেরা বড়ো বড়ো কুঠি করিয়া ধান-চাষের জমি লইয়া বাংলাদেশে নীল (Indigo) চাষ করিতে আরম্ভ করে। এই সব কুঠিয়ালরা নিজ আর্থিক স্বার্থ আদায় এবং পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দরিদ্র, নিরীহ কৃষকদের উপর নানাভাবে অকথ্য অত্যাচার করিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নানাস্থানে কৃষকরা রুখিয়া দাঁড়ায়। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা জাতীয় ভাবের প্রেরণায় কৃষকদের পক্ষে দাঁড়ান। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা

বাংলার নব জাগরণ

বিশেষভাবে দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ পাদ্রী লং সাহেবের নামে প্রকাশিত হয়। অপর দিকে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকুঠির মালিকদের সব অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করিতে থাকেন। ইংরেজ সরকার দমনমূলক নীতির সাহায্যে নীল আন্দোলন বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করার অপরাধে লং সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা এবং এক মাসের জেল হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় লং সাহেবের জরিমানার টাকা দিয়া দেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামেও মানহানিকর মামলা দায়ের করা হয়। মামলা চলা-কালে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। লং-এর কারাদণ্ড ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ফলে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপিয়া প্রবল আলোড়নের স্বষ্টি হয়।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের লোক। ব্রাহ্মরাই বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের মতো লোকের নেতৃত্ব লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন এবং সমাজ-সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি তরুণ ব্রাহ্মদের প্রচেষ্টায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহা স্থাপনের অল্পকাল মধ্যেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক আন্দোলন চালাইবার সুযোগ আসিল। আই. সি. এস্. পরীক্ষায় ভারতীয়দিগকে অধিকতর সুযোগদানের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্রনাথ সুবক্তা ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া তিনি ভারতব্যাপী এক তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের এবং দেশীয় লোকদের অস্ত্র রাখার বিরুদ্ধে আইন-এর প্রতিবাদেও অগ্রণী হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলনেও ইহা বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। এই সব আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সুরেন্দ্রনাথ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া সর্বভারতীয় জনমত

সর্বভারতীয় আন্দোলন গঠন

গঠন করিতে চেষ্টা করেন। এইভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্র দেশের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সূত্রপাত হয়।

ইতিমধ্যে ছাত্ররাও স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়াইয়া পড়িতেছিল। ছাত্ররা স্বভাবতই আদর্শবাদী। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের এবং সমাজ-সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু আনন্দমোহন বসু স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন নামে ছাত্র সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে এক সর্বভারতীয় সভা আহ্বান করা হয়। এই বিরাট কনফারেন্সে ভারতের সকল অংশ হইতেই প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হন। তাঁহারা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার, সিভিল সার্ভিসের সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই কনফারেন্স জাতীয় আন্দোলন পরিচালনের নিমিত্ত একটি স্থায়ী সর্বভারতীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাবও গ্রহণ করেন।

ন্যাশনাল কনফারেন্স

ভারতের জনমত যে জাগ্রত হইয়াছিল, একথা ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকারও অনুভব করিতে পারিতেছিলেন। গণতান্ত্রিক দেশের লোক হিসাবে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছিলেন যে এই জনমতকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণাও হয়তো ছিল যে, এই জনমত ইংরেজী শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উহাদের হয়তো চাকুরী ইত্যাদি দিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস্. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের লক্ষ্য করিয়া একখানা খোলা চিঠি লেখেন। ইহাতে তিনি ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের পরামর্শ দেন। সম্ভবত হিউম সাহেব তখনকার গভর্ণর জেনারেলের সহিত পরামর্শ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠিতে ব্যক্ত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে স্থানীয় নেতারা হিউম সাহেবের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

করেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুগামীদের 'রাজবিদ্রোহী' বলিয়া এই অধিবেশনে আহ্বান করা হয় নাই। এইভাবে ইংরেজ সরকারের পরোক্ষ সমর্থন লইয়া জাতীয় কংগ্রেস জন্মলাভ করে। সেদিন হয়তো ইংরেজ সরকার বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রধানত এই কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলেই ইংরেজদের একদিন ভারত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যাহা হউক, এদিকে যখন বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল, কলিকাতায় তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন চলিতেছিল। পরবৎসর, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ইংরেজ সরকারের চাল ব্যর্থ হয়। জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রাধান্য লাভ করেন। ফলে, 'রাজবিদ্রোহীদের' কংগ্রেস হইতে বাদ দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অধিবেশনে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং জাতীয় কংগ্রেস একত্র মিলিত হইয়া জাতীয় মহাসভায় পরিণত হয়। এই মহাসভার নাম জাতীয় কংগ্রেসই থাকিয়া যায়। ইংরেজ সরকারের পক্ষপুষ্ট হইয়া জন্মলাভ করিলেও, ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেই কংগ্রেস ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক এবং বাহক হইয়া ওঠে।

কংগ্রেস জাতীয়রূপ ধারণ করিলেও, প্রথম প্রথম ইহার কর্মপন্থা ছিল নরমপন্থী। ইংরেজ সরকারের সহিত প্রত্যক্ষ কোনো সংঘর্ষের চিন্তাও করা হইত না। প্রতিবৎসর নেতারা কংগ্রেসের অধিবেশনে মিলিত হইয়া ইংরেজ সরকারের কাছে দেশের অভাব-অভিযোগের কথা জানাইতেন। আবেদন-নিবেদনই ছিল তাঁহাদের প্রধান সম্বল। ইংল্যাণ্ডে, প্রকৃত শাসকদের মন যাহাতে ভারতের অভাব-অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় সেই উদ্দেশ্যেও কংগ্রেস চেষ্টা করিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডে 'ইণ্ডিয়া' নামক একখানা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে কিছু ফলও পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতের দাবীর প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হইয়া ওঠে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ ব্রাড্‌লক্ নামে বৃটিশ পার্লামেণ্টের একজন সদস্য কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে ভারতবর্ষে আসেন। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, বৃটিশ পার্লামেণ্টে

নরমপন্থী নীতি

কাউন্সিল এ্যাক্ট পাশ হয়। এই এ্যাক্ট-এর দ্বারা ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিতে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে মুসলমানেরা কিন্তু সাধারণত নিজেদের কংগ্রেস আন্দোলন হইতে বিযুক্ত করিয়াই রাখিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে কংগ্রেসের সহিত সংস্রব রক্ষা না করিলেই, ইংরেজ সরকার তাঁহাদের দলীয় স্বার্থের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। তাই স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের নেতৃত্বে মুসলমানেরা এই সময়ে মহমেডান-এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন অব্‌ ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড পেট্রিয়ট্‌স এ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি কয়েকটি দলীয় সংস্থা গঠন করেন। এইভাবে ভারতের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়।

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক নীতির সূত্রপাত

অপরদিকে জাতীয় কংগ্রেস বেশী দিন নরমপন্থী থাকিতে পারিল না। প্রথম প্রথম ব্যারিষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতি উচ্চবিত্ত লোকেরাই কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। ধীরে ধীরে মধ্যবিত্তেরা কংগ্রেসে স্থান করিয়া লইতে লাগিলেন। ইঁহারা কংগ্রেসে বামপন্থী চিন্তাধারা সংক্রামিত করিলেন। বামপন্থী চিন্তাধারার নায়কগণ কৃষক এবং শ্রমিকদেরও কংগ্রেসের ভিতর আনিয়া উহাকে প্রকৃত গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে এবং ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন পরিত্যাগ করিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভের নিমিত্ত বিধিবদ্ধ-ভাবে আন্দোলন চালাইতে সংকল্প করেন। তখন বাংলাদেশেই বামপন্থীদের সংখ্যা বেশী ছিল। উহাদের মুখপাত্র ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে দ্বারকা-নাথ আসামের চা বাগানের কুলিদের স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। একই সময়, অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশাল হইতে ৪৫,০০০ লোকের স্বাক্ষরসহ এক স্মারকলিপি কংগ্রেসের নিকট পেশ করেন। ইহাতেই কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দাবী লইয়া আন্দোলন চালাইতে অনুরোধ করা হয়। অপরদিকে, মহারাষ্ট্রের তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকার মাধ্যমে বামপন্থী আন্দোলন চালাইতেছিলেন। বৃটিশ সরকারের নিকট অনুরোধ-উপরোধের পালা শেষ করিয়া, তিনি কার্যকরীভাবে উহার বিরোধিতা করার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কংগ্রেসে বামপন্থী চিন্তাধারার উদ্ভব

এই সময়, গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জনের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতেছিল, তাহাতে ইন্ধন যোগাইল। লর্ড কার্জন কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া বাংলার জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিলেন। লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া বাংলার জাতীয়তাবোধে সর্বাপেক্ষা বড়ো আঘাত দিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার নামে তিনি বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া ১৯০৫ সালে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিলেন। হয়তো, তাঁহার আশা ছিল যে, এইভাবে বিভক্ত করিয়া তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর সংগ্রামক্ষমতা হ্রাস করিবেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। বাঙ্গালীদের জাতীয়তাবোধ সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইল। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ রোধ করিতে বাঙ্গালী দৃঢ়সংকল্প হইল। বঙ্গ ভঙ্গ নিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিলেন। জাতীয়তাবাদী সকল ভারতবাসীরই এই আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন ছিল।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন

ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নিল। বিলাত হইতে আগত সর্বপ্রকার জিনিস বর্জন এবং স্বদেশজাত জিনিস ব্যবহার করণের নিমিত্ত নেতারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলনের ফলে ইংরেজদের অর্থনৈতিক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বিপর্যস্ত করা যাইবে এই ভরসা ছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এবং 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের অগ্নিবর্ষী লেখা বাঙ্গালীকে এই সংগ্রামে শক্তি যোগাইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বন্দেমাতরম্' হইল এই সময় জাতীয় সঙ্গীত। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও আবেগের বশে এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নেতাদের পরিচালনায় শোভাযাত্রা করিয়া, বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তাহারা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। চারিদিকের বাড়ীতে যেসব বিলাতী দ্রব্য ছিল বাড়ীর লোকেরা তাহা স্বেচ্ছায় আনিয়া তাহাদের নিকট জমা দিতে লাগিল। তারপর কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আরম্ভ হইল বিলাতী দ্রব্যের বহ্নি-উৎসব। দেশবাসীর মন আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম

বাঙ্গালীর নিকট বরেণ্য বিপিনচন্দ্র পাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি সকলেই এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। মুসলমান নেতাদের মধ্যে আব্‌দুল রসুল এবং লিয়াকৎ হুসেন গজনভী এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। এই আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করিয়া ছাত্রদের স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া। ইহার ফল হিসাবে, কলিকাতায় জাতীয় মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়।

সমগ্র ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তার

ইংরেজ সরকার আর একটি ভুল করিলেন। ভাবিলেন, গায়ের জোরে এই আন্দোলনকে দমন করা যাইবে। শোভাযাত্রাকারীদের উপর লাঠি চালানো হইল; বিদেশী দ্রব্য বয়কটের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে দলে দলে লোককে বন্দী করা হইল। কিন্তু অত্যাচার যত বাড়িতে লাগিল, আন্দোলনও তত শক্তিশালী হইতে লাগিল। শোভাযাত্রাকারীরা, কারাবদ্ধ বন্দীরা—জাতীয় বীরের সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। আন্দোলন শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ রহিল না, উহা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রে তিলক, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায়—ইঁহারা আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হইলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

এই আন্দোলনের মধ্যে ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে নরম এবং চরমপন্থীদের মধ্যে প্রবলভাবে মতের সংঘর্ষ ঘটে। চরমপন্থীদের কংগ্রেসের মধ্যে পরাজয় ঘটিলেও, পত্রিকাদির মাধ্যমে (যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, নবশক্তি ইত্যাদি) তাঁহারা দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের মতবাদ ছড়াইতে লাগিলেন। ইংরেজ সরকার চরমপন্থীদের আন্দোলনের উপর দমননীতি চালাইলেন। বাংলার যুব সম্প্রদায়ের তখন চরম উত্তেজনার মুহূর্ত। অহিংস আন্দোলনে ফল লাভ হইবে না ভাবিয়া তাহারা সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাংলাদেশের অনেক স্থানে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইল। দেশের শত্রুদের ছলে-বলে বিনষ্ট করাই হইল এই গুপ্তসমিতিগুলির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আত্মবলিদান

চরমপন্থী মতবাদের প্রচার এবং বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি

করিতে সর্বদাই তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। ইঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্তত প্রথম প্রথম খোলাখুলিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করা সম্ভব নহে। অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যার দ্বারা তাহাদের মনে ত্রাসের স্থষ্টি করা ছিল তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯০৮ সালে বালক খুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ভুল করিয়া কেনেডি নামে আর একজনকে হত্যা করেন। তাঁহারা ধরা পড়েন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। হাসিতে হাসিতে ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়ি গলায় পরিলেন। তাঁহার 'বীরত্বের' কাহিনী পল্লী-গীতিতে প্রচারিত হইয়া অজ পাড়াগাঁয়ের লোকদেরও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯০৮ সালে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি আরও অনেক অনেক সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়িলেন। বিচারে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পাইলেন, কিন্তু বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের দ্বীপান্তর হইল। ইহাতেও সন্ত্রাসবাদের অবসান হইল না। সন্ত্রাসবাদের প্রসারের ফলে আমাদের

মোরলে-মিণ্টো শাসন সংস্কার এবং বঙ্গ ভঙ্গ রদ

শাসনকর্তারা বুঝিতে পারিলেন যে দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ কতখানি জাগিয়াছে। কেবলমাত্র দমননীতির দ্বারা বেশী ফল লাভ হইবে না। তাই, ১৯০৯ সালে মোরলে-মিণ্টো শাসনসংস্কারের প্রবর্তন করিলেন। ইহার দ্বারা আইন সভায় বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি হইল এবং দেশীয় লোকদের কিছু উচ্চপদে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হইল। ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গও রহিত হইল। কিন্তু, এই সব ব্যবস্থার ফলেও দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না।

এদিকে দেশবাসীর মধ্যে বিভেদের স্থষ্টি করিয়া সরকার ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯০৬ সালে

বিভেদনীতি এবং মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

আগা খাঁ লর্ড মিণ্টোর সহিত দেখা করিয়া, আইন সভায় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানান। এই অনুরোধের অর্থ এই যে, আইন সভায় মুসলমান সদস্যদের আসন নির্দিষ্ট থাকিবে এবং তাঁহারা শুধু মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টির সুযোগ লইয়া লর্ড মিণ্টো জানান যে তিনি আগা খাঁর প্রস্তাব

সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া, ঢাকার নবাব সালিম উল্লাহ, মুস্‌লিম লীগের প্রতিষ্ঠা করিলেন। মিণ্টো সাহেব ইহাতে খুশী হইলেন ; তিনি মত প্রকাশ করিলেন যে মুসলিম লীগ একটি কংগ্রেস বিরোধী প্রতিষ্ঠান।

১৯১৬ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার কালে, লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এক চুক্তি হয়। তাহাতে কংগ্রেস মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন নীতি মানিয়া লয়। ইংরেজদের বিভেদ নীতি অকেজো করার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছিল। ফলে, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যুগ্মভাবে শাসনসংস্কারের দাবী জানাইল। ১৯১৬ সালেই বাল গঙ্গাধর তিলক হোম রুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী এ্যানি বেসান্তও অনুরূপ একটি লীগ স্থাপন করেন। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন চালানোই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১৭ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের বামপন্থী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রভাবে কংগ্রেস আর অল্পসল্প শাসনসংস্কারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, পূর্ণ স্বরাজের দাবী করিল। ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে নরমপন্থীদের পূর্ণ পরাজয় হইল এবং নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে আসিল। ফলে, শ্রমিক এবং কৃষকরা দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট চলিতে লাগিল।

পূর্ণ স্বরাজের দাবী

যুদ্ধ অবসানের পর ইংরেজ সরকারের নীতিতে ভারতবাসী খুবই নিরাশ হইয়াছিল। যুদ্ধে তাহারা ইংরেজদের সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিল। এই আশায় যে যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীনতা পাইবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। অধিকন্তু খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য তাহাদের দুর্দশা বৃদ্ধি পাইল। ফলে, চারিদিকে নানারূপ আন্দোলন দেখা দিল। শ্রমিক আন্দোলন ইহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯২০-২১ সালের মধ্যে মোট প্রায় ৬,০০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। এইসব আন্দোলন দমনের নিমিত্ত সরকার দমন নীতি প্রয়োগ করেন। ১৯১৯ সালে কুখ্যাত রাওলাট এ্যাক্ট পাশ হয়। সংবাদ-পত্রের মুখ বন্ধ করা, যথেচ্ছভাবে রাজনৈতিক অপরাধীদের দণ্ডদান করা

রাওল্যাট এ্যাক্ট

বা দেশবাসীকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা প্রভৃতি বিধান এই আইন-এ স্থান পাইয়াছিল।

এই সন্ধিক্ষণে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয়। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ দেশের বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরিয়া আসেন। রাওলাট এ্যাক্ট যখন বিধিবদ্ধ হইতেছিল, তখনই তিনি ইহার বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেল চেমস্‌ফোর্ডের নিকট প্রতিবাদ জানান। এই আইন পাশ হওয়ার পর,

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূত্রপাত ও জালিয়ানওয়ালা-বাগ
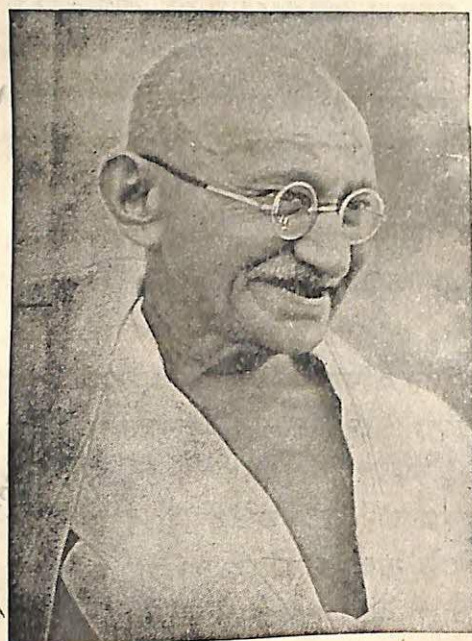
মহাত্মা গান্ধী

ইহা অমান্য করার নিমিত্ত সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান। সশস্ত্র শাসকের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র শাসিতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সত্যাগ্রহ মহাত্মা গান্ধীর এক বড়ো অবদান। মন হইতে বিদ্বেষ দূর করিয়া সাহসিকতার সহিত, শান্ত, নিরস্ত্রভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদকে মহাত্মা গান্ধী নামকরণ করেন সত্যাগ্রহ। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে নানাস্থানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইল। সরকার দমন নীতি তীব্রতর করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন। অমৃতসরে, জালিয়ানওয়ালাবাগে রাওলাট আইনের প্রতিবাদের নিমিত্ত আহূত এক নিরস্ত্র জনসভার উপর বৃটিশ জেনারেল ডায়ার সাহেবের আদেশে গুলি চালানো হয়। চারিশত নিরীহ নরনারী ইহাতে প্রাণ হারায়। জালিয়ানওয়ালাবাগ শহীদক্ষেত্রে পরিণত হয়। আজও প্রতি বৎসর ভারতের সর্বত্র জালিয়ানওয়ালাবাগ

দিবস প্রতিপালিত হইয়া থাকে। জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো পৃথিবীবরেণ্য মহাপুরুষ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বৃটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট্' অর্থাৎ "স্যার" উপাধি ত্যাগ করেন।

১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার

দমনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে কিছুটা তোষণেরও চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯১৯ সালে আর একটি শাসন-সংস্কার আইন পাশ করা হয়। এই আইনের ফলে ভারতে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা (Diarchy) প্রবর্তিত হয়। শাসনকার্যকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় শাসন-ব্যবস্থাতেই এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষা, বিচার, সেচ, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়গুলি ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থ, দেশরক্ষা, পরিবহণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পূর্বেরই মতো গভর্ণর জেনারেল বা গভর্ণরের হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি কার্যনির্বাহক সভার সাহায্যে ঐসব বিষয়গুলির পরিচালনা করেন। এই আইনের বলে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলিকে দুই কক্ষযুক্ত আইন সভায় পরিণত করা হয়। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল বা গভর্ণরের হাতে আইনসভা কর্তৃক পাশ করা যে কোনো আইন বাতিল করিবার ক্ষমতা থাকে। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। কারণ প্রকৃত ক্ষমতা বৃটিশদের হাতেই রাখিয়া দেওয়া হয়। তাই স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতে থাকে এবং সরকারকে রাওলাট এ্যাক্ট পাশ করিতে হয়। কিন্তু প্রবল আন্দোলনের ফলে দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই এ্যাক্টকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন

এই সময় ভারতীয় মুসলমানরাও বিশেষ কারণে বৃটিশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, মুসলমানদের সর্বোচ্চ ধর্মযাজক (খলিফা) তুরস্কের সুলতানের সাম্রাজ্য বৃটিশরা অগ্রণী হইয়া খণ্ডিত করে। ভারতীয় মুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশের এই কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। আলি ভ্রাতৃদ্বয়, মহম্মদ আলি ও সওকত আলি, এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত

খিলাফৎ আন্দোলন সংযুক্ত করিয়া ভারতে ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থা একেবারে অচল করিয়া দিতে চাহিলেন। ১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসিল। ইহাতে মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র ভারতব্যাপী অসহযোগ পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। একই বৎসরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই পরিকল্পনা পুনরায় অনুমোদন লাভ করিল। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। আন্দোলনের মূল কথা হইল, সরকারের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জন করা। সরকারের চাকুরী, স্কুল, কলেজ, আদালত, আইনসভা সব কিছু বর্জন করিয়া শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করিয়া দিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানাইলেন।

দেশবাসী এই আন্দোলনে অভাবনীয়রূপে সাড়া দিয়াছিল। নূতন শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে যখন ১৯২০ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হইল, অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে পড়িয়া প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক ইহাতে ভোটদানে অংশ গ্রহণ করিল না। অনেক আইনজীবি আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন। আইন-ব্যবসা পরিত্যাগকারীদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, বিলাতী কাপড় ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সর্বসমক্ষে তাহা পোড়াইয়া ফেলা এবং অহিংসভাবে সরকারের আইন অমান্য করা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য লোক প্রতিদিন দলবদ্ধ হইয়া বিলাতী কাপড় পোড়াইতে লাগিল এবং সরকারের আইন ভঙ্গ করিতে লাগিল। সরকার উহাদের ধরিয়া জেলে পাঠাইলেন। প্রায় ৩০,০০০ হাজার লোক কারাবরণ করিল। কারাগারের ভয় আর লোকের রহিল না। বরং কারাগারে যাওয়ার সময় এবং কারাগার হইতে মুক্তি পাওয়ার সময়, দেশবাসী সত্যাগ্রহীদের বিজয়ী বীরের সম্মান দিতে লাগিল।

১৯২১ সাল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরও জোরের সহিত চালাইতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। স্থির হইল যে মহাত্মা গান্ধীই হইবেন এই আন্দোলন-পরিচালনায় সর্বাধিনায়ক। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য জনসাধারণের

উৎসাহ চরমে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলা সমীচীন মনে করিলেন। তিনি কেবলমাত্র বরদৌলি জেলায় সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু, ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়া গেল। উত্তর প্রদেশে গোরক্ষপুরে আন্দোলনের উন্মাদনায় সত্যাগ্রহীগণ সহিংস হইয়া পড়িল। তাহারা একটি থানায় আগুন লাগাইয়া দিল এবং ইহার ফলে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী প্রাণ হারাইল। হয়তো এই ধরনের ঘটনার আশঙ্কায়ই, মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন বরদৌলিতে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, সত্যাগ্রহ আন্দোলন হিংসার পথে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন।

স্বরাজ্য পার্টি

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের একদল প্রভাবশালী নেতা, নূতন শাসন-সংস্কার আইন ধ্বংস করিবার নিমিত্ত, নূতন নীতি অবলম্বন করার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে পরবর্তী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া, বিধান সভার ভিতর হইতে, শাসন-ব্যবস্থাকে অচল করিয়া তুলিবেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইঁহারা 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে এক নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের নীতি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সরকারের সহিত পূর্ণ অসহযোগিতার নীতি হইতে পৃথক হইলেও ইহার উদ্দেশ্য একই ছিল। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া স্বরাজ্য পার্টি বাংলাদেশে এবং উত্তর প্রদেশে জয়লাভ করিল। এই দলের লোকেরা আইন সভার ভিতরে তীব্র বিরোধিতা করিয়া সরকারকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

সাইমন কমিশন

ইতিমধ্যে, লর্ড আরউইন যখন গভর্ণর জেনারেল, তখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট সাইমন কমিশন নামে এক কমিশন ভারতবর্ষে পাঠাইলেন (১৯২৭ সাল)। এই কমিশনের উপর নির্দেশ ছিল যে, ১৯২৯ সালের শাসনসংস্কার কতখানি কার্যকরী হইয়াছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীকে মিথ্যা প্রবোধ দেওয়াই এই কমিশন নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল। এই কমিশনে একজনও ভারতীয় না থাকায় কংগ্রেস উহার সহিত সহযোগিতা করে না।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায়ের অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবার তিনি স্থির করেন যে,

জনসাধারণের লবণ প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে সরকারের যে আইন আছে তাহা ভঙ্গ করিয়া তিনি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ৬ই এপ্রিল কয়েকজন অনুচরসহ তিনি পদব্রজে ডাণ্ডি অভিমুখে (প্রস্তাবিত লবণ আইন অমান্য করার স্থান) রওনা হন। রাস্তায় দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দেয়। সরকার মহাত্মা গান্ধীকে বন্দী করিলেন। ফলে, ভারতের সর্বত্র সরকার বিরোধী আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। বিলাতী দ্রব্য বর্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, সরকারী অফিসের সম্মুখে পিকেটিং ইত্যাদি সর্বত্র চলিতে থাকে। এবারকার আন্দোলনে মেয়েরাও দলে দলে যোগ দেন। কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও আন্দোলন চলিতে থাকে। সরকারের হিসাবমতোই, এই আন্দোলন দমনের চেষ্টায় ২৯টি স্থানে গুলি চালানো হয়, ১০৩ জন লোক প্রাণ হারায় এবং ৪২০ জন লোক আহত হয়। এক বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ষাট হাজার লোক কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহীদের উপর বেপরোয়া মারপিট চলে। মেয়েরাও বাদ যান নাই। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ফলে, ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে বৃটিশ সরকার বুঝিতে পারেন যে দমন নীতির সাহায্যে সুফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাই, তাঁহারা ভারতবাসীর সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার চেষ্টা স্থির করিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

এদিকে সাইমন কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিল এই রিপোর্টের ভিত্তিতে, কি ধরনের শাসন-ব্যবস্থা চালু করিলে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারে। এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনার নিমিত্ত ১৯৩০ সালে লণ্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক সভা আহ্বান করা হয়। ইহা প্রথম গোল টেবিল বৈঠক নামে খ্যাত। কংগ্রেস তখন অসহযোগ আন্দোলন চালাইতেছে, তাই কংগ্রেস প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিল না। জনমতের চাপে পড়িয়া সরকার গান্ধীজিকে মুক্তি দিলেন এবং গভর্ণর জেনারেল আরউইনের সঙ্গে তাঁহার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (গান্ধী-আরউইন চুক্তি)। এই চুক্তি অনুসারে, সকল অসহযোগ আন্দোলনকারীদের মুক্তি দেওয়া হইল। কংগ্রেস দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩১ সাল) যোগ দিতে স্বীকার করিল।

গোল টেবিল বৈঠক

কিন্তু ঐ বৈঠকের সাফল্যের পথে অনেক বাধা দেখা দিল। ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে এক সর্বভারতীয় মুসলিম কনফারেন্স আহ্বান করা হয় এবং ইহার আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া জিন্নাহ্ মুসলমানদের তরফ হইতে ১৪ দফা দাবীর তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার অধিকাংশ দাবীই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মুসলমান সমাজের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। গোল টেবিল বৈঠকেও জিন্নাহ্ সর্বভারতীয় নীতির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বন করিলেন।

জিন্নাহ্‌র ১৪ দফা দাবী

বৃটিশরা আলোচনা সভায় হিন্দু-মুসলমানের নীতিগত বিরোধের সুযোগ নিতে চেষ্টা করিল। তখন মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তিতে বৃটিশের নিকট হইতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আদায় করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মনোভাব সকলের নিকটই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইল। ১৯৩২ সালে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দিল না।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর দেশে ফিরিয়া মহাত্মা গান্ধী পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবার বৃটিশ সরকারের দমন নীতি আরও চরমে পৌঁছিল। সত্যাগ্রহীদের উপর (স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে) লাঠি চালনা, গুলীবর্ষণ ইত্যাদি সব রকম জুলুমই চলিল। ভারতীয়দের ঐক্য নষ্ট করিবার নিমিত্ত, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রবর্তন করিলেন (১৯৩২ সাল)। ইহার দ্বারা শুধু মুসলমানদের নহে, অনুন্নত সংখ্যালঘু হিন্দুদেরও (তপশীল সম্প্রদায়—Scheduled class) পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং তাহাদিগকে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। বৃটিশের এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে, বিশেষ করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করানোর জন্য, মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রাণরক্ষার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ফলে, তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর আম্বেদকারের সঙ্গে পুনরায়

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা

এক চুক্তি হইল। ডক্টর আম্বেদকার বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষিত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ত্যাগ করিলেন। বিনিময়ে তপশীলী সম্প্রদায়কে বাটোয়ারায় যে পরিমাণ প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল কংগ্রেস তাহার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দিতে রাজী হইল।

সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং গোল টেবিল বৈঠকগুলির আলাপ-আলোচনা ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ সালে ভারতে নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্তন করা হইল। ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federation of States) বলিয়া ঘোষিত হইল। বৃটিশের অধীনস্থ প্রদেশগুলি ইহাতে রাজ্য হিসাবে যোগ দিল। স্থির হইল, ইচ্ছা করিলে দেশীয় নরপতিশাসিত রাজ্যগুলিও ইহাতে যোগ দিতে পারে। মুসলমান এবং তপশীল শ্রেণীর হিন্দুদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। আইন সভাগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা সমর্থিত মন্ত্রি-মণ্ডলী সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন, ইহাও স্থির হইল। পূর্বপ্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিল। কিন্তু ইচ্ছা করিলে গভর্ণর জেনারেল এবং গভর্ণরগণ মন্ত্রীদের সব রকম কাজেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী হইতে পারেন। গভর্ণর জেনারেল এবং গভর্ণরদের হাতে ঐরূপ ক্ষমতা দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্র গ্রহণে অস্বীকার করিল। ইহাতে বিচলিত হইয়া তখনকার গভর্ণর জেনারেল লিন্‌লিথ্‌গো প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি এবং গভর্ণরগণ মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতির ফলে কংগ্রেস এখন শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশের আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল এবং ঐসব প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিল।

১৯৩৯ সালের শাসন-সংস্কার

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাবের দিন হইতে এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস প্রায় তাঁহার নির্দেশেই পরিচালিত হইতেছিল। কিন্তু এই সময় সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসে এক বামপন্থী দলের অভ্যুত্থান হইল। দীর্ঘদিন হইতে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। যুব সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। ১৯৩৮ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত

ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন

হইয়াছিলেন। তাঁহার বামপন্থী নীতি গান্ধীজি প্রভৃতি প্রবীণ নেতাদের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু, সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে প্রবীণ নেতাদের মনোনীত প্রার্থীকে অসংখ্য ভোটে পরাজিত করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে দক্ষিণপন্থীদের সহিত কাজ করা সম্ভব নয় দেখিয়া সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি সর্বভারতীয় দল গঠন করেন। স্বভাবতই বাংলাদেশে এই দলের প্রভাব বেশী হয়।

ইতিমধ্যে (১৯৩৯ সালে) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো নিজ দায়িত্বে ভারতকে যুদ্ধে জড়িত করায় ইহার প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। এই সুযোগে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব গঠন করে। কংগ্রেস তখন যুদ্ধে সহযোগিতার শর্ত হিসাবে, ভারতকে যুদ্ধান্তে স্বাধীনতা দানে বৃটিশ সরকারকে রাজী করাইতে চেষ্টা করে। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে লিন্‌লিথ্‌গো এক ঘোষণায় জানান যে যুদ্ধান্তে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধান সভা আহ্বান করা হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাবে জানান যে একা কংগ্রেসের হাতে তিনি কিছুতেই শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন না। এই ঘোষণায় মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ খুবই উৎসাহিত হন। প্রকারান্তরে ইংরেজ সরকার মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস হয়। উৎসাহিত হইয়া, সাম্প্রদায়িকতার শেষ বিষফল হিসাবে, তিনি তাঁহার 'দুইজাতি মতবাদ' প্রচার করিতে থাকেন। ইহার অর্থ, ভারতের হিন্দু-মুসলমান শুধু ধর্মেই পৃথক নহে, তাহারা জাতিতেও (nationality) পৃথক। কাজেই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিলে, জাতিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ দেওয়ার নীতি স্বীকৃত হইলে, মুসলমানদিগকে 'পাকিস্তান' গঠনের সুযোগ দিতে হইবে। প্রগতিশীল মুসলমানগণ জিন্নাহ্‌র এই মতবাদ সমর্থন না করিলেও, ইংরেজ সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে জিন্নাহ্‌ মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবী করিতে লাগিলেন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান গঠনের দাবী পাশ হয়।

দুইজাতি মতবাদঃ পাকিস্তান দাবী

ইতিমধ্যে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে ভারতের

সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত আপস-আলোচনা চালাইতে এদেশে আসেন। তিনি যুদ্ধান্তে শাসন-সংস্কারের যে নূতন প্রস্তাব করিলেন, তাহাতেও গভর্ণর জেনারেল এবং গভর্ণরদের সর্বাত্মক ক্ষমতা হ্রাসের কোনো কথা না থাকায়, কংগ্রেস উহা গ্রহণযোগ্য মনে করিল না। পাকিস্তান গঠনের দাবী এই প্রস্তাবে স্বীকার না করায় মুসলিম লীগও উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

ষ্ট্যাফোর্ড দৌত্য

ক্রিপস্‌ মিশনের ব্যর্থতার পর ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হইয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় থাকিলে জাপান ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিবে; কিন্তু তাহারা ভারত ছাড়িয়া গেলে দেশ বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে। ১৯৪২ সালে ৮ই আগষ্ট বোম্বাইএ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ভারত ছাড় (Quit India) প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইল। "ভারত ছাড়" প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পরদিন সকালেই বৃটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধী এবং আরও বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সরকার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ইহার ফলে আন্দোলন না কমিয়া বরং বৃদ্ধি পাইল। বাংলা দেশে মেদিনীপুরে এই আন্দোলন প্রবল রূপ নেয়। এদিকে নেতৃত্বহীন আন্দোলন কিছুটা হিংসার পথ ধরিল। আন্দোলনকারীরা সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, টেলিগ্রাফের তার, থানা প্রভৃতি বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অপর দিকে পুলিশের অত্যাচার, সেনা-বাহিনীর গুলীবর্ষণ ইত্যাদির ফলে বহু ভারতবাসী প্রাণ হারাইল। সমগ্র দেশে যেন এক বিদ্রোহের আবহাওয়া বহিয়া চলিল। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু আন্দোলনের হিংসাত্মক গতি সমর্থন করিলেন না। তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করিলেন এবং হিংসাত্মক কার্যাবলীর নৈতিক প্রতিবাদ হিসাবে, দীর্ঘ তিন সপ্তাহ অনশনে ব্রতী হইলেন।

কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আওতায় এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যাভাবে মৃত লোকের দেহ পথে পথে পড়িয়া থাকে। খাদ্যের প্রয়োজনে পিতামাতা সন্তানকে বিক্রয় করে, স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ

করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর, ভারতে এত বড়ো দুর্ভিক্ষ আর দেখা যায় নাই। দেশবাসীর ধারণা হইল যে মুসলিম লীগ সরকারের দেশপ্রেমের অভাবের সুযোগ লইয়া বৃটিশ সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ

এই বৎসরই একটি প্রায় অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিল। বৃটিশ সরকারের চোখে ধূলা দিয়া, দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র কলিকাতার বন্দীদশা হইতে পলাইয়া, কাবুল হইয়া জার্মানী চলিয়া যান। তারপর তিনি সিঙ্গাপুরে আসিয়া, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে জাপানী হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ (I.N.A.) গঠন করেন। এই ফৌজে, হিন্দু-মুসলমান সকলে সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়ায়। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের উদ্দেশ্য হইল ভারতকে বৃটিশদের হাত হইতে মুক্ত করা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ সরকার নাম দিয়া সিঙ্গাপুরেই স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তারপর নেতাজীর সৈন্যবাহিনী ভারতবর্ষের দিকে স্থলপথে অগ্রসর হইল। আসামে কোহিমা, বিষেণপুর (কাছাড় জেলার শিলচর হইতে অল্প দূরে) প্রভৃতি স্থান দখল করা হইল। এই সময় জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের মুখে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সে যথোপযুক্ত সাহায্য দিতে পারিল না। ফলে, খাদ্যাভাবে সুভাষচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইল এবং অবশেষে আত্মসমর্পণও করিতে হইল। সুভাষচন্দ্রের কিন্তু কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগষ্ট এক বিমান দুর্ঘটনায় জাপানে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া নেতাজীর পরিবারের লোকেরা, এই ঘোষণায় আজও বিশ্বাস করেন না। ১৯৪৫ সালে ধৃত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবর্গের কয়েকজনের বিচার দিল্লীতে লাল কেল্লায় আরম্ভ হয়।

নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

সুভাষচন্দ্র বসু

কংগ্রেস তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করে। বিচারে মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ, কর্ণেল ধীলন প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিলেন। সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেম এবং বীরত্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইল। তাহার পর যে নির্বাচন হইল তাহাতে বৃটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিকদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি তাঁহারা অধিকতর সহানুভূতিশীল। এদিকে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় সকল প্রদেশেই জয়যুক্ত হইল। বাংলাদেশ ও সিন্ধু ভিন্ন সকল প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। যুদ্ধে বৃটেনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল তাহাতে গায়ের জোরে ঐদেশ যে আর বেশী দিন ভারতবর্ষকে শাসন করিতে পারিবে এমন ভরসা ছিল না। এই সময়ে বোম্বেতে রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভীর ভারতীয় কর্মচারিগণের বিদ্রোহ এই বিশ্বাস বৃটেনের মনে আরও দৃঢ়মূল করে। ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা দিন দিনই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদ দীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে এবং জনগণের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ইংরেজ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই অবস্থায় যদি তাহারা আপসে ভারত পরিত্যাগ করিয়া যায় তবেই প্রকৃত রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে লর্ড প্যাথিক লরেন্স, ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ এবং আলেকজাণ্ডার নামে বৃটিশ মন্ত্রিসভার (ক্যাবিনেটের) তিনজন মন্ত্রী দৌত্য করিবার নিমিত্ত ভারতে আসেন। এই দৌত্যকে 'ক্যাবিনেট মিশন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মুসলিম লীগের সহিত একমত হইতে না পারার দরুন কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের সামনে কোনো ঐক্যবদ্ধ দাবী উপস্থিত করিতে পারিল না। যাহা হউক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ক্যাবিনেট মিশন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন—১। ভারতে সর্বভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। ২। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি 'ক' শ্রেণীর, আর মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি 'খ' শ্রেণীর এবং বাংলাদেশ

ক্যাবিনেট মিশন

ও আসামকে 'গ' শ্রেণীর অঞ্চলে ভাগ করিয়া তিনটি অঞ্চলের সৃষ্টি করা হইবে। ৩। এই তিন অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সংবিধান সভা গঠিত হইবে। তিনটি অঞ্চল নিজ নিজ এলাকায় শাসনতন্ত্র গঠন করিবে। ৪। যতদিন সংবিধান রচিত না হইতেছে ততদিন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইবে।

কংগ্রেস সংবিধান সভায় যোগ দিতে স্বীকার করিল, কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে রাজী হইল না। মুসলিম লীগ উভয় প্রস্তাবেই রাজী হইল। কিন্তু কংগ্রেস রাজী না হওয়ায় গভর্ণর জেনারেল ওয়াভেল অন্তর্বর্তী শাসন-ব্যবস্থা গঠনে রাজী হইলেন না। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া মুসলিম লীগ সংবিধান সভায় যোগ দিতে অস্বীকার করিল এবং পাকিস্তান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন আরম্ভ করিবার হুমকি দিতে লাগিল। লীগ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্বেষ প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। বাংলা-দেশে তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ আন্দোলনের নামে কলিকাতা শহরের বুকে মুসলমানরা ব্যাপক দাঙ্গার সৃষ্টি করিল। অনেক হিন্দু প্রাণ হারাইল। কিন্তু ধীরে ধীরে হিন্দুরা আত্মরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করিল। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে তাহারাও পাল্টা আক্রমণ চালাইল। কলিকাতার পথে পথে বহু মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান এখানেই হইল না। বাংলাদেশের মুসলমান-প্রধান জেলা ঢাকা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে মুসলমান সমাজবিরোধীরা হিন্দু নরনারীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইল। হত্যা, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন সবই দিবালোকে চলিল। ইহার প্রতিক্রিয়া ভারতের হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতেও দেখা দিল। বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের প্রতিও অত্যাচার হইল। সমগ্র ভারত সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হইয়া উঠিল। প্রাচীনতম কাল হইতে ভারত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবাসভূমি। কিন্তু ইহার পূর্বে ভারতের মাটি কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলঙ্কিত হয় নাই। বৃটিশের ভেদনীতির বিষফল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতের সুনামকে চিরতরে কলঙ্কিত করিল।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস

কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করিল। লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায় মুসলিম লীগও এই সরকারে যোগ দিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে চলিল না। অল্পকাল মধ্যেই দেখা গেল যে মুসলিম লীগের সভ্যগণ এবং লর্ড ওয়াভেল এক পক্ষভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কংগ্রেসী সভ্যগণের সহিত তাঁহাদের মতের মিল হইতেছে না। ইতিমধ্যে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলি ঘোষণা করিলেন যে বৃটেন ভারতের শাসনভার আর নিজের হাতে রাখিবে না, ভারতের সংবিধান রচিত না হইলেও, ভারতীয়দের হাতে শাসনভার সমর্পণ করিয়া বৃটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিবেন। এই ঘোষণায় মুসলিম লীগের আতঙ্ক হইল, শাসনভার বুঝি কংগ্রেসের হাতে চলিয়া যায়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করাই মুসলিম লীগের একমাত্র অবলম্বন। ইহার প্ররোচনায়, পাঞ্জাবে মুসলমানরা হিন্দু এবং শিখদের উপর আক্রমণ চালাইল। প্রায় ৭৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নরনারী ভারতের বিভিন্ন স্থানে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। এই অবস্থায়, পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি, মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি হইতে পৃথক হইবার দাবী তুলিল।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। ভারতে আসিয়াই তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ভারতের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি ইচ্ছা করিলেই পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলে পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি খণ্ডিত করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (যেখানে বিধান সভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল) এবং শ্রীহট্ট জেলায় (যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা সামান্য বেশী) গণভোট গ্রহণ করিয়া স্থির হইবে, তাহারা মুসলমান রাষ্ট্রে যোগ দিবে কি না।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের এই ঘোষণা, হিন্দু বা মুসলমান কাহাকেও পূর্ণ সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। হিন্দুগণ ভারত বিভাগের নীতি স্বীকৃত হওয়ায় ক্ষুণ্ণ হইলেন, আবার মুসলমানগণ যতটুকু পাইলেন তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তথাপি উভয় পক্ষই বুঝিতে পারিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাই, কিছুটা বাদানুবাদের পর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল। বৃটিশ সরকার স্যার সিরিল র‍্যাড্‌ক্লিফের

সভাপতিত্বে পাঞ্জাব এবং বাংলা দেশকে বিভক্ত করার জন্য দুইটি কমিশন গঠন করিলেন। মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা অনুসারে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টে 'ভারত স্বাধীনতা বিল' সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ধার্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে ভারতীয় সংবিধান পরিষদের একটি বিশেষ বৈঠক বসিল। ইহা বৃটিশ ডোমিনিয়ন হিসাবে, ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেলরূপে নির্বাচিত হইলেন। অপর দিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেলরূপে নির্বাচিত করা হইল এবং পাকিস্তান সংবিধান-পরিষদ গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসীরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে বলিয়া গণভোট দিল। তারপর বাকি থাকিল, ভারতের সংবিধান পরিষদ। ইহাই স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। দীর্ঘদিনের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে ভারত মুক্ত হইল—স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান হইল। কিন্তু, নূতন ভারত গঠনের সমস্যা আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।
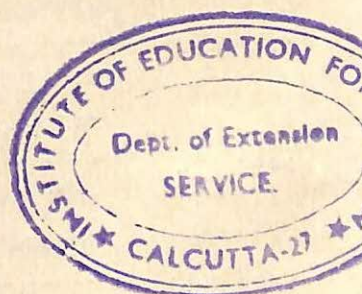
সময়-পঞ্জী

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন

সময়	ঘটনা
১৮৫০ খৃষ্টাব্দ	সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭)
১৮৬০ „	বাংলাদেশে নীল আন্দোলন (১৮৬০)
১৮৭০ „	
১৮৮০ „	ইল্‌বার্ট বিল (১৮৮২) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)
১৮৯০ „	
১৯০০ „	বঙ্গ ভঙ্গ (১৯০৫) মর্লে-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৯)
১৯১০ „	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ (১৯১৪) রাওলাট এ্যাক্ট ; জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯)
১৯২০ „	প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২০) সাইমন কমিশন (১৯২৭)
১৯৩০ „	প্রথম গোল টেবিল বৈঠক (১৯৩০) ভারত শাসন-সংস্কার আইন (১৯৩৫)
১৯৪০ „	ক্রীপস্ মিশন (১৯৪২) ; কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন (১৯৪২) স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম (১৯৪৭)
১৯৫০ „	

অনুশীলন

(স্বাধীনতা সংগ্রাম)

১। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।
(S. F. 1966, 1967) (উঃ—পৃঃ ৩৯৪-৯৮)

২। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।
(S. F. 1968) (উঃ—পৃঃ ৪১৬)

৩। বাংলার নবজাগরণ সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (S. F. 1968)
(উঃ—পৃঃ ৪০৪-৬)

৪। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তাহার আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। (S. F. 1968 Comp.) (উঃ—পৃঃ ৪১৭-১৮)

৫। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিম্নলিখিত নেতাদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(ক) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) তিলক, (গ) বিপিন চন্দ্র পাল, (ঘ) সুভাষচন্দ্র বসু, (ঙ) আলী ভ্রাতৃদ্বয়, (চ) চিত্তরঞ্জন দাস।

স্ক্র্যাপ বইএর জন্য :
নিম্নলিখিত জাতীয় নেতাদের কিছু কিছু বাণী সংগ্রহ কর —
মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল।

ভারতরাষ্ট্র

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের দ্বারা ভারতীয়দের হাতে বৃটিশ সরকার শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন। এই আইনের ফলেই আমাদের ভারতবর্ষ ভারত ডোমিনিয়ন ও পাকিস্তান—এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উভয় রাষ্ট্রই তাহাদের নিজ নিজ শাসনতন্ত্র রচনার অধিকারও লাভ করে। সেই অনুযায়ী ভারতীয় গণপরিষদ (Constituent Assembly) এদেশের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচনা করেন, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। ইহাই ভারতীয় সংবিধান নামে খ্যাত। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নূতন সংবিধান অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু বৃটেনের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে আমাদের সংবিধানে গ্রহণ করা হয় নাই। তৎপরিবর্তে কানাডার মতোই শাসন-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যেও পরিণত করা হইয়াছে। এমনিভাবে কানাডা ও আমেরিকার শাসনপদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও এই সংবিধানে ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব (One-citizenship) স্বীকৃত হইয়াছে এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই কতকগুলি মৌলিক অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে ; শুধু তাহাই নহে, বিচারালয়ের সাহায্যে এই সব অধিকার রক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের শাসনতন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, এই সংবিধানকে মোটামুটিভাবে অনমনীয় (rigid) বলা যাইতে পারে (যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মতো ইহা চূড়ান্তভাবে অনমনীয় নহে)। আমাদের দেশের শাসন-ব্যবস্থায় এই সংবিধানের প্রাধান্যই চূড়ান্ত ; সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎসও এই সংবিধান।

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের শাসনতন্ত্রের প্রারম্ভেই, প্রস্তাবনায়

(Problem) আমাদের রাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবনায়ই ভারতীয় জনগণের জন্য কতকগুলি উচ্চ আদর্শ ও অভীষ্টের কথাও বলা হইয়াছে। যথা, ভারতের সংবিধানের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে জনগণের মধ্যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী আনয়ন করা।

প্রস্তাবনা
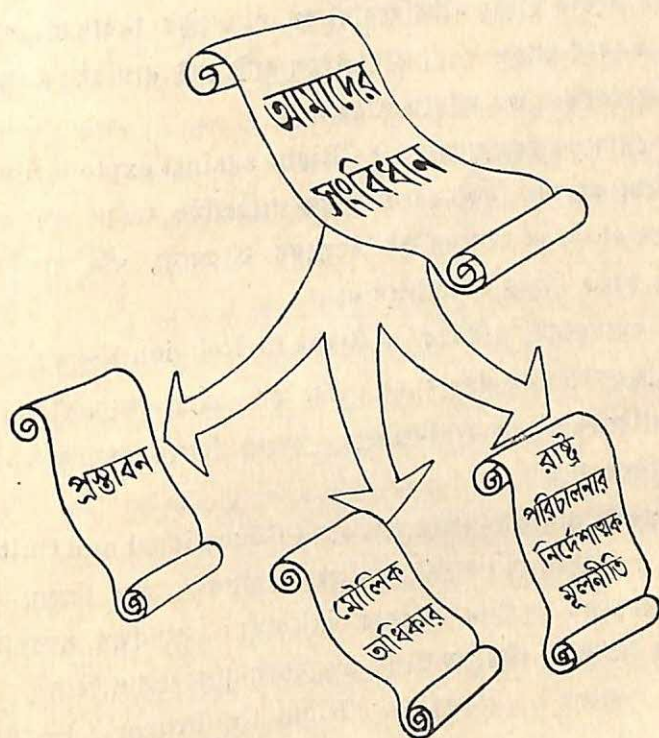
এই উদ্দেশ্যে সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি মৌলিক অধিকারের (Fundamental Rights) ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

মৌলিক অধিকার

(১) সাম্যের অধিকার (Rights of Equality) —জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সাধারণ আমোদ-প্রমোদের

স্থান, হোটেল, রাস্তা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিবে। সরকারী চাকুরীতে সকলেরই সমানাধিকার থাকিবে। অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)—ভারতের সকল নাগরিকই কথা বলার স্বাধীনতা, সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা, দেশের সর্বত্র অবাধ ভ্রমণের ও বসবাস করার স্বাধীনতা উপভোগ করিবে। তাহারা যে কোনো পেশা, বৃত্তি বা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবে। বেআইনীভাবে কাহাকেও আটক রাখা চলিবে না। অবশ্য যদি কাহারও কোনো অধিকারের প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় নীতিবিরোধী হয়, বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও জনস্বার্থ ব্যাহত করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র সেই নাগরিককে তাহার ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation)—জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ব্যতীত শ্রম আদায় করা যাইবে না। ১৪ বৎসরের কম বয়স্কদের কারখানা, খনি বা কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা চলিবে না।

(৪) ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Religion)—যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম গ্রহণ বা বর্জন এবং স্বীয় ধর্মমত অনুযায়ী ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। সরকারী বিদ্যালয়ে কোনো বিশেষ ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া চলিবে না।

(৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার (Educational and Cultural Rights)—এদেশে যে কোনো অঞ্চলের নাগরিকগণ স্বীয় বিশেষ ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতির অনুশীলন করিবার অধিকারী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামতো বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৬) সম্পত্তির অধিকারী (Right to Property)—আইনের অনুমোদন ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তাহার নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না ; এমন কি জনস্বার্থেও কোনো সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ না দিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। তবে ১৯৫১ সালে ও ১৯৫৫ সালে সংবিধানের প্রথম ও চতুর্থ সংশোধনের দ্বারা জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের হাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনার ব্যাপকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

(৭) অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে তাহার প্রতিকারের

অধিকার (Right to Constitutional Remedies)—যদি কোনো কারণে
কোনো নাগরিকের কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার
দাবী জানাইয়া সে সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চতম আদালতে আবেদন জানাইতে
পারিবে ; এবং বিচারপতি বিচার করিয়া যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিয়া
তাহার অধিকার রক্ষা করিবেন। তবে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা
করিলে যে কোনো নাগরিককে তাহার মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত
করিতে পারেন। এই অবস্থায় নাগরিক তাহার অধিকার রক্ষার জন্য
বিচারালয়ে আবেদন করার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত হইতে পারে।

মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়াও সংবিধানে শাসন-সংক্রান্ত কতকগুলি
নির্দেশাত্মক নীতি (Directives Principles of State Policy) বর্ণিত
হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের ন্যায় যদিও এইসব মূলনীতির প্রধান লক্ষ্য
গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করা—ব্যক্তি-
স্বাধীনতার বিস্তার সাধন করা—কিন্তু মৌলিক অধিকার
লঙ্ঘিত হইলে যেমন বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়া যায়,
এই মূলনীতিগুলি শাসকবর্গ কর্তৃক উপেক্ষিত হইলে তাহার প্রতিবিধানের
কোনো সুযোগ নাগরিকদের দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নিম্নলিখিত নীতিগুলি
অনুসরণ করা বা না করা একান্তভাবেই শাসকবর্গের ইচ্ছাধীন—

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক মূলনীতি

(১) নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন যাহাতে
ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সরকার এইরূপ একটি জনকল্যাণকর সমাজব্যবস্থা
গঠনে প্রয়াসী হইবেন। এই উদ্দেশ্যে কার্যক্ষম সকল নাগরিকের জীবিকা
অর্জনের সুযোগ দেওয়া, জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ
করা, সমান কাজের জন্য স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সমান পারিশ্রমিক দান,
শ্রমিকদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা, সকল নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা
প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক বালকবালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতা-
মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির সার্বিক উন্নতিসাধন,
মাতৃমঙ্গল, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, কৃষি ও পশুপালনের উন্নতি, গ্রাম্য পঞ্চায়েত
গঠন প্রভৃতিও সরকারের অবশ্য কর্তব্য হইবে।

(৩) জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান ও বিষয়সমূহ
সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত করিতে সরকার প্রয়াস পাইবে।

(৫) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, পররাষ্ট্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি স্বীকার করা, শান্তিপূর্ণভাবে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা প্রভৃতি সম্বন্ধে সরকার সচেষ্ট থাকিবে।

আমাদের সংবিধানে ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় রাজ্য ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন

যে কোন যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা স্বাভাবিক নিয়মেই সৃষ্ট হয়। এই শাসনক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে শাসনক্ষমতাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার উল্লেখ যে তালিকায় আছে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা (Federal list), রাজ্য সরকারের ক্ষমতার উল্লেখ যে তালিকায় আছে তাহাকে রাজ্য তালিকা (State list) এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম ক্ষমতার উল্লেখ যে তালিকায় আছে তাহাকে যুগ্ম তালিকা (Concurrent list) বলা হয়। ইহা ছাড়া, যেসব ক্ষমতার উল্লেখ উপরিউক্ত তিনটি তালিকার কোনোটিতেই নাই, তাহাদিগকে সংবিধানে অনুল্লিখিত বা অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary powers) বলা যাইতে পারে। এই অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় দেশরক্ষা, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্মাণ, কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক, রেলপথ ও বন্দর পরিচালনা, ডাক, তার ও টেলিফোন, মুদ্রাব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, শিল্পনিয়ন্ত্রণ, মাদক দ্রব্যাদির উপর কর স্থাপন, বিচার বিভাগীয় গঠনতন্ত্র স্থিরীকরণ প্রভৃতি ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রাজ্য তালিকায় রহিয়াছে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা, বনসম্পদ প্রভৃতি ৬৬টি বিষয়। আর যুগ্ম তালিকায় আছে ফৌজদারী আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর, শ্রমিক কল্যাণ, সংবাদপত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ৪৭টি বিষয়।

যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার

উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে, কিন্তু উভয় আইনে বিরোধ উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ থাকিবে। এছাড়াও সংবিধানে ব্যবস্থা রহিয়াছে, (১) এক বা একাধিক রাজ্য ইচ্ছা করিলে রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সমর্পণ করিতে পারে ; (২) কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে কোনো রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে তবে রাজ্যতালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে ; (৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে ; এবং (৪) কোনো রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়নের সমস্ত অধিকার নিজের হাতে লইতে পারে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের আইন প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। সংবিধানে বিধান রহিয়াছে যে, রাজ্যগুলির শাসনক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যে তাহা কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতাকে ব্যাহত না করে বা তাহার বিরোধী না হয়। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে শাসন-সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে পারিবে এবং রাজ্য সরকারকে ঐ নির্দেশ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে। দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে নদীর জল বা নদী-উপত্যকা সংক্রান্ত বিরোধ-মীমাংসার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের। এইভাবে, যদিও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের (Distribution of Powers) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারকেই অধিকতর ক্ষমতাশালী করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই সংবিধান অনুযায়ী এদেশে একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের মামলার বিরুদ্ধে আপীল শোনা ছাড়াও ইহার প্রধান কাজ হইতেছে : (১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে সংবিধানোক্ত কোনো অধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার করা, (২) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

হইলে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করা, এবং (৩) নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা।

লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র। অনমনীয় কথার অর্থ হইতেছে যে, শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন বা সংশোধন করা চলে না। তোমাদের আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের সংবিধানও লিখিত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো চূড়ান্তভাবে অনমনীয় না হইলেও ইহাকে অনমনীয় পর্যায়ভুক্তই করা চলে। সংবিধানের যে একেবারে কোনো সংশোধন করা চলে না এমন নহে। তবে সংবিধানের কোনো সংশোধন করিতে হইলে উহা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটাধিক্যে এবং সমগ্র সদস্যের সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হইয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করা প্রয়োজন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো

তোমরা জান, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলিয়া সংবিধানে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে, এদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো অঞ্চলের নাগরিকই শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিচিত। কেহ তাহার জন্মস্থান হিসাবে বাংলা, বিহার, আসাম ইত্যাদি বিশেষ কোনো রাজ্যের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে না। সংবিধান প্রবর্তনের কালে এদেশস্থ বিভিন্ন প্রকার অধিবাসীকে নাগরিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে, ১৯৫৫ সালে, কেন্দ্রীয় আইনসভা যে নাগরিকত্ব আইন পাশ করে সেই আইন অনুযায়ী পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়—(১) জন্ম : ভারতে জন্ম হইলে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়। (২) বংশ : ভারতীয় পিতামাতার সন্তান প্রবাসী হইলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে। (৩) অর্জন : কোনো ব্যক্তি পাঁচ বৎসরাধিককাল এদেশে বসবাস করিলে সেও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। (৪) রেজেষ্ট্রী করা : যদি কোনো ব্যক্তির মাতাপিতা বা পিতামহ-পিতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং এইরূপ ব্যক্তি যদি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইর পূর্বে

ভারতীয় এক-নাগরিকত্ব

পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে, অথবা ঐ তারিখের পরে ভারতে আসিয়া কমপক্ষে ছয়মাস এদেশে বসবাস করিয়া নাগরিক অধিকার অর্জন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা রেজেস্ট্রীভুক্ত হয় তাহা হইলে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পর ভারত ছাড়িয়া পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে তাহারাও যদি ভারতীয় ছাড়পত্র লইয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে উপরিউক্ত উপায়ে ভারতীয় নাগরিক হইতে পারিবে। সর্বশেষে, (৫) রাষ্ট্রভুক্তি: পরবর্তীকালে যেসব বৈদেশিক কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের ভারতভুক্তি হইয়াছে সেখানকার অধিবাসীরাও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার

ভারতীয় গণতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে "প্রাপ্তবয়স্ক" নাগরিক মাত্রকেই ভোট দানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোট দানের ক্ষমতাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূলে রহিয়াছে—ভোট দিয়াই কেন্দ্র, রাজ্য এবং বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে শাসদ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ বা সভা নির্বাচিত হয়। আবার এই সভাই মন্ত্রী প্রভৃতি রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালকদের নির্বাচন করে। ফলে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রকেই ভোটাধিকার দিলে, রাষ্ট্র পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে। কিন্তু কোন কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, একটা নিম্নতম মানের বিদ্যা বা সম্পত্তি না থাকিলে ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া হয় না। ইহার স্বপক্ষেও হয়তো কিছুটা যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে বিদ্যা বা সম্পত্তি কোন কিছুর বিচার না করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রকেই ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক অর্থ ২১ বৎসর; ২১ বৎসর বয়স হইলেই স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে কোন লোক ভোটদানের ক্ষমতা অর্জন করিবে। কেবলমাত্র পাগল বা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলেই তাহার ভোটদানের ক্ষমতা থাকিবে না। ইহার ফলে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে, ভারতের মোট প্রায় ৪৮ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ২৫ কোটির বেশী ভোট দেওয়ার অধিকার পায়। অর্থাৎ আমাদের দেশের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী লোকের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। ইংরেজদের অধীনে থাকাকালে,

ভিন্নরূপ ভোটদানের আইনের ফলে ১৯১৯ সালে এবং ১৯৩৫ সালে ভোটদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল, যথাক্রমে ৫% ও ১০%।

কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেণ্ট রাজ্যসভা ও লোক্‌সভা নামক দুইটি আইন পরিষদ লইয়া গঠিত। রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা অনধিক ২৫০। রাষ্ট্রপতি তন্মধ্যে ১২ জনকে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক বা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত করেন। অন্যান্য সদস্যরা প্রত্যেক রাজ্যের নিম্নকক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সামানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সভা স্থায়ী পরিষদ। প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় আইনসভা

লোকসভা বা নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যা অনধিক ৫০০। আগেই বলা হইয়াছে, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটদানের ভিত্তিতে এই সভার সদস্যরা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতি পাঁচ লক্ষ লোক একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। এই সভা সাধারণত পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইয়া থাকে, তবে জরুরী অবস্থায় এই স্থিতিকাল এক বৎসর বৃদ্ধি পাইতে পারে। আবার রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে পাঁচ বৎসরের পূর্বেও এই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্র কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে, এক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, অথবা জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষের উদ্দেশ্যেও যে পার্লামেণ্ট সভা রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপরও আইন প্রণয়ন করিতে পারে সেই কথা তোমাদের ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতাও পার্লামেণ্ট সভার হস্তেই ন্যস্ত। সাধারণত, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া অন্য যে কোনো প্রস্তাব উভয় পরিষদের যে কোনো একটিতে উত্থাপিত হইতে পারে। উভয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের সম্মতিলাভের পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিলে ঐ প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়। যদি কোনও পরিষদ সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকে, এবং ছয় মাসের পরও যদি মতামত জ্ঞাপন না করে তাহা

কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতা

হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিবেন, এবং ঐ অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইলেই ঐ প্রস্তাব আইনে পরিণত হইবে। তবে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার সদস্যসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ, সুতরাং উভয় কক্ষের মতবিরোধ ঘটিলে সাধারণত লোকসভার জয়ই সুনিশ্চিত। রাষ্ট্রপতি যদি প্রস্তাবটিতে সম্মতি না দেন তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার সুপারিশসহ উক্ত প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্ট সভায় পাঠাইতে হইবে। পার্লামেণ্ট সভা পুনর্বিবেচনা করিয়া উহা যদি রাষ্ট্রপতিকে পুনরায় সম্মতির জন্য প্রেরণ করে, সেই ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার সম্মতি দিতেই হইবে। অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব শুধুমাত্র লোকসভায়ই উত্থাপন করা চলে। লোকসভা কর্তৃক ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে উহা রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়; কিন্তু রাজ্যসভা যদি ১৪ দিনের মধ্যে তাহার মতামত জ্ঞাপন না করে তাহা হইলে রাজ্যসভার মতামত ছাড়াই উহা আইনে পরিণত হইবে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদই আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে সমান ক্ষমতাশালী, প্রকৃতপক্ষে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত লোকসভাই ঐ ব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

রাজ্য আইনসভা

কেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যেও আইনপ্রণয়নের অধিকারী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভা গঠিত হয়। তামিলনাড়ু, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি যে সব রাজ্যে আইনসভায় দুটি কক্ষ রহিয়াছে—উচ্চ পরিষদ বা বিধান পরিষদ এবং নিম্ন পরিষদ বা বিধান সভা—সেখানেও প্রকৃত ক্ষমতা বিধান সভার হস্তেই ন্যস্ত। উচ্চ কক্ষ বা বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যার $\frac{1}{4}$ অংশের অধিক এবং ৪০এর কম হইতে পারিবে না। ইহাদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, এক-দ্বাদশাংশ সদস্য অন্যূন তিন বৎসর পূর্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশ সদস্য অন্যূন তিন বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা, এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিম্ন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট সদস্যগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। রাজ্যসভার ন্যায় বিধান পরিষদও স্থায়ী,

এবং প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর উহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিধান পরিষদের সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোট দ্বারা নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর দশ বৎসর পর্যন্ত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৯৫৯ সালের সংবিধানের অষ্টম সংশোধন দ্বারা ঐ সময় আরো দশ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকসভার ন্যায় ইহারও কার্যকাল পাঁচ বৎসর, তবে রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধে তৎপূর্বেও ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

রাজ্য তালিকাভুক্ত বা যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য আইনসভাগুলির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কোনো প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। তবে উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা এক্ষেত্রে সীমিত। উচ্চ পরিষদ যদি তিন মাস পর্যন্ত নিম্ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোনো প্রস্তাবে সম্মতি না দেয় তাহা হইলে নিম্ন পরিষদ পুনরায় ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। উচ্চ পরিষদ যদি এইবারও এক মাসের মধ্যে সম্মতি না দেয়, তাহা হইলে উচ্চ পরিষদের সম্মতি ব্যতীতই উহা আইনে পরিণত হইবে। অর্থসংক্রান্ত বিলেও উচ্চ পরিষদ ইহার মতামত জ্ঞাপন করিতে পারে, তবে তাহা গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা নিম্ন পরিষদের।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার পার্লামেন্টারী কাঠামো

আমাদের সংবিধানে ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রকে একটি প্রজাতন্ত্র বলা হইয়াছে। এদেশের শাসন-ব্যবস্থায় রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতেছেন শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তি। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একজন উপরাষ্ট্রপতি আছেন। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ। উপরাষ্ট্রপতি তাঁহার পদমর্যাদা বলে রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করেন মন্ত্রিপরিষদ।

রাষ্ট্রপতি

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ ও রাজ্যসমূহের নিম্ন কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি ভারতের শাসন-

ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়াই সংবিধানে জনগণকর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্র কর্তৃক তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতাগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) শাসন পরিচালনার ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতির নামেই ভারতবর্ষের সমস্ত শাসন পরিচালিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, সুপ্রীম কোর্টের
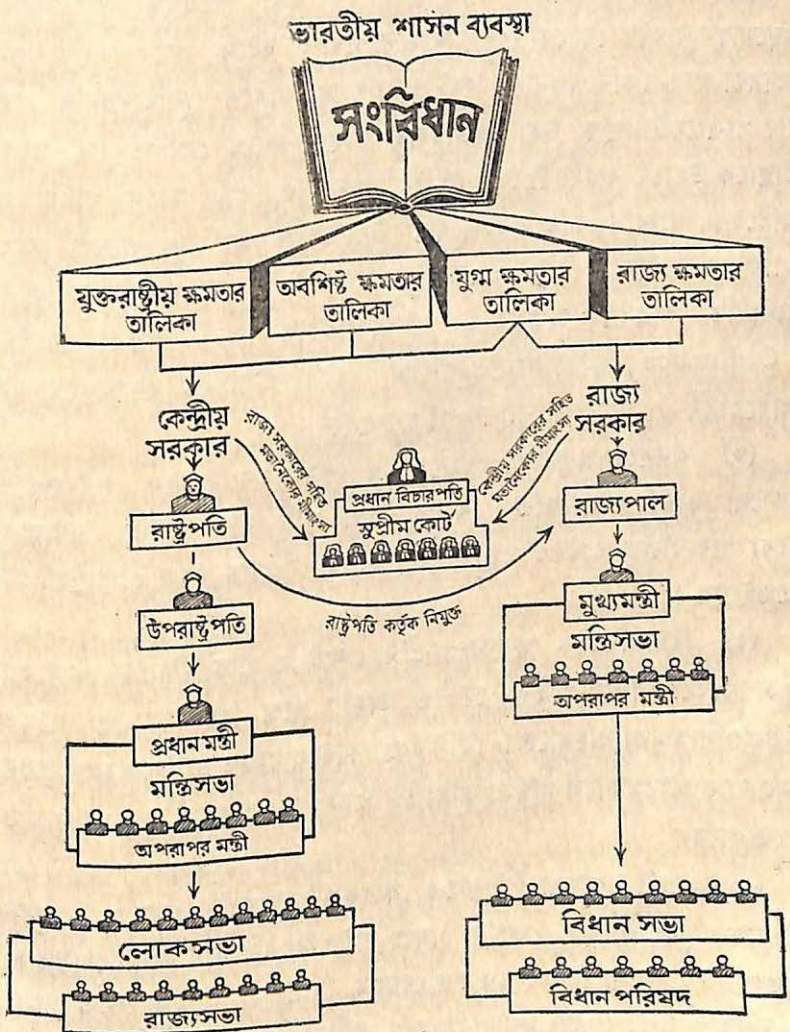
ও উচ্চ বিচারপতিদের, ভারতের অডিটার জেনারেল (পার্লামেন্টে বা বিভিন্ন রাজ্যে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ যাহাতে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় হয় এবং বরাদ্দের অধিক যাহাতে ব্যয় না হয় ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখাই অডিটার জেনারেলের প্রধান করণীয়), এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর অধিকর্তা ; যুদ্ধঘোষণা বা সন্ধিস্থাপনের ক্ষমতাও একমাত্র তাঁহারই। জরুরী অবস্থায় বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে।

(২) আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা—আগেই বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত কোনো বিলই আইনে পরিণত হইতে পারে না (অবশ্য, তোমরা জান, তিনি একবার বিলটি প্রত্যাখ্যান করিলে পুনর্বিবেচনার পর যদি পার্লামেন্ট কর্তৃক উহা দ্বিতীয়বার তাঁহার কাছে প্রেরিত হয়, তবে তাঁহাকে উহাতে সম্মতি দিতেই হয়)। এছাড়াও, তিনি আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, উহা স্থগিত রাখিতে পারেন, এবং লোকসভা ভাঙ্গিয়াও দিতে পারেন। রাজ্যসভার বারো জন সদস্য তিনি মনোনীত করেন। পার্লামেন্টের অবকাশকালে তিনি জরুরী আইন (Ordinance) জারী করিতে পারেন ; তবে পার্লামেন্ট সভার পরবর্তী অধিবেশনে ঐ অর্ডিন্যান্স উত্থাপন করিতে হইবে।

(৩) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতিরেকে অর্থমঞ্জুরীর কোনো দাবী পার্লামেন্টে উত্থাপন করা যায় না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আদায়ীকৃত আয়কর প্রভৃতি বণ্টন করিয়া দেওয়ার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তেই ন্যস্ত।

(৪) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়সমূহের বিচারপতিদের নিয়োগ করা ছাড়াও তাঁহার হস্তে বিচারসংক্রান্ত আরও কতকগুলি ক্ষমতা রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডলাভের সময় বা দণ্ডভোগকালে মার্জনা করিতে পারেন, বা তাহাকে লঘুতর শাস্তি দিতে পারেন।

(৫) জরুরী ক্ষমতা—তাঁহাকে কতকগুলি জরুরী ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। যথা—(ক) কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ কোনো বিশৃঙ্খলার জন্য দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন, তবে তাঁহার ঐ

ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক সমর্থিত না হইলে দুই মাসের বেশী বলবৎ হইতে পারে না। এইরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এক কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। ঐ সময় পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। এবং সেই ক্ষেত্রে তাহাদের বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়ারও কোনো সুযোগ থাকে না। (খ) যদি রাষ্ট্রপতি বুঝিতে পারেন যে কোনো রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সংকট উপস্থিত হইয়া সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে তিনি শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা দ্বারা ঐ রাজ্যের সমস্ত শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন (সেই ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের আইন-প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত হয়)। ঐরূপ ঘোষণার মেয়াদকাল দুই মাস। কিন্তু পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক সমর্থিত হইলে উহাকে ছয়মাস কার্যকরী রাখা যায়। এইরূপে ছয়মাস ছয়মাস করিয়া তিন বৎসর পর্যন্ত পার্লামেন্টের সম্মতিক্রমে এইরূপ ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব। (গ) প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হইবে। কিন্তু অপর দুইটির মতো এই ক্ষেত্রেও ঘোষণাটিকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সম্মতিলাভ করিতে হইবে। অন্যথায় উহা দুই মাসের বেশী বলবৎ থাকিবে না।

কিন্তু এইভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে জনপ্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত পার্লামেন্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। তাঁহার সব কাজই তিনি প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে। সেই প্রস্তাব যদি সেই কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা এবং অন্য কক্ষেরও দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা গৃহীত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যাইতে পারে। এই সব কারণেই আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বস্তুত, রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, তিনি স্বাধীনভাবে তাহা পরিচালনা করেন না; সকল কাজেই তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী

(Prime Minister) সহ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী করিতে হয়। প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত হন, এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। মনে রাখিতে হইবে যে, লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ না থাকিলে কেহ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। মন্ত্রিপরিষদের সমস্যদের অবশ্যই পার্লামেণ্টের যে কোনো কক্ষের সদস্য হইতে হইবে। যদি নিয়োগকালে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য না হন, তাহা:হইলে নিয়োগের ছয় মাস কালের মধ্যেই পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে। শাসনসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা রাখার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা কতকগুলি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং এক একজন মন্ত্রী এক বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হয়। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার দেওয়া হয় রাষ্ট্রমন্ত্রী নামক আরেক শ্রেণীর মন্ত্রীদের। এছাড়া মন্ত্রীদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের উপমন্ত্রীও নিয়োগ করা হইয়া থাকে।

মন্ত্রিপরিষদও তাহাদের নীতি ও কার্যকলাপের জন্য পার্লামেণ্টের কাছে যৌথভাবে দায়ী। অর্থাৎ, কোনো একজন মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত সমর্থন না করিতে পারেন, মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে তাহার বিরোধিতাও করিতে পারেন, কিন্তু পার্লামেণ্টের নিকট বা জনগণের নিকট মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত পেশ করার সময় তিনি কখনই মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। পার্লামেণ্টের সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদকে একক ও অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কাজ করিতে হইবে। যদি আইনসভা কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে, অথবা কোনো মন্ত্রী কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে ঐ একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সমগ্র মন্ত্রিপরিষদকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা, যেখানে সমগ্র মন্ত্রিসভা যৌথভাবে পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকেন তাহাকে ক্যাবিনেট গভর্ণমেণ্ট বলে। গ্রেট ব্রিটেনের নিকট হইতে আমরা

ক্যাবিনেট গভর্ণমেণ্ট

আমাদের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা
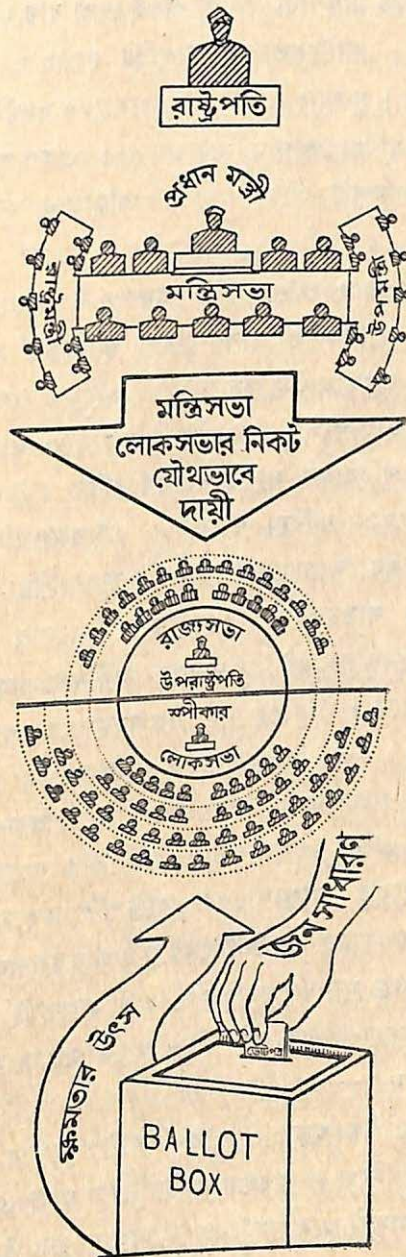
এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি। কেন্দ্রের মত রাজ্যগুলিতেও ক্যাবিনেট গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত আছে। তবে, সংবিধান কর্তৃক এরূপ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলেও কার্যত মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্যই দেখা যায়। ইহার মূল কারণ দলীয় শাসন-ব্যবস্থা। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানগণই মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়া থাকেন। সুতরাং আইনসভায় তাহাদের সমর্থকদের সমর্থনলাভে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ সহজেই দলীয় সমর্থনপুষ্ট হইয়া অবাধে তাহাদের কার্যসূচীকে রূপদান করিতে পারেন।

রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা

জম্মু ও কাশ্মীর এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ছাড়া অন্যান্য রাজ্যেও সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাসন-ব্যবস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইলেন একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য মন্ত্রি-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য রাজ্যপাল নিয়োগ করিয়া থাকেন। এই রাজ্যপাল নিয়োগপদ্ধতির অবশ্য বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূলনীতি হইতেছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। সেইক্ষেত্রে রাজ্যের সর্বময় শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইলে তাঁহার স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে; তাঁহাকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িতে হয়। এই সমালোচনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। তবে

রাজ্যপাল

রাজ্যপালদের হস্তে ন্যস্ত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাগুলি যেহেতু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়, সেইহেতু রাজ্যপালের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের ফলে দায়িত্বশীল রাজ্য সরকারের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত। তাঁহার ক্ষমতাগুলিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা মতো মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা—শাসনবিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী রাজ্যপাল। তিনি নিজে বা অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা ঐ ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়োগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। যে সমস্ত রাজ্যে অনগ্রসর জাতির বা শ্রেণীর অধিবাসীরা

আছে, সেই সব রাজ্যে উহাদের কল্যাণ সাধনের বিশেষ ভারও রাজ্যপালের উপরই ন্যস্ত।

(২) আইনবিষয়ক ক্ষমতা—যেসব রাজ্যে আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট, সেখানে রাজ্যপাল উচ্চকক্ষে কতিপয় সদস্য মনোনীত করেন। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনবোধে তিনি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য ঐ সম্প্রদায় হইতে কয়েকজন বিধানসভায় মনোনীত করিতে পারেন। তিনি আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে পারেন, প্রয়োজনবোধে নিম্ন কক্ষ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি সম্মতি না দিলে কোনো বিলই আইনে পরিণত হইতে পারে না। তবে প্রথমবার সম্মতি প্রত্যাহার করিলেও আইনসভা যদি দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট বিলটি প্রেরণ করে তাহা হইলে তাঁহাকে সম্মতি দিতেই হয়। আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে তিনি জরুরী আইনও জারী করিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে পূর্বেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। আইনসভার অধিবেশন শুরু হইলেই অবশ্য ঐ জরুরী আইন সম্বন্ধে আইনসভার অনুমোদন লাভ করিতে হয়।

(৩) রাজস্ববিষয়ক ক্ষমতা—যে কোনো অর্থসংক্রান্ত বিষয় আইনসভায় পেশ করার পূর্বে রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন।

(৪) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—রাজ্যসরকারের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির ন্যায়, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মার্জনা করিতে পারেন, দণ্ড হ্রাস করিতে পারেন, বা একজাতীয় শাস্তিকে অন্যজাতীয় শাস্তিতে পরিবর্তিত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সহিত পরামর্শ করিয়া তিনিই রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে রাজ্যপালকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী মনে হইলে কার্যত তিনিও রাষ্ট্রপতির ন্যায় মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুযায়ীই তাঁহার সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন (শুধুমাত্র আসামের রাজ্যপালকে 'উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা' সম্পর্কে দুইটি বিষয়ে সংবিধানে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—যাহা তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াও নিজের বিবেচনামতো প্রয়োগ করিতে পারেন)।

রাজ্যপাল আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister) নিযুক্ত করেন এবং পরে তাহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের অবশ্যই রাজ্য আইনসভার সদস্য হইতে হয়। যদি নিয়োগকালে কেহ সদস্য না থাকেন তাহা হইলে তাহাকে ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার যে কোনো কক্ষের সদস্য নির্বাচিত হইতে হয়। কেন্দ্রের ন্যায় রাজ্য-মন্ত্রিপরিষদও যৌথভাবে রাজ্য-আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়ী থাকেন।

রাজ্য-মন্ত্রিপরিষদ

তোমাদের আগেই বলা হইয়াছে, কোনো আইন প্রণয়ন করিতে হইলে উভয় কক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। এই অনুমোদন লাভের জন্য বিলটিকে অর্থাৎ আইনের খসড়াটিকে কয়েকটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। প্রথমত, প্রস্তাবককে ঐ বিল আইনসভায় উত্থাপনের অনুমতি এক মাস পূর্বেই স্পীকারের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়। বিলটি উত্থাপনের অনুমতি পাইলে নির্দিষ্ট দিনে বিলটি উত্থাপন করিয়া প্রস্তাবক তিনটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি করিতে পারেন :—(১) পরিষদে বিলটির বিচার করা হউক ; (২) বিলটিকে বিচার-বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হউক ; অথবা, (৩) বিলটি সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহের জন্য সরকারী গেজেটে উহা প্রচার করা হউক। অবশ্য কোনো মন্ত্রী কোনো বিল উত্থাপন করিলে তাহার জন্য পূর্বে অনুমতি লইবার প্রয়োজন হয় না। এই পর্যায় বিল উত্থাপন ও প্রথম পাঠ নামে পরিচিত। এই সময় বিলটির নীতিগত আলোচনা হইতে পারে কিন্তু বিশদ আলোচনার কোনো অবকাশ নাই। বিলটি পুরাপুরি পড়াও হয় না। জনমত সংগ্রহের সময় উত্তীর্ণ হইলে প্রস্তাবককে পুনরায় উহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করিতে হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে সিলেক্ট কমিটি বিলটি ভালোভাবে পর্যালোচনা করে এবং তাহাদের সুপারিশসহ বিলটিকে আইন পরিষদে ফেরত পাঠানো হয়। এই পর্যায়কে বলা হয় কমিটি পর্যায়। ইহার পর প্রস্তাবককে বিলটির দ্বিতীয় পাঠে প্রস্তাব করিতে হয়। তখন বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। এই সময়ই সংসদ সদস্যরা ঐ বিল সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাবও আনিতে পারেন। অতঃপর বিলটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হয়।

আমাদের আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি

আইন পাশ হওয়ার পদ্ধতি
(কেন্দ্রীয় সরকার)
রাষ্ট্রপতি
আইন
রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর
রাজ্যসভা
প্রস্তাব
রাজ্যসভার অনুমোদন লাভ
লোকসভা
প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি
প্রস্তাবের প্রথম পাঠ ও আলোচনা
প্রস্তাব
তৃতীয় পাঠ, মৌলিক আলোচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদন
প্রস্তাব
বিশেষ বিবেচনার জন্য
দ্বিতীয় পাঠ ও ভোটদান
লোকসভায় পুনঃপ্রেরণ
সিলেক্ট কমিটি
প্রস্তাব
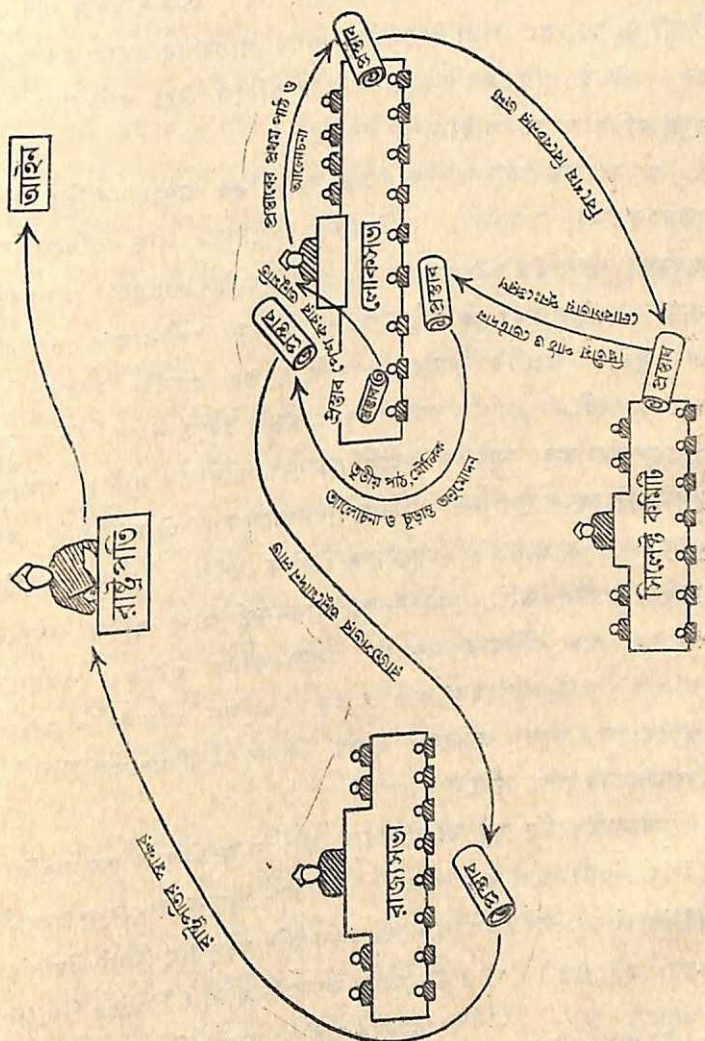
যদি ভোটে উহা গৃহীত হয় তাহা হইলে প্রস্তাবককে পুনরায় বিলটির তৃতীয় পাঠের জন্য প্রস্তাব করিতে হয়। এই পর্যায়ে মৌখিক সংশোধন ছাড়া অন্য কোনো সংশোধনী প্রস্তাব আনা চলে না। বিলটিকে হয় গ্রহণ করিতে হয় না হয় সামগ্রিক বিলটিকেই বর্জন করিতে হয়। এক পরিষদে যদি ঐ পর্যায়ে বিলটি গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহা অপর পরিষদের মতামতের জন্য প্রেরিত হয়। উভয় পরিষদের অনুমোদন লাভ করিলে উহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া তবেই আইনে পরিণত হয়।

অর্থসংক্রান্ত কোনো বিল কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ভিন্ন আইনসভায় আনয়ন করা যায় না। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিলে সাধারণত অর্থমন্ত্রী বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দের বিবরণী (budget) লোকসভায় পেশ করেন। ঐ ব্যয়বরাদ্দে রাষ্ট্রপতি, লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন প্রভৃতি কতকগুলি নির্দিষ্ট খাতের দাবী সম্পর্কে লোকসভায় আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু সে সম্পর্কে লোকসভার মঞ্জুর করা-না-করার কোনো অধিকার নাই। অন্যান্য খাতের দাবীগুলি অবশ্য লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। ঐ দাবীগুলি লোকসভার এবং পরে রাজ্যসভার অনুমোদন লাভ করিলে আর একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষকে সঞ্চিত তহবিল হইতে ঐ অর্থ ব্যয় করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া থাকে। করধার্যের জন্যও আলাদা আইন প্রণয়ন করিতে হয়। এইসব আইনের খসড়া রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিলে রাজস্ব বিলের (Finance Bill) আকারে লোকসভায় পেশ করিতে হয়।

শাসনকার্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্যগুলিকে কতকগুলি বিভাগে (Division) ভাগ করা হইয়াছে। বিভাগগুলিকে আবার কতকগুলি জেলায় (District) এবং জেলাগুলিকে কতকগুলি মহকুমায় (Subdivision) বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রতি মহকুমায় কয়েকটি থানা (Police Station) এবং প্রতি থানার অধীনে কতকগুলি গ্রাম রহিয়াছে। এইসব বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা

বিভাগীয় পর্যায়ে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া থাকেন একজন বিভাগীয় কমিশনার। এতদ্ব্যতীত স্বীয় বিভাগের ভূমিরাজস্ব তদারক ও

নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বও তাঁহার। জেলা পর্যায়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন জেলা-শাসক। জেলার শাসন পরিচালনা ছাড়াও তাঁহাকে জেলার ভূমি-রাজস্ব আদায় করিতে হয়, ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে হয় এবং জেলার কৃষি, চিকিৎসা, জল, সেচ, বন, শিক্ষা প্রভৃতি তদারক করিতে হয়। পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর নজর রাখাও তাঁহারই দায়িত্ব। সর্বোপরি জেলার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বও তাঁহারই, এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জেলার সুপারিশ বিভাগের কাজও নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। মহকুমার শাসনকার্য পরিচালনা করেন মহকুমা-শাসক। স্বীয় মহকুমার তিনি সর্বময় শাসক হইলেও, জেলা-শাসক তাঁহার কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। প্রতি থানায় একজন করিয়া দারোগা বা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী স্থানীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে গ্রামস্থ চৌকীদার ও দফাদার সাহায্য করিয়া থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য ইংরেজ আমল হইতেই এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। আমাদের সংবিধানেও এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা, বোম্বাই, তামিলনাড়ু প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে কর্পোরেশন এবং অন্যান্য শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে প্রতি জেলায় জেলা বোর্ড, প্রত্যেক মহকুমায় লোকাল বোর্ড এবং এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির (কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি) সদস্যরা শহরের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। কর্পোরেশনের সদস্যদের বলা হয় কাউন্সিলার। অন্যান্য পৌরপ্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বলে কমিশনার। ইঁহাদের কার্যকাল সাধারণত চারি বৎসর।

পৌরপ্রতিষ্ঠান

কর্পোরেশনের সদস্যরা প্রতি বৎসর বাৎসরিক প্রথম অধিবেশনে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন। কিন্তু অন্যান্য পৌরপ্রতিষ্ঠানের সদস্যরা একবারই চার বৎসরের জন্য একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিয়া থাকেন। পৌর প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা বিভিন্ন কাজের জন্য কয়েকজন করিয়া সদস্য লইয়া এক একটি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) গঠন করিতে পারে। এই সব কমিটির কাজ হইতেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কাজ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা

করিয়া পৌরপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় পেশ করা। সমস্ত সদস্যরা মিলিত হইয়া যদি সংখ্যাধিক্যে ঐ সব প্রস্তাব গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে উহা কার্যকরী করার জন্য মুখ্য কার্যসচিব, এক বা একাধিক উপ-কার্যসচিব, মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার, মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকার প্রভৃতি স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পৌরপ্রতিষ্ঠানকে বহুবিধ কাজ করিতে হয়। ঐসব কাজকে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) জনস্বাস্থ্য, (২) জননিরাপত্তা, (৩) জন-সুবিধা, ও (৪) জনশিক্ষা। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান শহরের রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে ও পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করে। শহরে জল ও আলো সরবরাহের দায়িত্বও পৌরপ্রতিষ্ঠানের। ইহা বাড়ী-ঘর নির্মাণব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করা, বা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে আর্থিক সাহায্য করা, প্রসূতি-সদন স্থাপন করা, শহরের ময়লা জল ও আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা, সংক্রামক ব্যাধির নিরোধকল্পে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা পৌরপ্রতিষ্ঠানের অবশ্যকরণীয় কাজ। জনশিক্ষাকল্পে অবৈতনিক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, গ্রন্থাগারাদি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করাও পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজ। শহরের লোকের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব পৌরপ্রতিষ্ঠানই রাখিয়া থাকে।

উপরিউক্ত বিভিন্ন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে সেই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে—(১) বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর ধার্য কর, (২) ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর কর, (৩) যানবাহনাদির উপর ধার্য কর, (৪) বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আয়, (৫) সরকারী অর্থসাহায্য, (৬) সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ প্রভৃতি। ভারতের কোনো কোনো রাজ্যে শহরে আনীত ও শহর হইতে রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির উপরও পৌরপ্রতিষ্ঠান কর (Octroi Duty) ধার্য করিয়া থাকে।

বড়ো বড়ো শহরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কার্য পরিচালনার জন্য কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। রাষ্ট্রীয় সরকার বিশেষ আইন করিয়া কর্পোরেশন স্থাপন করেন। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। শহরটিকে ছোট ছোট অঞ্চল বা ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য

কর্পোরেশন

একজন করিয়া প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেন। তাহাদের কাউন্সিলার বলা হয়। কয়েকটি ওয়ার্ড লইয়া একটি "ব্যারো" (Borough) গঠিত হয়। প্রত্যেক "ব্যারোতে" কর্পোরেশনের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি করিয়া কমিটি থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কলিকাতা কর্পোরেশন বর্তমানে ১০০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত আছে এবং কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা ১০০ জন ; পাঁচটি করিয়া ওয়ার্ড লইয়া একটি করিয়া "ব্যারো" গঠন করা হইয়াছে।

কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে মেয়র নির্বাচিত হন। তিনিই কর্পোরেশনের বড় কর্তা।

তিনটি প্রধান বিভাগের মাধ্যমে কর্পোরেশনের কাজ পরিচালিত হইয়া থাকে—১। জেনারেল কাউন্সিল, ২। বিভিন্ন স্ট্যাণ্ডিং কমিটি, ৩। কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ অফিসার। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে জেনারেল কাউন্সিল নির্বাচিত হন। অবশ্য কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানরাও জেনারেল কাউন্সিলের সভ্য হন। কর্পোরেশনের সকল অফিসার নিয়োগ করেন এই কাউন্সিল ; কিন্তু কমিশনার নিয়োগের অধিকার রাজ্য সরকারের। কর্পোরেশনের কাজ, যথা—আয়-ব্যয়, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয় এবং এক একটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি এক একটি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কমিশনারের কাজ হইল কর্পোরেশনের সকল কাজের উপর নজর রাখা। তিনি বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম ভাগ করিয়া দেন এবং এই সব কাজকর্মগুলি যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে চলে তাহার ব্যবস্থা করেন।

গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা

গ্রামের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে তিন স্তরে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহার সর্বনিম্ন স্তরে রহিয়াছে গ্রাম সভা বা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোক ভোট দিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন করে। গ্রামের পথ-ঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতি সাধন করা পঞ্চায়েতের কাজ। তার উপর গ্রামের কৃষি-কাজ, পশুপালন ও গ্রাম-শিল্পের উন্নতির বিষয়েও পঞ্চায়েত যত্ন নিয়া থাকে।

কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত হয় এক একটি ব্লক বা তালুক পঞ্চায়েত। যে সব ক্ষমতা বা কাজ পরিচালনা গ্রাম ভিত্তিতে সম্ভব নহে সেগুলির

পরিচালনার ভার গ্রহণ করে তালুক পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তালুক পঞ্চায়েতের সভ্যদের নির্বাচন করেন। তালুক পঞ্চায়েতের কাজ হইল, উহার অধীনস্থ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাহাদের কাজের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া। গ্রামের স্বায়ত্তশাসনের তৃতীয় স্তরে থাকে জেলা পরিষদ। জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব থাকিবে জেলা পরিষদের হাতে। জেলাভিত্তিক সর্বপ্রকার জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যাদি জেলা পরিষদ পরিচালনা করিবে এবং নিয়মতান্ত্রিক বা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে সাহায্য করিবে। পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি এবং জেলার আইন সভা ও পার্লামেন্ট সভার সদস্যদের লইয়া এই জেলা পরিষদ গঠিত হইবে। অনুন্নত শ্রেণী ও তপশীলভুক্ত জাতি এবং মেয়েদের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে আসন সংরক্ষিত আছে। বোম্বাই, মহীশূর ও রাজস্থানে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা দুই ; কিন্তু অন্ধ্র, আসাম, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, কেরালা ও মধ্যপ্রদেশে ঐ সংখ্যা মাত্র একটি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গুলিতে এই পঞ্চায়েতগুলির উপর খুবই উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত উহারাই পরিকল্পনার সংগঠন, উন্নয়ন, কল্যাণসাধন, ভূমিসংস্কার, ভূমির ব্যবস্থাকরণ পল্লীর পর্যায়ে ঐসব কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য মৌলিক সংগঠনী হিসাবে কাজ চালাইয়া যাইবে। এইভাবে আমাদের সংবিধানে যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার রূপায়ণের আয়োজন করা হইয়াছে।

বিচার বিভাগ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেবলমাত্র শাসন বিভাগের আলোচনা করিতে-ছিলাম। কিন্তু জনসাধারণের অধিকার রক্ষার ব্যাপার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্থানও খুব উচ্চে রাখা হয়।

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে বা রাজ্যদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার বিচারের অধিকার সুপ্রীম কোর্টের রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে পারে। সংবিধানে যেভাবে মৌল অধিকার নাগরিককে দেওয়া হইয়াছে, তাহা রক্ষা করার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের।

হাইকোর্ট

সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া হাইকোর্ট আছে। ইহা প্রত্যেক রাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। বড়ো বড়ো দেওয়ানী এবং গুরুতর ফৌজদারী মামলা হাইকোর্ট প্রত্যক্ষভাবে বিচার করিতে পারে।

ছোট আদালত

হাইকোর্টের নিচে, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলা বিচারের জন্য জেলা জজের আদালত, সাব্ জজের আদালত, মুন্সেফের আদালত ও ন্যায় পঞ্চায়েত রহিয়াছে।

জেলা পরিষদকে তাহার কাজের জন্য কর ধার্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে একটি আইন দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

ন্যায় পঞ্চায়েত

গ্রামের ছোট খাট বিপদ এবং সামান্য অপরাধের বিচারের জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হইয়া থাকে। সাধারণত প্রত্যেক তালুক পঞ্চায়েত পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি করিয়া ন্যায় পঞ্চায়েত স্থাপন করে। এই পঞ্চায়েত দেওয়ানী ও ফৌজদারী সবরকমের ছোট-খাট মামলার বিচার করিতে পারে। জরিমানা করার এবং সামান্য দণ্ড দেওয়ার অধিকার ইহাদের আছে। তবে এই ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করা সরকারের পবিত্রতম কর্তব্য। এক নাগরিক যদি অপর নাগরিকের অধিকার নষ্ট করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। যেমন কেহ যদি কোনো ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি করিতে চেষ্টা করে, সরকারকে পুলিশের সাহায্যে তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আবার দুই নাগরিকের মধ্যে কোন অধিকার নিয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে বিচার বিভাগ তাহার বিচার করিয়া বিবাদের (মামলার) নিষ্পত্তি করে। কিন্তু সরকার যদি নাগরিকের অধিকার নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন তবে কে তাহা রক্ষা করিবে? বিচার বিভাগকেই তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে হয়। যে কোন লোক সরকারের বিরুদ্ধে তাহার অধিকার নষ্ট করার জন্য মামলা দায়ের করিতে পারে। কিন্তু এখানে মুস্কিল হইল এই যে সরকারই বিচার বিভাগের বিচারককে নিয়োগ করিয়া থাকেন; তাহাদের চাকুরীর

উন্নতি বিধান প্রভৃতিও সরকারই করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় বিচারকেরা নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়া সরকার-নাগরিক বিবাদে বিচার করিতে পারেন না। এ যেন যে অপরাধী সে-ই অপরাধের বিচার করিতেছে। এই অবস্থায় জনসাধারণের নিজ অধিকার সম্বন্ধে নিরাপত্তা বোধ থাকে না। পুলিশ যদি শত্রুতা করিয়া মিছামিছি কাহাকেও চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে, বিচারক নিরপেক্ষ না হওয়ার দরুন তাহাকে সাজা দিতে পারেন।

তাই শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র রাখা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন। ইহা না হইলে সরকার স্বৈরাচারী হইয়া ওঠার আশঙ্কা থাকে। তাই ভারতীয় সংবিধানে শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। মন্ত্রিসভার (শাসক গোষ্ঠী) বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা নাই। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বিচারকদের নিয়োগ করেন মন্ত্রিসভা তাঁহাকে এই ব্যাপারে কোনো পরামর্শ দিতে পারেন না। কোনো কোনো রাজ্যে এখনও জেলা শাসক প্রভৃতির হাতে কিছু কিছু বিচারের ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু ধীরে ধীরে সকল রাজ্যেই এই রীতি উঠিয়া যাইতেছে।

তোমরা জান, আমাদের সংবিধানের প্রারম্ভেই যে প্রস্তাবনা যোগ করা হইয়াছে, তাহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী আনয়ন করা। এই ঘোষণার ফলে স্বভাবতই আমাদের রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি ব্যাপকতর রূপ লাভ করিয়াছে। অপরাধ নিবারণ করা বা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাতেই রাষ্ট্রের কর্তব্য সমাপ্ত হয় না। তাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) ধারণাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলেই সরকার শ্রমিক, দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কারখানা ও প্রজাসত্ত্ব সংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সুনাগরিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, নাগরিক জীবনের নৈতিক মান উন্নতির প্রয়াসে, সমাজে অস্পৃশ্যতা, বাল্য-বিবাহ, মদ্য পান প্রভৃতি যে সকল প্রগতি-বিরোধী কুপ্রথা চালু ছিল, সেগুলি দূর করার জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিয়া নানাবিধ বিধি-নিষেধ

ভারতবর্ষ কল্যাণকর রাষ্ট্র

প্রবর্তন করিয়াছেন। ভারতবাসীর সামাজিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কার্যত সর্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে।

অনুশীলন

(ভারতরাষ্ট্র)

১। ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা কর। (S.F. 1966) (উঃ—পৃঃ ৪৩৪-৩৭)

২। ভারতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (S. F. 1968, Comp.) (উঃ—পৃঃ ৪৩৫-৩৭)

৩। টীকা লেখ :

ক্যাবিনেট গভর্ণমেণ্ট, লোকসভা, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত ও ন্যায়পঞ্চায়েত, বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। (S. F. 1968)

৪। ভারতের সংবিধান বলিতে কি বুঝ? এই সংবিধানে সংরক্ষিত নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (S.F. 1968)

(উঃ—পৃঃ ৪২৪-২৭)

৫। ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব এবং ক্ষমতার ভাগাভাগি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ৪২৮-২৯)

৬। সকল ভারতীয়ের এক-নাগরিকত্ব বলিতে কি বুঝ আলোচনা কর। ভারতীয় নাগরিকত্ব কি ভাবে লাভ (acquired) করা যায়?

(উঃ—পৃঃ ৪৩০-৩১)

৭। কেন্দ্রে বা রাজ্যে কি ভাবে আইন পাস হয় তাহা বর্ণনা কর।

(উঃ—পৃঃ ৪৪২-৪৪)

৮। লোকসভা ও বিধানসভা কিভাবে গঠিত হয় এবং উহাদের কি কি ক্ষমতা রহিয়াছে আলোচনা কর। (উঃ—পৃঃ ৪৩২-৩৪)

নিম্নলিখিত প্রজেক্ট গ্রহণ করা যাইতে পারে :

(১) কৃত্রিম (Mock) পার্লামেণ্ট, ২। কৃত্রিম বিল পাস, ৩। কৃত্রিম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

(২) "নিজ সংবিধান জান" এই নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর।

আজিকার ভারত

ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠন প্রয়াস

১৯৪৬ সালের পূর্বে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান সমস্যা ছিল পরাধীনতা। পরাধীনতা হেতুই সেই যুগে আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতি যেমন ব্যাহত হইত, তেমনি ব্যক্তিমানসের পূর্ণ বিকাশও সম্ভব হইত না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সমস্যা দূর হইয়াছে। কিন্তু তাহার জায়গায় অন্য যেসব সমস্যা গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা (over-population), দারিদ্র্য ও বেকারত্ব, অজ্ঞতা, ব্যাধি, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি প্রধান। এই সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের উপরই আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা।

১৯২১ সাল হইতেই ভারতের জনসংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে হাজারে হাজারে শরণার্থী আগমনের ফলেও সাম্প্রতিককালে এই সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। নিচে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গত ত্রিশ বছরের আদমসুমারীর হিসাব দেওয়া গেল—

বৎসর	জনসংখ্যা (কোটি হিসাবে)	বৃদ্ধি (কোটি হিসাবে)	শতকরা বৃদ্ধি হার
১৯৩১	২৭'৫৫	২ ৭৪	১১%
১৯৪১	৩১'৪৭	৩'৯২	১৪%
১৯৫১	৩৫'৬৮	৪'২১	২২%
১৯৬১	৪৩'৮০	৮'১২	২২%
১৯৬৮ (অনুমান)	৫১'১১	৭'৩১	২২%

উপরের হিসাব হইতে দেখিতে পাইবে ১৯৩১ সালে যেখানে আমাদের জনসংখ্যা ছিল ২৭'৫৫ কোটি, সেই ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালে আমাদের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৩'৮০ কোটি। ১৯৩১-১৯৪১ এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা শতকরা ১৪ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আর, ১৯৫১-১৯৬১ এই

দশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২২ জন হারে ; অর্থাৎ শতকরা বৃদ্ধির হার হইয়াছে দেড়গুণেরও বেশী। অথচ, এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের উৎপাদন একই হারে বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে, দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব প্রায়শই দেখা যায়।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার এই আধিক্য হেতুই আমাদের দেশে আর একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা হইতেছে খাদ্যসমস্যা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই খাদ্যসমস্যা ভীষণ আকারে দেখা দেয় ; আজিও ইহার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নাই। সত্য বটে, আমাদের দেশে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা প্রভূত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছি। তবুও কৃষিপদ্ধতি সন্তোষজনক না হওয়ার ফলে এখনও আমাদের খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য দেশ হইতে অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেখানে কানাডার প্রতি একর জমিতে ১২ মণ বা ব্রাজিলে ১৫ মণ গম উৎপন্ন হয়, সেখানে আমাদের দেশে প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ মাত্র ৮ মণ। জাপানের তুলনায় ভারতে এক একর জমিতে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ চাউল উৎপন্ন হয়। যেখানে জাভাতে এক একর জমিতে উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ ৫০ টন, সেখানে আমাদের দেশে সমপরিমাণ জমিতে মাত্র ১৫ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ফলে, আমাদের খাদ্যসংকট দূর করা সরকারের পক্ষে এখনও সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। শুধু তাহাই নহে ; মুনাফালোভীদের খাদ্যশস্য মজুত করিয়া রাখিবার চেষ্টার ফলেও খাদ্যশস্যের মূল্য না কমিয়া চরম বৃদ্ধিই পাইয়াছে। আমাদের দেশের এক বিরাট অঞ্চলে শুধুই চাউলজাত খাদ্য খাওয়ার ব্যবস্থাও আমাদের খাদ্যসংকটকে তীব্রতর করিয়াছে। আমাদের এখনও প্রতি বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে।

খাদ্যসমস্যা

আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান যদি করিতে হয় তাহা পল্লীগ্রামেই করিতে হইবে। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগেরও উপর গ্রামে বাস করে। তাই পরিকল্পনা কমিশন গ্রামোন্নয়নের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব হইতেই উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে গ্রামের উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলিতেছিল। পরিকল্পনা কমিশন মোটামুটি এই প্রচেষ্টার অনুসরণ

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

৪ টাকা, সেইক্ষেত্রে ১৯৫৫-৫৬ সালে তাহা সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে মণ প্রতি ২৮ টাকা। ফলে, লোকের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

আমাদের জাতীয় আয়ের এত নিম্নমানের একটি প্রধান কারণ এদেশে বেকার-সংখ্যার আধিক্য। আমাদের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে সেই হারে নূতন কাজ সৃষ্টি করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণ আগেই বলা হইয়াছে। আমাদের জাতীয় সরকারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এদেশের শিল্পপ্রসার এতখানি হয় নাই যে এইসব বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। অন্যদিকে শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে। আমাদের কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে বেকার-সমস্যা রহিয়াছে; কারণ, যতলোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অনেক কম লোকেই এই কাজ চলিতে পারে। তাছাড়া, উচ্চ-শিক্ষার মোহও আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে। উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা সাধারণত শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ পারতপক্ষে করিতে অনিচ্ছুক। ফলে, বর্তমান ভারতে বেকার-সমস্যা উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে।

বেকার-সমস্যা

১। আমাদের কর্মনিয়োগ কেন্দ্রগুলির (Employment Exchanges) হিসাব হইতে জানা যায় যে ১৯৬৮ সালে ঐসব কেন্দ্রে ৩০,৩৯,৫১৬ বেকার কাজের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে মাত্র ৪,২৪,২২৭ জনের কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে। কাজেই বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬,৬৫,২৮৯। প্রকৃত বেকারের সংখ্যা ইহার চাইতেও অনেক বেশী, কারণ এখনও অনেক বেকার বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামের বেকারগণ কর্মনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখান না। আরও চিন্তার কথা এই যে, আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিন দিনই দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। উপরোক্ত ধরনের কর্মনিয়োগ কেন্দ্রগুলির হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫৬ সালে যেখানে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ হইতে কম, ১৯৬৯ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৩৬ লক্ষেরও বেশী।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার মধ্যে আরেকটি অন্যতম প্রধান হইতেছে শিক্ষা-সমস্যা। ইংরেজ

আমলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই ছিল এদেশে ইংরেজের অনুগত একটি শিক্ষিত শ্রেণী তৈরী করা, যাহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও আচারে-আচরণে-রুচিতে হইবে ইংরেজী মনোভাবসম্পন্ন। তাহারা এদেশের মানুষের সহিত ইংরেজপ্রভুর যোগাযোগ রক্ষা করিবে, দেশ শাসনে ইংরেজপ্রভুদের সাহায্য করিবে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার মাধ্যম ছিল বিদেশী ইংরেজী ভাষা। ইহার অনিবার্য পরিণতি হইতেছে এদেশের এক বিরাট সংখ্যক লোকই শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইত। শুধু তাহাই নহে, ইংরেজী-জানা স্বল্প ভাগ্যবান ব্যক্তির সহিত ইংরেজী-না-জানা এদেশের বিরাট জনসংখ্যার এক দুস্তর ব্যবধান রচিত হইয়াছিল। মূলত, শাসনকার্য চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, দেশের শিল্পোন্নয়ন বা কৃষি-উন্নয়নের জন্য বিশেষ শিক্ষিত লোকের একান্তই অভাব ছিল। আবার, অন্যদিকে. প্রয়োজনীয় কর্মচারীর সংখ্যার চাইতে বেশীসংখ্যক ভারতীয় যখন ঐ শিক্ষাগ্রহণ শুরু করিল তখনও শিক্ষাসমাপনান্তে তাহারা কি করিবে সেই সম্বন্ধে তৎকালীন সরকার কোনো দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ফলে, দেশে যে ব্যাপক পরিমাণে শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি শুরু হয়, আজও আমাদের পক্ষে তাহাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। এমন কি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাও পর্যাপ্ত ছিল না। আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল নিতান্তই স্বল্প।

শিক্ষা-সমস্যা

ইহার ফলে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই এই দেশের এক বিপুল জনসংখ্যা নিরক্ষরই রহিয়া গিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকালীন হিসাবে দেখা যায়, সেই সময় এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৪ জন মাত্র ছিল শিক্ষিত, অন্যরা নিরক্ষর। ঐ শতকরা ১৪ জনের মধ্যে আবার মেয়েদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৩ জন। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে দেখা যায় এই শতকরা সংখ্যা যদিও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবু তাহাও নগণ্য। এই হিসাবমতে, আমাদের দেশের মাত্র শতকরা ২৩.৭ জন শিক্ষিত, অর্থাৎ সহজ চিঠিপত্র পড়িতে বা লিখিতে পারে ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ১২.৮ জন, আর শিক্ষিত পুরুষদের সংখ্যা শতকরা ৩৩.৯ জন।

জনস্বাস্থ্যের সমস্যাও স্বাধীন ভারতের এক বিরাট সমস্যা। আমাদের গড় আয়ুষ্কালের স্বল্পতা বা আমাদের মৃত্যুহারের কথা তোমাদের আগেই বলা হইয়াছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকালে আমাদের শিশুমৃত্যুর হারও ছিল অত্যধিক। অবশ্য সাম্প্রতিককালে আমাদের জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টায় এই শিশুমৃত্যুর সংখ্যা নগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য-সমস্যা

আমাদের এই স্বল্প আয়ুষ্কাল বা মৃত্যুহারের আধিক্যের কারণ আমাদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা, দারিদ্র্যহেতু স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার উপকরণাদির অভাব, পুষ্টিকর সমতাপূর্ণ খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

তোমরা জান, আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর সর্ববিধ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের জাতীয় সরকার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। পুলিশী রাষ্ট্রের আদর্শ বর্জন করিয়া জনকল্যাণকারী রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প সার্থক করার জন্য তাহারা আমাদের দেশের সকল নাগরিকের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান করিয়া সুখী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িবার কাজে ব্রতী হইয়াছেন। নিচে উপরিউক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে বিবিধ সরকারী প্রচেষ্টার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টা

আমাদের আতঙ্কজনক জনবৃদ্ধির হার নিরোধকল্পে সরকার পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (**Family Planning Programme**) গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইতেছে জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত ও অবহিত করা। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জন্মশাসনসংক্রান্ত জ্ঞান ও কৌশল জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ও সেই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য বর্তমানে এদেশে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে বহু পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

পরিবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে সরকার আমাদের খাদ্যসমস্যা দূর করার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাছাড়া, ১৯৫৭ সালে গঠিত খাদ্যসমস্যা সমাধান কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী সরকার অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

খাদ্যসমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন কৃষি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দান করেন এবং ৭৬ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তবুও এই পরিকল্পনায়ও এক কোটি টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর জীবনীশক্তি সংরক্ষক খাদ্য সরবরাহের এবং কৃষিকার্যে অধিকতর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য ফল এবং উদ্ভিজ্জের উৎপাদনের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থাও করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায়ও কৃষি-উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ সালের খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে বার্ষিক ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া ফল, তরিতরকারী, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতিরও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আমাদের বিভিন্ন শিক্ষা-সমস্যার সমাধানেও জাতীয় সরকার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। এদেশে দশ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়াও শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২০ জন। তাই সরকার প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন। প্রতি রাজ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে; রেডিও, সিনেমা প্রভৃতির সাহায্যেও ইহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সব শিক্ষাপরিকল্পনার লক্ষ্য শুধু ইহাদের শিক্ষিত করা নহে। ইহাদের উদ্দেশ্য এইসব প্রাপ্তবয়স্কদের অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; সুনাগরিকত্ব, সুস্বাস্থ্য, অবসর সময়ের সুব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও ইহাদের সুশিক্ষিত করিয়া তোলা।

শিক্ষা-সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে

আমাদের সংবিধানে ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক সকল ছেলেমেয়ের জন্য আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা ঘোষিত হইয়াছিল। কোনো কোনো রাজ্যে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলেও নানাবিধ কারণে উহা সামগ্রিকভাবে সম্ভবপর হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনাধীন কালের মধ্যে ৬—১১ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়েদের আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্যও সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত চিকিৎসক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য মহাবিদ্যালয়গুলির সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে কে. এন. উডুপের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার শিক্ষা, গবেষণা এবং ঔষধাদি প্রস্তুতের ব্যাপার পরিচালনার্থে আয়ুর্বেদিক গবেষণা পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্যার পাঁচ বৎসরের শিক্ষাক্রমকেও অনুমোদন করিয়াছেন।

কিন্তু উপরিউক্ত সমস্যাগুলির কোনোটিই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ; সুতরাং সাময়িক সমাধান আংশিকভাবে হইলেও কোনোটারই পূর্ণ স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যতদিন না পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি রোধ করা যায় এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায়, ততদিন পর্যন্ত আমাদের অসম খাদ্যগ্রহণ বন্ধ করা যাইবে না ; বা সেইহেতু জনস্বাস্থ্যের অবনতিও রোধ করা যাইবে না। আবার, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গেলে ঐ বিষয়ে কুশলী ব্যক্তিদের প্রয়োজন ; সেই জন্য কৃষিবিদ্যা শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন। তেমনি ব্যক্তিগত আয়ের বৃদ্ধি করিতে গেলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের প্রয়োজন, প্রয়োজন জাতীয় সম্পদের পূর্ণ ও সার্থক ব্যবহার। তাই, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অল্প পরেই আমাদের সর্ববিধ সমস্যার সাময়িক ও স্থায়ী সমাধানকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া জাতীয় সরকার জাতীয় জীবনকে সমস্যামুক্ত করিবার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করেন। প্রতি পাঁচ বছরের জন্য একটি করিয়া পরিকল্পনা গ্রহণের নীতি ভারত সরকার মানিয়া নিয়াছেন। আজ পর্যন্ত ঐরূপ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে চারিটি। প্রতি পাঁচ বছরের জন্য একটি করিয়া পরিকল্পনা গৃহীত হইতেছে বলিয়া ইহাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপদানের উদ্দেশ্যেই ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভার ন্যস্ত হয়—

আমাদের জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(১) দেশের সম্পদ, মূলধন ও জনবল নির্ধারণ করা।

(২) উহাদের যথাযথ ও সর্বাধিক পরিমাণ সুব্যবহার সম্পর্কে প্রস্তাব করা।

(৩) এ সম্পর্কে গুরুত্ব অনুযায়ী কোন কাজটি পূর্বে শুরু হওয়া প্রয়োজন তাহা স্থির করা। এবং,

(৪) সামগ্রিক পরিকল্পনাটির সাফল্যলাভের জন্য কি ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করা।

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কমিশনের খসড়া প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, এবং ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল দুইটি—

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

(১) জাতির জীবনের মান উন্নয়ন করা এবং তাহার নিকট উন্নততর ও বিচিত্রতর জীবনের সুযোগের পথ অবারিত করিয়া দেওয়া। এবং

(২) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথম লক্ষ্যসাধনের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এইজন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন প্রয়োজন যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের হাতে উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলি এবং আর্থিক সঙ্গতি না কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। তাহার জন্য প্রয়োজন সরকার পরিচালিত আর্থিক ক্ষেত্রের ক্রমিক পরিবর্ধন এবং ব্যক্তি পরিচালিত আর্থিক ক্ষেত্রের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিস্তার। এই উদ্দেশ্যে শিল্পক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Mixed Economy) প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি অনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রে সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্র (Public Sector) এবং বেসরকারী উৎপাদন ক্ষেত্র (Private Sector) স্থিরীকৃত হয়। এতদ্ব্যতীত বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন কুটির শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান সহায়ক হিসাবে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়।

সারা ভারতের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য মোট বরাদ্দ করা হয় ২,০৬৯ কোটি টাকা। পরে পরিকল্পনা বহির্ভূত কতকগুলি উপকল্পনা সংযুক্ত করিয়া আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৩৫৬ কোটি টাকা। পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন বিভাগে বরাদ্দের হিসাব দেওয়া গেল—

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে এইজাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র ৪৫টি, ১৯৫৭-৫৮ সালে তাহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২০টি। শুধু চিকিৎসকই নহে; চিকিৎসাব্যবস্থার বিশেষ অঙ্গ হিসাবেই ধাত্রীবিদ্যা (nursing) শিক্ষাদানের জন্যও দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রাম প্রভৃতি জায়গায় উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে সুচিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতে পারে সেইজন্য হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের সংখ্যাও যে বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে, নিচের তালিকা হইতেই তাহা বোঝা যাইবে—

জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে

বৎসর	হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা
১৯৪৬	৩,৮২৫	৪,৩০,১৯,৭৭২
১৯৫১	৯,৫৫২	১০,০৯,৯৪,৭৯৮
১৯৫৬	১০,৫০১	১৩,৩৮,২৫,৫১৩
১৯৫৭	১০,৬৯৭	১৩,১৭,৬০,১৫৭
১৯৫৮	১০,৩৯০	১৪,০৪,৪৩,৬১৫

বলাবাহুল্য, আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় ইহাও যথেষ্টসংখ্যক নহে। সংক্রামক রোগগুলির প্রতিকারার্থে যে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) জাতীয় ম্যালেরিয়া দূরীকরণ পরিকল্পনা—এই উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আমেরিকান কারিগরী সহযোগিতা মিশনের সহায়তায় ভারতের ম্যালেরিয়া ইনষ্টিটিউট্ কাজ করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের লক্ষ্য ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহক মশককূল ধ্বংস করিয়া এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা। ১৯৬১ সালের ১লা মার্চের হিসাবে জানা যায় ঐ সময় এদেশে ৩৯০টি ম্যালেরিয়া ইউনিট কার্যরত ছিল।

(২) জাতীয় ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা—ইহারও লক্ষ্য মশককূল ধ্বংস এবং যেসব অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ফাইলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী সেখানে ব্যাপকভাবে ঔষধ প্রয়োগ। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে ৪৫টি ইউনিট কার্যরত রহিয়াছে।

(৩) যক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা—এক হিসাবে দেখা গিয়াছে এদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সক্রিয় যক্ষারোগে ভোগে। এই রোগ নিয়ন্ত্রণার্থে ব্যাপক

B. C. G. টীকা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক যক্ষা নিরোধ অভিযান ও পরবর্তীকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক শিশুদের আশু প্রয়োজনীয় অর্থ তহবিলের (UNICEF) সাহায্যে ১৭ কোটি সম্ভাবনাময় যক্ষারোগীকে B. C. G. টীকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে ১১৯ জন চিকিৎসক ও ৮১৬ জন টেকনিশিয়ান সম্বলিত ১৬০টি দল এদেশে কাজ করিয়া চলিয়াছে। রোগমুক্ত যক্ষারোগীদের জন্য এপর্যন্ত ১৫টি কলোনী (Aftercare Colony) স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) কুষ্ঠ নিবারণী পরিকল্পনা—বর্তমানে এই দেশে কুষ্ঠরোগগ্রস্তের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। ইহাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য বেসরকারী মিশন ফর লেপারস, হিন্দ্ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ, মহারাণী সেবামণ্ডল, গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রোসী ফাউণ্ডেশন প্রভৃতি ছাড়াও সরকারী প্রচেষ্টায় ৪টি কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ২৯টি সহযোগী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

(৫) জাতীয় বসন্ত রোগ দূরীকরণ পরিকল্পনা—এই উদ্দেশ্যে ১১টি রাজ্যে ১৩টি বসন্ত রোগের টীকা প্রস্তুতকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মিলিত প্রচেষ্টায় যে পরিমাণ টীকা উৎপাদন হয় তাহাতে বছরে প্রায় সাড়ে সাত কোটি লোককে টীকা দেওয়া সম্ভব। কি শহরাঞ্চলে, কি গ্রামাঞ্চলে—ব্যাপক বসন্তের টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য ১৯৫৪ সাল হইতে যে পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে তাহার ফলে বর্তমানে শহরাঞ্চলে ৩৬৪টি জলসরবরাহ ব্যবস্থার আয়োজন সম্ভবপর হইয়াছে। তাছাড়া, এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই শহরাঞ্চলে ৮২টি স্যানিটেশন পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হইয়াছে। এইজন্য প্রায় ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলেও ১৮·৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১৬ হাজার গ্রামবাসীর জন্য নলকূপ ইত্যাদির দ্বারা বিশুদ্ধ জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

খাদ্যের ভেজালাদি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ঐ আইনকে কার্যকরী রূপ দিবার জন্য Central Committee of Food Standards নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসাবিদ্যারও উন্নয়নের

বিভাগ	মূল বরাদ্দ (কোটি টাকা)	সমগ্রের শতকরা অনুপাত	পরিবর্তিত বরাদ্দ (কোটি টাকা)	সমগ্রের শতকরা অনুপাত
১। কৃষি ও পল্লীউন্নয়ন	৩৬০.৪৩	১৭.৫	৩৫৭.০০	১৫.১
২। সেচ ও শক্তি উৎপাদন	৫৬১.৪১	২৭.১	৬৬১.০০	২৮.১
৩। শিল্প ও খনি	১৭৩.০৪	৮.৪	১৭৯.০০	৭.৬
৪। পরিবহণ ও যোগাযোগ	৪৯৭.১০	২৪.০	৫৫৭.০০	২২.৬
৫। সমাজসেবা ও পুনর্বাসন	৪২৪.৮১	২০.৫	৫৩৩.০০	২২.৬
৬। বিবিধ	৫১.৯৯	২.৫	৬৯.০০	৩.০
	২,০৬৮.৭৮	১০০.০	২,৩৫৬.০০	১০০.০

উপরিউক্ত ব্যয়বরাদ্দ পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, এই পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নই অগ্রাধিকার পায়, কারণ এই সময় খাদ্যসমস্যাই ভারতের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাছাড়া, পাট ও কার্পাস উৎপাদন অঞ্চল দেশবিভাগের ফলে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পাটকল ও কাপড়ের কলগুলির কাঁচা মালেরও ঘাটতি দেখা দেয়। সেই কারণেই এই খাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সেচ ও শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনা শস্য উৎপাদনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ; তাই তারপরেই তাহা অগ্রাধিকার পায় (নদী-পরিকল্পনাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত)। পরিকল্পনার এই দুই বিভাগেই মোট ৯২২ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট বরাদ্দের প্রায় শতকরা ৪৪.৬ ভাগ, বরাদ্দ করা হইয়াছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়-পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। পরিকল্পনানুযায়ী শিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব মালিকদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার তাহাদের অনুরোধ জানান। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে মোট বরাদ্দের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ধার্য করা হয়। তবে ইহার বেশীর ভাগই ধার্য করা হয় রেলপথের উন্নতির জন্য (২৬৮ কোটি টাকা)। ইহা ব্যতীত রাস্তাঘাটের সংস্কার ও প্রসারের জন্য ধার্য হয় ১৩০ কোটি টাকা। সমাজসেবা খাতে যে পরবর্তীকালে ৫৩৩ কোটি টাকা ধার্য হয় তাহার মধ্যে শিক্ষার জন্য ১৬৪ কোটি, স্বাস্থ্যের জন্য ১৪০ কোটি, গৃহনির্মাণ বাবদ ৪৯ কোটি, অনগ্রসর জাতিগুলির উন্নতির জন্য ৩২ কোটি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ১৩৬ কোটি, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি নানাজাতীর সমাজ কল্যাণমূলক

কাজের জন্য ৫ কোটি এবং শ্রমিক কল্যাণের জন্য ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ না করিলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর হইয়াছে। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্যও অতিক্রান্ত হইয়াছে। কৃষির ক্ষেত্রে আশা করা গিয়াছিল খাদ্যশস্যের উৎপাদন পরিমাণ ৫২৭ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৬ লক্ষ টন দাঁড়াইবে। পাট, তুলা প্রভৃতি কাঁচা মালের ক্ষেত্রে দেশ অনেকটা পরিমাণে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রায় ৬০০ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। প্রথম পরিকল্পনা শেষে দেখা যায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা গিয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা পরিকল্পনার লক্ষ্য অপেক্ষা বেশী। সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনও শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন পরিমাণ পরিকল্পনার লক্ষ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সিমেণ্ট উৎপাদন ক্ষেত্রেও বেসরকারী উৎপাদন পরিমাণ পরিকল্পনানুযায়ীই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু চিনি বা লৌহ ইস্পাত শিল্পে উৎপাদন পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। এই সময়ই সরকারী ক্ষেত্রে সিন্ত্রি সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, দুর্গাপুর হিন্দুস্থান কেবলস্ কারখানা, বিশাখাপত্তনমে জাহাজ নির্মাণ কারখানা, মাদ্রাজে রেলগাড়ীর কামরা নির্মাণ কারখানা, বাঙ্গালোরে টেলিফোন কারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাধীনকালে মোট ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মিত হয়, এবং কতকগুলি জাতীয় ও রাজ্য সড়ক গড়িয়া ওঠে। বিভিন্নক্ষেত্রে এই উন্নতির ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী যেখানে জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধির আশা করা গিয়াছিল, সেখানে শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ১০ বৎসর পরে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার (rationing) অবসান ঘটানো সম্ভবপর হয়। কিন্তু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ক্ষেত্রে বা বেকার-সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আশানুরূপ কাজ হয় নাই।

১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য চারিটি—

সার কারখানা স্থাপিত হইবে। রেলওয়ে লোকোমোটিভ আরও বেশী করিয়া তৈরী করা হইবে। এতদ্ব্যতীত, সিমেণ্টের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া পরিকল্পনার আরম্ভকালীন ৪৩ লক্ষ টন হইতে ১৩০ লক্ষ টন এবং কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৩৮০ লক্ষ টন হইতে ৬০০ লক্ষ টন পর্যন্ত করা হইবে। অবশ্য গুরু শিল্পসমূহের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহের জন্যও মোট বরাদ্দের প্রায় শতকরা ৪'১ ভাগ, অর্থাৎ ২০০ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে। আশা করা গিয়াছে, এইভাবে শিল্পোন্নয়নের ফলে এবং নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নের কাজের ফলে এই পরিকল্পনাধীনকালে প্রায় ৮০ লক্ষ বেকারকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া যাইবে। এছাড়া কৃষির উন্নতির ফলেও ১৬ লক্ষ বেকারের কাজের সংস্থান হইবে। প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় এই পরিকল্পনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও অধিক পরিমাণে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন কালে কৃষি, সেচ, পরিবহণাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভকালে আমাদের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে সামগ্রিকভাবে ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনক্ষমতা ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে ইহার সহিত আরও ১১ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ শক্তি যুক্ত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে বৈদ্যুতীকরণ ব্যবস্থার ক্ষমতা ৩৪ লক্ষ হইতে বাড়াইয়া ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াট পর্যন্ত করা হইয়াছে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের পরিমাণ যেখানে ১৯৫১ সালে ছিল ১৪ ইউনিট সেখানে উহা প্রায় ৫০ ইউনিটে পৌঁছিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে সিমেণ্ট, চিনি, সাইকেল, মোটর ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক পাম্প প্রভৃতির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা ৩০-৩৫ ভাগেরও বেশী)। কুটির শিল্পের অগ্রগতিও এই পরিকল্পনাধীনকালে লক্ষণীয়। তাছাড়া, জাতীয় আয়ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমাদের জীবন-ধারণের মান এই পরিকল্পনাকালেও বিশেষ উন্নত হয় নাই। সরকার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহার্থে করভার বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মূল্যস্তরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, বেকার-সমস্যারও আশানুরূপ সমাধান সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ

এই কারণে মনে করেন, এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে জাতীয় আয়বৃদ্ধি প্রয়োজন, আর তাহার প্রধান উপায়ই শিল্পায়ন। এইজন্য সাময়িকভাবে দেশের জনসাধারণের ত্যাগ স্বীকার অপরিহার্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনা এই দিক দিয়া কতদূর সার্থক তাহার আশু বিচার সম্ভব নহে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাধীনকালে তাহার বিচার হইবে জাতির সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাপকাঠিতে।

প্রসঙ্গত এই পরিকল্পনার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন। ইহাতে গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির উপর খুবই উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব আরোপ করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, ঐ পঞ্চায়েতগুলিই পরিকল্পনার সংগঠন, উন্নয়ন, কল্যাণসাধন, ভূমিসংস্কার, ভূমির ব্যবস্থাকরণ ও পল্লীর পর্যায়ে ঐসব কার্য-সাধনের জন্য মৌলিক সংগঠনী হিসাবে কাজ চালাইয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্যে জেলাসমূহের পুনঃসংগঠন এমনভাবে করার ব্যবস্থা হইয়াছে যাহাতে জেলার অন্তর্গত পঞ্চায়েতী কেন্দ্রসমূহে এমন এক একটি শাসন পরিষদ গড়িয়া ওঠে যাহা গ্রামের জনসাধারণের নিকট হইতে ক্ষমতা লাভ করিবে এবং যাহার দ্বারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্ভবপর হইবে। পঞ্চায়েতগুলির কাজ-কর্ম, বিধিব্যবস্থা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যক্রমের সহিত নিবিড়ভাবে সুসংবদ্ধ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত-গুলিকে ভূমিরাজস্বের একটি বৃহৎ অংশ দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস হইতে আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে। ইহার মূল লক্ষ্য হইতেছে—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

(১) জাতীয় আয় প্রতি বৎসরে শতকরা ৫ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি করা।

(২) খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

(৩) মূল শিল্পগুলির উন্নতি করা এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের স্থাপন, যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বীয় সম্পদেই শিল্পক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিতে পারে।

(৪) কর্মসংস্থান ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার করা এবং দেশে জনশক্তির পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

(৫) অর্থনৈতিক অসাম্য আরও বেশী রকমে দূর করা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য নিম্নরূপ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে—

বিভাগ	মোটবরাদ্দ (কোটি টাকা)	সমগ্রের শতকরা অনুপাত
১। কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	১০২৫	১৪.১
২। সেচ ও শক্তি	১৫৭৫	২১.৮
৩। শিল্প ও খনি	১৭৫০	২৪.১
৪। পরিবহণ ও যোগাযোগ	১৪৫০	২০.০
৫। সমাজ সেবা	১২৫০	১৭.২
৬। বিবিধ	২০০	২.৮
মোট	৭২৫০	১০০.০

উপরিউক্ত ব্যয়বরাদ্দ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্যের উপর গুরুত্ব শিল্পক্ষেত্রের গুরুত্বের ন্যায়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজসেবাক্ষেত্রের গুরুত্বও অব্যাহত রহিয়াছে। পরিকল্পনার বিস্তৃত ব্যয়বরাদ্দ আলোচনা করিলে জানা যায় এই খাতে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ৫০০ কোটি (যেখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছিল ৩৭০ কোটি) এবং স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হইয়াছে ৩০০ কোটি টাকা (যেখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২৭৪ কোটি টাকা)। দেশের জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সার্থক রূপায়ণের জন্য স্বাভাবিক।

কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। শিল্পের উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার আশা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্বের পরিমাণও কমে নাই। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিও আশানুরূপ হয় নাই। ফলে মানুষের জীবন ধারণের মানেরও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ, বৈদেশিক সাহায্য লাভে অসুবিধা, খাদ্যাভাব প্রভৃতি নানা কারণে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যথাসময়ে রচিত হইতে পারে নাই। মাত্র ১৯৬৯ সালে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইয়াছে।

এই পরিকল্পনায় সমগ্রভাবে প্রায় ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। ইহার মধ্যে শিল্প ও খনি খাতে সরকারী তহবিল হইতে ৩৯৩৬ কোটি

টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। কৃষি, সমাজ উন্নয়ন, সমবায় ও সেচের জন্য সরকার ব্যয় করিবেন ৩৩৭৪ কোটি টাকা। শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সরকারী ব্যয় হইবে ১৩৫০ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনার বহর যে পূর্ব পূর্ব তিন পরিকল্পনা হইতে বড়ো তাহা উপরের হিসাব হইতে বুঝা যায়। উৎপন্ন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ২২ হাজার কোটি টাকা নিয়োগ করা হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার কোটি টাকা—অর্ধেকেরও কম।

অনুশীলন

(ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠন প্রয়াস)

১। নূতন ভারত গঠন করিবার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন কেন দেখা দেয়? পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সমালোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখ। (S. F. 1967) (উঃ—পৃঃ ৪৬২-৭১)

২। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা কাহাকে বলে? জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (S. F. 1966) (উঃ—পৃঃ ৪৫৩-৫৫)

৩। সমষ্টি উন্নয়ন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (S. F. 1968) (উত্তর পূর্বপ্রশ্নের অনুরূপ)

৪। আধুনিক ভারতের বিভিন্ন সমস্যা এবং সরকারের তাহা সমাধানের চেষ্টা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (উঃ—পৃঃ ৪৫৬-৬২)

৫। (ক) স্ক্র্যাপ বইএর জন্য—

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, জনসংখ্যা প্রভৃতি যে কোন একটি সমস্যা সম্বন্ধে তিনমাস ধরিয়া সংবাদপত্রের সংবাদ এবং মন্তব্য সংগ্রহ কর।

(খ) নিম্নলিখিত প্রজেক্ট গ্রহণ করা যাইতে পারে—

প্রত্যেক ছাত্র নিজ বাসা বা বাড়ীর চারিপাশের ১০।১৫টি বাড়ী বা বাসা সম্বন্ধে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জন্ম, মৃত্যু, আয় প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবে। সংগৃহীত তথ্য হইতে প্রাচীর পত্রিকা প্রকাশিত হইবে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর বহু দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে চলিয়া আসিতেছে। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর আগেও মিশর, রোম, গ্রীস, আরব, ইরান ও চীনের সহিত তাহার বাণিজ্য-জনিত লেনদেন চলিত। মৌর্যযুগে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে কোনো অজ্ঞাতনামা বিদেশী কর্তৃক রচিত Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থ বা পরবর্তী কালের টলেমী, হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়ান প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে, সেই সুদূর অতীতেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দর হইতে রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, মশলা, হীরা, মুক্তা ও সুপারি প্রভৃতি কৃষিজ ও শিল্পজাত উভয় প্রকার দ্রব্যই য়ুরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইয়া এদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। মধ্যযুগে (ত্রয়োদশ শতকে) মার্কো পোলো উপরিউক্ত দ্রব্যাদির সঙ্গে সঙ্গে চিনি ও লবণ রপ্তানির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান আমলেও মোটামুটি এরূপ বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের দেশের বহির্বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণই লুব্ধ বিদেশী শক্তির বারবার আক্রমণের একমাত্র কারণ।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিকথা

ইংরেজ আমলে আমাদের বহির্বাণিজ্যের এক গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার স্বার্থেই এদেশে কার্পাস বা রেশম বস্ত্র উৎপাদন, লবণ তৈরী প্রভৃতি শিল্প লুপ্ত হইয়া যায়। ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটায় সেখানে মূলত কারখানা-শিল্প গড়িয়া ওঠে, এবং কাঁচা মালের প্রয়োজনে ভারত হইতে ইংল্যাণ্ড কাঁচামাল লইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে পাঠায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং ভারতের সহিত ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই বাড়িয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বৃটেন হইতে ভারতে মাল আমদানি খুবই কমিয়া যায়। ফলে বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প আমাদের দেশে গড়িয়া

ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালেও ভারতের শিল্পোন্নতি ঘটে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে ভারত প্রকৃত-পক্ষে শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার ফলে তাহার বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়তন, আমদানি এবং রপ্তানি উভয় দিকই বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিচে ভারতের গত কয়েক বৎসরের আমদানি ও রপ্তানির মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি

ভারতের আমদানি ও রপ্তানি

(কোটি টাকার হিসাবে)

বৎসর	আমদানি	রপ্তানি	ঘাটতি
১৯৫০-৫১	৬৫·৪৩	৬০০·৬৮	—৪৯·৭৭
১৯৫৫-৫৬	৭৭৪·৩৫	৬০৮·৯১	—১৬৫·৪৪
১৯৬৬-৬৭	২,০৭৮·৩৬	৩,২৩৪ ৮৯	—৯২১·৮৩
১৯৬৭-৬৮	১,৯৭৪·২৮	৩,১৭২·৯৫	—৭৭৫·৬১

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে গত কয়েক বৎসরে আমাদের আমদানি এবং রপ্তানি অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির বৃদ্ধি অনেক বেশী ; অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করিতেছি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জিনিস ক্রয় করিতেছি। ইহা আশঙ্কার কথা। তাই রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আমাদের সরকার বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তবে আমদানির পরিমাণ বেশী হইলেও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা যে খুব শোচনীয় একথা মনে করার বিশেষ কারণ নাই। বর্তমানে আমরা যে সব জিনিস আমদানি করিতেছি তাহার এক বড়ো অংশ আমরা সরাসরি ভোগে না লাগাইয়া, শিল্প সম্প্রসারণের কাজে লাগাইতেছি। ফলে, কিছুদিন পরে, হয়তো আমাদের দেশের আমদানির পরিমাণ খুবই কমিয়া যাইবে এবং রপ্তানি অনেক পরিমাণে বাড়িবে। বর্তমানে আমাদের ঋণগ্রস্ত মনে হইলেও ভবিষ্যতে এ অবস্থা থাকিবে না বলিয়াই আশা করা যায়।

ভারতের আমদানি-রপ্তানি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, আমাদের মোট আমদানির একটা বড় অংশ নানাবিধ যন্ত্রপাতি। অন্যান্য প্রধান

আমদানি দ্রব্য হইতেছে লৌহ ও ইস্পাত, ধাতুদ্রব্য, পেট্রোলিয়াম দ্রব্য, তুলা প্রভৃতি ; এইগুলি শিল্পের উপাদান বা শিল্পের মূল দ্রব্য (raw materials)। কিন্তু ভারতবর্ষে যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য বা খাদ্যশস্য হইতে প্রস্তুত দ্রব্য আমদানি করিতে হইতেছে সে দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। দেশ বিভাগ ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। ভালো খাদ্যশস্য উৎপাদনের জমি অনেক পরিমাণে পাকিস্তানের ভাগে পড়িয়া যাওয়ায় আমাদের খুবই অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। পাট ও তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির বেশীর ভাগ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতকে পাট ও তুলাও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে।

তবে, "ভোগ্য" ও "অন্যান্য দ্রব্যের" আমদানি আমাদের দেশে দিন দিনই কমিতেছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি ছিল, সমগ্র আমদানির শতকরা ১৮ ভাগ, ১৯৬২-৬৩ সালে তাহা কমিয়া শতকরা ১১ ভাগ হইয়াছে ; অন্যান্য দ্রব্যের বেলাও আমদানি শতকরা ১১ ভাগ হইতে কমিয়া শতকরা ৯ ভাগ হইয়াছে।

আমাদের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য

রপ্তানি বাণিজ্যের গতি পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। রপ্তানি বৃদ্ধির বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা দ্বারাই ইহা সম্ভব হইতেছে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রথমেই পাটজাত দ্রব্যের নাম করিতে হয়। বর্তমানে ইহা মোট রপ্তানির শতকরা ৩৫ ভাগ অধিকার করে। রপ্তানি বাণিজ্যে চা-এর একটি বিশেষ স্থান আছে। অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তৈলবীজ, সুতীর কাপড়, তামাক, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, গালা, মশলা ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আমরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ও শিল্প-ব্যবহারের দ্রব্যাদিও পাঠাইতেছি।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানত বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথ-যুক্ত দেশগুলির সহিতই বেশী ছিল। স্বাধীনতালাভের পর অন্যান্য আরও অনেক দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিচে বাণিজ্য সম্পর্কের গুরুত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটা খসড়া দেওয়া গেল—

(১) **ভারত-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য**—এখনও ভারতের বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যকে প্রধান অংশীদারের স্থান দেওয়া চলে। ১৯৬৭-৬৮ সালের

হিসাব হইতে দেখা যায় শতকরা ২০% বাণিজ্য যুক্তরাজ্যের সহিত হইয়াছে। যুক্তরাজ্য ভারত হইতে চা, পাটজাত দ্রব্য, পাকা ও কাঁচা চামড়া, তৈলবীজ, কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য, পশম, তামাক, কফি, রবার, লাক্ষা, দড়ি, ছোবড়া, মশলা প্রভৃতি ক্রয় করে। আর ভারত যুক্তরাজ্য হইতে যন্ত্রপাতি, মোটর, সাইকেল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি, পশম ও কার্পাসজাত দ্রব্য, রবারজাত দ্রব্য, রঞ্জক দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, পুস্তক ইত্যাদি ক্রয় করে।

(২) **ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য**—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। ১৯৫৬ সালে ভারত আমেরিকা হইতে প্রায় ৯৬.২৩ ও ১৯৫৯-৬০ সালে প্রায় ১১৮.৭২ কোটি টাকার পণ্য আমদানি এবং প্রায় ৮৫.৯১ ও ৯৫.১২ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের প্রায় ২০ ভাগ বাণিজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সহিত হয়। ঐ দেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, কলকব্জা, কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য, মোটরগাড়ী, খনিজ তৈল, লৌহজাত দ্রব্য, রপ্তানিকৃত রাসায়নিক দ্রব্য, তামাক, কাগজ ও পেষ্টবোর্ড প্রভৃতি প্রধান। ঐ দেশে দ্রব্যাদির মধ্যে চা, পাটজাত দ্রব্য, পাকা ও কাঁচা চামড়া, ম্যাঙ্গানীজ, ইলমেনাইট, গালা, অভ্র, তৈলবীজ, মরিচ ও মশলাই উল্লেখযোগ্য।

(৩) **ভারত-পশ্চিম জার্মানী বাণিজ্য**—ভারত পশ্চিম জার্মানীতে রপ্তানি করে প্রধানত কার্পাসজাত দ্রব্য, চা, তামাক, আকরিক লৌহ, মশলা, পাকা ও কাঁচা চামড়া, হরিতকী, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, পাটজাত দ্রব্য, লাক্ষা, উদ্ভিজ্জ তৈল ও তৈলবীজ। ভারত ঐ দেশ হইতে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রঞ্জক দ্রব্যাদি, কাঁচের দ্রব্যাদি ও ঔষধ ইত্যাদি ক্রয় করে। ১৯৫৯ সালে ভারত জার্মানী হইতে ১১৮.৭২ কোটি টাকার পণ্য আমদানি ও ১৯.৪৪ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে। ১৯৬৭-৬৮ সালে আমদানি দাঁড়াইয়াছে ১৪৩.১৬ কোটি টাকা এবং রপ্তানি হইয়াছে ২২.২৮ কোটি টাকা।

(৪) **ভারত-জাপান বাণিজ্য**—জাপান হইতে বস্ত্র ও কৃত্রিম রেশম, রেশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি, কাঠ ও কাঁচের দ্রব্যাদি, নানাবিধ খেলনা আমদানি করে। অপর পক্ষে ভারত কার্পাস, আকরিক লৌহ, পাটজাত

দ্রব্যাদি, চা, চিনাবাদাম ইত্যাদি রপ্তানি করে। ১৯৫৯ সালে ভারত জাপান হইতে ৪০·৯৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি ও জাপানে ৩৪·৩৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ইহা যথাক্রমে হইয়াছে ১০৬·৯০ এবং ১২১·৭৯ কোটি টাকা।

(৫) **ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য**—পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত পাকিস্তান হইতে প্রচুর পরিমাণে পাট ও তুলা আমদানি করে এবং পাকিস্তানে কার্পাস বস্ত্র, পাটজাত দ্রব্যাদি, গুড়, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, চা, সরিষার তৈল, সিমেণ্ট প্রভৃতি রপ্তানি করে। বর্তমানে পাকিস্তানে একটি নূতন চিনির কল স্থাপিত হওয়ায়, চিনি রপ্তানি ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে। ১৯৫৯ সালে ভারত পাকিস্তান হইতে ৫·৪৬ কোটি টাকার পণ্য আমদানি ও ৬·২৯ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই সংখ্যা যথাক্রমে হইয়াছে ২·১১ এবং ১·০০ কোটি টাকা। ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে বাণিজ্যের পরিমাণ স্বল্প মেয়াদী চুক্তি দ্বারা পূর্ব হইতে নির্ধারিত হয়।

(৬) **ভারত-সোভিয়েত রাশিয়া বাণিজ্য**—সোভিয়েত রাশিয়া হইতে ভারত যন্ত্রপাতি, গম, অপরিশুদ্ধ খনিজ তৈল প্রভৃতি আমদানি করে ও পাটজাত দ্রব্য ও চা রপ্তানি করিয়া থাকে। ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ফলে উভয় দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের রাশিয়া হইতে আমদানি ৯৫·৮২ এবং রপ্তানি ১২১·৭৯ কোটি টাকা।

(৭) **ভারত-সিংহল বাণিজ্য**—ভারত সিংহল হইতে নারিকেল শাঁস, নারিকেল তৈল, খনিজ দ্রব্য, রবার, চা প্রভৃতি আমদানি ও ধান, চাউল, কার্পাস দ্রব্য, ইস্পাত দ্রব্য, কয়লা, ফল, তামাক, মশলা, সার প্রভৃতি দ্রব্যাদি সিংহলে রপ্তানি করে। ১৯৫৯ সালে ভারত সিংহল হইতে ৮·৫৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি ও ২২·১৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করিয়াছে। বর্তমানে রপ্তানি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৮) **ভারত-মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও সীমান্ত বাণিজ্য**—প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে ভারত কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করায় ভারতে আড়তদারী বাণিজ্যের (Entrepot Trade) বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলি হইতে পণ্য আমদানি করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য আবার

কেনিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা, প্রণালী উপনিবেশ প্রভৃতি স্থানে ভারত প্রেরণ করে। ভারত কাশ্মীরের মধ্য দিয়া আফগানিস্থান, মধ্যপ্রাচ্য ও সৌদী আরব দেশগুলির সহিত কিছু 'সীমান্ত বাণিজ্য' (frontier trade) করে। এই বাণিজ্যের পরিমাণ মোট বাণিজ্যের তুলনায় এত কম যে সাধারণভাবে ইহার কোনো তুলনামূলক মূল্যায়ন হয় না। তবুও আঞ্চলিক গতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা যে একটি শুভ সূচনা তাহাতে সন্দেহ নেই।

ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Balance of Trade)

১৯৬৭-৬৮ সালের হিসাব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ঐ বৎসর প্রায় ১৩৭৬·৪৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি ও প্রায় ১০১৯·০২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করা হয়। ফলে, অনিবার্য কারণেই ভারতের ঐ বৎসর প্রায় ৩৫৭·৪৭ কোটি টাকা লোকসান হয়। ইহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Adverse balance of trade) বলা হয়। রপ্তানিমূল্য যদি আমদানিমূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, সে ক্ষেত্রে উহাকে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Favourable balance of trade) বলা হয়।

হিসাব হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে প্রতিবৎসর আমাদের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, আমরা খাদ্যে স্বনির্ভরতা লাভ করিতে পারি নাই। শিল্পোন্নয়নের জন্য আমরা অত্যধিক বর্ধিতহারে প্রচুর যন্ত্রপাতি ও শিল্পের মূল দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিতেছি। যে সমস্ত কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়া আমাদের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকিত তাহাও বর্তমানে দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া দেশ বিভাগের ফলে পাট ও তুলা উৎপাদনের স্থান পাকিস্তানের ভাগে চলিয়া যাওয়ায় ভারতকে ঐ সমস্ত কাঁচামাল পুনরায় আমদানি করিতে হইতেছে। মূলধনী দ্রব্যের আমদানি ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের সূচনা করে। অপরদিকে আমাদের এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তকে আয়ত্তে আনিবার জন্য বিভিন্ন ভাবে রপ্তানি-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা—নানা ভাবেই এই চেষ্টা চলিতেছে। প্রথমত রপ্তানিতে লিপ্ত শিল্প মালিকদের ভারত সরকার নানাভাবে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তারপর ১৯৫৭ সালে একটি বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড (Foreign Trade Board) এবং একটি স্বতন্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধির বিভাগ গঠন করেন (Directorate of Export

Promotion)। ইহা ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ জিনিসের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার পৃথক পৃথক কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন (Export Promotion Council)। সুতির কাপড়, সিল্ক ও রেয়নের কাপড়, প্লাষ্টিক ও লিনলিয়ম, গালার জিনিসপত্র, চামড়া, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জিনিসপত্র, মশলা ইত্যাদির রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পৃথক পৃথক কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ১৯৫৬ সালের মে মাসে সরকারী মালিকানায় ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি—

১। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করা।

২। অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির আমদানির ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কর্পোরেশন সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ কাজ করিয়া থাকেন।

১। ভারত যে সব দেশ হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্র আমদানি করিয়া থাকে, সেইসব দেশে ভারতীয় জিনিস রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা। ঐসব দেশে যে সব জিনিসের চাহিদা বেশী ভারতে সেইসব জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা কর্পোরেশন করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাশিয়া এবং ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে ভারত পাটজাত দ্রব্য ও চা রপ্তানি করিয়া থাকে। তাই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন ভারতবর্ষে এই দুই দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নানাভাবে উৎসাহ দিয়া থাকেন।

২। পৃথিবীর কোন দেশে, ভারতের কোন উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করা যাইতে পারে কর্পোরেশন সেই সম্বন্ধেও পর্যালোচনা করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আমেরিকায় ভারতীয় শিল্প এবং বিভিন্ন কুটিরজাত শিল্পদ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব অনুমান করিয়া, কর্পোরেশন নানাভাবে প্রচারের সাহায্যে ঐ দেশে ঐসব দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে।

৩। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য চালানোও কর্পোরেশনের অন্যতম কার্জ। এইরূপ করিতে পারিলে আর বৈদেশিক

মুদ্রার প্রয়োজন হয় না। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার যে অভাব আছে তাহা অনেকটা লাঘব করা যায়।

৪। ভারতীয় শিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ, যাহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়, তাহা একত্র আমদানি করিয়া প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন শিল্পে বণ্টনের দায়িত্বও কর্পোরেশন গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়ার ফলে, আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৫৬-৫৭ সালে, যেখানে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯·২ কোটি টাকা, ১৯৬৭-৬৮ সালে তাহা বাড়িয়া ১৮১·৩ কোটি টাকা হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে কর্পোরেশন নিজে ৫·৮ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে ; ১৯৬৭-৬৮ সালে, এই সংখ্যা ২৩·৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কাজেই এই কর্পোরেশনের দ্বারা আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে উন্নতি হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনুশীলন

(ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য)

১। টীকা লেখ :

ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন (S.F. 1968) ; বৈদেশিক বাণিজ্য।

(S. F. Comp. 1963) (উ:—পৃ: ৪৭৮-৭৯)

২। নিম্নলিখিত দেশের সহিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ দাও :

(ক) জার্মানী, (খ) গ্রেট বৃটেন, (গ) জাপান, (ঘ) রাশিয়া, (ঙ) আমেরিকা, (চ) পাকিস্তান।
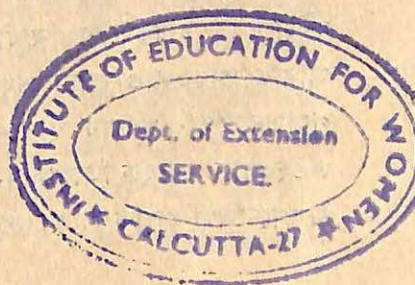
ভারতের বৈদেশিক নীতি

সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষত প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত, এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া আসিতেছে। একদিকে যেমন এইসব দেশের কত বিভিন্ন জন কত বিচিত্র সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া এদেশে আসিয়া একে একে ধীরে ধীরে এই দেশের সমাজ জীবনে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এই দেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে ভারতবর্ষ হইতেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ঐসব দেশে প্রবাহিত হইয়া ঐসব দেশের সংস্কৃতির উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তোমরা জান, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই সম্রাট অশোকের দূতেরা পশ্চিমে সুদূর এপিরাস, কাইরিনি, সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন প্রভৃতি দেশে, দক্ষিণে সিংহলে, পূর্বে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ব্রহ্ম, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার পর হইতে ইংরেজদের আগমন পর্যন্ত ঐসব দেশের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। কিন্তু ইংরেজ আগমনের ফলে এই যোগসূত্র শিথিল হইয়া পড়ে ; ক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। শুধু ভারতবর্ষই নহে ; এই সময় য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকতার প্রসারের ফলে ঔপনিবেশিকতার স্বার্থেই প্রাচ্যের প্রায় সব দেশই প্রাচ্যস্থ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কি অর্থনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক—উভয়ক্ষেত্রেই 'তাহাদের একমাত্র যোগসূত্র বজায় থাকে তাহাদের নিজ নিজ পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক প্রভুদের দেশের সহিত। এই সময় ভারতবর্ষেরও প্রধান যোগসূত্র স্থাপিত হয় শুধুই বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সঙ্গে।

আমাদের বৈদেশিক সংযোগের ইতিকথা

কিন্তু ১৯৫৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভে অন্যান্য দেশ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। আবার ভারতবর্ষও প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্যের দেশগুলির সহিত তাহার পুরাতন সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, মালয়, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাজ্যে এবং পশ্চিমে পারস্য, আরব, মিশর, সিরিয়া.

জর্ডন, ইরাক প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্যগুলিতে পরিভ্রমণ করায় ঐসব দেশে ভারতের বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার বাণী প্রচারিত হইয়াছে।

বস্তুত, আমাদের বৈদেশিক নীতির মূল কথাই হইতেছে বিভিন্ন রাজ্যের সহিত বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা বজায় রাখা। আমাদের সংবিধানের আলোচনা প্রসঙ্গে তোমরা দেখিয়াছ, আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনায় যেসব নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অন্যতম হইতেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, পররাষ্ট্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির সম্মান প্রদর্শন এবং শান্তিপূর্ণভাবে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া বিরোধসমূহের মীমাংসা করার চেষ্টা করা—ইহাই হইবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ভারতের বৈদেশিক নীতি এই মূল নীতির দ্বারাই পরিচালিত। একই কারণে ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হইতেছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী জনগণকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা, কোনো বিশেষ বৈদেশিক শক্তির সহিত নিজেকে জড়াইয়া না ফেলা, সমস্ত রকম সামরিক চুক্তি, অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি, বা আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার সর্বরকম বিরোধিতা করা, এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন। কারণ, ভারতবর্ষ মনে করে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষাকল্পে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য।

আমাদের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী ১৯৫৪ সালে চীনের সহিত তিব্বত সম্বন্ধে চুক্তি প্রসঙ্গে ভারতের উপরিউক্ত বৈদেশিক নীতিকে পাঁচটি সূত্রে উপস্থাপিত করেন। ইহারাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পঞ্চশীল নামে খ্যাত। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে উপস্থিত ২৯টি আফ্রো-এশীয় দেশ এই পঞ্চশীলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। পরবর্তীকালে যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া পোল্যাণ্ড, মিশর প্রভৃতি দেশের সহিত আমাদের সম্পর্কও এই পঞ্চশীলের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই পঞ্চশীল শব্দটি অবশ্য এদেশে নূতন কিছু নহে। তোমরা জান, বুদ্ধদেব যখন তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন তখন তিনি মানুষের অবশ্যকরণীয় পাঁচটি আচারের উল্লেখ করেন—সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। আমাদের বৈদেশিক নীতির পঞ্চশীলের

পঞ্চশীল

সহিত অবশ্যই এই পঞ্চশীলের কোনো সম্পর্ক নাই। শুধুমাত্র, বুদ্ধদেব মানুষকে যেমন কয়েকটি নীতি মানিয়া চলার নির্দেশ দিয়াছিলেন, তেমনি ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির কতকগুলি নীতি মানিয়া চলা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পঞ্চশীল হইতেছে—

(১) পরস্পরের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক সংহতিতে শ্রদ্ধা রাখা।

(২) অনাক্রমণ অর্থাৎ অন্যের অধিকৃত অঞ্চল দখল করার চেষ্টা না করা।

(৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

(৪) পরস্পরের সমতা বজায় রাখা ও পারস্পরিক উন্নতির সহায়তা করা।

(৫) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি উভয় রাজ্যের অবস্থানের মধ্য দিয়া উভয়েরই উন্নতির চেষ্টা করা।

এই পঞ্চশীলই আমাদের বৈদেশিক নীতির প্রধান ভিত্তি।

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের বৈদেশিক নীতির একটি প্রধান লক্ষ্য কোনো বিশেষ শক্তিগোষ্ঠীর সহিত জড়াইয়া না পড়া। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, পৃথিবী আজ দুইটি প্রধান শক্তিগোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। এক গোষ্ঠীতে রহিয়াছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, নরওয়ে, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানি, ইতালী, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশগুলি। ইহারা পরস্পরের মধ্যে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি প্রভৃতি চুক্তি দ্বারা (N. A. T. O. North Atlantic Treaty Organisation), S. E. A. T. O. (South-East Asia Treaty Organisation) প্রভৃতি সংগঠন গড়িয়া তুলিয়া নিজেদের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও নিরাপত্তার আয়োজন করিয়াছেন। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি কমিউনিষ্ট মতাবলম্বী রাজ্যগুলি ওয়ারশ' চুক্তি প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়াছেন। পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির বেশীর ভাগই এই দুই বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর কোনো একটার সহিত নিজেদের সত্তা বিলাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা করে নাই। বস্তুত, ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য নেতিবাচক নিরপেক্ষতা নহে। ভারতবর্ষ এই দুই গোষ্ঠীর কোনোটির সহিতই নিজের সত্তা

ভারতবর্ষের কোনো বৃহৎ শক্তির সহিত নিজেকে সনাক্ত না করার নীতি

বিলাইয়া দেয় নাই। তাই বলিয়া আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সে যে স্বীয় অভিমত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিবে না বা যখন আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হইবে তখন সে নিরপেক্ষভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহা নহে।

বস্তুত, কোনো বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর সহিত নিজেকে বিলাইয়া না দিয়া স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ মতামত ও কার্যকলাপের নীতি ভারতবর্ষকে কোরিয়া, সুয়েজ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষায় ভারতের অবদান

কোরিয়া

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধ যখন আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে তখন জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভারতই প্রথম দাবী করে যে জাতিসঙ্ঘের সেনাবাহিনীর ৩৮ অক্ষাংশ অতিক্রম করা উচিত হইবে না। প্রথমে এই দাবী গ্রাহ্য না হইলেও, চীনা স্বেচ্ছাসেবকদের উত্তর কোরিয়ার সমর্থনে অগ্রসর হওয়ার পর ভারতবর্ষের এই দাবীর যৌক্তিকতা সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। পরিশেষে ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই ভারতবর্ষের প্রস্তাব গৃহীত হইলে তবেই ঐ যুদ্ধ বন্ধ হয়। সেই সময় ভারতবর্ষকে নিরপেক্ষ জাতিদের লইয়া গঠিত বন্দী বিনিময় কমিশনের (Neutral Nation Repatriation Commission) সভাপতি হিসাবে এক গুরু দায়িত্ব বহন করিতে হয়। কিন্তু কমিশনের ভারতীয় সভাপতি জেনারেল থিমায়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কোরিয়ায় শান্তি স্থাপিত হয়।

ইন্দোনেশিয়া

প্রধানত ভারতবর্ষের চেষ্টার ফলেই ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়াছে। ডাচ্ সাম্রাজ্যবাদের একগুঁয়েমীর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষই পৃথিবীর জনমতকে সংহত করে এবং এই উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি সম্মেলনও আহূত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের চেষ্টার ফলেই ইন্দোনেশিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ইন্দোচীন

কোরিয়ার ন্যায় ইন্দোচীনের অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া সেখানে শান্তি-স্থাপনের ব্যাপারেও ভারতবর্ষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কলম্বো সম্মেলন এবং পরবর্তীকালে জেনেভা সম্মেলনে ভারতের প্রস্তাব বিশেষভাবে আলোচিত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেননের প্রচেষ্টায় ১৯৫৪ সালের ২রা জুলাই

ইন্দোচীনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়। শান্তি চুক্তি যথার্থ প্রয়োগের জন্য যে তিন জাতির পরিদর্শন কমিটি (Three Nation Supervisory Commission) গঠিত হয় তাহার অন্যতম সদস্য হিসাবে ভারত স্বীয় সৈন্যবাহিনী সেই দেশে পাঠাইয়া সেখানকার শান্তিরক্ষায় প্রভূত প্রয়াস পায়।

মিশরে সুয়েজখালের ব্যাপার লইয়া যখন ইংরেজ, ফরাসী ও ইস্রায়েলী সৈন্যরা মিশর আক্রমণ করে তখন ঐ সব সৈন্যদের মিশর হইতে আশু নিষ্ক্রমণের যে আফ্রো-এশীয় প্রস্তাব করা হয়, ভারতবর্ষ ছিল তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা। এই উদ্দেশ্যে মিশরে যখন জাতিসঙ্ঘের সৈন্য প্রেরণ করা হয় তখন সেই সৈন্যদলে ভারতবর্ষও তাহার সৈন্যদের প্রেরণ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা ভারত স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেয় যে ভারতীয় সৈন্যদল শুধুমাত্র বিদ্রোহী সৈন্যদের নিষ্ক্রমণ ও যুদ্ধবিরতি তদারক করিবে মাত্র।

মিশর

একই কারণে হাঙ্গেরীতে রুশ সৈন্যসমাবেশের প্রতিবাদ জানাইয়াও ভারতবর্ষই প্রস্তাব আনয়ন করে। ভারতীয় প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হাঙ্গেরীতে জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকদের গমনের ব্যবস্থা হয়।

হাঙ্গেরী

জাপান সম্বন্ধে সান-ফ্রান্সিস্‌কোতে যে চুক্তি সম্পাদনের আয়োজন করা হয়, ভারতবর্ষ তাহার তীব্র বিরোধিতা করে এবং একটি শক্তিমান এশীয় জাতির ব্যাপারে এইরূপ অসম্মানকর চুক্তি সম্পাদনের গুরুত্ব সম্বন্ধে পৃথিবীকে অবহিত করে।

জাপান

আফ্রিকার দেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সমর্থনও ভারত সর্বদা জানাইয়াছে। চাপে পড়িয়া বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদ কঙ্গো ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও, ষড়যন্ত্র করিয়া কঙ্গোতে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ এই গৃহযুদ্ধ নিবারণেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় সেখানে কাটাঙ্গার সভাপতি শোম্বে যখন এক আত্মঘাতী যুদ্ধের সূত্রপাত করেন, জাতিসঙ্ঘ তখন প্রথম দিকে যে কারণেই হউক প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতবর্ষই তখন এই সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জোর দিয়া ঘোষণা করে ও অবিলম্বে সেখানে জাতিসঙ্ঘের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবী করে। এই উদ্দেশ্যে ভারত সেখানে জাতিসঙ্ঘ বাহিনীর অংশ হিসাবে ভারতীয়

কঙ্গো

সৈন্যও প্রেরণ করে। ভারতীয় প্রচেষ্টাতেই ১৯৬২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্যের অপসারণের নির্দেশ দিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে কাটাঙ্গায় অস্ত্রশস্ত্রের গোপন সরবরাহের বিরুদ্ধে যেমন ভারত জোর গলায় প্রতিবাদ জানায়, তেমনি কঙ্গোর প্রধান মন্ত্রী আদোলার অস্ত্র-সরবরাহের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করে।

উপনিবেশসমূহ

অছি পরিষদের সদস্য হিসাবে ভারত উপনিবেশগুলির স্বাধীনতালাভের ব্যাপারেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তাহার প্রচেষ্টাতেই ডাঃ মালানের ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দখলের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। টিউনিশিয়া, মরোক্কো, কেনিয়া, আলজেরিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি দেশের স্বাধিকারের ব্যাপারেও ভারতবর্ষ প্রধান মুখপাত্র হিসাবে কাজ করিয়াছে।

এমনিভাবে, যদিও বৃহৎ শক্তিগুলির তুলনায় ভারত অনগ্রসর দেশ, তবু সে শান্তির প্রতি তাহার ঐকান্তিক বিশ্বাস ও অনুরাগ লইয়া বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার 'বলিষ্ঠ নিরপেক্ষ' নীতির দ্বারা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ রোধে প্রয়াস পাইয়াছে।

পাকিস্থান

শুধু বিদেশের সমস্যার সমাধানই নহে। ভারত স্বীয় সমস্যাও একই নীতি অনুসরণ করিয়া সমাধানের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারত-পাকিস্তান সম্বন্ধের উল্লেখ করা যায়। নিম্নলিখিত কারণে ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে সম্বন্ধ, ভারতের আপ্রাণ চেষ্টাসত্ত্বেও সৌহার্দ্যপূর্ণ হইতে পারিতেছে না। (১) ভারতের প্রতি বিদ্বেষ নিয়াই পাকিস্তানে জন্ম এবং ভারত বিরোধিতা এখনও পাকিস্তানী বৈদেশিক নীতির মূল সুর। সাম্প্রদায়িকতার ধ্বনি দিয়া হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করিয়া পাকিস্তানের প্রকৃত সমস্যা এবং সরকারের বিফলতা হইতে জনসাধারণের দৃষ্টি অপর দিকে আকৃষ্ট করার নীতি পাকিস্তানী সরকার বিধিবদ্ধ ভাবে অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। (২) ভারত এবং পাকিস্তানের যখন সৃষ্টি হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত নির্দেশনার কাজ সুষ্ঠু ভাবে সমাপ্ত হয় নাই। ইহার সুযোগ লইয়া পাকিস্তান সব সময়ই সীমান্ত সম্বন্ধে নূতন নূতন দাবী দাওয়ার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। (৩) স্ব-ইচ্ছায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পাকিস্তান কিছুতেই তাহার উপর

দাবী ছাড়িতেছে না। এমনকি উহার এক অংশ অবৈধ ভাবে অধিকার করিয়া আছে। (৪) ভারতের যত শত্রু আছে তাহাদের সঙ্গে পাকিস্তান সব সময়ই চক্রান্ত চালাইয়া আসিতেছে। চীন এবং ভারতের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইলে, পাকিস্তান চীনের প্রধান বন্ধু হইয়া দাঁড়ায়। এমনকি ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সুযোগ নিতেও পাকিস্থান চেষ্টা করিতেছে। নাগা এবং মিজো বিদ্রোহীদের সে অস্ত্র-শস্ত্র এবং গরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া ভারতের প্রত্যক্ষ শত্রুতা করিতেছে। (৫) ভারতের নদী পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধেও পাকিস্তান নানারূপ দাবী-দাওয়া তুলিয়া ধরার সৃষ্টি করিতেছে (ফরাক্কা বাঁধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়)। (৬) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তান তাহাদের ভারতে আশ্রয়প্রার্থী রূপে আসিতে বাধ্য করিতেছে। আজ পর্যন্তও হাজারে হাজারে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করিতেছে। (৭) যখন যেখানে সুযোগ পাইতেছে পাকিস্তান ভারত সীমানায় হানা দিয়া লুটতরাজ প্রভৃতি করিতেছে। (৮) ভারতের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ ভাবে পাকিস্তান অপপ্রচার ও কটূক্তি করিয়া চলিয়াছে। (৯) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দুইবার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে। প্রথমত পাকিস্তান কচ্ছের রান অঞ্চলে সসৈন্য প্রবেশ করে। ভারত বাধা দেয়। তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলসনের চেষ্টায় এবং আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় এই বিবাদের মীমাংসার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই ঘটনার অল্পদিন পরেই (১৯৬৫ সালে) পাকিস্তান দ্বিতীয়বার কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ করে এবং ভারতের সীমানা লঙ্ঘন করিয়া ছাম্ব এলাকায় সামরিক আক্রমণ সুরু করে। ভারতবর্ষ কিন্তু তদানীন্তন ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল চৌধুরীর নেতৃত্বে আক্রমণ কারীদের বাধা দেয় এবং পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া লাহোর, শিয়ালকোট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া পাকিস্তানের সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করে। পাকিস্তান জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবক্রমে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়।

১৯৬৬ সালে রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তান সম্বন্ধের উন্নতির জন্য তাশখন্দে (রাশিয়া) ভারত ও পাকিস্থান এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু ভারত যদিও আন্তরিকতার সহিত এই চুক্তি মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে, পাকিস্তানের সে বিষয়ে কোন আগ্রহই দেখা যাইতেছে না।

ফলে আজও ভারত-পাকিস্তান সম্বন্ধের উন্নতি হয় নাই। অথচ এই দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে কাহারও মঙ্গল নাই।

চীন

দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানের মতো চীনও ভারতের সঙ্গে কিছুতেই সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না। চীনে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভারত সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করিয়া নয়া চীন সরকারকে স্বীকৃতি এবং নৈতিক সমর্থন জানায়। জাতিসঙ্ঘে চীনের সদস্যপদ লাভের জন্যও ভারত প্রথম হইতেই চেষ্টা করে। ভারত চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল নীতিতে স্বাক্ষর করে। চীনের প্রধান মন্ত্রী ভারত সফরে আসিলে 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' রবে ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। চীন যখন তিব্বত অধিকার করিল ভারত তখনও চীনের সঙ্গে মৈত্রীর খাতিরে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিল না। ভারতের এইসব মিত্রতাসুলভ কার্যক্রম সত্ত্বেও চীন সরকার ভারতীয় লাদাক অঞ্চলে (আকসাই চীন সংলগ্ন অঞ্চল দাবী করিয়া) বেআইনী অধিকার স্থাপন করিল। কিন্তু এত প্ররোচনা সত্ত্বেও ভারত যুদ্ধে অগ্রসর হইল না। সে আলাপ-আলোচনার মারফতেই চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসার আশা করিতে লাগিল।

ভারতের এই মিত্রভাবাপন্ন মনোবৃত্তির সুযোগ লইয়া ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং আধুনিকতম সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ভারত আক্রমণ করিল। ভারত আক্রমণে চীনের উদ্দেশ্য কি ছিল বুঝা কঠিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হইলেও চীন তাহার সৈন্য হঠাইয়া নিল। বর্তমান বৎসরে (১৯৭০) ভারত চীন সম্বন্ধের কিছুটা উন্নতি দেখা যাইতেছে। এশিয়ার এই দুই বৃহত্তম দেশের মধ্যে যত শীঘ্র মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এশিয়ার পক্ষে ততই তাহা মঙ্গলজনক হইবে।

ভারতবর্ষ ও কমনওয়েলথ

অন্যদিকে, ভারতবর্ষের এই বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতির ফলেই সে কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই। কেহ কেহ অবশ্য সমালোচনা করিয়া থাকেন যে কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের সার্বভৌমিকতা বিনষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় ভারতকে যে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হইবার ফলে কার্যত সেই সার্বভৌমিকতা ভারতের নাই। কিন্তু

এই ধারণা ঠিক নহে। আন্তর্জাতিক মৈত্রীতে আস্থাবান বলিয়াই ভারতবর্ষ তাহার পূর্বতন শাসক বৃটেনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে নাই ; সেইজন্যই সে কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিতে ভারত বাধ্য নহে। কি আভ্যন্তরীণ, কি আন্তর্জাতিক—উভয়ক্ষেত্রেই ভারত যে কোনো বিষয়ে যে কোনো স্বাধীন নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে পারে ; বৃটেনের রাষ্ট্রপ্রধান কমনওয়েলথের প্রধান হইলেও শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে ভারতের উপর তাহার কোনো কর্তৃত্বই নাই। তাই সেই দিক হইতে ভারতের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারত কমনওয়েলথে থাকিয়াও যে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহার প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা (যদিও বৃটেন ইহার বিরোধী)। শাদা চামড়া ভিন্ন, অপরাপর বর্ণের নির্যাতন বন্ধ না করা পর্যন্ত ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত সর্বপ্রকার বাণিজ্য বন্ধ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে যাহাতে কোনো দেশ তৈল সরবরাহ না করে সেই চেষ্টায়ও ভারত অগ্রগী হইয়াছে। মোটকথা, যেখানে অন্যায়, যেখানে নির্যাতন, ভারত সেখানেই নির্যাতিতের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষ ও জাতিসঙ্ঘ

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের বৈদেশিক নীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য জাতিসঙ্ঘের সনদের ও কার্যকলাপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন। যদিও সাম্প্রতিককালে জাতিসঙ্ঘের কোনো কোনো কার্যকলাপ অনেকের মনেই ইহার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগাইয়াছে, তবু ভারতবর্ষ ইহার লক্ষ্যের প্রতি এখনও পরম আস্থাশীল। আগেই বলা হইয়াছে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে দুইটি বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ অন্যান্য নিরপেক্ষ ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সহিত একযোগে এই বিবদমান শক্তিদ্বয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস পাইয়া চলিয়াছে। শান্তি ও মানবজাতির কল্যাণের প্রতি তাহার পরম বিশ্বাস লইয়া ভারতবর্ষ ইহাদের বিরোধ ও বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ যথাসম্ভব দূর করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার কাজে সহায়তা করিয়া চলিয়াছে।

ভারতীয় প্রতিনিধিরা বরাবরই জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সম্মেলনে ও কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতবর্ষ দুই বৎসরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল। ১৯৫৪ সালে শ্রীমতী

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত জাতিসঙ্ঘের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। আমাদের বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ইউনেস্কোর বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করেন, রাজকুমারী অমৃত কাউর পৃথিবীর স্বাস্থ্য-সংস্থার (WHO) বিভিন্ন সভায় সভানেত্রীত্ব করেন, রামস্বামী মুদালিয়র করেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সিলের সভায়, ডাঃ ভাবা করেন এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সভায়, শিব রাও করেন অছি পরিষদের সভায়।

সাম্প্রতিককালে আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া যে বিধ্বংসকারী আণবিক বোমার পরীক্ষায় রত হইয়াছে, ভারতবর্ষ ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধেও জাতিসঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে। ১৯৬১ সালের ৩রা নভেম্বর আণবিক বোমার পরীক্ষায় রত আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য প্রভৃতির বিরোধিতা সত্ত্বেও বিপুল ভোটাধিক্যে আণবিক বোমার পরীক্ষা হইতে বিরত হওয়ার যে আবেদনমূলক প্রস্তাবটি জাতিসঙ্ঘে গৃহীত হয়, তাহার অন্যতম প্রস্তাবক ছিল ভারত। সুখের বিষয়, অধুনা, ভূনিম্নবর্তী আণবিক বোমার পরীক্ষা বন্ধ করিয়া, রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে। পৃথিবীর শতাধিক দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে। স্বভাবতই এই চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে ভারতই অগ্রণী হইয়াছে।

জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ ছাড়াও ইহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাদিতেও ভারত বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। জাতিসঙ্ঘের শুরু হইতেই ইহার অন্তর্গত FAO, ECAFE, WHO, UNESCO, ILO প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারত কাজ করিয়া আসিতেছে। ভারতের আমন্ত্রণে ১৯৫৩ সালে বাঙ্গালোরে ECAFE-এর দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। FAO-এর ডিরেক্টর জেনারেল হইতেছেন শ্রী বি. আর. সেন। ভারতের আমন্ত্রণে UNESCO-র নবম সাধারণ সম্মেলনও ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে UNESCO-র বিভিন্ন প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য ভারত নানাভাবে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। ভারত ILO-রও সদস্য এবং ইহার পঁচিশটির বেশী নিয়ম শ্রমিকদের স্বার্থে ভারতের চেষ্টায়ই পরিবর্তিত হইয়াছে। ভারত WHO, আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রভৃতিরও অন্যতম সদস্য।

শুধু তাহাই নহে। জাতিসঙ্ঘ ও ইহার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক

ব্যাপারেও ভারতের দেয় অর্থের পরিমাণ পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সাম্প্রতিককালে এই অর্থের পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অনুশীলন

(ভারতের বৈদেশিক নীতি)

১। স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (S.F. 1967)

(উঃ—পৃঃ ৪৮০-৮২)

২। বিশ্বশান্তি ও সৌহার্দ্যই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য—স্বাধীন ভারতের অপক্ষপাতিতা নীতির পরিপ্রেক্ষিতে উক্তিটির আলোচনা কর। (S. F. 1967)

(উঃ—পৃঃ ৪৮২-৮৮)

৩। টীকা লেখ—

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে (S. F. 1968) ; পঞ্চশীল ; বান্দুং সম্মেলন ; কল্যাণ রাষ্ট্র ; বিশ্বশান্তি। (S. F. Comp. 1968)

(উঃ—পৃঃ ৪৮১, ৪৮৫)

নিম্নলিখিত বিতর্কের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে—

(১) ভারত পাকিস্থান সম্বন্ধের উন্নতি ;

(২) ভারতীয় নিরপেক্ষতা নীতির প্রশংসা।

SYLLABUS IN SOCIAL STUDIES

(*For the School Final Examination 1965 onwards*)

A. Introduction

Unit 1. The country we live in—its physical background—geographical position in relation to the rest of the world—the political set-up—the Indian Union and the constituent States—Living as citizens of Free India.

B. Our Basic Needs

Unit 2. Food—food taken in different parts of India—influence of environment (natural and social) on food habits—composition of our food and its nutritive value.

A comparative study of food in India and a few typical countries, *e. g.* Arab countries, Mediterranean countries, Japan, Lapland etc.

Unit 3. Clothing—clothing worn in different parts of India—influence of environment (natural and social) on clothing—aesthetic in clothing.

A comparative study of clothing in India and a few typical countries *e. g.* Desert Lands, undeveloped African countries, European countries, Polar regions.

Unit 4. Shelter—Types of our houses in different parts of India—influence of environment (natural and social) on housing—modern developments and problems of housing in India.

A comparative study of housing in India and a few typical countries, *e. g.* Desert Lands, Polar Regions, European countries and U.S.A., African jungles.

Unit 5. Other Needs—Consumers' goods and services.

C. How We Meet Our Needs

Unit 6. Our principal occupations for meeting the basic needs—agriculture and supplementary occupations, forestry, mining, fishing and pastoral occupations, industries, transport, social services *e. g.* education, health, entertainments, administration, law and order.

Unit 7. Detailed studies of the important occupations and services.

(*i*) Agriculture—Principal Crops—types of agriculture—geographical factors and methods of cultivation. Need

for irrigation—the role of River Valley Projects in India's economic progress. The problem of self-sufficiency in Food.

A comparative study between India and a few other countries, *e. g.* Japan, Egypt, U.S.A., U.S.S.R. regarding crops, methods of cultivation and yield.

(*ii*) Occupations supplementary to agriculture—fishing animal husbandry, poultry, dairy, preservation of food.

(*iii*) Forestry—Important forest areas and products—utilisation, conservation and afforestation.

(*iv*) Mining—mineral wealth of India—important mining centres—utilisation and conservation.

(*v*) Industries—different types—heavy industries, *e. g.* iron and steel, textile (jute, cotton, wool, silk, synthetic), chemical, shipbuilding, locomotive, automobile and aircraft industries.

Our cottage industries—chief centres of production in West Bengal.

(*vi*) Transport and Communication in India—forms of communication and transport in rural and urban areas.

A comparative study of different forms of transport in typical areas, *e. g.* desert lands, polar regions, mountains etc.

A brief account of the development of transport through the ages—invention of wheel and mechanical power—use of steam, gas, electricity and atomic power—recent developments, *e. g.* space-ship.

D. Our Culture and Heritage

Unit 8. (*a*) The past background—a short survey of the evolution of Indian culture and heritage through the Ages (only land-marks to be touched).

(*b*) Our Religion—principal religions in India—Hinduism, Buddhism, Jainism, Christianity and Islam—teaching of some important religious reformers of medieval and modern times.

(*c*) Our Language—the chief language groups and linguistic areas—Federal language and Regional languages—medium of instruction at different stages of education.

(*d*) Our Art—some notable forms of Art—Ajanta, Ellora, Gandhara, Mahavalipuram, Mughal and Rajput Art—Modern Art.

(*e*) Our Architecture—some notable forms of architecture—temples, mosques, and other famous historical buildings.

(*f*) Our Music—Classical and other forms of music—Baul, Bhatiali, Folk-songs, 'Rabindra Sangeet'.

(*g*) Our Dance—classical, modern and folk dances of India—their characteristics.

In the teaching of the above item, it is not necessary to go into technical details. Attempt should be made to present things like Music, Dance, Art and Architecture in real or realistic settings with ample suitable illustrations.

E. Our National Government

Unit 9. (*a*) Living as citizens of Free India—achievement of Independence in 1947—building up a New India—a free, sovereign, democratic republic with a rich heritage and culture—unity in diversity.

(*b*) How we attained Independence in 1947. First war of Independence against the British in 1857—growth of Nationalism and the Indian National Congress—Partition of Bengal—Swadeshi Movement—Mahatma Gandhi and Non-violent Non-co-operation movement—armed struggle in Bengal—August movement 1942—Netaji and the I.N.A. Achievement of Independence in 1947.

(*e*) Our National Government—The New Constitution, 1950—Important features of the Constitution—Fundamental Rights and Duties—Federal character—Centre and Constituent Units—Parliamentary Government—universal suffrage and democratic government—How our laws are made and administered—our Local Administration.

India, a Welfare State—increasing role of Government in the economic life of the people—India's striving for a socialistic goal.

F. India To-day

Unit 10. Post-Independence efforts towards Reconstruction.

(*a*) Our immediate problems—growing population—economic problems—problems of health and education—our efforts to solve them. The Five Year Plans—their main features—Development of Power, Heavy Industries, Community Development etc. Family Planning.

(*b*) India's Foreign Trade—commodities we generally export and commodities we import—countries with which most of the trading take place—change in the nature of Trade especially with reference to Trade-Balance.

(*c*) India's Foreign Policy—Policy of Non-Alignment—participation in World Organisations—India's efforts in the preservation of world peace—India's place in the comity of Nations.

G. Man as Citizen of the World

Unit 11. Shrinkage of distance through development of transport and communication facilities—growing inter-dependence of Nations and countries—Necessity of World Peace—World Organisations and their efforts towards solution of international problems—need of developing world-mindedness.

PRACTICAL WORK

The practical work should consist of the following :—

(*a*) Visits of educational value, *e. g.* to factories, farms, ports, museums, industrial and agricultural fairs, National Library etc. and preparation of individual and group reports on visits.

(*b*) Educational projects and activities and preparation of handiwork, models, charts, graphs and short reports.

(*c*) Maintenance of individual scrap-book.

(*d*) Organisation of cultural and educational functions including educational exhibition.

(*e*) Celebration of Independence Day and Republic Day.

Two consecutive periods should be available when project work is undertaken.